সংসদে যা বলেছি

মওদুদ আহমদ

মওদুদ আহমদের সংসদে দেয়া বক্তৃতার নির্বাচিত এই সংকলনে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রসার ও বিকাশ, ভূমি সংস্কার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, গণতন্ত্রে উত্তরণে সাংবিধানিক সংকট, ধোলাইখাল কনসেপ্ট, রাষ্ট্রধর্ম, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা এবং ঔষধনীতির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক নীতি-নির্দেশনায় ও সামাজিক উন্নয়নে যে বিবর্তন ঘটেছে তার একটি ধারাবাহিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

এছাড়াও এতে পাওয়া যাবে সুশাসন, সুবিচার, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য, বাংলাদেশের ভাবমূর্তি, হরতাল কালচার, নারীর ক্ষমতায়ন, দেশের অর্জন, সংসদের কার্যকারিতা, বিরোধী দলের ভূমিকাসহ সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুর উপর আলোচনা।

সর্বোপরি আরো পাওয়া যাবে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য কিছু সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট ও এতদ্‌সম্পর্কে আইনমন্ত্রী হিসেবে লেখকের দেয়া ব্যাখ্যা।

ঋজু অথচ তীক্ষ্ণ বক্তব্য, যুক্তিজালের বিস্তার, বাক্যচয়ন, উপস্থাপনা শৈলী, আঘাতে প্রতিঘাত, কৌতুক, ইত্যাদির সংমিশ্রণে এই বক্তৃতাগুলি পাঠকের কাছে অবশ্যই চিত্তাকর্ষক হবে বলে আশা করা যায়। আমাদের দেশে সংসদীয় রাজনীতি, পদ্ধতি ও চর্চার ক্রমবিকাশ ও ক্রমোত্তরণের ক্ষেত্রেও এই সংকলনটি একটি বিশেষ প্রকাশনারূপে আদৃত হবার দাবী রাখে।

(পরবর্তী ফ্ল্যাপে দেখুন)

টাকা ৬০০.০০

www.pathagar.com

মওদুদ আহমদ, ব্যারিস্টার, বাংলাদেশ সরকারের একজন সিনিয়র মন্ত্রী এবং বর্তমানে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এর আগে তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদেও দায়িত্ব পালন করেছেন। একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতিতে তিনি যেমন প্রজ্ঞার পরিচয় রেখেছেন, তেমনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে নিয়মিত লিখে চলেছেন।

জনাব আহমদ জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৬, ১৯৮০ ও ১৯৯৬), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৩) ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮১ ও ১৯৯৮) সমূহের ফেলো। তিনি দি জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৯৭) ইলিয়ট স্কুলের একজন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবেও অধ্যাপনার কাজ করেছেন। ইউপিএল থেকে তাঁর প্রকাশিত বই: *Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy* (1976), *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman* (1983), *Democracy and the Challenge of Development: A Study of Politics and Military Interventions in Bangladesh* (1995), এবং *South Asia: Crisis of Development – The Case of Bangladesh* (2002)। প্রথমোক্ত ৩টি বইয়ের বাংলা অনুবাদ *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, *বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল* এবং *গণতন্ত্র ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ – পেক্ষাপট: বাংলাদেশের রাজনীতি ও সামরিক শাসন* ইউপিএল থেকেই যথাক্রমে ১৯৯২, ১৯৮৩ ও ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

ISBN 984 05 0278 6

www.pathagar.com

সংসদে যা বলেছি

মওদুদ আহমদ

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

www.pathagar.com

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট হাউস
৬১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
পোস্ট বক্স ২৬১১
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফ্যাক্স : (৮৮০২) ৯৫৬ ৫৪৪৩
E-mail : upl@bttb.net.bd, upl@bangla.net
Website : www.uplbooks.com

প্রথম প্রকাশ ২০০৫
স্বত্ব© দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ২০০৫

প্রচ্ছদ
আনওয়ার ফারুক

ISBN 984 05 0278 6

প্রকাশক : মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট হাউস, ৬১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০। টাইপসেটিং: শিশির বোস, মার্ক প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১৬০/১, শান্তিনগর, ঢাকা। এ এম এস এন্টারপ্রাইজ-এর তত্ত্বাবধানে একতা অফসেট প্রেস, ১১৯, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Sangsadey Ja Bolechi (Selected Parliamentary Speeches by Moudud Ahmed, 1982-04), published in 2005 by The University Press Limited, Red Crescent House, 61, Motijheel C/A, Dhaka 1000, Bangladesh.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত শহীদদের স্মরণে এবং
বাংলাদেশে একটি কার্যকর সার্বভৌম
সংসদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

মুখবন্ধ ix

রাষ্ট্রপতি সাত্তারের ভাষণের উপর বক্তব্য ১

রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণের উপর বক্তব্য ৭

সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ ১৩

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ১৭

১৯৮৭-৮৮ সালের বাজেট ২১

সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ ৩৩

রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণের উপর সমাপনী বক্তব্য ৪৩

১৯৮৮-৮৯ সালের বাজেট এবং সমাপনী ভাষণ ৫৫

বন্যাউত্তর বিশেষ অধিবেশন ৭১

পার্বত্য চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস রেগুলেশন রহিত আইন, ১৯৮৯ এবং
পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনসমূহ, ১৯৮৯ ৭৯

বিনিয়োগ বোর্ড আইন, ১৯৮৯ ৮৯

রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণের উপর সমাপনী বক্তব্য ৯৫

১৯৮৯-৯০ সালের বাজেট ১০৭

সংবিধান (নবম সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ ১২৭

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণের উপর বক্তব্য ১৩৩

সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ ১৩৭

বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতি ১৪১

১৯৯২-৯৩ সালের বাজেট ১৪৫

'ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংস' সম্পর্কিত প্রস্তাব ১৫৫

রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের ভাষণের উপর বক্তব্য ১৫৯

১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেট ১৬১

লালবাগ হত্যাকাণ্ড ১৭১

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণের উপর বক্তব্য ১৭৫

এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২; এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ ১৮১

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ১৮৫

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল অধ্যাদেশ এবং আইন, ২০০২ ১৮৯

www.pathagar.com

যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ এবং আইন, ২০০৩	১৯৫
দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ২০০৩	২০১
অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩	২০৫
২০০৩-২০০৪ সালের বাজেট	২০৯
দেওয়ানী কার্যবিধি (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৩	২১৭
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩	২২৩
বিশেষ আদালত (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন, ২০০৩	২২৭
দি বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনারস এন্ড বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩	২৩১
দেওয়ানী কার্যবিধি (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৩	২৩৫
আদালত সংস্কার বাস্তবায়ন (সহায়ক বিধান) আইন, ২০০৪	২৪১
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪	২৪৩
সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪	২৪৯
সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ (চূড়ান্ত)	২৫৭
সংসদ সদস্য আহসানউল্যাহ্ মাস্টারের হত্যাকাণ্ড	২৬৭
দি রেজিস্ট্রেশন (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০৪	২৬৯
২০০৪-২০০৫ সালের বাজেট	২৭৭
ক্রিমিনাল ল এ্যামেন্ডমেন্ট আইন, ২০০৪	২৮৫
ইপিজেড শ্রমিক সংঘ ও শিল্প সম্পর্ক আইন, ২০০৪	২৮৯
জেল হত্যা মামলা	২৯৫
জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪	২৯৯
নির্ঘণ্ট	৩০৭

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

মানব সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে যে বিষয়টি প্রতিটি সমাজে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে সেটা হলো রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা; রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা স্থাপন করা, অর্থাৎ রাষ্ট্রের জন্য একটি মৌলিক কাঠামো নির্ধারণ করা যাকে রক্ষা করা ও বিকশিত করা ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ও অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের একটি জরুরী দায়িত্ব হিসাবে পরিগণিত হয়। এক একটি সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ এবং লক্ষ্য, যার উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ বা রাষ্ট্র তাদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, সমাজ ও রাষ্ট্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা শাসন ব্যবস্থা কায়েম বা পরিবর্তন করতে গিয়ে দেশে দেশে হয়েছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সংঘাত, আন্দোলন, সংগ্রাম, বিদ্রোহ এবং বিপ্লব। যদিও আপাতত মনে হয় এই বিষয়টি এখন একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে পৌঁছেছে, কিন্তু এই প্রক্রিয়া এখনও চলমান এবং অনন্তকাল পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে।

বিংশ শতাব্দীতে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে শাসন ব্যবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের সাথে সাথে মানুষের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, চাহিদা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন ঘটে। ইউরোপের শিল্প বিপ্লব এবং বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্রের বিকাশ বিশ্বে নতুন এক মেরুকরণের সৃষ্টি করে। আদর্শগত দ্বন্দ্ব সে সময় আরও তীব্র হয় এবং রাষ্ট্রসমূহ মূলত দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি হলো এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা তৈরি করা যেখানে রাজনীতি এবং অর্থনীতি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত আর অপরটি হয় ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে রাজনীতি এবং অর্থনীতি হবে মুক্ত, যা হবে উদার পরিবেশমণ্ডিত, যেখানে বিভিন্নমুখী স্রোতধারার সহ-অবস্থান থাকবে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার রূপায়ণে এই দুটি প্রধান দর্শন আরও সুকঠিন আকার ধারণ করে। এক দিকে থাকে একনায়কত্ববাদী কম্যুনিস্ট শাসন আর অন্যদিকে থাকে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। দুই পরাশক্তির আবির্ভাবের কারণে কিছু কিছু রাষ্ট্র যদিও নিজেদের ঐ দুটি শিবির থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্য একটি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা করে, কিন্তু ঐ সব দেশে শাসন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সংমিশ্রণ বিরাজ করতে থাকে। এক দিকে যেমন কিছু রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে অবস্থান নিয়েছে, যেমন ভারত এবং আলবেনিয়া, তেমনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নয় এমন কিছু কিছু রাষ্ট্র আবার পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক শিবিরে সমর্থন জুগিয়েছে, যেমন সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহ। আবার উভয় ধরনের শাসন ব্যবস্থার রাষ্টসমূহই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্যভুক্ত হয়েছে। যাই হোক এক সময় মনে হয়েছিল এই দুই পরাশক্তি অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিশ্ব নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা এবং স্নায়ুযুদ্ধ বোধহয় অনন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যার কারণে মানুষের মনে এক তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কা সব সময় বিরাজ করেছে। আশির দশকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয় বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে এবং যুক্তরাষ্ট্র একক পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার বিষয়টি একটি সার্বজনীন আঙ্গিকে অপরিবর্তিত থেকে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায় এবং ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু এর পরও কিছু কিছু রাষ্ট্র এখনও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বহাল রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

এছাড়াও ৫০ থেকে ৮০ দশকে আমরা প্রায় ৬৫টি দেশে সামরিক শাসনের আবির্ভাব দেখেছি। দুর্বল সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এসব দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। এই সব দেশে গণতন্ত্র রক্ষা বা কায়েম করার জন্য নয়, মূলত কম্যুনিজমকে প্রতিরোধ করার জন্যই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে সামরিক অভ্যুত্থান এবং শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে সোভিয়েত

www.pathagar.com

বিপর্যয়ের পর একক পরাশক্তি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র এখন সামরিক শাসন ব্যবস্থার চাইতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকেই বেশি উৎসাহিত করে।

রাজতন্ত্রের শাসন এখনও পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি। এমন দেশ এখনও আছে, যেমন মধ্যপ্রাচ্য, যেখানে ফরমান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের লেশমাত্র না থাকলেও এই দেশগুলিই আবার গণতান্ত্রিক বিশ্বের বলয়ভুক্ত এবং যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্বার্থকে এই দেশগুলি সমর্থন করার কারণে সোভিয়েত বলয় থেকে এতদিন তারা মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু এখন একক পরাশক্তির উদ্ভবের কারণে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, এই রাজতন্ত্রগুলিতে ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন আসতে বাধ্য। তবে তেলসমৃদ্ধ দেশসমূহের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি হবে স্বাভাবিকভাবেই নমনীয়।

পৃথিবীতে এখন দুই ধরনের রাজতন্ত্র বিরাজমান। একটি হলো সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, যেখানে রাজা বা রানী হলেন রাষ্ট্রপ্রধান, কিন্তু একটি নির্বাচিত সরকার দেশ পরিচালনা করে। এ সব দেশে রাজা বা রানী প্রতীকী বা নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান, এখানে প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রধান নির্বাহী। পৃথিবীতে এখন এধরনের প্রায় ৩৬টি সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Democratic Constitutional Monarchy) এখন বিরাজ করছে, যেমন জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন এবং যুক্তরাজ্য ইত্যাদি। কিছু কিছু দেশ অর্থাৎ ১৫টি কমনওয়েলথভুক্ত দেশ হিসাবে এখন যুক্তরাজ্যের রানীকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, যেমন অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, বাহামা, জামাইকা এবং সেন্ট ভিনসেন্ট। সম্পূর্ণ রাজতন্ত্র অর্থাৎ Absolute Monarchy বিরাজ করে ১০টি দেশে যেমন সৌদি আরব, বাহরাইন, ব্রুনাই, কুয়েত, ওমান, কাতার, ইউএই, সোয়াজিল্যান্ড, টোঙ্গা এবং ভ্যাটিক্যান সিটিতে। সরাসরি একনায়কতন্ত্রবাদী সরকার রয়েছে ৩৩টি দেশে যার মধ্যে কম্যুনিস্ট শাসিত দেশ আছে ৫টি, যেমন চীন, উত্তর কোরিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম এবং কিউবা।

উল্লিখিত দেশগুলি ছাড়া প্রায় ৯৯টি দেশে বিভিন্ন ধরনের গণতন্ত্রের চর্চা হয়ে থাকে। যদিও এসব দেশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Democratic Republic) বলে পরিচিত, কিন্তু এদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রকারভেদ অনেক। বেশির ভাগ দেশে প্রেসিডেন্ট হলেন সর্বেসর্বা, এক ধরনের Authoritarian Regime। কোনগুলিতে আছে ফ্রান্সের মত রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতি ও সংসদীয় পদ্ধতির (Presidential and Parliamentary system) সংমিশ্রণ। আবার কতকগুলিতে আছে যুক্তরাষ্ট্রের আদলে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা, আর অন্যকিছু দেশে আছে যুক্তরাজ্যের আদলে সংসদীয় ব্যবস্থা। মূলত কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহ, যে সব দেশ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেই সব দেশ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ করার চেষ্টা করে।

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অধীন রাষ্ট্রসমূহে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে নানা ধরন, রূপ এবং আঙ্গিকে। বিভিন্ন আদলে বৈচিত্র্যময় শাসন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। তবে আলোচনার সুবিধার্থে আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাসমূহকে এখন দুটি মোটাদাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত বা Presidential পদ্ধতি, যেখানে রাষ্ট্রপতি সরাসরি সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি হন রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান। অভিশংসন বা Impeachment ছাড়া তাঁকে অপসারণ করা সম্ভব নয়। অন্যটিতে রয়েছে সার্বভৌম সংসদ, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন প্রধানমন্ত্রী হন সরকারের নির্বাহী প্রধান। রাষ্ট্রপতি হন একজন প্রতীকী ও নামেমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্রপরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু সংসদের মেয়াদকাল যাই থাকুক না কেন প্রধানমন্ত্রীর কোন বাঁধাধরা সময়কাল নেই। সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে তাঁকে অপসারণ করতে পারে অর্থাৎ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা যদি তাঁর উপর না থাকে তাহলে তাঁকে সরে দাঁড়াতে হবে। দুটো পদ্ধতিই (system) গণতান্ত্রিক, তবে কোন ব্যবস্থা বেশি গণতান্ত্রিক সেটা একটি বিরাট বিতর্কের বিষয়।

আমরা যারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিলাম, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ, এসব দেশের সমাজে ইংরেজদের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার একটি প্রভাব ঐতিহ্যগত কারণেই পড়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে উপমহাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের দেশের শাসন ব্যবস্থার মূল্যবোধ, চর্চা

www.pathagar.com

এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিফলন অব্যাহতভাবে ঘটতে থাকে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল এবং একই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং সামরিক ব্যবস্থার মতো কতকগুলি মৌলিক কাঠামোর উপর ব্রিটিশরা প্রচণ্ড প্রভাব রেখে যায়, যার কোন বিকল্প পদ্ধতি এ পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার কোন রাষ্ট্রে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। বরং ইংরেজদের প্রচলিত ব্যবস্থাকেই অনুকরণ করা হয়েছে দ্বিধাহীনভাবে। তাছাড়া রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষার প্রবল প্রভাব এবং আধিপত্য। তাই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভ করলেও ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার মূলভিত্তি থেকে সরে আসতে পারে নি।

দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে ভারত আগাগোড়া ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে অনুকরণ করে এগিয়ে যায় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক প্রাতিষ্ঠানিক সফলতাও অর্জন করে। ৫৮ বছর যাবত বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ভারত একটি গৌরবময় আসন অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে। একই সাথে ব্রিটিশ আমলের আমলাতন্ত্রসহ সামরিক বাহিনী এবং বিচার বিভাগীয় সকল কাঠামোই অক্ষুণ্ন রেখে দেশ পরিচালনা করার ব্যবস্থাকে জোরদার করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো অপরিবর্তিত থাকলেও রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র বজায় রাখতে তারা সক্ষম হয় নি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সেদেশে বারবার ব্যাহত হয়। স্বাধীনতার দু'বছরের মধ্যে ভারত যেখানে ১৯৪৯ সালে সংবিধান প্রবর্তন করে, পাকিস্তান সেখানে ৯ বছর নানা রকমের অস্থিতিশীলতার পর ১৯৫৬ সালে সংবিধান কার্যকর করে। এই সংবিধানে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার জন্য সংসদীয় পদ্ধতি নিশ্চিত করা হয়। অন্তর্বর্তী সময়ে কোন সাধারণ নির্বাচন ছাড়াই গণতন্ত্রের এক ধরনের একটি মুখোশ পরে দেশ চালানো হয়। সংবিধান প্রবর্তনের পর একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা বা makeshift arrangement করে সংসদীয় সরকার দেশ চালাতে শুরু করলেও ঐ ব্যবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে নি। নতুন সংবিধান অনুযায়ী প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর সেনাপ্রধান আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। সংবিধান এবং গণপরিষদ বাতিল করে সামরিক আইনের অধীনে দেশ পরিচালনা করা শুরু করেন। চার বছর সামরিক শাসনের পর ১৯৬২ সালে সকল ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে কুক্ষিগত করার অভিপ্রায়ে পরোক্ষ ভোটভিত্তিক তথাকথিত "মৌলিক গণতন্ত্র" এবং তদনুযায়ী একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। পাকিস্তানে একটি কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হয় যা আইয়ুব খানের পতনের দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ১৯৬৯ সালের গণজাগরণের মুখে দেশে আবার সামরিক শাসন ফিরে আসে এবং সেইসঙ্গে '৬২ সালের সংবিধান বাতিল হয়ে যায়। পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে, কিন্তু সেই নির্বাচন পাকিস্তান নামক দেশটির জন্য শেষ পর্যন্ত কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানে ভোটের ফলাফল কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে যায় নি। তারা নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী দেশ শাসনের অনুশীলন করতে অস্বীকার করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের গণমানুষের উপর সামরিক অভিযান শুরু করে। ফলে যুদ্ধ বাধে এবং পাকিস্তান একক রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। একটি মুক্তিযুদ্ধের মাধমে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয় এবং ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র ভূখণ্ড নিয়ে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর পাকিস্তান পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন একটি সংবিধানের অধীনে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করা শুরু করে। মাত্র পাঁচ বছরের মত এই সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চলার পর সেদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে পুনরায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং সেনাপ্রধান জিয়াউল হক প্রায় ১১ বছর সরকারপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। পাকিস্তান পুনরায় আগের মত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন পদ্ধতিতে ফিরে যায়। এরপর জনগণের আন্দোলনের মুখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর সংবিধান সংশোধন করে আবার সংসদীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপরিচালনার প্রক্রিয়া শুরু হয়, কিন্তু বরাবরের মত ঐ ব্যবস্থাটি কয়েক বছর পর রহিত হয়ে যায়। আবারও একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে সেনাপ্রধান পারভেজ মোশাররফ ক্ষমতা দখল করেন এবং এখন পর্যন্ত তিনি একটি রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতির আদলে দেশ পরিচালনা করে চলেছেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা। ১৯৭২ সালে ব্রিটিশ এবং ভারতের আদলে একটি শক্তিশালী সংসদীয় শাসন পদ্ধতি চালু করা হয়। নতুন সংবিধানের অধীনে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর দেশে পুরোপুরি সংসদীয় পদ্ধতির অধীনে নির্বাহী প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতির অধীনে যে সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা অর্জন করেন, রাষ্ট্রপতি তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাঁর প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা বলবৎ থাকে ততদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকার অধিকার রাখেন। রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানের কোন নির্বাহী ক্ষমতা থাকে না বললেই চলে। মূলত একজন নামেমাত্র সরকারপ্রধান হিসাবে তিনি কাজ করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ সরকার তাদেরই প্রণীত সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন আনে এবং দেশে একদলীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন পদ্ধতি চালু করে। আট মাসের মাথায় ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবের হত্যার পর সেই প্রথারও বিলুপ্তি ঘটে। তাঁরই দলের একজন শীর্ষ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ ২০ আগস্ট সামরিক আইন জারি করেন এবং একদলীয় শাসনের (রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতি) প্রথা অব্যাহত রাখেন। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে জিয়াউর রহমানকে অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্ত করে ক্ষমতাসীন করা হয়। ক্ষমতায় আসার পর জিয়া পূর্ব-জারিকৃত সামরিক শাসন অব্যাহত রেখে সংবিধানে অনেকগুলি মৌলিক পরিবর্তন আনেন। বহুদলীয় গণতন্ত্র, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পুনঃস্থাপন করেন এবং ১৯৭৯ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর সামরিক আইন তুলে নিয়ে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। তবে দেশের শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতির অধীনেই রাখেন।

পরিবর্তিত এই অবস্থায় আইন প্রণয়নের জন্য সংসদের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত রাখা এবং সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা ভোগকারী একজন সদস্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার বিধান করা হয়, কিন্তু রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান থেকে যান। তিনি হন একই সাথে সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধান। ৩০ মে ১৯৮১ জিয়াউর রহমানকে হত্যার পর প্রত্যক্ষ নির্বাচনে বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু মাত্র ১২৮ দিনের মাথায় সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। তিনি সংসদ বাতিল করে দেন এবং সংবিধানের কার্যকারিতা স্থগিত করেন। এই ব্যবস্থা বজায় রেখে প্রথম দফায় প্রায় চার বছর জেনারেল এরশাদ সামরিক আইনের অধীনে দেশ পরিচালনা করেন। এরপর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন করেন। জিয়াউর রহমান যেই রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন পদ্ধতি রেখে গিয়েছিলেন এরশাদ সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশ পরিচালনা করেন। আগের মতই আইন প্রণয়নকারী হিসাবে সংসদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা হয় এবং সংসদের আস্থাভাজন নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অক্ষুণ্ন রাখা হয়। রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকেন অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্র এবং সরকারপ্রধান থাকেন।

পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে এসেছে। রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার কাঠামো বিবেচনার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পূর্ণ রাজনৈতিক রূপের প্রতিফলন তারা দেখতে চেয়েছে এবং সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা মনে প্রাণে লালন করে এসেছে। বিষয়টি এতই স্পষ্ট যে প্রতিটি গণআন্দোলনে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রায় সকল রাজনৈতিক দল এবং নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে অভিন্ন অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশ জন্মলাভ করার পর যদিও সাংবিধানিক ব্যবস্থার অনেক উত্থান-পতন, রূপ-কাঠামোর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপ সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমেই অর্জন করার প্রত্যয় বিভিন্ন আন্দোলনে বারবার ঘোষিত হয়েছে। জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এরশাদ অনুসৃত রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা বা Presidential System of Government প্রায় সকল রাজনৈতিক দল প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৯০ সালের গণআন্দোলনের সময় ১৯ নভেম্বর পান্থপথে অনুষ্ঠিত জনসভায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃত্বে তিনটি জোটের তরফ থেকে এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের যে রূপরেখা ঘোষণা করা হয়, যার প্রতি জামায়াতে ইসলামীও সমর্থন দেয়, সেই রূপরেখাতেও দাবি ছিল যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি সার্বভৌম সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে, যে সংসদের কাছে

www.pathagar.com

সরকারের দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা থাকবে। অর্থাৎ আন্দোলনরত সকল দলই দেশে একটি সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

এই রূপরেখা অনুযায়ী এরশাদ সরকার অবশেষে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। উপরাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করার পর আন্দোলনরত দলগুলির মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন এবং তারপর নিজে পদত্যাগ করেন। এর ফলে সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে গণতন্ত্রের নতুন পদযাত্রায় জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ বাংলাদেশে প্রথমবারের মত একটি অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। রূপরেখার ঘোষণা অনুযায়ী দেশের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতি থেকে সংসদীয় পদ্ধতিতে রূপান্তরের জন্য একটি বিশেষ সর্বদলীয় সংসদীয় বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর দেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পুনর্বহাল করে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল চূড়ান্ত শেষে রিপোর্ট দাখিল করে। সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস করার পর বেগম খালেদা জিয়া ১৯ সেপ্টেম্বর একটি সংসদীয় পদ্ধতির অধীনে প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশের নতুন সংবিধানের অধীনে সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ ১ বছর ১০ মাসের জন্য সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা থাকার পর দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার অভিপ্রায়ে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, যদিও পরবর্তী পর্যায়ে সেই ব্যবস্থা নানা রূপ ধারণ করে, কিন্তু রাষ্ট্রপতিই সরকারের নির্বাহী প্রধান হিসাবে সরকার পরিচালনা করেন। ১৬ বছর ৮ মাস পর ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, বাংলাদেশের জনগণের কাঙ্ক্ষিত সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা এবং প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও এ ব্যবস্থা মোটামুটি একটি স্থায়ী সাংবিধানিক রূপ গ্রহণ করেছে। আজ প্রায় ১৫ বছর যাবত এই ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া এখন একটি প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি হিসাবে জনসাধারণ গ্রহণ করে নিয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যত এখন একটি কার্যকর শক্তিশালী সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। সংসদ শুধু একটা সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান নয়, এটি রাজনৈতিক সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া এবং কর্মকাণ্ডের শক্ত বাহন হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এদেশের সার্বিক উন্নয়নের অগ্রগতি নিশ্চিত হবে। এই নিশ্চয়তা অর্জন করার জন্য প্রয়োজন হবে ধৈর্য, সহনশীলতা ও প্রত্যয়। এই ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের উপর থাকতে হবে মূল রাজনৈতিক দল এবং নেতৃত্বের আন্তরিক বিশ্বাস এবং একটি সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার। দেশের জন্য সার্বভৌম ও কার্যকর সংসদের অবস্থিতি প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও রাজনীতি সচেতন সকল দেশবাসীর একটি রাজনৈতিক বিশ্বাসে পরিণত হতে হবে।

সংসদকে গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যকর করার জন্য সংবিধান এবং কার্যপ্রণালী বিধি যথেষ্ট নয়, এর কতকগুলি ঐতিহ্যগত শক্তিশালী দিক আছে, যার অনেকটাই নিরবচ্ছিন্ন সংসদীয় চর্চার উপর নির্ভর করে। এখানে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক নেতৃত্বের আচার-আচরণ, মন-মানসিকতা, জ্ঞান, বিশ্বাস এবং সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা এবং শ্রদ্ধাবোধ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নেতৃত্বদানকারীদের জন্য এটি একটি আত্মবিশ্বাস, আত্মোপলব্ধি, নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে নেয়ার মত একটি ব্যাপার, এটা রাতারাতি সৃষ্টি হয় না বা এর জন্য কেউ রাতারাতি বিকশিত হয় না। আমি আগেই বলেছি, সংসদীয় চর্চার উৎকর্ষ ও সাফল্য দেখতে হলে একটি নিরবচ্ছিন্ন সময়কালের প্রয়োজন। প্রাথমিক অবস্থার অনেক দুর্বলতা, ব্যর্থতা বা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান ক্রান্তিকালটি সফলতার সাথে অতিক্রম করা অবশ্যই সম্ভব। খোদ ব্রিটেনের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এ ব্যাপারে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

সংসদীয় গণতন্ত্রের উৎকর্ষ আসে কালের বিবর্তনে। ভারত বা অন্য যেসব দেশে সংসদীয় ধরনের শাসন ব্যবস্থার পরিচর্যা করা হয়, সেই সব দেশের অভিজ্ঞতা একই রকম। বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রম হতে পারে না।

সংসদের মূল কার্যাবলী সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা সংবিধানের ৭৫ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত একটি বিধান। স্পীকারের দায়িত্ব হলো এই কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করা এবং যেহেতু এই বিধানের অধীনে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্পীকারের অনেকগুলি ইচ্ছামাফিক চলার বা অবাধ (discretionary) ক্ষমতা রয়েছে, তাই সংসদের ঐতিহ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদকে কার্যকর করা, সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে ভারসাম্য এবং সমঝোতা রক্ষা করা, বিরোধী দলকে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ দেয়া, সংসদের মান-মর্যাদা সমুন্নত রাখা, জাতীয় ইস্যুসমূহের উপর আলোচনা ও বিতর্কের ব্যবস্থা করা এবং সংসদকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে স্পীকারের দায়িত্ব। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সংসদের গুরুত্ব সর্বাধিক বিধায় স্পীকারের নিজস্ব ভূমিকা এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সংসদের মুখ্য দায়িত্ব হলো সরকার এবং নির্বাহী বিভাগকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ রাখা, রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা (accountability) এবং স্বচ্ছতা (transparency) প্রতিষ্ঠা করা। সংসদ সরকারের জন্য কোন নীতি রচনা করে না বা কোন কর্মসূচী বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দেয় না। সরকার কিভাবে চলবে, কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটাও সংসদ নির্ধারণ করে না, সেই সব দায়িত্ব হলো সরকারের। সংসদের দায়িত্ব হলো সরকার যে নীতি বা যে পরিকল্পনা বা যে কর্মসূচী বা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা সঠিক এবং স্বচ্ছভাবে বাস্তবায়ন করছে কি না তা অনুবীক্ষণ করা, পরীক্ষা করা, পর্যালোচনা করা; ক্রমাগত এবং অব্যাহতভাবে নজরদারি করা এবং সংসদের মাধ্যমে সরকারকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ রাখা; প্রয়োজনে সরকারকে ভর্ৎসনা (censure) করা। সংসদ কর্তৃক এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করার জন্য অনেকগুলি স্বীকৃত প্রথা বা practice রয়েছে। প্রথমটি হলো সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং বিভিন্ন কমিটির অর্থবহ কার্যক্রম। সংসদীয় কমিটি যত বেশি জোরালো এবং কর্মদক্ষ হবে, তত বেশি সরকারের উপরে সংসদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। এই ক্ষেত্রে এই কমিটিগুলির কার্যক্রম হলো সবচাইতে বেশি মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ। আর দ্বিতীয়টি হলো সংসদ কক্ষে আইন প্রণয়ন, প্রশ্নোত্তর, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং প্রস্তাব বা মোশনসমূহের উপর আলোচনা এবং বিতর্কে বিরোধী দলকে অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দান করা।

বিরোধী দলের জোরালো এবং অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ ছাড়া একটি নির্বাচিত সংসদ কোনদিন কার্যকর হতে পারে না। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর, বিশেষ করে একটি দল যখন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে সংসদে আসে বিরোধীদল হিসাবে ভূমিকা রাখার জন্য, তখন তাদের মধ্যে একটা ক্ষোভ-দুঃখ থাকা অতি স্বাভাবিক। স্পীকার এবং সরকারী দলকে সে ব্যাপারে সংবেদনশীল হতে হয়। সেই জন্য শত মতবিরোধ থাকলেও সংসদ যাতে সজীব এবং সচল থাকে, কার্যকর হয়, সেইজন্য সংসদ পরিচালনায় বিরোধী দলের একটা কায়েমী স্বার্থ (vested interest) তৈরি করা প্রয়োজন, তাদের একটা লাভালাভের বিষয় (stake) থাকতে হবে। তাদের নিজেদের স্বার্থেই তারা যেন সংসদে সক্রিয় ভূমিকা রাখে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সংসদকে কার্যকর রাখার দায়িত্বটাও যেন তাদের উপর সমানভাবে বর্তায়, সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। সংসদকে কার্যকর রাখলে তারা রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে লাভবান হবে এই বিশ্বাস যেন তাদের মধ্যে জন্মায়। এর জন্য অবশ্য প্রয়োজন হবে সরকারী দলের একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি, আর বিরোধী দলের সংসদীয় রাজনীতির সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করার সদিচ্ছা। সংসদীয় পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারী দলের পক্ষে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকার পতনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেই ক্ষেত্রে সংসদে বিরোধী দলকে বেশি সময় দেয়া, তাদের উত্থাপিত প্রস্তাব এবং ইস্যুর উপর আলোচনা এবং বিতর্কের সুযোগ দেয়ার জন্য সরকারকে উদার মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে। বিরোধী দলের কঠোর সমালোচনা, এমনকি,

www.pathagar.com

কোন কোন সময় যদি তারা দায়িত্বহীনতারও পরিচয় দেয়, তা সহ্য করার মানসিকতা থাকতে হবে। ধৈর্য এবং সহনশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করার দায়িত্ব তখন সরকারী দলের উপর এসে পড়ে। এ ব্যাপারে স্পীকারকেও স্বাধীনতা দেয়া প্রয়োজন যাতে তিনি একটি অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। আর সেটা নির্ভর করবে সরকারী দল কতটুকু উদার আর বিরোধী দলের বিশ্বাস স্পীকার কতটুকু অর্জন করতে পেরেছেন, তার ওপর।

সংসদকে কার্যকর রাখার লক্ষ্যে বিরোধী দলের ভূমিকা বৃদ্ধি করার জন্য সংসদ পরিচালনায় তাদের স্বার্থ সুগভীর থাকতে হবে। তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন—(১) প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে বিরোধী দলের সাথে পরামর্শ করা এবং এটাকে একটা রেওয়াজ বা culture-এ পরিণত করা; (২) সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সময় সরকারের পক্ষ থেকে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বক্তব্য সংসদের কক্ষে প্রথমে ঘোষণা করা; (৩) বিরোধী দল আনীত প্রস্তাবসমূহ বা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনার নোটিশসমূহ বিবেচনা করা এবং যতটুকু সম্ভব সেগুলি সংসদকক্ষে আলোচনা করার ব্যবস্থা করা; (৪) গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নে বিরোধী দলের পরামর্শ গ্রহণ করা এবং সংসদকক্ষে উপস্থাপিত যদি কোন সংশোধনী গ্রহণযোগ্য হয় তা গ্রহণ করা; (৫) সংসদীয় স্থায়ী, বিশেষ এবং অন্যান্য কমিটিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য কমিটিগুলির চেয়ারম্যান বা সভাপতির পদে আনুপাতিক হারে বিরোধী দলের সদস্যদের নিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং সরকারী হিসাব সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির (Public Accounts Committee) সভাপতি পদে প্রধান বিরোধী দলের একজন প্রবীণ সদস্যকে নিয়োগদান করা, কেননা, স্থায়ী এবং বিশেষ কমিটির চেয়ারম্যান বা সভাপতির জন্য উন্নত পদমর্যাদা এবং কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করলে এই সব কমিটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে; (৬) স্পীকার কর্তৃক সরকার এবং বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত সাক্ষাৎ এবং মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা, যেহেতু এই ব্যবস্থায় সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে সাহায্য করে। উপরন্তু দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে রাজনীতি (Politics of bipartisanship) গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন; (৭) পেছনের সারিতে বসা সাংসদদের (Back-benchers) সংসদের কার্যধারায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা; এবং (৮) সংসদীয় দলের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান করা।

সংসদীয় পদ্ধতির রাজনৈতিক সংস্কৃতি অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন এবং অনেক উন্নতমানের। এই ব্যবস্থায় সংসদ হয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংসদকে গড়ে তোলার উপর নির্ভর করে এর মান-মর্যাদা এবং ভাবমূর্তি। যাঁরা সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসেন, বিশেষ করে সরকার এবং বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের উপর নির্ভর করে সংসদের কার্যকারিতা এবং সংসদীয় ঐতিহ্য গড়ে তোলা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সংসদের মর্যাদা এবং গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংসদ ভবনেই মাঝে মাঝে রাত যাপন করতেন, বিদেশী অতিথিদের সংসদে সাক্ষাৎ দিতেন এবং সামান্য বিরতি ছাড়া সারা বছরই প্রায় সংসদের অধিবেশন চালাতেন। সকল রাজনৈতিক বিষয়ে সংসদকে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিতেন। সংসদকে তিনি ভালবাসতেন। আজকে ভারতে হাজার হাজার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা ভারতীয় রাজনীতির রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করছে। সংসদ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সংসদকক্ষে সংসদ সদস্যদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং মন-মানসিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার কিছুটা সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে বিধৃত আছে। বৈঠকের কার্যক্রম চলাকালে কোন্ পর্যায়ে কি ধরনের প্রশ্ন তোলা যায় বা বক্তব্য রাখা যায় এটা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব যদিও স্পীকারের, তারপরও এটা অনেকটা নির্ভর করে দলীয় নেতৃবৃন্দের উপর। তাঁদের মার্জিত ব্যবহার এবং মানসিকতা তাঁদের দলীয় সদস্যদের জন্য অনুকরণীয় হয়। তাঁদের উপর নির্ভর করে সংসদের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং সংস্কৃতি। সংসদকক্ষে বক্তব্য প্রদানের ভাষা, শব্দ চয়ন এবং ভঙ্গি হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এখানে আবেগ বা কটূক্তি বা উচ্চস্বরে উত্তেজিত বক্তব্যের কোন স্থান নেই। তথ্য এবং জ্ঞাননির্ভর যুক্তিতর্ক সংসদের মানকে বৃদ্ধি করে। বক্তব্যের মধ্যে মার্জিত হাস্যরস ও কৌতুক (wits and humours) আলোচনাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। পার্লামেন্টের বক্তৃতায় শব্দের ব্যবহার নির্ধারণ অর্থাৎ

www.pathagar.com

শব্দ চয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি সংসদে সকল সদস্যই পার্লামেন্টারিয়ান হতে পারেন না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও তাই। সকল প্রধানমন্ত্রী বা সংসদ নেতা যে ভাল পার্লামেন্টারিয়ান হবেন তা সত্য নয়। হ্যারল্ড ম্যাকমিলান, স্যার ডগলাস হিউম, এমনকি, কিছুদিন আগের প্রধানমন্ত্রী জন মেজর, এরা ভাল প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু ভাল পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন নি বা ছিলেন না। অন্যদিকে হারল্ড উইলসন এবং এখনকার টনি ব্লেয়ার দক্ষ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে খুব ভাল পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে পরিচিত। পৃথিবীর সকল সংসদেই একই অবস্থা। ভারত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশেও বড়জোর ৫ শতাংশ সদস্যকে পার্লামেন্টারিয়ান বলা যেতে পারে। সকল সংসদ সদস্যকে পার্লামেন্টারিয়ান হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

পার্লামেন্টারিয়ান হওয়ার কতগুলো আলাদা গুণের প্রয়োজন। তবে প্রধান দুটি গুণের প্রথমটি হলো তথ্য এবং জ্ঞান, ভাষার উপর দখল, সঠিক শব্দ চয়নের ক্ষমতা, হাস্য-কৌতুক করার দক্ষতা, মাথা ঠাণ্ডা রাখা। দ্বিতীয়টি হলো মার্জিত ভাষায় কথা বলা ছাড়াও বক্তব্য রাখার শৈলী (style)। বক্তৃতাকে মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য এ দুটি গুণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পার্লামেন্টারিয়ানদের বোধহয় একটি অন্য ধরনের মেধাও থাকে। তা না হলে সকলেই পার্লামেন্টারিয়ান হতে পারেন না কেন?

যাই হোক আমাদের দেশে সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। আমাদের ঐতিহ্য এবং অভিজ্ঞতা দুটোই কম। আমাদের জন্য বলতে গেলে সবকিছুই নতুন। সেই দিক থেকে আমাদের অগ্রগতি ভালই এবং হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। এ অবস্থাকে টেকসই করার জন্য প্রয়োজন হবে ধৈর্য, সহনশীলতা আর অধ্যবসায়। জাতি হিসেবে তাই এই ব্যবস্থাকে রক্ষা করাটাই হবে আমাদের জন্য সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ।

আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি এ পর্যন্ত পাঁচবার — ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯০ এবং ২০০১ সালে। পরাজিত হয়েছি একবার, ১৯৯৬ সালে। সংসদ আমার খুব প্রিয় প্রতিষ্ঠান। সংসদে কথা বলতে, বক্তব্য রাখতে আমি খুব পছন্দ করি। আমি উপভোগ করি। সংসদে কোন্ ইস্যুতে কি বলব, কিভাবে বলব তা মনে মনে অনুশীলন করি। আমার সব বক্তৃতা উপস্থিত বক্তৃতা, লিখিত বক্তৃতা নয়, তবে পয়েন্টগুলির নোট রাখি। ১৯৭৯ সালের সংসদ ছিল আমার জন্য প্রথম। এর আগে ছাত্র অবস্থায় হাউস অব কমন্সে হ্যারল্ড উইলসনের বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। হোসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও ভাল পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন।

তাই ১৯৭৯ সালের সংসদে আমি যদিও উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং উপনেতা হিসাবে কাজ করেছি এবং আমার ভূমিকা সক্রিয় থাকলেও আমি তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখি নি। তবে বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর একই সংসদের Back-bencher হিসাবে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি একটি নীতিনির্ধারণী বক্তৃতা দিয়েছিলাম। ১৯৮৬-৮৮ সালে উপ-প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের উপনেতা, ১৯৮৮-৮৯ সালে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা, ১৯৯১-৯৬ সালে জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা এবং ২০০১ থেকে চলতি সংসদে আইনমন্ত্রী হিসাবে বেশ কিছু বক্তব্য রাখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এগুলোর কিছু কিছু সংগ্রহ করা হয়েছে এই সংকলনে ছাপানোর জন্য। কিন্তু কাজটা অত সহজ ছিল না।

প্রথমত, বক্তৃতাগুলি ছিল অলিখিত, শুধু কিছু নোট ব্যতীত অনেকটা extempore। দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্টে বক্তৃতা delivery, style এবং performance সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, সেটা দেখা এবং শ্রবণ করার অভিজ্ঞতা, আর সেই বক্তৃতা ছাপার অক্ষরে পড়ার মধ্যে অনেক তফাৎ রয়েছে। তৃতীয়ত, বক্তৃতাগুলি পড়ার যোগ্য করার জন্য ন্যূনতম হলেও সংশোধন, সংযোজন এবং পরিমার্জন করতে হয়েছে।

এই সংকলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রসার ও বিকাশ, ভূমি সংস্কার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, গণতন্ত্রে উত্তরণে সাংবিধানিক সংকট, ধোলাইখাল কনসেপ্ট, রাষ্ট্রধর্ম, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা এবং ঔষধনীতির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক নীতি-নির্দেশনায় ও সামাজিক উন্নয়নে যে বিবর্তন ঘটেছে তার একটি ধারাবাহিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। এছাড়াও রয়েছে সুশাসন, সুবিচার, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য, বাংলাদেশের

www.pathagar.com

ভাবমূর্তি, হরতাল কালচার, নারীর ক্ষমতায়ন, দেশের অর্জন, সংসদের কার্যকারিতা, বিরোধী দলের ভূমিকাসহ সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুর উপর আলোচনা।

এই বইয়ের মধ্যে মূলত তিনটি দিক রয়েছে— ১। জাতীয় জীবনে বিশাল গুরুত্ববহ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে সংসদে আলোচনা ও বক্তৃতায় আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন; ২। প্রতিপক্ষের আক্রমণাত্মক সমালোচনার মুখে দ্ব্যর্থহীনভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করার ক্ষেত্রে আমার আন্তরিকতা; এবং ৩। দেশের বিচার ব্যবস্থাকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য কিছু সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তনে আমার ভূমিকা ও ঐসব আইন সম্পর্কে আমার দেয়া ব্যাখ্যা।

আশা করি এই বইটি আমাদের দেশে সংসদীয় রাজনীতি, পদ্ধতি এবং চর্চা বিকাশের পথে একটি ক্ষুদ্র অবদান রাখবে।

সেপ্টেম্বর ২০০৫ মওদুদ আহমদ

www.pathagar.com

থানাকে উন্নয়ন এবং প্রশাসনের একটি ইউনিট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে

রাষ্ট্রপতি সাত্তারের ভাষণের উপর বক্তব্য

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২

তখন দেশের জন্য ছিল একটি ক্রান্তিকাল। বিচারপতি সাত্তার তখন একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। ড. কামাল হোসেনকে পরাজিত করে জনগণের এক বিরাট স্বতঃস্ফূর্ত ম্যান্ডেট নিয়ে তিনি মাত্র তিন মাস আগে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু একদিকে তাঁর মন্ত্রিসভা এবং প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং অন্যদিকে সামরিক প্রধানের হস্তক্ষেপের হুমকির কারণে দেশ পরিচালনায় সরকারের কোন পরিচ্ছন্ন দিক-নির্দেশনা ছিল না। সংসদে বিএনপির পেছনের সারির কিছু সদস্য, যাদের এক সময় বিদ্রোহী গ্রুপ বলে আখ্যায়িত করা হতো, এই লেখকের নেতৃত্বে তারা বেশ কিছুকাল পরিশ্রম করে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি সুদূরপ্রসারী সংস্কারমূলক প্যাকেজ প্রস্তাব তৈরি করে, যা সংসদের এই বক্তব্যের মাধ্যমে পেশ করা হয়। এটাকে একটা ঐতিহাসিক দলিল বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এই প্যাকেজের কিছু কিছু প্রস্তাব পরবর্তী সরকারসমূহ নানাভাবে বাস্তবায়ন করেছে। বিকেন্দ্রীকরণকে সফল করার জন্য থানাকে উন্নয়ন ও প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু করার যে প্রস্তাব ছিল তা এরশাদ সরকার একই ভাবধারায় উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন করার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে এবং পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার এই জন্য একটি আইনও প্রণয়ন করে। এই বক্তব্যে যেই সব বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে তার মধ্যে রয়েছে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, নির্বাচিত থানা পরিষদের উপর উন্নয়ন-পরিকল্পনা এবং প্রশাসনের দায়িত্বভার, জেলা এবং বিভাগ পর্যায়ের আমলাভিত্তিক প্রশাসনের বিলুপ্তি; পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া, বাজেট প্রস্তুতিকরণ, বৈদেশিক ঋণগ্রহণ নীতি (Aid Concept), আর্থিক এবং ব্যাংকিং নীতিমালা; উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং বসতবাড়ির নিশ্চয়তাভিত্তিক ভূমি সংস্কার; সরকারের পরিসর সঙ্কুচিত করা, বিরাষ্ট্রীয়করণ, শিল্প এবং কৃষি ব্যবস্থাপনা, সামাজিক সেক্টরে জাতীয় সমঝোতা এবং সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্যে ভারসাম্যতার বিষয়। উল্লেখ্য যে, এই বক্তেব্যের ৩০ দিনের মাথায় একটি নির্বাচিত সরকারকে অপসারণ করে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। লেখক সরকারী দলের একজন back-bencher হিসাবে এই বক্তব্য রাখেন।

মাননীয় স্পীকার

রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ধন্যবাদ প্রস্তাব এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন করি। কিন্তু রাষ্ট্রপতি কতগুলি সত্য কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, কতগুলি সাফল্যের কথা বলেছেন, কতগুলি সমস্যার কথাও বলেছেন। আমাদের সামনে, এই সংসদের সামনে আজকে কতগুলি বিশেষ বিশেষ সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে। সেগুলি আমরা প্রায় সকলেই এখানে আলোচনা করেছি।

সরকার এসেছে, সরকার গেছে, কিন্তু এদেশের সাধারণ মানুষের অবস্থার কোন উন্নতিসাধন করা সম্ভবপর হয়নি। আমরা সকলে জানি যে, গরিব আরও গরিব হয়েছে, বড়লোক যারা তারা আরও বড়লোক হতে পেরেছে। ভূমিহীনদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে, বেকারদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রশাসনের কথা না বললেও চলে। কারণ এই প্রশাসন যেসব যন্ত্রণা দেশের মানুষকে দেয় সে ব্যাপারে আমার মনে হয় যে আমরা সবাই একমত হব।

পরিকল্পনা প্রণয়নে এই পার্লামেন্টের কোন ভূমিকা নেই। জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় কিন্তু কোন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের কোন ভূমিকা এই জাতীয় পরিকল্পনায় থাকে না। এই পরিকল্পনা শেরেবাংলা নগরে আমাদের প্লানিং কমিশনে তৈরি হয়। আমলারা তৈরি করে এনে বাজেটসহ এই পার্লামেন্টে উত্থাপনের এক ঘণ্টা আগে কেবিনেটে পেশ করা হয়, তারপর সেটা পার্লামেন্টে আনা হয়। আমাদের আগামীতে যে এডিপি হবে, ঐ এডিপি'র খবর জুন মাসে আমাদের কাছে দেওয়া হবে এবং তারপর সেটা আমাদেরকে অনুমোদন করে দিতে হবে।

www.pathagar.com

আজকে বৈদেশিক ঋণগ্রহণ নীতি বলে আমাদের কিছুই নেই। আমলাতান্ত্রিকভাবে এই নীতিকে নির্ধারণ করা হয় এবং সেটা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যে সব দেশ আমাদেরকে ঋণ দেয়, তাদের পার্লামেন্ট সেই ঋণের নীতি নির্ধারণ করে। কিন্তু আমরা যারা ঋণগ্রহণ করি আমাদের ঋণগ্রহণ করার নীতি নেই। Aid concept বলে আমাদের জাতীয় পর্যায়েও কোন concensus এখন পর্যন্ত আমরা অর্জন করতে পারিনি।

আর্থিক ও ব্যাংক নীতিমালার পুনরাবৃত্তি আমি আর করতে চাই না। জাতীয় পরিকল্পনায় জনগণের অংশগ্রহণ যতদিন সম্ভবপর না হবে, ততদিন পর্যন্ত বাজেটও প্রস্তাব করার এক ঘণ্টা আগে ক্যাবিনেটে পেশ করা হবে এবং তারপর সেটা পার্লামেন্টে আসবে।

কৃষিক্ষেত্রে শোষণের কথা এই মহান সংসদে, সরকারী দলীয় এবং বিরোধী দলীয় সদস্যগণ বলেছেন। আমাদের কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের কোন নিশ্চয়তা এখন পর্যন্ত কোন সরকার দিতে পারেনি। ভূমিহীনদের কথা না বলে, যাদের কাছে ভূমি আছে তারা যে বর্গাদার প্রথা এখনও চালু রেখেছেন, সে ব্যাপারেও Land reform-এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিরোধীদল থেকে কোন সঠিক প্রস্তাব এখন পর্যন্ত আসেনি যে, ভূমি সংস্কার কোন্ নীতিমালার উপর করা হবে। এটা কি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য করা হবে, এটা কি কৃষিক্ষেত্রে employment বাড়ানোর জন্য করা হবে, নাকি আমরা শুধু বড়লোকদের জমি নিয়ে গরিবদের মধ্যে বিলি করে দিলে সেই reform হবে, ভূমি সংস্কার হবে। এ ব্যাপারে সঠিক কোন প্রস্তাব তারা আমাদের কাছে দেননি।

শিল্প ক্ষেত্রে, মাননীয় স্পীকার, সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আজকে প্রয়োজন, সেটা হল পুঁজি এবং চাকুরি। আমরা যত বড় বক্তৃতাই এখানে দেই না কেন, যত আলোচনাই করি না কেন, আমাদেরকে আমাদের basic যে সমস্যা আছে, সেখানে যেতে হবে। সেটা হল আমাদের দেশ গরিব, আমাদের সম্পদ সীমিত, আমরা যদি আমাদের সম্পদ বাড়াতে পারি, তা হলে আমাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে। আমাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে চাকুরি আমরা দিতে পারব মানুষকে এবং মানুষের জীবনের মানের উন্নয়নসাধন আমরা করতে পারব। যে জন্য আজকে কতগুলি দিকের উপর নজর রেখে আমি কিছু প্রস্তাব আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং এখানে যে সকল সংসদ সদস্য আছেন তাদের পক্ষ থেকে দিতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, আমরা আমাদের জাতীয়তাবাদী দলের ঘোষণাপত্রে বলেছি, এবং আওয়ামী লীগ ও জাসদের ঘোষণাপত্রে আছে যে, সরকারকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে, থানাকে পরিকল্পনা এবং প্রশাসনের basic unit হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আমাদের থানাভিত্তিক পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যেসব পার্লামেন্টারী কমিটি আছে তারা তাদেরকে guideline দিতে পারবে। Priorities-গুলি থানা level-এ ঠিক হয়ে আসতে হবে। আমার থানায় কি প্রকল্প হবে সেই প্রকল্প শেরে বাংলা নগরে বসে করলে চলবে না। সেই প্রকল্প থানার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ঠিক করবেন যে সেটা কোন্ priority-তে আসবে।

মাননীয় স্পীকার, জেলা এবং Divisional headquarter-গুলিকে abolish করে দিতে হবে। Subdivision কে basically থানার উপর coordinate করার জন্য প্রশাসনিক কাঠামো হিসাবে রাখতে হবে। কেন্দ্র, থানা এবং মহকুমা[১] এই তিনটি স্তর হবে প্রশাসনিক স্তর এবং এর ফলে দেশে দুর্নীতি এবং দেশের মধ্যে যে অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ আছে সেগুলি বন্ধ করা সম্ভবপর হবে। আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীলতা আমাদের কমাতে হবে এবং জাতীয় পুঁজির বিকাশ সাধনে সক্ষম হতে হবে। দুইমাস, চারমাস পর পর কর্পোরেশন হচ্ছে, বোর্ড হচ্ছে, ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে, এর কোন হিসাব নেই। মাননীয় স্পীকার, আমি আশা করব যে, আমাদের মাননীয় সংস্থাপন-মন্ত্রী এ ব্যাপারে আমাদের জানাবেন যে, দেশে মোট কতগুলি কর্পোরেশন, বোর্ড, autonomous body এবং department আছে। এগুলির সংখ্যা আমি নিজে কোনদিন জানতে পারিনি। সরকারে যখন ছিলাম, তখন চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তখনও জানতে পারি নি।

---

১. মহকুমাগুলি এখন জেলা হওয়াতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এখন হবে কেন্দ্র, থানা এবং জেলা।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, আমাদের সরকারের recurring expenditure কমাতে হবে। আমরা যেভাবে বেহিসেবী খরচ করে যাচ্ছি এই খরচ কমাতে হবে এবং এটা করার জন্য ADP যখন তৈরি হবে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যখন বাজেট তৈরি করবে তখন সেটা আগে পার্লামেন্টের Standing Committeeতে পাঠাতে হবে। পার্লামেন্টের Standing committee সেটা দেখবে, দেখে Ministry of Finance-এ পাঠাবে বাজেট তৈরি করার জন্য। তাহলে আমি মনে করি যে, বাজেট তৈরির প্রক্রিয়ায় এ পার্লামেন্টের সদস্যদের একটা ভূমিকার নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারব।

মাননীয় স্পীকার, পরিকল্পনার বিষয়ে আমার প্রস্তাব হল, আমরা যে annual development programme করি, তার যে lay-out থাকে সেই lay-out-এর অংশ rural development-এর জন্য earmark করে দিতে হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে। প্রত্যেক থানাতে গড়ে যদি ২ কোটি টাকা যায় তাহলে তিন হাজার কোটি টাকার বাৎসরিক পরিকল্পনার এক হাজার কোটি টাকা rural development-এর জন্য earmark করে দিতে হবে। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ অংশ যে ADP বাজেট থাকবে সেই বাজেটের priority ঠিক করার জন্য এ পার্লামেন্টের বিভিন্ন এলাকার কমপক্ষে ৩০ জন সদস্যকে নিয়ে ADP-র priority ঠিক করার জন্য পার্লামেন্টের একটা কমিটি নির্ধারণ করে দেবে এবং ADP approve করার তিন মাসের মধ্যে এই পার্লামেন্টে সেই ADP হাজির করতে হবে, যাতে করে আমরা সকল সদস্য ADPতে অংশগ্রহণ করতে পারি এবং আমাদের সুপারিশ দিতে পারি। আমাদের পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি প্রণয়ন করে তাহলে এ পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভবপর হবে।

থানায় যে ২ কোটি টাকার কথা বললাম, যদি প্রতি থানায় ২ কোটি টাকা পায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে কোন থানা কম পাবে, কোন থানা বেশি পাবে এবং সেই থানায় উন্নয়ন প্রকল্পের priority নির্ধারণ করার ভার সেখানকার জনগণের প্রতিনিধির উপর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সেটা supervise করার ক্ষমতা যদি তাঁকে দেওয়া হয়, আর executionএর ক্ষমতা যদি সরকারী agency-র কাছে থাকে তাহলে, আমি মনে করি, আমার নিজের থানায় আগামী ৫ বছরে ১০ কোটি টাকা দিলে কোন সমস্যাই আমার থানায় থাকবে না। আমার থানায় বিদ্যুৎ, আমার থানায় রাস্তা পাকা করা, সেচের ব্যবস্থা করা ইত্যাদিসহ infrastructural development-এর যে কথা আমরা বলি সেটার নিশ্চয়তা আমরা সকলেই সকলের এলাকায় দিতে পারব। মাননীয় স্পীকার, foreign aid and assistance সম্পর্কে আমাদের একটা aid concept থাকতে হবে, যাতে করে আমরা প্রত্যেকটা aid আসবে আর নেব সেটা না হয়।

'Why we should not say 'No'. We should not be shy to say 'No', Sorry your aid is not necessary for our country'.

আমরা আমাদের priority ঠিক করতে পারি না। কারণ এদের সংগে জনগণের সম্পর্ক নেই। আমলারা যারা আছেন, তারা এটা ঠিক করেন; আমাদের কোন ভূমিকা এতে থাকে না। বাজেট এবং banking-এর ব্যাপারে, মাননীয় স্পীকার, আমি বলতে চাই যে, আমাদের ছটা রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের দরকার নেই। আমরা এগুলিকে amalgamate করে দুটো ব্যাংক করব। কিন্তু এই banking-এর employment-এ যারা আছে তাদেরকে affect করা হবে না। কারণ যেই বাজারে তিনটা বা চারটা শাখা ৪টা ব্যাংকের আছে ওটাকে দুটো করে বাকি যে এলাকায় কোন ব্যাংকের শাখা নেই, সেই এলাকাগুলিতে বাকি ব্যাংকগুলি চলে যাবে যাতে করে existing employment এবং business -এর কোন ক্ষতি না হয়। এটা করলে আমার মনে হয় যে, এদেশে এই যে establishment cost এত বেশি বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন, আমরা recurring expenditure কমাতে পারব। রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যাংকগুলিকে আমরা reorganise করতে পারব, efficient করতে পারব এবং এদেরকে productive করতে পারব।

মাননীয় স্পীকার, taxation-এর ব্যাপারে বলতে চাই, যারা আমরা ট্যাক্স দিই, আমরা সব চাইতে বেশি ভুক্তভোগী। যাঁরা ট্যাক্স দেন না তাঁরা সবচাইতে সুখী ব্যক্তি, কারণ ট্যাক্স দিতে গেলেই গোলমাল। এত মান্ধাতার আমলের rules, যেগুলি আমরা follow করতে পারি না। প্রয়োজনের খাতিরে যদি কেউ বেশি ট্যাক্স দিতেও চায় তা সম্ভব হয় না। তাই ঐ taxation procedureগুলি আমাদেরকে change করতে হবে এবং এ ব্যাপারে আমার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে।

www.pathagar.com

যদি আমরা জাতীয় পুঁজির বিকাশ ঘটাতে চাই, যদি আমরা কালো টাকা কমাতে চাই, যদি আমরা inflation কমাতে চাই, flight of capital কমাতে চাই, তাহলে দেশী পুঁজির বিকাশ ঘটানো এখন অবশ্য-কর্তব্য হয়ে পড়েছে। আমরা যত বড় বড় বক্তৃতা করি না কেন, আমরা আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য কিছুতেই কিছু করতে পারব না, যদি না আমরা আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে পারি। সেইজন্য আমি প্রস্তাব করি, আমাদের taxation—income tax ৩০%-এ নিয়ে আসা হোক, corporation tax ৪০%-এ নিয়ে আসা হোক এবং custom duty ৩০% immediately কমিয়ে দেওয়া হোক, সমস্ত ক্ষেত্রে যাতে করে কাঁচামাল আমদানী করে আমাদের শিল্পগুলি বেঁচে থাকতে পারে, যাতে করে ৩৩টা জুটমিল বন্ধ করে দিতে না হয়। যাতে করে, আজকে মিল, কলকারখানাগুলিতে কাঁচামালের অভাবে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তারা ধ্বংস হতে চলেছে—তাদের বাঁচানোর জন্য এটা immediately দরকার। এছাড়া দেশীয় শিল্প যেখানে কাঁচামালের জন্য ১৫০%, ১২৫% duty impose করা হচ্ছে অথচ একই জিনিসের finished product আমদানী করে নিয়ে আসা হচ্ছে ২৫ per cent, ৩০ per cent-এ। এতে করে আমরা import oriented যে economic policy pursue করছি তাতে আমাদের দেশে নতুন এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আজকে আমরা নিজেরা যদি self-sufficient হতে চাই, যে স্বনির্ভরতার কথা আমরা বলি, সেটা একমাত্র সম্ভবপর হবে, যদি আমরা আমাদের জাতীয় শিল্পকে বাঁচাতে পারি এবং এই জাতীয় শিল্পকে বাঁচানোর জন্য raw materials-এর উপর import duty কমাতে হবে। এই পার্লামেন্টের একটি কমিটি করে ট্যারিফ এ্যানোম্যালিগুলি রিল্যাক্স করার ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে, যাতে করে আমরা আমাদের জাতীয় শিল্পকে বাঁচাতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, excise duty, যেসব খাতে পাঁচ কোটি টাকার কম আয় রয়েছে সেসব খাতগুলিতে excise duty exempt করে দেওয়া হোক। অনেকে বলবেন যে, এতে আমাদের revenue কমে যাবে। আমাদের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আছেন, যিনি পার্লামেন্টে বসেন না, কিন্তু তিনি একবার আমার সঙ্গে argue করেছিলেন যে, revenue দেশে কমে যাবে যদি custom duty কমিয়ে দেওয়া হয়, income tax কমিয়ে দেওয়া হয়।

মাননীয় স্পীকার, দুনিয়ার সমস্ত দেশে এটা প্রমাণিত হয়েছে, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এতে revenue কোন দিন কমে নি, বরং revenue বেড়েছে। Inflation কমেছে, flight of capital কমেছে, investment বেড়েছে, production বেড়েছে, employment বেড়েছে, work generate করেছে। এটা আমরা দেখেছি আমাদের অভিজ্ঞতায়।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের stock exchange আছে একটা। আমরা জানি না এটা কোথায় কিভাবে operate করে। এই stock exchangeকে reactivate করতে হবে। এটা যদি করতে চাই আমরা, তাহলে abandoned property রয়েছে সরকারের under-এ। আমাদের সরকার অনেক শেয়ারের মালিক হয়েছেন, বিভিন্ন সংস্থায়। কিন্তু তাঁরা কোন কাজ করেন না। সেখানে অফিসাররা বোর্ডে গিয়ে বসেন। একশ' টাকা করে board meeting-এ attend করার জন্য টাকা পান। সেটা নিয়ে চলে আসেন অফিসে। সেই শেয়ারগুলির সত্যিকারের মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হচ্ছে না। আমি প্রস্তাব করছি, এই শেয়ারগুলি যদি আমরা প্রাইভেট সেক্টরে দিয়ে দেই, বেসরকারী খাতে দিই, তাহলে আমাদের stock exchangeকে reactivate করা সম্ভবপর হবে, employment generate করা সম্ভবপর হবে, capital generate করা সম্ভবপর হবে।

মাননীয় স্পীকার, কৃষি খাতে আমরা আমাদের কৃষকদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য দিতে পারছি না। কৃষিক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, কৃষকরা যে পণ্য উৎপাদন করছে, সেই উৎপাদনের মূল্যের নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারছি না। Jute sector-এ আগে আমরা দেখেছি, যখন এটা public sector-এ ছিল এবং এ জন্য ৫টা কর্পোরেশন ছিল, তখন যেখানে সরকার পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি ১২০ টাকা নির্ধারণ করেছিল, সেখানে কৃষক ৪০ টাকাও পায় নি। সরকার এর কোন নিশ্চয়তা দিতে পারে নি। যতদিন পর্যন্ত না সরকার কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারবে, ততদিন পর্যন্ত সেটা সরকারের জন্য একটা অপমানজনক ব্যাপার হবে। সেই সরকার ব্যর্থ হতে বাধ্য হবে, যদি তারা এটা করতে না পারে।

www.pathagar.com

ভূমি সংস্কারের জন্য আমি প্রস্তাব করেছি যে, এমন একটা কমিটি করা হোক, যাতে করে production বাড়ানোর জন্য এবং employment generate করার জন্য যে land reform-এর প্রয়োজন সেই land reform-এর একটি নীতি নির্ধারণী procedure এখান থেকে ঠিক করে দেওয়া হোক, যাতে করে সে ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি এবং একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

তারপরে ভূমিহীন কৃষকদের সম্পর্কে অনেকে বলেছেন যে, তাদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দেওয়া হোক। মাননীয় স্পীকার, ভূমিহীনদের শুধু জমি দিলেই চলবে না। জমির সাথে সাথে তাদেরকে কৃষি উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। শুধু তাই নয়, তাদেরকে বসতবাড়ি দিতে হবে। কারণ, বসতবাড়ি যদি দিতে না পারি, তাহলে তারা সেই জমি ভোগদখল করতে পারবে না। ইতিপূর্বেই দেখা গিয়েছে যে, ভূমিহীন কৃষক কেল্লাদারদের লাঠির আঘাতের ভয়ে সেই জমির আশেপাশে যেতে পারে না। যে জমি সরকার তাদেরকে দেয়, সেই জমি তাদের ৫শ' টাকা বিঘা দামে বিক্রি করে দিতে হয়। দেখা যায় যে, হয় সে ঐ জমিতেই যেতে পারে না; না হয় তাকে জমি বিক্রি করে দিতে হয়, না হয় সে জমিতে উৎপাদনের জন্য যে উপকরণ দরকার, তা সে কোন দিনই জোগাড় করতে পারে না। আমাদের দেশে কৃষিঋণ নেওয়ার যে পদ্ধতি রয়েছে, সেই মান্ধাতার আমলের পদ্ধতি চালু থাকার জন্য তারা কৃষিঋণ গ্রহণ ক রতে পারে না। কারণ, তাদের কোন স্থাবর সম্পত্তি থাকে না। মাননীয় স্পীকার, আমি তাই মনে করি যে, আমরা ভূমিহীনদেরকে যদি ভূমির সাথে সাথে কৃষি উপকরণ এবং বসতবাড়ির ব্যবস্থা করতে না পারি, তাহলে ভূমিহীনদের সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব না।

মাননীয় স্পীকার, আমরা যদি প্রতিটি গ্রামে একটি করে compulsory multipurpose co-operative society সৃষ্টি করি তাহলে প্রত্যেক গ্রামে যারা বেকার আছে, যারা ভূমিহীন আছে, যাদের জমি কম আছে, তাদেরকে আমরা একটি সম্মানজনক বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে পারব।

খাদ্যের ব্যাপারে আমার বিরোধী দলের ভাইরা অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, খাদ্যকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা উচিত। তার কারণ, এদেশের সাধারণ মানুষ যারা ক্ষুধার্ত, যারা খেতে পায় না, তাদের দুর্দশাকে বৃদ্ধি করে রাজনীতি করার কোন মানে হয় না। খাদ্যের উপরে একটা national consensus করতে হবে, যাতে করে সকল দলের সকল নেতা ও কর্মীরা এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশের লোক যাতে না খেয়ে না মরে সেজন্য খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের এই পার্লামেন্টে একটি national consensus করতে হবে।

চা শিল্পকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাখার কোন মানে হয় না। এটাকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসা হোক। মাননীয় স্পীকার, শিল্প খাত সম্পর্কে আমি আর দু'একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব।

বড় বড় কর্পোরেশনের যেসব ইউনিটের মূলধন ২০ কোটি টাকার নিচে, সেগুলিকে disinvest করা হোক। এগুলিকে কর্পোরেশনের অধীনে রাখার কোন মানে হয় না। ৫০ কোটি টাকার নিচের কোন project কর্পোরেশনের হাতে দেওয়া উচিত হবে বলে আমি মনে করি না। এবং এইসব কর্পোরেশনের মাথাভারি প্রশাসনকে কমিয়ে এনে ছোট করে একটি effective public sector স্থাপন করা হোক। এই প্রস্তাব আমি করছি। আমি মনে করি যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমাদের যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান quick return দেবে, সেগুলিকে priority list-এ রেখে সেইসব project-এ আমাদের সর্বপ্রথম হাত দিতে হবে, যাতে করে আমরা এমন কোন প্রজেক্ট না নেই যে, ১০ বছর ধরে প্রজেক্ট চলতে থাকে। সেই প্রজেক্টের রিটার্ন আমরা পাই না। অথচ যদি এমন কোন প্রজেক্ট আমরা নেই, যে প্রজেক্টের রিটার্ন আমরা তাড়াতাড়ি পাব, তাহলে সেইসব ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমরা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করতে পারব।

মাননীয় স্পীকার, প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস। এই গ্যাস সম্পর্কে একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এই সিদ্ধান্ত এই পার্লামেন্টে নিতে হবে বলে আমি প্রস্তাব করছি। এই পার্লামেন্টে একটি standing কমিটি করে দেওয়া হোক। তারা এই জিনিসটা বিচার করে দেখুক যে, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির কাছে বা তারও বাইরে এই গ্যাস আমরা বিক্রি করব কি করব না। করলে কী শর্তে করব, এটা যেন কোন ড্রইংরুমে সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়, পার্লামেন্টের চত্বরে যেন নেওয়া হয়।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, কতগুলি বিষয়কে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। আমি মনে করি যে, সমস্ত দল-মত নির্বিশেষে কতগুলি বিষয়ে আমাদের ন্যাশনাল কনসেন্সাস বিল্ডআপ করা উচিত। তার মধ্যে হল পপুলেশন, স্বাস্থ্য, খাদ্য, ভূমি সংস্কার, পরিকল্পনা, লিটারেসি, ডিসেন্ট্রালাইজেশন অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এগুলির ব্যাপারে আমার মনে হয় সর্বদলীয় কমিটি হতে পারে, যাতে করে আমরা জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করে এই কাজগুলি করতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, এই পার্লামেন্টকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। যদি আমরা প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম চালু রাখতে চাই, তাহলে প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্টের যে ব্যালান্স রয়েছে এই ব্যালেন্সকে আরও improve করতে হবে। এই improve করার জন্য আমি তিনটি প্রস্তাব করতে চাই। একটি হল, মাননীয় স্পীকার, আমাদের সংবিধানে আছে যে, শতকরা কুড়ি ভাগ মন্ত্রী পার্লামেন্টের বাইরে থেকে আসতে পারে। আমি মনে করি যে, আমরা এটা delete করে দিতে পারি। কারণ এই পার্লামেন্টে অনেক সুদক্ষ সদস্য আছেন, যাঁরা মন্ত্রিসভার সদস্য হলে, যাঁরা সদস্য নন, তাঁদের চাইতে খুব খারাপ চালাবেন বলে মনে করি না।

মাননীয় স্পীকার, দুই হল, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আছেন, তাঁর কোন ক্ষমতা নেই। শাহ আজিজুর রহমানের জন্য বলছি না, ইনস্টিটিউশনের জন্য বলছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কোন power আমাদের সংবিধানে নেই। আমি মনে করি যে, আমাদের সকলের উচিত হবে এই সংবিধানকে সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রীর power and function define করে দেওয়া। আর একটি ব্যাপার হল এই যে, আমাদের কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে no confidence motion আনার ক্ষমতা কারো নেই। আমি মনে করি যে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বাড়বে অথচ প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কমবে না, যদি আমরা মন্ত্রিসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে বা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে no confidence motion আনার provision করি, তাতে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্টের ভারসাম্য আরও মজবুত হবে।

আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

www.pathagar.com

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় পড়েছিলাম, জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্বভার দিতে হবে

রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণের উপর বক্তব্য

২১ জুলাই ১৯৮৬

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাতে সামরিক প্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। পরবর্তীতে গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়ায় অনেক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি ১৯৮৬ সালে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হন। যদিও এই নির্বাচনে দেশে বিরাজমান দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিএনপি অংশগ্রহণ করে নি এবং নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু হয়েছে তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়, কিন্তু তারপরও এই নির্বাচন সামরিক আইন এবং শাসন প্রত্যাহার করে দেশে সংবিধান সম্পূর্ণভাবে পুনর্বহালের পথ সুগম করে। এই ভাষণে এরশাদ মূলত সামরিক শাসনামলে তাঁর প্রণীত বিভিন্ন সংস্কার এবং উন্নয়ন কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ দেন। ১৯৮২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সংসদে লেখকের প্রদত্ত নীতিনির্ধারণী বক্তব্যের আঙ্গিকে এরশাদের ভূমি সংস্কার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এই বক্তব্যে একটি নতুন নির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতি হিসাবে এরশাদ এই ভাষণ দেন। দেশে তখনও সামরিক আইন বহাল ছিল এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তখনও হয়নি।

মাননীয় স্পীকার

আজকে আমি সর্বপ্রথম মাননীয় সদস্য গিয়াস কাদের চৌধুরী[1] আনীত প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানাচ্ছি।

রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণের মধ্যে দেশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর যে চিন্তাধারা সেটা জানার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তিনি এই গত সাড়ে ৪ বছরে নানা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই সাড়ে ৪ বছরের শাসন আমলকে আমরা উন্নয়ন ও সংস্কারের যুগ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। অর্থাৎ 'এইজ অব ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিফর্মস'। গত সাড়ে ৪ বছরে এই সরকারের অধীনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প এবং কৃষিতে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে আমাদের দেশে কর্মসংস্থান এবং উৎপাদন বেড়েছে।

জাতীয় সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার ১৯৮১-৮২ সালে ১.৬ শতাংশ ছিল সেটা আজকে বেড়ে ৭.২ শতাংশ হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন ১৯৮১-৮২ সালের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ বেড়েছে এবং ১৯৭২-৭৩ সালে আমাদের দেশে এক কোটি টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন হয়েছিল। সেই তুলনায় গেল বছর আমরা ১ কোটি ৬২ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন করেছি।

মাননীয় স্পীকার, যেসব সংস্কার এই সরকার এনেছেন তার সব আলোচনা না করে আমি দু'একটি সংস্কারের উপরে গুরুত্ব দিতে চাই। প্রথমটি হল ভূমি-সংস্কার। অতীতের সকল সরকারই ভূমি-সংস্কারের কথা বলেছেন। কিন্তু এই প্রথম নির্দিষ্টভাবে একটি ভূমি-সংস্কার নীতিমালা এই সরকার প্রণয়ন করেছেন। সেটা বাস্তবায়ন করতে হয়তো আমরা এখনও সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হই নি। কিন্তু এটা যদি বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়, তাহলে এই দেশের কোটি কোটি কৃষকের ভাগ্যের উন্নয়ন আসবে। তাদের জীবনে নিশ্চয়তা ফিরে আসবে।

মাননীয় স্পীকার, এই ভূমি-সংস্কারের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হল আগেকার জমানায় বর্গাদারদের কোন অধিকার ছিল না জমির উপর। এই প্রথম আইনের মাধ্যমে বর্গাদারদের কমপক্ষে

১.গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী, চট্টগ্রাম-৭ আসনে নির্বাচিত সদস্য।

www.pathagar.com

৫ বছরের জন্য জমি চাষ করার ক্ষমতা এবং অধিকার দেওয়া হয়েছে। জমির ফসল তেভাগের ভিত্তিতে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি মালিক চাষের উপকরণ না দেয় তাহলে বর্গাদার উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগের অংশীদার হবে এবং মালিক এক-তৃতীয়াংশ ভাগের অংশীদার হবেন।

ক্ষেতমজুরের মজুরি, অর্থাৎ আমরা যাদেরকে বলি দিনমজুর, যারা ক্ষেতে-খামারে কাজ করে তাদের wage fixation বলে কিছু ছিল না। এটা বহুদিনের একটা দাবি ছিল এবং আমি মনে করি, এটা একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ যে, এই প্রথম আমরা ক্ষেতমজুরের মজুরির নিশ্চয়তা দিয়েছি এবং আমরা বলেছি যে, সাড়ে তিন কেজি চালের সমান মূল্য তাকে দিতে হবে একদিন কাজ করার জন্য।

মাননীয় স্পীকার, একইভাবে এই সরকারের ঔষধনীতি সারা বিশ্বে নন্দিত হয়েছে। World Health Organisation থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের ঔষধনীতি নিয়ে আলোচনা হয়। চার হাজার বিভিন্ন ধরনের ঔষধ আমাদের দেশের নিরক্ষর, অশিক্ষিত, নিরীহ মানুষের কাছে বিতরণ করে, এদেরকে নানা রকমের ঔষধ খাইয়ে, অনেক সময় জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করার একটা প্রচেষ্টা তখন ছিল। তার মধ্যে ১,৭০৭টি ঔষধ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং ২৫০টি ঔষধকে প্রয়োজনীয় আখ্যায়িত করা হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ১০০টি ঔষধকে অর্থাৎ যেগুলির ব্যাপারে প্রেসক্রিপশন লাগবে সেগুলিকে জরুরী ঔষধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপজেলা লেভেলে মাত্র ৩৩টি ঔষধ প্রেসক্রাইব করার ক্ষমতা সরকার ডাক্তারদেরকে দিয়েছেন। চাহিদার শতকরা ৯০ ভাগ ঔষধ বাংলাদেশে তৈরি হবে।

সবচাইতে বড়, উল্লেখযোগ্য, গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক সংস্কার এই সরকার এনেছেন সেটা হল প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ। মাননীয় স্পীকার, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন থেকে, স্কুলজীবন থেকে শুনে এসেছিলাম আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক। আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থা অনুপযোগী এবং এই প্রশাসন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থায় পরিণত করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, ১৯৫৪ সালে, আমি তখন স্কুলের ছাত্র, ২১-দফায় পড়েছিলাম যে, প্রশাসনকে democratise করতে হবে, গণতন্ত্রায়ন করতে হবে এবং জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে প্রশাসনের দায়িত্বভার দিতে হবে। Bureaucracyকে elected representative-দের কাছে accountable করতে হবে। এই দাবি ১৯৫৪ সাল থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন আন্দোলনের সময় আমরা শুনে এসেছি। আজকে প্রকল্প অগ্রাধিকার, প্রকল্প প্রণয়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে উপজেলার নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং তাঁর অধীনে যে উপজেলা পরিষদ আছে তার উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

আমরা যদি এই উপজেলার budget allocation-এর দিকে তাকাই, তাহলে আমরা দেখব ১৯৮৫-৮৬ সালে আমাদের বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ ছিল তার ২২.২৩ শতাংশ টাকা উপজেলা উন্নয়নের জন্য এই সরকার ব্যয় করেছেন। ১৯৮৬-৮৭ সালে অর্থাৎ এই বছর, যেহেতু আমাদের উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেড়েছে সেই জন্য আমরা শতকরা ১৬.৬৭ ভাগ উপজেলার উন্নয়নের জন্য খরচ করছি। এবং এই Third Plan-এর দু'বছরে ১৯.২২ শতাংশ টাকা আমরা এই উপজেলার গ্রামের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করেছি।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের যে revenue surplus হয় অর্থাৎ আমাদের আয়ের যে উদ্বৃত্ত, এই উদ্বৃত্তের, রাজস্ব উদ্বৃত্ত যাকে আমরা বলি, সেই উদ্বৃত্তের কত শতাংশ এই উপজেলা অর্থাৎ গ্রামের উন্নয়নের জন্য আমরা খরচ করছি সেটা আমি উল্লেখ করতে চাই। ১৯৮৩-৮৪ সালে যখন এই উপজেলা পদ্ধতি চালু হয়, আমরা এই উদ্বৃত্তের ৬৫ শতাংশ উপজেলাকে দিয়েছি। ১৯৮৪-৮৫ সালে ৭৭ শতাংশ দিয়েছি। ১৯৮৫-৮৬ সালে ৬৫ শতাংশ দিয়েছি। এবং এই বছর ১৯৮৬-৮৭ সালে আমাদের রাজস্ব উদ্বৃত্তের শতকরা ৩১ ভাগ আমরা উপজেলার উন্নয়ন অর্থাৎ গ্রামের উন্নয়নের জন্য খরচ করার ব্যবস্থা রেখেছি।

মাননীয় স্পীকার, এই যুগান্তকারী সংস্কারকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদ আজ নিজেকে একজন সফল সংস্কারক হিসাবে ইতিহাসে পরিচিত করতে পেরেছেন। এই ব্যাপারে আমি একটি ব্যাখ্যা দিতে চাই। আমার কাছে সংবাদপত্রের clippings আছে। কোন একটি রাজনৈতিক

www.pathagar.com

দলের, বিরোধীদলীয় সংসদীয় দলের নেতার উল্লেখ করে বলতে চাই–তিনি বলেছেন, উপজেলা পদ্ধতি সংবিধানবিরোধী।

আমি পেছনের দিকে যেতে চাই না, কাউকে সমালোচনা করতে চাই না। কিন্তু এটা হল ১৯৭২ সালের Original Constitution. মাননীয় স্পীকার, আপনি নিজেও ছিলেন, এই সংবিধানে আপনার সই আমি দেখেছি ঢাকা জাদুঘরে যে কপি আছে তাতে।[২]

মাননীয় স্পীকার, আমি ১১ অনুচ্ছেদের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কারণ যেহেতু ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এদেশের মানুষ প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য, প্রশাসনকে গণতন্ত্রায়ন করার জন্য আন্দোলন করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে। তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে। এই অনুচ্ছেদে লেখা আছে,

> "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"

অর্থাৎ participation of people at every level of administration is to be guaranteed। এটা আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির মধ্যে রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আমি ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে যেতে চাই যেখানে স্থানীয় শাসন সম্পর্কে আলাদা chapter আপনারা করেছিলেন। সেই chapter-এ আছে:

> "আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনের নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

এখানে যে কথাটি আমি একটু আগে উল্লেখ করেছি, প্রকল্প অগ্রাধিকার ঠিক করা, প্রকল্প প্রণয়ন করা এবং বাস্তবায়ন করা একই হুবহু ভাষায় এখানে লেখা আছে:

> "জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।"

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, চতুর্থ সংশোধনী বিল যখন আনা হয় ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫ সালে, বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের এই যে দাবি, এই যে আশা, এই যে স্বপ্ন, যে প্রশাসনকে গণতন্ত্রায়ন করা হবে, প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে, প্রশাসনকে ঔপনিবেশিক ছায়া থেকে আমরা দূরে সরিয়ে আনব, সেই chapterটা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ–স্থানীয় শাসনের পুরো chapterটা delete করে দেওয়া হয়।

১১ অনুচ্ছেদের শেষ লাইনটি, যেখানে লেখা আছে,

> "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"

এই লাইনটিও delete করে দেওয়া হয়েছে ৪র্থ সংশোধনী বিলের মাধ্যমে। তার ফলে সেই সরকার, যাঁরা আজকে এখানে উপজেলা সম্পর্কে বলেন, তাঁরা তখন Governor system introduce করেছিলেন এবং রাজনৈতিকভাবে appointed মানুষকে দিয়ে, গণতান্ত্রিক উপায়ে নয়, অগণতান্ত্রিক উপায়ে local government চালানোর জন্য তাঁরা তখন article-এর শেষ লাইনটি delete করে দিয়েছিলেন। তাই, আজকে মাননীয় স্পীকার, এই যুগান্তকারী সংস্কার এ দেশের মানুষের মনের আশা পূরণ করবে, আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবে। যেহেতু প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ আজকে আনা হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য, সেহেতু রাষ্ট্রপতি এরশাদের এই সরকার বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মাননীয় স্পীকার, যদিও বিরোধীদলীয় সংসদ-সদস্যগণ অধিবেশন বর্জন করেছেন, কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রপতির ভাষণ বর্জন করেন নি। কারণ রোজ আমরা খবরের কাগজে দেখি তাঁরা এই পার্লামেন্টে

---

২. এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করছিলেন ডেপুটি স্পীকার জনাব কোরবান আলী।

www.pathagar.com

নিজেদের কক্ষে বসে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনা করছেন। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় একদিক দিয়ে। তাঁরা অধিবেশন কেন বর্জন করছেন জানি না, কিন্তু রাষ্ট্রপতির ভাষণ যে তাঁরা বর্জন করেন নি এবং তার উপর তাঁরা আলোচনা করে তাঁদের বক্তব্য দিয়ে চলেছেন এবং তার ফলে আমরাও তাঁদের প্রতিক্রিয়া খবরের কাগজের মাধ্যমে কিছু কিছু পাচ্ছি।

আজকে এই সুযোগে আমি তাঁদের কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। তাঁরা বলেছেন, এই রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়ার এখতিয়ার নেই এবং তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন। ১৮ জুলাই '*ইত্তেফাক*', '*বাংলার বাণী*', '*খবর*' পত্রিকায় এ সব বেরিয়েছে। আমি এর উত্তরে গতকাল সামান্য একটু বলেছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় এই জিনিসটা একটু পরিষ্কার হওয়া ভাল।

মাননীয় স্পীকার, এই পার্লামেন্ট সংবিধানের relevant provision-এর অধীনে গঠিত। কিন্তু সামরিক আইনের অধ্যাদেশের অধীনে এই নির্বাচন হয়েছে এবং এই পার্লামেন্ট বসেছে। স্পীকারের যে নিয়োগপত্র এবং ডেপুটি স্পীকারের যে নিয়োগপত্র, সামরিক আইনের অধীনেই সেগুলি দেওয়া হয়েছে। আমরা সহ বিরোধী দলীয় সংসদ-সদস্যরাও এই সামরিক আইনের অধীনে নির্বাচনের ফলে নির্বাচিত হয়ে তাঁরা সেই সামরিক আইনের অধীনে নিযুক্ত স্পীকার সাহেবের কাছে শপথ গ্রহণ করেছেন। যে অধ্যাদেশের অধীনে আজকে এই পার্লামেন্ট বসেছে এবং আমাদের সংবিধানের যেসব অনুচ্ছেদ পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে তার gazette notification হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৮৬ তারিখে। আমাদের সংবিধানের যে legislature chapter-এর অধীনে আমরা আজকে এখানে বসেছি এর সমস্ত অনুচ্ছেদ পুনরুজ্জীবিত হয়েছে ১০ জুলাই, ১৯৮৬ থেকে।

মাননীয় স্পীকার, সামরিক অধ্যাদেশের ১২ নং paragraph-এ বলা আছে:

> "Notwithstanding anything contained in the Constitution, any reference to the President in any part or provision of the Constitution revived by this order or by any other order... shall be a person elected as President enters upon office, be read as a reference to the person holding office as President of Bangladesh."

মাননীয় স্পীকার, আমাদের দেশে একজনই রাষ্ট্রপতি রয়েছেন এবং বিরোধীদল যখন দাবি তোলেন সেই রাষ্ট্রপতির কাছেই তোলেন। সেই বিরোধীদলই যাঁরা আজকে বলছেন যে, এই রাষ্ট্রপতির এখানে ভাষণ দেওয়ার অধিকার নেই, সেই বিরোধীদলের নেতারাই আজকে এই রাষ্ট্রপতিকে বলছেন যে, আপনি সামরিক আইন অধ্যাদেশে সংবিধানকে সংশোধন করেছেন যাতে করে আমরা এই পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারি।

এটা একটা অত্যন্ত স্ববিরোধী gesture on the part of the Opposition। এই self-contradiction-এর জন্য বিরোধীদল আজকে জনগণের সামনে তাদের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় নি।

মাননীয় স্পীকার, আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, article 73, যা এই অধ্যাদেশের অধীনে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে এবং যার অধীনে প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই পার্লামেন্টে ভাষণ দিয়েছেন, এই পার্লামেন্ট বসতে পারত না, যদি না রাষ্ট্রপতি এই পার্লামেন্টে ভাষণ দিতেন। কারণ, এটা একটা mandatory provision। article-73 হল একটা mandatory provision। এটা কোন optional provision নয়। এখানে বলা আছে:

> "The President shall address the Parliament at the commencement of the First Session of the Parliament."

সুতরাং, আজকে মাননীয় স্পীকার,

At the commencement of the First Session after a general election of the Members of Parliament and at the commencement of the First Session of each year the President shall address Parliament.

সুতরাং, এই পার্লামেন্ট বসতে পারত না, যদি না রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণ দিতেন। আজকে সে জন্য যাঁরা বলতে চান যে, নির্বাচন হয়েছে, সংসদ বসেছে সংবিধানের অধীনে, কিন্তু রাষ্ট্রপ্রতির ভাষণ

www.pathagar.com

সংবিধানের অধীনে হয় নি–এই বক্তব্য নিছক বিভ্রান্তিকর। এই বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। এই বক্তব্যের সাথে আমাদের সংবিধানের কোন মিল নেই।

মাননীয় স্পীকার, তাঁরা আর একটা কথা বলেন যে, সংসদকে পাশ কাটিয়ে বাজেট পাস করা হয়েছে। আমাদের বাজেট পাস করার provision হল article-87 of the Constitution, যেটা গত ১০ জুলাই revived হয়েছে। সুতরাং, যাঁরা বলেন যে, আমরা সংসদকে পাশ কাটিয়ে বাজেট করেছি, তাঁদের উদ্দেশে আমি এটুকু বলতে পারি যে, সময়ের স্বল্পতার জন্য এবং আইনগত কারণের জন্য আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই পার্লামেন্টের মাধ্যমে আমরা পাস করতে পারি নি। কারণ ১ জুলাই থেকে অর্থবছর শুরু হয়। আমরা যে বাজেট আলোচনার জন্য দেব, article-84-এর অধীনে, এই বাজেটের একটা সাধারণ আলোচনা হয়। সেই আলোচনার উপর ভিত্তি করে এবং দু-তিন সপ্তাহ আলোচনার পর, সেই সুপারিশগুলির উপর ভিত্তি করে ৮১ অনুচ্ছেদের অধীনে Appropriation Bill পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। গত ১২ জুন আমাদের নামে গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছে। সেদিন থেকে, আমি argument sake বলছি, যদি রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের নোটিশে সংসদ অধিবেশন ডাকতেন, তাহলেও ২৬ জুনের আগে সংসদ অধিবেশন বসতে পারত না। তারপর সংসদ সদস্যদের শপথগ্রহণ, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের নির্বাচন, ইত্যাদি মিলিয়ে যে সময়ের দরকার, তাতে এই অধিবেশনে বাজেট পাস করার কোন সুযোগ থাকত না। তার ফলে আমাদের যে উন্নয়ন বাজেট অর্থাৎ এ.ডি.পি. এবং tax proposal, যেগুলি সারা বছরের জন্য করা হয় এবং ১ জুলাই থেকে effective হয়, তার কোনটাই আমরা এই সংসদ অধিবেশনে করতে পারতাম না এবং তার ফলে দেশে একটা সম্পূর্ণ অচল অবস্থার সৃষ্টি হত। এর ফলে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে একটা অচল অবস্থা আসতো এবং এখানে আমরা তখন আর কোনভাবেই আমাদের বাজেট, এ.ডি.পি. এবং যে tax proposal, সেটা আমরা এখানে পাস করাতে পারতাম না।

আর একটা কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। আমাদের বাজেট simple majorityতে পাস হয় এবং জাতীয় পার্টির শুধু simple majority নয়, আমরা এই পার্লামেন্টে বহু সংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং বাজেট, Money Bill যদি আলোচিত হত, তাহলে এ বাজেট এবং Money Bill ৫১ শতাংশ ভোটে পাস হত এবং সেটা অনায়াসে পাস হত। যদি আলোচনার প্রশ্ন তোলা হয়, তাহলে যে কোন সময়, যে কোন বিষয় বাজেট সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে এবং সেটা সম্পর্কে আমি মাননীয় সংসদ-সদস্যদের বলতে চাই যে, এই বাজেটের যদি কোন অংশ সংশোধন করতে চান, তাহলে তার এখতিয়ার এই পার্লামেন্টের রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আর একটা প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এই তারিখ ঘোষণা পার্লামেন্টের দ্বারা হওয়া উচিত ছিল। জনাব স্পীকার, নির্বাচনের কোন তারিখ পৃথিবীর কোন দেশে কোন পার্লামেন্ট ঘোষণা করে না। দুই নম্বর কথা, এই সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ প্রেসিডেন্ট এরশাদ সামরিক আইন চলার জন্য সংশোধন বা পরিবর্তন করেন নি। তার ফলে আজকে আমাদের যে সংবিধান রয়েছে এই সংবিধানের পূর্ণ পুনরুজ্জীবন নির্ভর করছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের উপর। যেহেতু নির্বাচনের এই হাউসের তিন ভাগের দুই ভাগ আসন বিরোধীদল পায় নি, সেই জন্য তারা এই সংবিধানের কোন রকম সংশোধন করার কোন সুযোগ পাবে না। সেই জন্য এটা আজকে একাডেমিক ব্যাপার যে কেন সংসদে এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপার আলোচিত হয় নি। আমি এই ব্যাপারে বলতে চাই, যেহেতু ৫ দফার মধ্যে ছিল যে, আগে পার্লামেন্ট নির্বাচন হবে এবং তারপর পার্লামেন্ট বসার পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে, আমি মনে করি প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতির প্রতি তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে পার্লামেন্টের নির্বাচন দিয়েছেন। ৫ দফার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য এই হাউস আজকে বসেছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচন যদি না হয় তাহলে গণতন্ত্রে উত্তরণের যে প্রক্রিয়া আজকে আমরা শুরু করেছি সেটা করা সম্ভবপর হবে না।

মাননীয় স্পীকার, আমি আমার বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে এসেছি। এখানে আমি সামরিক আইন এবং সামরিক শাসনের উপর দুই একটি কথা বলতে চাই। সামরিক আইন এবং শাসন কোন একটা বিশেষ অবস্থায় কোন কোন দেশে আসে। আমাদের বাংলাদেশেও এটা নতুন আসেনি। পাকিস্তান

www.pathagar.com

আমলেও দেখেছি, বাংলাদেশ আমলেও এর আগে দেখেছি, এখনও দেখছি। আজকে যে শাসন রয়েছে এই শাসন ঠিক সামরিক শাসন নয়। এখানে শুধু সামরিক আইন রয়েছে। একটা thin cover of Martial Law রয়েছে বাংলাদেশে, আইনগত কারণে। যতক্ষণ সাংবিধানিক সংসদ না আসে ততক্ষণের জন্য সামরিক আইন আজকে আমাদের দেশে বলবৎ আছে এবং থাকতে হবে।

গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া, মাননীয় স্পীকার, কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সামরিক শাসন এবং আইন যতটা সহজে আসে অতটা সহজে সামরিক শাসন বা আইন তুলে নেওয়া সম্ভবপর হয় না। আজকে তাই সমারিক শাসন ওভার নাইট তুলে নেওয়া সম্ভব নয়। যার জন্য আমরা এটাকে বলি ট্রানজিশন টু ডেমোক্রেসি। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে এই সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়া যাতে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি সেদিক থেকে এই বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

বিরোধীদলীয় সদস্যরা যদি মনে করেন যে, by an order or by a decree 'মার্শাল ল' যে রকমভাবে আসে ঠিক একইভাবে 'মার্শাল ল' তুলে নেওয়া যায়, যে রকম আমাদের সংসদের বিরোধীদলের নেত্রী বক্তব্য রেখেছেন যে, "যিনি যেভাবে এই 'মার্শাল ল' জারী করেছেন, তিনি সেইভাবেই সামরিক আইন তুলে নেবেন", তাহলে, মাননীয় স্পীকার, এই পার্লামেন্টের প্রয়োজন হত না। আমরা এই পার্লামেন্ট করেছি যাতে আইন প্রণয়নকারী হিসাবে এই পার্লামেন্ট সার্বভৌম অধিকার বাস্তবায়িত করতে পারে; সেইজন্য করেছি যাতে করে সামরিক আইন যদি তুলে নেওয়া হয় তাহলে দেশের জন্য আইন প্রণয়নে যাতে কোন অসুবিধা না হয়। পার্লামেন্ট না হলে সামরিক আইন তুলে নেওয়া সম্ভবপর নয়। এই সামরিক আইন তুলে নেওয়ার জন্য সাংবিধানিক যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এই প্রয়োজনীয়তা এই পার্লামেন্টের মাধ্যমে মেটাতে হবে এবং যেদিন এটা মেটানো যাবে সেদিন এই সামরিক আইন তুলে নেওয়া হবে, সম্ভবপর হবে।

আজকে আমরা যাঁরা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি, আমরা যাঁরা সম্প্রীতির রাজনীতিতে বিশ্বাস করি, যেমন আওয়ামী লীগ, জাসদ, বি.এন.পি, মুসলিম লীগ, এই সমস্ত দলগুলির কোনটাই বিপ্লবী দল নয় মাননীয় স্পীকার। এমনকি বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টিও বিপ্লবের কথা বলে না। সুতরাং গণতন্ত্র আনতে হলে আমাদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে আনতে হবে। সেদিক থেকে বাংলাদেশের এই পার্লামেন্ট নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। আজকে তাই 'সামরিক আইন না তুললে সংসদে যাব না,' 'সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে,' 'যিনি যেভাবে সামরিক আইন জারী করেছেন, তিনি সেভাবে সামরিক আইন তুলে নেবেন', এসব কথা বলা অবান্তর, মাননীয় স্পীকার।

মাননীয় স্পীকার, দেশে সামরিক আইন এখনও বলবত আছে। এই সংবিধানের অল্প কয়েকটি ধারা ছাড়া পুরো সংবিধান ১১টি chapter, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ পরিপূর্ণভাবে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। শুধু সেটুকুই পুনরুজ্জীবিত করা হয় নি যেমন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হওয়ার আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতির যে অধিকার সে অধিকারগুলি পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভবপর নয়। আর্টিকেল-৭, আর্টিকেল-১১ যেহেতু সামরিক আইনের সঙ্গে consistent নয়, সেইজন্য সেগুলি পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং সাংবিধানিক শূন্যতা এড়ানোর জন্য এবং দেশে পূর্ণ সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর পঞ্চম সংশোধনীর মত আর একটি সাংবিধানিক সংশোধনী পাস করা প্রয়োজন হবে।

কিছুদিন আগে ডঃ কামাল হোসেন, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের সদস্য, উল্লেখ করেছিলেন যে, ১১ এবং ৭ অনুচ্ছেদ যদি পুনরুজ্জীবিত না হয় তার মানে কোন কিছুই পুনরুজ্জীবিত হয় নি। তাঁকে উদ্দেশ করে বলতে চাই, ১১ অনুচ্ছেদের শেষের লাইনটি আপনারা চতুর্থ সংশোধনী বিলে যখন বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন তখন ১১ অনুচ্ছেদের কথা কেন মনে পড়ে নি আপনাদের। আজকে এই কথা শুধু বলতে চাই, যতদিন পর্যন্ত এই সামনের চেয়ারগুলি খালি থাকবে ততদিনের জন্য সামরিক আইন দীর্ঘায়িত হবে। আমরা সকলেই যেখানে সামরিক আইনের অবসান চাই, আসুন আমরা সকলে মিলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করি। ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের একমাত্র রক্ষাকবচ হল এই পার্লামেন্ট।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

সরকার এবং সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য এই সংবিধান সংশোধনী প্রয়োজন

সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬

১০ নভেম্বর ১৯৮৬

একটি দেশের চলমান সাংবিধানিক প্রক্রিয়া যখন ব্যাহত হয়, যা আধুনিককালে সাধারণত যুদ্ধাবস্থার মত কোন পরিস্থিতির কারণে বা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তখন সেই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য একটি সাংবিধানিক সংকট অতিক্রম করতে হয়। মূল ইস্যুটা হয়ে ওঠে আইন-কানুন, রাষ্ট্র এবং সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। সংবিধান ব্যাহত থাকার সময়কালে যেসব আইন, আদেশ, নির্দেশ, কাজকর্ম বা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন বা বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলিকে আইনসিদ্ধ করা অর্থাৎ সংবিধানের মূল স্রোতধারায় সন্নিবেশিত করা, যাতে করে রাষ্ট্র পরিচালনার ধারাবাহিকতায় কোন আইনগত শূন্যতা দেখা না দেয়। এখানে নৈতিকতার প্রশ্ন তোলা অবান্তর, কারণ বিষয়টি নেহাত একটি বাস্তবধর্মী আইনগত ব্যাপার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে, লিখিত সংবিধান না থাকা সত্ত্বেও, যুদ্ধচলাকালীন সরকারের সকল কৃতকর্মকে আইনসিদ্ধ করতে হয়েছে। ভারতে ১৯৪৯ সালের সংবিধানে স্বাধীনতা পাওয়ার পরের দুবছরের কৃতকর্মের জন্য একই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে সংবিধান প্রবর্তন করার আগ পর্যন্ত সরকারের সব কৃতকর্মকে একইভাবে আইনসিদ্ধ করা হয় (সংবিধানের চতুর্থ তফশীল ধারা ৩)। একইভাবে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক শাসন চলাকালীন সময়ের সরকারের সকল কৃতকর্মকে আইনসিদ্ধ করা হয় সংবিধান এবং সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য। এখন ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে সংবিধানের এই সপ্তম সংশোধনী কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় চার বছর সামরিক শাসন চলাকালীন সময় সরকারের সকল কৃতকর্মকে আইনসিদ্ধ করার জন্য সংবিধানের এই সংশোধনী উত্থাপন করা হয়। যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য এটা একটি স্বীকৃত সংবিধানিক প্রক্রিয়া। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯১ সালে একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রধান বিচারপতির পদে বহাল থেকে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনার সকল কৃতকর্মকেও আইনসিদ্ধ করতে হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

আমাকে কিছু বলার জন্য সময় দিয়েছেন, সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আজকের এই দিনটি আমাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। আমরা অনেক রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করে এদেশকে স্বাধীন করেছিলাম। স্বাধীন করেছিলাম দেশে একটা সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার জন্য। আমাদের অনেক স্বপ্ন ছিল এবং সেই স্বপ্ন দেখে এদেশের হাজার হাজার তরুণ তাঁদের জীবন দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য এই জাতিও সেই দিন শপথ গ্রহণ করেছিল। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে এদেশের মানুষ সংগ্রাম করেছিল, আন্দোলন করেছিল এদেশে শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি এরশাদ ২৪ মার্চ, ১৯৮২ সালে যখন দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন এবং এমন একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করবেন যাতে করে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ধারা আর ব্যাহত না হয়। আজকে আমরা এই সংশোধন বিল পাস করার মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতিকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ এবং দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই যে গত সাড়ে চার বছর যেসব রাজনৈতিক দল সংঘাতের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র আনার কথা বলেছিলেন, আজকে একটি সামরিক সরকার স্বেচ্ছায় শান্তিপূর্ণভাবে সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে। সামরিক

www.pathagar.com

সরকার ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে চায়। আজকে সবচাইতে irony হল, যেসব বিরোধীদল গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন, স্লোগান দিয়েছেন, মিছিল করেছেন তাঁরা আজকে সেই গণতন্ত্র ফিরে পেতে চান না। তারা এই বিলের বিরোধিতা করছেন।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতি এরশাদ যখন আর্মির চীফ অব স্টাফ ছিলেন তখন বিরোধীদল মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কত শত জনসভায় দাবি করেছেন, 'পোশাক ছেড়ে রাজনীতিতে আসুন।' রাষ্ট্রপতি যখন সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং একটি নজির সৃষ্টি করলেন, দুনিয়াতে বহু জায়গায় সামরিক শাসন আছে এবং আসে, তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি নির্বাচনের আগে পোশাক ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে এসেছেন।

সামরিক শাসন ও আইন যত সহজে আসে তত সহজে চলে যেতে পারে না। বাস্তবতার আলোকে আজকে এই দিনটিকে আমাদের পরীক্ষা করতে হবে। সেই জন্য আজকে অনেকে বলেন যে, আমরা এই ৭ম সংশোধন বিল এনেছি বর্তমান সরকারকে, সামরিক সরকারকে বৈধ করার জন্য। মাননীয় স্পীকার, আমি আজ আপনাকে বলতে চাই যে, এই বিল পাস হলে এই জাতি কি পাবে? প্রথমত, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, সাংবিধানিক সরকার আসবে, সংবিধান পুনর্বহাল হবে। মৌলিক অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত হবে। বিরোধীদল এতদিনের আন্দোলন, সংগ্রাম, হরতাল, মিছিল, স্লোগান যে কারণে করেছেন, আজকে রাষ্ট্রপতি এরশাদ এবং জাতীয় পার্টির সরকার শান্তিপূর্ণভাবে নিজে থেকেই তাদের দাবিকে নিস্তব্ধ করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যে বিল আজকে মাননীয় আইন-মন্ত্রী[১] উত্থাপন করেছেন তার সমর্থনে আমরা অনেকে বক্তব্য রেখেছি। এই বিলটি, মাননীয় স্পীকার, নতুন কিছু নয়। In continuity of law and society there cannot be any vacuum। কোন রাষ্ট্র, কোন সমাজ, কোন জাতি, কোন একটি জায়গায় স্তব্ধ হয়ে থাকতে পারে না। একটি জাতি চলমান ঘড়ির কাঁটা, এটাকে বন্ধ করে রাখা যায় না।

আজকে আমরা এই continuity ensure করতে চাই। আমরা এই continuity ensure করার জন্য এই বিল এনেছি।

The purpose of this bill is to ensure the continuity of law and society, state and the sovereign authority of Bangladesh.

আজকে যাঁরা বলেছেন যে, আমরা এই বিলটি এনে এই সরকারকে বৈধ করার চেষ্টা করেছি, তাঁদের উদ্দেশে বলতে চাই যে, তাঁরা এই সংসদে না এসে, বিরত থেকে, এটা প্রমাণ করেছেন যে, তাঁরা continuity চান না; তাঁরা আমাদের সার্বভৌমত্বের continuity চান না; তাঁরা state-এর continuity চান না। তাঁরা এই সমাজ, এই রাষ্ট্র, আমাদের সমাজের যে অবকাঠামো আছে তার continuity তাঁরা চান না। সেই জন্য আজকে তাঁরা উপস্থিত হন নি।

Constitutional rule যখনই থাকে না, বা যে কোন কারণেই হোক না কেন interrupted হয়, তখন এইভাবে আইন একটি historical necessity-র পর্যায়ে পড়ে। এটা একটা constitutional imperative, এটা একটা constitutional requirement, মাননীয় স্পীকার।

আমি এর কিছুটা উদাহরণ আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। সেটা হল, ভারতের সংবিধান ১৯৪৯ সালের। Article 372-এর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। Article 394 এবং 395, এগুলিতে continuity-র provision রাখা হয়েছে। কারণ কোন দেশে, কোন অবস্থায় আইনের vacuum সৃষ্টি হতে পারে না। এই বিধান Turkish Constitution-এ আছে; এটা ১৯৭৮ সালের Sri Lankan Constitution-এ আছে। Article 158, 168 Turkish Constitution-এর reforms clause যেগুলি তাঁরা এনেছিলেন, সেগুলির protection তাঁরা সংবিধানে দিয়েছেন।

আমি আপনার সামনে আরও দুটো দৃষ্টান্ত show করতে চাই, সেটা হল এই যে, পাকিস্তানে ১৯৭৩ সালে যে সংবিধান এবং ১৯৭৫ সালে যে সংশোধনী তাঁরা এনেছেন তা যদি আমরা দেখি,

১. বিচারপতি এ. কে. এম. নুরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। সংসদে বিলটি তাঁর পক্ষে আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী উত্থাপন করেন।

www.pathagar.com

তাহলে আমরা দেখব যে, তাঁরাও তাঁদের societyকে হেয় করে রাখতে চান নি। তাঁদের laws continuance enforcement order-এর দ্বারা তাঁরা stateকে হেয় করে রাখতে চান নি। তার constitutional protection তাঁদের সংবিধানের মধ্যে তাঁরা দিয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশের কথা বলি। ১৯৫৬ সালে প্রথম যখন পাকিস্তানে সংবিধান তৈরি হয় সেই Constitution-এ '৪৭ সাল থেকে '৫৬ সাল পর্যন্ত যত আইন-কানুন করা হয়েছিল সব আইনের সাংবিধানিক protection রাখা হয়েছিল।

আইয়ুব খান '৫৮ সালে ক্ষমতায় এসেছিলেন। '৬২ সালে তিনি সংবিধান চালু করেছিলেন। এই সংবিধানে সেই protection-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল, যেদিন Proclamation of Independence জারী করা হয়, মাননীয় স্পীকার, সেদিন তদানীন্তন সরকার যার সঙ্গে আমাদের অনেকেই তখন জড়িত ছিলেন, Laws Continuance Enforcement Order চালু করা হয়েছিল। তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল:

> "I, Syed Nazrul Islam... all laws shall, subject to the proclamation aforesaid, continue to be so inforce with such consequential changes as may be necessary on account of the creation of the sovereign independent State of Bangladesh formed by the will of the people of Bangladesh and that all government officials – civil, military, judicial and diplomatic who take the oath of allegiance to Bangladesh shall continue in their offices on terms and conditions of service so long enjoyed by them and that all District Judges and District Magistrates, in the territory of Bangladesh and all diplomatic representatives elsewhere shall arrange to administer the oath of allegiance."

মাননীয় স্পীকার, what does it mean? এর অর্থ হল যে, আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলাম। কিন্তু পাকিস্তান-আমলের যে আইন তখন বলবত ছিল, before the commencement of the Order, সেটা এই আইন অনুযায়ী চালু রাখা হয়েছিল, সোসাইটিকে চালু রাখার জন্য, দেশকে চালু রাখার জন্য। Proclamation of Independence ১৯৭১ সালে ঘোষণা করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর সেই Proclamation of Independenceকে অনেকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, অনেকে বলেছিলেন যে, এই জনপ্রতিনিধিদের এই ক্ষমতা আমরা দিই নি, দেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রস্তাবনা তৈরি করার ক্ষমতা আমরা দিই নি।

কিন্তু মাননীয় স্পীকার, সেই ১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চ থেকে ৭১-এর ষোলই ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে যত অর্ডার হয়েছিল, যত আইন হয়েছিল, তখন এই Proclamation of Independence-এর অধীনে তাঁরা সেই আইন জারী করেছেন এবং constitutional protection তাঁরা '৭২ সালে লিপিবদ্ধ করেছেন যে ভাষায়, আমাদের এই বিলে সেই ভাষারই প্রতিফলন আপনি দেখবেন। আজকে বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানে যেটা আমাদের সকলের কাছে রয়েছে সেটার উল্লেখ ডাঃ মতিন[২] করেছেন, আমি তার সঙ্গে শুধু একটি কথা বলতে চাই যে, যদি আজকে ১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ষোলই ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের প্রচলিত আইনগুলি লিপিবদ্ধ করা না হত, যদি আজকে প্রটেকশন দেওয়া না হত তাহলে স্বাধীনতা আন্দোলন যে কারণে আমরা করেছিলাম, স্বাধীনতার জন্য রক্ত আমরা যে কারণে দিয়েছিলাম, সেটা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যেত।

মাননীয় স্পীকার, এ সংশোধনী আনার দ্বিতীয় কারণ হল আমরা পেছনে ফিরে যেতে চাই না– we want to move forward–আমরা সামনের দিকে এগুতে চাই। আমাদের দেশে একটা স্থিতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা আসুক, সেটাই আমরা চাই। আজকে যারা বিরোধীদলের সদস্য, যাঁরা আজকে এখানে উপস্থিত হন নি, তাদের আমি তিরস্কার করি। আর যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে আমরা মনে করি, দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসুক এটাই তাঁরা চান। আজকে যারা এখানে বক্তব্য

২. ডাঃ এম. এ. মতিন।

www.pathagar.com

রেখেছেন–জনাব আ. স. ম. আবদুর রব, জনাব আইনুদ্দিন[৩], মির্জা সুলতান রাজা, জনাব আমজাদ[৪] এবং বেগম লায়লা সিদ্দিকী–তাদের প্রত্যেককে আমি অভিনন্দন জানাই। আমি অভিনন্দন জানাই আরও যাঁরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং এই বিলকে সমর্থন করেছেন তাঁদেরকে। তাঁরা এই বিলকে সমর্থন করছেন এই সরকারকে বৈধ করার জন্য নয়, এদেশে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য।

আমরা শুধু গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে চাই না, মাননীয় স্পীকার। আমরা এ দেশে এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা দেখতে চাই যাতে করে এত কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়। এই বিলটি যাতে আমাদের সুফল আনে, যাতে আমাদের গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা এবং গতিধারা আর ব্যাহত না হয়, আর যাতে ইন্টারাপ্টেড না হয়, ডিসরাপ্টেড না হয়।

আজকে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করতে চাই। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আজকে এই বিল পাস হলে আমরা একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করব। ইতিহাসে আমাদের ভূমিকা উল্লেখ থাকবে।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।*

---

৩. রাজশাহী-৪ আসনে নির্বাচিত মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য মোঃ আয়েন উদ্দিন।

৪. রাজশাহী-৩ আসনে নির্বাচিত বাকশাল দলীয় সদস্য সরদার আমজাদ হোসেন।

* বিলটি ১৯৮৬ সালের ১০ই নভেম্বর সংসদে পাস হয়।

www.pathagar.com

যে কোন মূল্যে শিক্ষাঙ্গনসমূহকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখতে হবে

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

স্বাধীনতার পর পর দেশের প্রায় সর্বত্র বেআইনী অস্ত্রের সমারোহ ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পায় নি। অস্ত্রধারীদের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায় এবং অনেক নিরীহ ছাত্রকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত রাজনৈতিক দলগুলির সম্পৃক্ততা এবং পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এইসব ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডের কোন অবসান করা সম্ভব হয় নি। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ মদদে বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সকল শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র প্রদর্শন এবং ব্যবহার একটি স্থায়ী রূপ ধারণ করে, যা সারা জাতিকে ভীত এবং সন্ত্রস্ত করে তোলে। অভিভাবকদের করে তোলে আতঙ্কিত। এই অবস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক শিক্ষাঙ্গনে বিরাজ করতে থাকে। এতে একদিকে যেমন শিক্ষার মরমী পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে ছাত্র সমাজের পুরাতন সংবেদনশীল ভূমিকার ঐতিহ্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়। গোটা সমাজে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক দলগুলি সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে শিক্ষালয়গুলিকে কিছু ছাত্রের হাতে জিম্মি রাখতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এই সব কর্মকাণ্ড দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত করে তোলে। ৩-৪ বছরের সেশন জট এখন একটি রুটিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যা এমনকি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। শিক্ষাঙ্গনসমূহকে অস্ত্রমুক্ত রাখা দেশের জন্য একটি বিরাট জাতীয় সমস্যা হিসাবে দেখা দেয় এবং সেই আলোকে এ বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।

মাননীয় স্পীকার

আজকে এটা আমাদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য দিন। আমার মনে হয় বাংলাদেশের তৃতীয় সংসদের আজকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমাদের ইতিহাসে এই দিনটি অলংকৃত হয়ে থাকবে। তার কারণ, আজকে এই প্রথম বিরোধীদল একটি প্রস্তাব এনেছেন যার প্রতি শুধু সরকারী দল হিসাবেই নয়, আমরা সকলে দেশের নাগরিক হিসাবে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাতে চাই। এই কারণে যে আজকে দেশে একটা উপলব্ধি এসেছে। এটা আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে 'সাইন অব ম্যাচিউরিটি' এবং এই 'ম্যাচিউরিটি' দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে আরও যেসব জটিল সমস্যা রয়েছে সেগুলি যাতে আমরা সমাধান করতে পারি, এই সংসদের মাধ্যমে সেই দিকে আমরা এগিয়ে যাব—এই বিশ্বাস আমি রাখি।

মাননীয় স্পীকার, ছাত্রদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা আমরা জানি। আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই যে, ছাত্র সমাজের যে Cause ছিল ১৯৭১ সালে, স্বাধীনতার পর সেই Cause তাদের আর ছিল না। সেজন্য, ছাত্রসমাজকে রাজনৈতিক দলগুলি সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে নি বলেই আজকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র গেছে এবং সেই অস্ত্রের উপর আমরা আলোচনা করছি। স্বাধীনতা উত্তরকালের অবস্থার কথা যদি আমরা পর্যালোচনা করে দেখি–আমি এ কথাটা টানতে চাইনি, কিন্তু যেহেতু বিরোধীদলের একজন মাননীয় সদস্য অতীতকে টেনেছেন–তাই আমি দুই একটি দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, যুদ্ধের সময় অনেক মানুষের কাছে অস্ত্র চলে গিয়েছিল, যে অস্ত্রের হিসাব বা উদ্ধার করা তখনকার সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। তাঁরা চান বা না চান অস্ত্র এমনভাবে প্রসারিত হয়েছিল যে সেই অস্ত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করেছিল এবং তার পরিণতিতে আজকে আমাদের এই সংসদে এই বিষয়টি পর্যন্ত আলোচনা করতে হচ্ছে। কারও না কারও ছত্রছায়ায় বা পৃষ্ঠপোষকতায় এই সকল দুষ্কৃতকারীরা শিক্ষাঙ্গনে বিরাজ করে। কোন কোন রাজনৈতিক দলের

www.pathagar.com

ছত্রছায়ায় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনে এই ছাত্র বা অছাত্র যারাই হোক তাদের কাছে অস্ত্র গেছে এবং তাদের কাছে অস্ত্র আছে। আজকে যদি রাজনৈতিক দলগুলি সত্যিকারভাবে সচেষ্ট হন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে অস্ত্রমুক্ত করতে পারি।

আমি আপনাকে বলতে পারি, মাননীয় স্পীকার, অনেকে হয়ত ভাবতে পারেন যে, সরকারের জন্য এটা বোধ হয় সবচেয়ে দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এরশাদ যখন বলেছিলেন যে ছাত্রদেরকে রাজনীতি করতে দেওয়াটা বোধ হয় ঠিক নয়, তখন এটার প্রতিবাদ উঠেছিল। তিনি এই অনুভূতি থেকে এই কথা বলেছিলেন যে, যাতে করে শিক্ষার পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিক্ষাঙ্গনে থাকে। সেই 'স্পিরিট' থেকেই তিনি কথাটা বলেছিলেন। আজকে তাঁর সেই অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছে এই সংসদে। আমি মনে করি এটা রাষ্ট্রপতি এরশাদের বিজয় নয়, এটা সারা জাতির জন্য একটি বিজয় যে, আজকে এই সংসদে তাঁরই মনের অনুভূতির প্রতিধ্বনিতে আমরা এখানে বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা করছি।

মাননীয় স্পীকার, ১৯৭২ সালের কথা বলেছেন মাননীয় সংসদ-সদস্য আ. স. ম. আবদুর রব। ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ সালে ডাকসুর নির্বাচনে তখনকার সরকারীদলের ছাত্র সংগঠন হেরে গিয়েছিল বলে সেখানে ব্যালট বাক্স ছিনতাই হয়েছিল। এটা কোন অতিরঞ্জিত কথা নয়, আমি এই কাগজ পড়ে দুটি লাইন মাত্র শোনাতে চাই:

> "গতকাল ডাকসু ও হল নির্বাচনে হেরে গিয়ে ভোটদান পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলেও সন্ধ্যার পর ভোট গণনাকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ব্যবহারে সচকিত হইয়া উঠে। রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হল ব্যতীত অধিকাংশ হলের ব্যালট বাক্সই অস্ত্রের মুখে ছিনতাই করা হয়।"

এটা হল *ইত্তেফাক* ৪-৯-৭৩ এবং এরপরে বলা হচ্ছে:

> "এদিকে গতকালের এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও রব সমর্থিত ছাত্রলীগ পরস্পরকে দায়ী করিয়াছে। রাত্রি বারোটায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গোলাগুলি চলিতেছে এবং চরম উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা গোলাগুলি শুরু হওয়ার পরই হল ছাড়িতে শুরু করে।"

মাননীয় স্পীকার, এই ঘটনার দুইদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, সেটা আমাদের অনেকের মনে আছে। এটা হল *ইত্তেফাক* ৭-৯-৭৩ —

> "এ কি পৈশাচিক নৃশংসতা? গতকাল রাত দশটা, নিস্তব্ধ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, অন্ধকার রাস্তা। সেই নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করিয়া একটি জীপ আসিয়া দাঁড়াইল শামসুন্নাহার হল আর জগন্নাথ হলের মাঝখানে। জীপ হইতে নামানো হইল হাতে পিছমোড়া দিয়া বাঁধা, মুখচোখ বাঁধা পাঁচটি তরুণকে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া স্টেনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করিয়া দেওয়া হইল পাঁচটি তরুণকে। একবার, দুইবার, কয়েকবার শিহরিত হইল মানবতা। রাত্রি সাড়ে দশটায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাঁচটি রক্তাপ্লুত তরুণ আর পৈশাচিক বিভীষিকাকে পিছনে ফেলে জীপটি ফিরিয়া গেল। পিছনে একটা সাদা মাজদা গাড়ী রক্ষক হিসাবে ছিল।"

মাননীয় স্পীকার, আমি এই করুণ কাহিনী, এই মর্মান্তিক কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমার বলার মূল বিষয় হল, আমাদেরকে এগুলির জবাব খুঁজে বের করতে হবে। এগুলি যদি আমরা না জানি, আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারব না। তখন ড. মতিন চৌধুরী ছিলেন ভাইস-চ্যান্সেলর। তিনি বলছেন, "মাত্র কয়েকটি গুলির সঙ্গে অকালে ঝরিয়া পড়িল যে কয়টি সোনার ছেলে, ইহা অপেক্ষা মর্মান্তিক এবং করুণ কাহিনী আর কী হইতে পারে?"

মাননীয় স্পীকার, নিহত তরুণদের যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশত সেই সকল তরুণই সরকারী দলের বিপক্ষের ছিল, এবং তাদের সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার হয় নি। তারপর ১৯৭৪ সালের ৫ এপ্রিল তারিখে, "বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসে নৃশংস হত্যাকাণ্ড"—*বাংলার বাণী*। *ইত্তেফাক* বলেছে– "বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড।"

মাননীয় স্পীকার, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র নিয়ে কথা বলছি। সুতরাং, এটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। "বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে আবার রক্ত ঝরিয়াছে"—*ইত্তেফাক*, ৬ এপ্রিল, ১৯৭৪।

www.pathagar.com

"আবার স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রের হিংস্র গর্জনে প্রকম্পিত হইয়াছে রাত্রির অন্ধকার। আবার মানবতার হৃৎপিণ্ড হিংস্রতার কুটিল নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি ২টা ১১ মিনিটে মুহসীন হলের টিভি রুমের সম্মুখস্থ করিডরে একই কক্ষে সাতটি ছাত্রের বুক ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে বুলেটের সুতীক্ষ্ণ আঘাতে। রক্তাপ্লুত প্রাণহীন সাতটি তরুণদেহ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি বিবেকের নিকট প্রশ্ন রাখিয়াছে, এই হত্যাকাণ্ড যদি রাজনীতির পরিণতি হয়, তাহলে সাতটি তরুণ দেহে বিদ্ধ প্রতিটি বুলেট কি রাজনীতিকে হত্যা করিবার জন্য বর্ষিত হয় নি?"

মাননীয় স্পীকার, এইখান থেকে শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের রাজনীতি। আজকে যেই হত্যাকাণ্ডের কথা বলছি, এই হত্যাকাণ্ডের কোন বিচার হয় নি। বিচার হয়েছে ১৯৭৭ সালে মার্শাল ল' কোর্টে। তদানীন্তন সরকার কোন বিচার করেন নি।

সত্যি কথা বললে খারাপ লাগার কথা। যদি আমার তথ্য ভুল হয়, তাহলে বলতে পারেন। তথ্য ভুল না হলে বাধা দেবেন না।

মাননীয় স্পীকার, আজকে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। সেটা হল, 'শহীদ মিনার' সম্বন্ধে। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অংশ বলে আমরা সব সময় মনে করি। আমি যখন ক্লাস নাইন-এ পড়ি, ১৯৫২ সালে রক্ত ঝরেছিল, বরকতের রক্ত নিজের গেঞ্জি ভিজিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম স্মৃতি রক্ষা করার জন্য। আজকে সেই শহীদ মিনারের অবস্থা কী আমরা সবাই জানি। বরকত, সালামের ছবি শহীদ মিনারে ওঠে না, রফিক, জব্বারের ছবি শহীদ মিনারে ওঠে না। শহীদ মিনারে যাঁদের ছবি টাঙ্গানো হয়, যতই সম্মানিত ব্যক্তি তাঁরা হোন না কেন, তাঁরা শহীদ দিবস-এ ১৯৫২ সালে তো তাঁরা জীবন দেন নি। আজকে আমরা 'শহীদ-মিনার'কে পবিত্র জায়গা হিসাবে দেখতে চাই। এই 'শহীদ মিনার'-এ এমন পরিবেশ দেখতে চাই যাতে করে, আমরা সকলে গিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের শ্রদ্ধা 'শহীদ মিনার'-এ নিবেদন করতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি দুই-একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। প্রথমত, রাজনৈতিক দলগুলিকে ঐকমত্যে আসতে হবে। আজকে যদি আমরা ঐকমত্যে আসতে পারি, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা অস্ত্রমুক্ত করতে পারব যে কোন সময়ে। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। যারই লোক হোক না কেন, যদি সরকার পক্ষের কোন ছাত্রের কাছে কোন অস্ত্র থাকে বা বিরোধীদলের কোন ছাত্রের কাছে বা অছাত্রের কাছে অস্ত্র থাকে, তাহলে তাকে সমানভাবে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহ থেকে অছাত্র এবং বহিরাগতদেরকে পুরোপুরিভাবে উৎখাত করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, ছাত্র-ছাত্রীদের এবং শিক্ষকদের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। আজকে শিক্ষকরা এবছর ঠিক করেছেন 'শহীদ-মিনার'-এ তাঁরা যাবেন না। কারণ, তাঁরা জীবনের নিশ্চয়তা সেখানে খুঁজে পান না। চিরাচরিতভাবে ১৯৭২ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই 'শহীদ-মিনার'-এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আজকে তাঁরা 'শহীদ-মিনার'-এ যেতে চান না তাঁদের জীবনের ভয়ে।

মাননীয় স্পীকার, যেসব ছাত্র বা অছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র ব্যবহার করে বা অস্ত্রের অধিকারী তাদেরকে, তারা যে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক হোক না কেন, দলমত নির্বিশেষে তাদেরকে নির্মূল করার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে, সকল রাজনৈতিক দলকে ধিক্কার দিতে হবে, নিন্দা জানাতে হবে, প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আজকে প্রস্তাব পাস করার পর সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেননা এই পার্লামেন্টে আজকে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাস হতে যাচ্ছে। এই প্রস্তাব আইনের চাইতে বেশি বল রক্ষা করে এবং আইনের চাইতে বেশি এর 'ফোর্স অব ল' রয়েছে। আশা করি, সরকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যাতে করে আমাদের যে এই উদ্বেগ, আমাদের আজকের যে এই সচেতনতা এর যাতে প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

মাননীয় স্পীকার, আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।*

---

* সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ, প্রয়োজন শুধু বলিষ্ঠ নেতৃত্বের

১৯৮৭-৮৮ সালের বাজেট

১১ জুলাই ১৯৮৭

এই বাজেট আলোচনায় মূলত সরকারের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিটা প্রকাশ পায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যক্তি উদ্যোগে, স্বাধীনতা এবং প্রতিযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং সরকারী খাতে জবাবদিহিতার বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ অন্যদিকে শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। শিল্পনীতিতে নতুন dynamics সংযোজন করা হয়। ধোলাইখাল concept-এর স্বীকৃতি এবং ব্যপক প্রসার, ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ, সংযোজন কারখানা এবং রপ্তানী বৃদ্ধির একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বাংলাদেশ যে একটি সম্ভাবনাময় দেশ তা এই বক্তব্যে প্রতিধ্বনিত হয়।

মাননীয় স্পীকার

বাংলাদেশের মত একটা দরিদ্র দেশের জন্য, যেখানে সম্পদ সীমিত, একটা বাজেট দেওয়ার জন্য আমি সর্বপ্রথম আমাদের অর্থমন্ত্রী সাইদুজ্জামান সাহেবকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। আমাদের মত দেশে অনেক স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করতে হয়। তার মধ্যেও তিনি যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য আমি তাঁকে মোবারকবাদ জানাই।

মাননীয় স্পীকার, আমি আমার বক্তব্য বাজেটের অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব না। কারণ বাজেটের অঙ্কের উপর অনেক আলোচনা হয়েছে। এই বাজেটের মূল বক্তব্যটা কী তার উপর আমি কিছু আলোকপাত করতে চাই। প্রত্যেক সরকারের অর্থনৈতিক, সামাজিক কর্মসূচী আছে। কতগুলি নীতি তাঁরা অনুসরণ করেন এবং সেই নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা এই বাজেটের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। আজকে এই সরকারের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দর্শন এবং এই অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে বাস্তবায়ন করার জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছা এই বাজেটের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

তবুও, দু-একটা কথা বাজেটের অঙ্কের উপর বলা দরকার। গত বছর আমাদের প্রবৃদ্ধির হার ৪.১% ছিল। এ বছর সেটা ৪.৪% হয়েছে। আগামী বছরে এটা ৫.১% রাখা হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে এর চেয়ে আরও বেশি করা উচিত ছিল। তা সত্ত্বেও আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে, এই তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় আমাদের performance ভাল হয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতি গত বছর থেকে সন্তোষজনক অবস্থায় আছে। এটাকে আমি সাংঘাতিক achivement বলে মনে করি। আমাদের মত দরিদ্র দেশে, এই ক্ষুদ্র দেশে, এই অভাবের দেশে মুদ্রাস্ফীতিকে এইরকমভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার নজির খুব কম উন্নয়নশীল দেশেই আছে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা কৃষিতে ৩.৬ শতাংশ উৎপাদন করেছি। এটা আমাদের জনসংখ্যার যে প্রবৃদ্ধি ২.৪ শতাংশ, তার চাইতে উঁচুতেই আছে। এটা যদিও গত বছর ৪ শতাংশের উর্ধ্বে ছিল, তবে এবছর আবহাওয়ার কারণে একটু কম হয়েছে। তবুও গড়ে দেখতে গেলে বলতে হয় যে, এটা একটা অত্যন্ত সাফল্যের রেকর্ড। শিল্প-খাতে গত বছর ১.২ শতাংশ মাত্র প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। এই বছর ৭.৪ শতাংশ হয়েছে, আগামী বছর ৮.৭ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এই বাজেটের মাধ্যমে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার ফলে সাড়ে নয় লক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

www.pathagar.com

আমরা কর আরোপ করেছি। আমাদের উন্নয়ন বাজেট হল ৫ হাজার ৩৬ কোটি টাকার। ৩৭১ কোটি টাকা আমরা কর আরোপ করেছি, আর বাকিটা আমরা fees এবং অন্যান্য উৎস হতে দেখিয়েছি। এটা আমাদের উন্নয়ন বাজেটের ৮% কম।

আমি '৭২ এবং '৭৫ সালের কথা টানতে চাই না। শুধু একটি উদাহরণ দিতে চাই যে, ১৯৭৩-৭৪ সালের ৫২৫ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট ছিল। সেখানে তাঁরা ৮৯ কোটি টাকা কর ধার্য করেছিলেন, সেটা ছিল ১৭ শতাংশ। মাননীয় স্পীকার, ৫২৫ কোটি টাকা খুব কম ছিল, অথচ সেই তুলনায় কর অনেক বেশি ছিল, ১৭ শতাংশ। আজকে আমরা ৫ হাজার ৩৬ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট ৮ শতাংশেরও কম কর আরোপ করেছি। এই কৃতিত্ব মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে না দিলে আমার অন্যায় হবে বলে মনে করি।

মাননীয় স্পীকার, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার কথা বিরোধীদলের মাননীয় সংসদ-সদস্যরা বলেছেন। ১৯৭৩ সাল থেকে '৭৯ সাল পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা তাঁরা বলেছেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে গেছেন যে, '৭৮ সাল পর্যন্ত তাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন না। মাত্র দুই বছরের কিছু বেশি সময় তাঁরা ছিলেন। তাঁদের projection ছিল যে, terminal year-এ, ১৯৭৮ সালে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ২৭%-এ কমে আসবে, মাননীয় স্পীকার, আজকে এটা উল্লেখ করতে হয় যে, ২৭%-এ কমে আসা তো দূরের কথা, এক বছরের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের উপরে তাদের নির্ভরশীলতা ৭৫%-এ উঠে গিয়েছিল। যদি সেই হারে তাদের অর্থনৈতিক গতি চলতো, তাহলে '৭৮ সালে সেটা ১০০% ছাড়িয়ে যেত।

আজকে তাঁরা বলেন যে, আমরা শতকরা ৮৫ ভাগ বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। এটা ঠিক যে, বিদেশী সাহায্যের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা রয়েছে কিন্তু এর কারণ হল যে, আমাদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংখ্যাও বেড়েছে, গতিও বেড়েছে। এর অর্থ হল যে, বিদেশী সাহায্য আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছি।

মাননীয় স্পীকার, এখনও আমাদের বিদেশী সাহায্যের কোন অভাব নেই। কিন্তু আমরা যেসব বিদেশী সাহায্য পাই সেগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারি না। মাত্র ১৭% বিদেশী সাহায্য আমরা ব্যবহার করতে পারছি। এবার চিন্তা করে দেখুন যে, আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশের goodwill সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজকে pipeline-এ যে অর্থের যোগান আছে, আওয়ামী লীগ যদি কোনদিন ক্ষমতায় আসে, সেই সব টাকাই তাদের জন্য থাকবে, তারা খরচ করতে পারবে।

মাননীয় স্পীকার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের দুটি স্বীকৃত পথ আছে, একটি হল সমাজতান্ত্রিক এবং আর একটি হল গণতান্ত্রিক। Mixed economy is no economy যদিও আমরা এটা ব্যবহার করি, সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয়। 'mixed' মানে কোনটাই ঠিক না–দুটোই আছে। কিন্তু economistরা বলেন, 'nothing is called mixed economy.' আজকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত দেশে যে অর্থনীতি চালু আছে আমরা কি এগুলিকে mixed economy বলব? কখনই না। অর্থনীতির একটা নির্দেশনা থাকতে হবে, আবেগের কোন স্থান নেই এখানে। কোন উচ্ছ্বাস, কোন ভাবাবেগের কোন স্থান নেই। নির্দিষ্ট পথে যদি এর অনুসরণ করা হয়, অবশ্যই এর ফলাফল পাওয়া যাবে।

যেটা আমাদের কমরেড ফরহাদ সাহেব বলেছেন, এটা আমাদের মেনিফেস্টোতে নেই। তারা মিশ্র অর্থনীতির কথা বলেছেন। এই একমাস বাজেট অধিবেশনে বক্তৃতা শুনে মনে হল যে ঐ স্থানে যত জন বসা আছেন সবাই socialist, আর আমরা যারা এখানে বসে আছি আমরা হলাম সব পুঁজিবাদী।

মাননীয় স্পীকার, কিছু অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। ঐ দিকে যখন আমি তাকাই তখন আমি ভয় পেয়ে যাই। আমার তখন ১৯৭২-৭৫ সালের জাতীয়করণ, সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা মনে পড়ে। জাতীয়করণ আর সমাজতন্ত্র এক জিনিস নয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য রেজিমেন্টেড সোসাইটির প্রয়োজন। আর তা না হলে তাঁরা নিশ্চয়ই ভারতের ইন্দিরা কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন বা ব্রিটেনের লেবার পার্টির সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন। যেই সমাজতন্ত্রের কথা তাঁরা এখানে

www.pathagar.com

বলছেন, ভাব-ভঙ্গি, ইশারা-ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে মনে হয়েছে, তাঁরা যেন রেজিমেন্টেড সোসাইটির সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন।

আমরা প্রতিযোগিতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি উদ্যোগ এবং economic democracyতে বিশ্বাস করি। এবং তারই প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করেছি এই বাজেটে। তার মানে এই নয় যে, আমরা সরকারী খাতকে উপেক্ষা করছি। এখনও আমাদের ৪৫% থেকে ৫০% industrial business public sector-এ আছে।

আমরা যখন বলি যে, আমরা economic democracy-তে বিশ্বাস করি, তার মানে এই নয় যে, আমরা সরকারী খাতকে তুলে দিতে চাই, কখনই না। আমাদের দেশে আর্থিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমরা সরকারী খাতকে মজবুত করতে চাই, প্রতিযোগিতামূলক করতে চাই, তাদের মধ্যে accountability আনতে চাই, যাতে তাদের জবাবদিহি করতে হয়, এই শিল্পগুলি পরিচালনার জন্য, ব্যবসা পরিচালনার জন্য।

সেইজন্য আমরা নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ৩০০ শ্রমিকের জায়গায় ৬০০ শ্রমিক থাকবে, দুর্নীতি থাকবে, আর জবাবদিহিতা থাকবে না, এটা হতে পারে না। সরকারী খাতকে প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে, তাদের প্রতিযোগিতা করে বাজারে টিকে থাকতে হবে। ৩ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আছে সরকারী খাতে, তার ১% রিটার্ন পাই আমরা। এই রিটার্নের অঙ্ক বাড়াতে হবে। এটাই হল আমাদের লক্ষ্য। এবং তারই প্রতিফলন আমাদের বাজেটে করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, বিরোধী দলের তিনটি মূল বক্তব্য এসেছে। একটা হল তাঁরা সবাই socialist, তাঁরা সমাজতন্ত্র চান। দুই নম্বর হল, তাঁরা কর আরোপে বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস না করে পারেন না, কারণ তাঁরাও একসময় সরকারে ছিলেন, তাঁদেরকেও কর আরোপ করতে হয়েছে। এবং আমাদের চেয়ে double কর আরোপ করেছেন তাঁরা ১৯৭৩-৭৪ সালে।

কিন্তু তাঁরা বলছেন, area of কর, যেটা আমরা নির্ধারণ করেছি, সেটা ঠিক হয় নি। সমালোচনা নিশ্চয় হবে। আমরা তাই সেই সমালোচনা মনোযোগের সঙ্গে শুনেছি। তাঁরা যে দুইটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি agitate করেছেন, সেই দুটোর কোনটাই কর নয়। একটা হল হাসপাতালের ফী, আর একটা হল বেতন বৃদ্ধি। মাননীয় স্পীকার, টাকা বড় কথা নয় এখানে। আমরা অত্যন্ত সচেতনভাবে এই বাজেটে এই দুটি ক্ষেত্রে কিছু আয় দেখিয়েছি। আমাদের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলনের জন্য আমরা এটা করেছি। সমাজের যারাই pay করতে পারে, সামান্য pay করতে পারবে, তাদেরকেই pay করতে হবে। সরকারের কাছ থেকে দিনের পর দিন বিনে পয়সায়, এই গরিব সরকারের কাছ থেকে চাইতে চাইতে আমাদের দেশের মানুষের অভ্যাস খারাপ হয়ে গিয়েছে। সবকিছু বিনা পয়সায় চায়।

তৃতীয়ত, এক একজন মাননীয় সংসদ-সদস্য দাঁড়িয়ে তাঁদের এলাকার যে দাবির কথা বলেছেন, including সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, তাতে দুইশত কোটি টাকা শুধু সুনামগঞ্জের জন্য দিতে হবে। সরকার কোত্থেকে দেবে? টাকা ছাপাবে? টাকাতো আমরা ছাপিয়েছিলাম '৭২-৭৩ সালে। সেই টাকা আমাদের এই দেশ ছাড়াও অন্য দেশেও পাওয়া গেছে। আমরা টাকা ছাপিয়ে অর্থনীতি চালাতে চাই না। আমাদের অর্থ-মন্ত্রী টাকা ছাপিয়ে দেশের অর্থনীতি চালাতে চান না। যার জন্যে মুদ্রাস্ফীতি কন্ট্রোলে রাখা সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, সেই জন্য এই রাজনৈতিক দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা যেখানে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তাদের কাছ থেকে আদায় করার ক্ষমতা এই সরকারকে রাখতে হবে। এই অভ্যাস ফিরে আসতে হবে, তাহলেই আমরা স্বাবলম্বী হব। আমাদের রাজনৈতিক দর্শনে dignity of man has to be established, আমরা মানুষকে মর্যাদা দিতে চাই, সম্মান দিতে চাই। সমাজে মানুষের স্থান নির্দিষ্ট করে দিতে চাই, যাতে করে তিনি সমাজে যথার্থ মানুষ হিসাবে বসবাস করতে পারেন।

মাননীয় স্পীকার, আজকে আমাদের মূল জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে। এটা বিরোধী দলে থাকি, আর সরকারী দলেই থাকি, আমাদের যে বর্তমান অবস্থা, তার মধ্যে আমরা কয়েকটি বিষয়ের উপর concentrate করতে পারি, একটা হল দারিদ্র্য, general poverty, অন্যটি হল শিক্ষা।

www.pathagar.com

আমাদের দেশে যে হারে শিক্ষিতের হার বাড়া উচিত ছিল সেই হারে বাড়ছে না। তার নানা কারণ আছে। তার অন্যতম কারণ হল, যদিও আমি একজন এডভোকেট of universal education এবং free and compulsory education, কিন্তু আজকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এই দেশের প্রাইমারী স্কুলগুলি ঠিকমত চলছে না। প্রাইমারী স্কুল সরকারীকরণ করা হয়েছে, কিন্তু সেই প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকরা ১২টার আগে ক্লাস নিতে যায় না। আমাদের প্রত্যেকের constituency আছে, there may be exception, কিন্তু শৈথিল্য এসে গেছে, যার জন্য আমাদের যে হারে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়া উচিত ছিল, আমাদের আশেপাশের দেশগুলিতে যে হারে বেড়েছে, সেইভাবে বাড়ছে না। এটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা উদ্বেগের কারণ বলে মনে করি।

আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে। যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে এই হারটাকে কমিয়ে আনতে হবে। এবং আমরা যে target করেছি, এই terminal year-এ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার terminal year-এ ১.৯% আমরা নামিয়ে আনতে চাই। যদি আমরা আনি, তাহলে আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা আরও উন্নতি লাভ করবে। খাদ্যে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। আমাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, এই কয়েকটি বিষয়ে কোন রাজনৈতিক দ্বিমত থাকতে পারে না। এবং আজকে যদি আমরা এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারি, তাহলে আমাদের দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে, মাথাপিছু আয় বাড়বে, দেশের প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে এবং এর জন্য রফতানীও বাড়াতে হবে।

আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে আছে। আমরা স্বাধীন হওয়ার পরে অনেকগুলি বছর নষ্ট করেছি। যে কোন কারণেই হোক নষ্ট হয়েছে। আমাদের আশেপাশের দেশগুলির কথা যদি আমরা একবার ভাবি, কোরিয়ার কথা আমরা বলি। ১৯৬২ সালে কোরিয়ার মাথাপিছু আয় আমাদের দেশের মানুষের মাথাপিছু আয়ের তুলনায় ২০ ডলার কম ছিল। আজকে কোরিয়ার মাথাপিছু আয় হল আড়াই হাজার ডলার। আমাদের মাথাপিছু আয় ১৩০ ডলার রয়ে গেছে। আমরা যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি সেই পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ৪১০ ডলার। থাইল্যান্ড আমাদের দেশের পিছনে ছিল ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪ সালে। তাদেরও মাথাপিছু আয় আমাদের দেশের তুলনায় ২০/২৫ ডলার কম ছিল। কিন্তু এখন তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

মাননীয় স্পীকার, আমি এই কথাগুলি এই জন্য বলছি যে, আজকে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত পৃথিবীর ৮ম বৃহত্তম শিল্প রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি এই কথাগুলি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি এই জন্য যেদেশের মানুষ যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করতে পারে, সেই দেশের মানুষের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা, যে স্বপ্ন থাকে সেই স্বপ্ন আমরা নষ্ট করে দিয়েছি। যে প্রতিভা ছিল সেই প্রতিভাকে আমাদের ভুল নীতির জন্য আমরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। আজকে আমাদেরকে সেই প্রতিভা ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই দক্ষতা আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

কোরিয়ার মত দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে আমাদের তুলনায় কিছুই না। বাংলাদেশ ছোট দেশ হতে পারে কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে আমরা তাদের চাইতে অনেক ধনী। আয়তনে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বড় হতে পারে কিন্তু চাষের জমিতে এখনও বাংলাদেশ ছোট হলেও এবং জনসংখ্যায় ১০ কোটি হলেও এবং কোরিয়ার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হলেও আমাদের চাষের জমি কোরিয়ার চাষের জমির তুলনায় দ্বিগুণ আছে। আমাদের হল ৩২ ডিসিমেল মাথাপিছু চাষের জমি, আর কোরিয়ার চাষের জমি হল ১৭ ডিসিমেল। কিন্তু তার পরেও দেখা যায় যে, আমরা প্রতি একরে সার ব্যবহার করি মাত্র ৫০ থেকে ৬০ কিলোগ্রাম, আর কোরিয়াতে ব্যবহার করে ৩৩০ কিলোগ্রাম, তারা আমাদের চাইতে ৩/৪ গুণ বেশি খাদ্য উৎপাদন করে।

তাই আমাদের দেশেরও সম্ভাবনা আছে। আমাদের দেশেরও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এবার ইনশাল্লাহ্ আমরা মনে করি যে, আমরা যে নীতি অনুসরণ করছি, এই নীতির ফলে বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। আর যদি না করতে পারে সেটা হবে আমাদের ব্যর্থতা।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, এই কোরিয়া তার উন্নতি করেছে বিদেশ থেকে জিনিস এনে, যন্ত্রপাতি সংযোজন করে তারা বাইরে বিক্রি করেছে, যেই প্রযুক্তি তাঁরা আমদানী করেছে, সেটাকে তারা উন্নত করেছে। করে সেটা বিদেশে বিক্রি করেছে। আজকে তারা উন্নতির শিখরে উঠেছে। আমরা তাদেরকে দেখে ঈর্ষান্বিত হই।

আজকে বাংলাদেশ থেকেও স্পেয়ার পার্টস নাইজেরিয়াতে রপ্তানী হয়। এই ধোলাই খালের চুন্নু মিয়া স্পেয়ার পার্টস নাইজেরিয়াতে export করেছে। এবং আমাদের দেশে স্পেয়ার পার্টস বিক্রি করে made in Japan লেখে, তৈরি কিন্তু ধোলাইখালে।

সেদিন মাননীয় সংসদ সদস্য শেখ সেলিম কটাক্ষ করে প্রশ্ন করেছেন যে আমার বাড়িতে ভিসিআর, ভিসিপির কারখানা আছে কিনা? কারণ আমি বলেছি যে বাংলাদেশ থেকে assemble করে ভিসিআর এখন বাইরে বিক্রি হচ্ছে। সিঙ্গাপুরে export হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আমি বাংলাদেশে তৈরি করা একটা ভিসিপি এখানে নিয়ে এসেছি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি এটা দেখাতে চাই।

আমি একটা গর্ব নিয়েই এটা এখানে নিয়ে এসেছি। এটা বুঝানোর জন্য যে বাংলাদেশকে আপনারা যত খারাপ মনে করেন, আপনারা যতই নিরাশ হন, আপনাদের অর্থনীতিবিদরা যতটা নিরাশার বাণী শোনান, এই সরকার ততটুকু নিরাশ নয় এবং আমরা মনে করি যে এদেশের মানুষের ভেতরে যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা, যে প্রতিভা রয়েছে, যে দক্ষতা রয়েছে তার সদ্ব্যবহার যদি আমরা করি তাহলে শুধু ভিসিপি, ভিসিআর-ই নয়, মাননীয় স্পীকার, electronics-এ ও আমরা একটা break through করতে পারব এবং যার জন্য electronics-এর ১৮০টি আইটেম মাত্র ১০ ভাগ শুল্কে আমরা এবছর import করার permission দিয়েছি যেটা ইতিপূর্বে অন্য কোন সরকার করে নি।

মাননীয় স্পীকার, এই জিনিসটায় আমার কোন technical জ্ঞান নেই; কিন্তু এই জিনিসটা ক্লাস এইট নাইন পাস করা ৬৫টি মেয়ে ১৫ দিনের ট্রেনিং-এ এ ভিসিপি তৈরি করেছে বাংলাদেশে। এবং শুধু তাই নয় এগুলি অস্ট্রেলিয়াতে export করেছে, সিঙ্গাপুরে export করেছে—এটার সব কাগজপত্র, এন্টিনা সব কিছুই এখানে আছে। এগুলি সব শেখ সেলিম সাহেবকে দিয়ে আসতে বলছি।

[হর্ষধ্বনি]

উনাদের যদি শুভেচ্ছা থাকে, সহযোগিতা থাকে, ইনশাল্লাহ এদেশে এসব জিনিস এত manufacture করা হবে যে, import-এর তো কোন দরকার হবে না, বরং আমরা export করব বিরাট আকারে।

[হর্ষধ্বনি]

মাননীয় স্পীকার, বাইরে থেকে জিনিস এনে এখানে সংযোজন করা হয়েছে, যেভাবে আজকে কোরিয়া এত উন্নতি করেছে। জাপানের উন্নতির মূলভিত্তি হল, এই industry, এই ধোলাইখালের concept-এর উপর শিল্পায়ন যেটা আজকের এই সরকার সর্বপ্রথম সার্বিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, চুন্নু মিয়ার প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আমরা যাঁরা এখানে বসে আছি, মাননীয় স্পীকার, আমরা উৎপাদক শ্রেণী নই, আমরা ব্যক্তিগত অর্থনীতিতে belong করি। কিন্তু যারা হাতে জিনিস তৈরি করে, 'না' করে নি কোন দিন চুন্নু মিয়া, তাদের প্রতিনিধি। যে দিন চুন্নু মিয়াকে বলেছি, 'আমার দেশে টেম্পো তৈরি করতে হবে, ট্রান্সমিশন গিয়ার তৈরি করতে হবে, লজ্জা লাগে না দেশ ১৬ বছর হল স্বাধীন হয়েছে, অথচ একটা ট্রান্সমিশন গিয়ার তৈরি করতে পারেন না?' চুন্নু মিয়া বলেছেন, 'সার, এর আগে আপনাদের মত অন্য কোন সরকার আমাদিগকে এসব করতে বলে নি।'

আজকে চুন্নু মিয়া এই টেম্পো বাংলাদেশে তৈরি করেছেন। এখনও পুরোপুরি integration হয় নি। ইনশাল্লাহ আগামী ডিসেম্বরে মাসের মধ্যে ৯৫ ভাগ টেম্পো integration হবে। বাংলাদেশের তিন চাকার টেম্পো এদেশের মাটিতে চলবে। একহাজার 'মিশুক' তৈরি করব শতকরা ৭৫ ভাগ আমরা manufacture করছি। আমরা linkage industries-এ বিশ্বাস করি যার জন্য ৩৭ জন

www.pathagar.com

sub-contractor এই মিশুকের বিভিন্ন ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরি করেছে, মাননীয় স্পীকার। আপনারা যদি চান, তাহলে আপনাদেরকেও ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা আমি করব।

আজকে এই মিশুক, এই টেম্পো আমাদের শিল্পায়নের নতুন যাত্রার সূচনা করেছে, মাননীয় স্পীকার। কারণ, এই সরকার নির্মাণকারী জাতি হিসাবে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমরা বিদেশীদের পণ্যের বাজারে নিজেদেরকে পরিণত করতে চাই না, যার জন্য আজকে আমরা সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছি।

[বাধা প্রদান]

উপযুক্তভাবে তৈরি করতে পারলে বছর দুয়েকের মধ্যে হবে; একটু সবুর করুন।

মাননীয় স্পীকার, আজকে এই শিল্পনীতিকে বাস্তবায়ন করার জন্য বাজেটে অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শিল্পনীতিতে সাতটি সাব-সেক্টর ছাড়া সমস্ত শিল্পায়নকে open করে দেওয়া হয়েছে। এখন কোন permission লাগে না; আগে তিন বছর লাগত সরকারের একটা permission পেতে। এখন কলকারখানা করতে কোন অনুমতির দরকার নেই। ৭০%-এর উপরে যদি import করতে হয় সেই শিল্পের জন্য শুধু অনুমতির দরকার হবে, কারণ সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, এই শিল্পনীতির উপর অনেক কটাক্ষ করা হচ্ছে। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, আমরা হোল্ডিং কোম্পানি করেছি কেন? তার উপর বক্তব্য আমি রেখেছি, তার পুনরাবৃত্তি আমি করতে চাই না। কিন্তু আমরা এই শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, আমি তার পুনরুল্লেখ করতে চাই। ব্রিটিশ আমল থেকে, পাকিস্তান আমল, তারপর স্বাধীনতার ১৬ বছর পর্যন্ত আমরা একটা কর কাঠামো, শুল্ক কাঠামো follow করে এসেছিলাম, সেটা আমাদের দেশের জন্য ভাল ছিল না। কাঁচামালের উপরে duty বেশি ছিল, আর finished product- এর উপর duty ছিল কম, যার ফলে দেশীয় শিল্প গড়ে ওঠা সম্ভব হয় নি।

আমরা সেই duty structure-কে পুনর্বিন্যাস করেছি। প্রাইমারী দ্রব্যের উপরে সবচেয়ে কম duty রেখেছি, intermediate stage-এ তার চাইতে বেশি রেখেছি এবং finished product-এর উপর সবচেয়ে বেশি duty রেখেছি, যাতে দেশীয় শিল্প গড়ে ওঠে এবং বাঁচে। তার জন্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকার মত আমাদের রেয়াত দিতে হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর লোকসান হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। কিন্তু আমরা তাঁকে ওয়াদা দিতে পারি যে ১৫০ কোটি টাকার অনেক বেশি টাকা বছর দুয়েকের মধ্যে তিনি পাবেন।

এই বাজেটে আমরা সঞ্চয় ও পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা রেখেছি। আমরা dividend-এর উপরে কর exempt করে দিয়েছি। ক্ষুদ্র যত কারখানা আছে, তাদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোন permission ছাড়া মেশিনারি আমদানীর ব্যবস্থা করেছি।

মাননীয় স্পীকার, সবাই বলে কালো টাকাকে এই যে সাদা টাকা করছি এটা আমরা অন্যায় করেছি। কার কাছে কালো টাকা আছে জানি না, তবে যার কাছে থাকুক, দেশের উৎপাদনের কাজে যে সেই টাকা ব্যয় করবে, তাকে আমি দেশপ্রেমিক বলব। বাংলাদেশে যারা শিল্পের সঙ্গে জড়িত, যারা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, যারা তাদের টাকা বিনিয়োগ করে, আমরা তাদেরকে দেশপ্রেমিক বলে আখ্যায়িত করতে চাই। আমরা তাই সমানভাবে সকল নাগরিককে সুযোগ দেব, এটার সঙ্গে কোন concession-এর প্রশ্ন আসে না।

আমি আরও খুশি হতাম যদি এর উপর কোন ট্যাক্সই আরোপ করা না হত। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন এবং একটা শৃঙ্খলার মধ্যে কাজ করতে হয় বলে আজকে আমরা ২০% কর ধার্য করেছি। কেন করেছি? মানুষের হাতে যাতে ন্যায়সঙ্গত টাকা থাকে, যাতে বিনিয়োগ করতে সুবিধা হয়, যাতে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে জবাবদিহি করতে না হয়, সেজন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের দেশের শিল্পায়নে সুদের হার বেশি বলা হয়। কোন দেশেরই সুদের হার inflation rate-এর নিচে হতে পারে না। সেজন্য এটাকে সব সময় rate of inflation-এর উপর রাখতে হবে। আজকে যদি শিল্পের জন্য interest-এর rate কমিয়ে দিতে হয়, তাহলে ব্যাংকের rate

www.pathagar.com

of deposit কমিয়ে দিতে হবে। তাহলে ব্যাংকের পুঁজি থাকবে না এবং সেটা বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে না। তবে আমরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, যদি কোন শিল্পোদ্যোক্তা সময়মত শিল্পকে উৎপাদনে নিতে পারেন এবং সময়মত ব্যাংকের দেনা শোধ করতে পারেন, তাহলে আমরা তাঁকে রেয়াত দেব। ব্যাংক loan rate-এ সে অন্তত ৩%-৪% রেয়াত পাবে এ ব্যবস্থা করেছি যাতে শিল্পোদ্যোক্তারা উৎসাহ পায়।

মাননীয় স্পীকার, এখানে অনেক শিল্প উদ্যোক্তা আছেন যাঁরা complain করেন, working capital পাওয়া যায় না। যে ব্যাংক industry finance করে সেই ব্যাংক industryকে local financing করে না, আর working capital দেয় না। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, যেই ব্যাংক industrial financing করবে, সেই ব্যাংক অথবা সেই ব্যাংককে consortium-এর মাধ্যমে working capital-এর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। আজকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের কোন জমি যদি শিল্পের জন্য কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়ে থাকে, সেই ব্যক্তি যদি সেই শিল্পকে limited company-তে পরিণত করতে চায়, এখনকার DIT এবং গভর্নমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী তাকে transfer fee দিতে হয়। মাননীয় স্পীকার, আমরা transfer fee মওকুফ করে দিয়েছি, যাতে করে corporate industrialisation বাংলাদেশে হয়, এবং যাতে মানুষ corporate body-তে অভ্যস্ত হয়, যাতে company করে কোম্পানির মাধ্যমে যাতে ব্যবসা করে, কোম্পানি করলে খুব কম কর ফাঁকি দেয়া যায়। কর্মসংস্থান হয় এবং economyটা re-vitalised হয়। সেই জন্য transfer fee আমরা উঠিয়ে দিয়েছি।

এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে করে এই দেশে এই ব্যবস্থাগুলির সুফল পাওয়া যায় এবং উৎপাদন বাড়ে। জিনিসপত্রের দাম সস্তা হবে। লাভ হবে শিল্প কারখানায়, নতুন শিল্প হবে। নতুন কর্মসংস্থান হবে।

মাননীয় স্পীকার, যদি আমাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, এই সরকারের প্রথম priority কী? আমি বলব, কর্মসংস্থান। দ্বিতীয় priority কী? আমি বলব, কর্মসংস্থান। থার্ড priority কী? আমি বলব, কর্মসংস্থান।

আজকে বাংলাদেশের vision সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হতে হবে। এই small pettiness, এই জড়তা, এই mixed economy, এই জাতীয়করণের জড়তা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, তা না হলে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে না। আমাদেরকে সোজা পথে এগুতে হবে। যেটা বিশ্বাস করি সেটা বলতে হবে, এবং যেটা বলি সেটা কার্যে পরিণত করতে হবে।

বাজেটের মাধ্যমে আমরা যে নীতির কথা বলেছি, সেই নীতিতে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা socialism-এর কথা বলি না। আমি যখন ছাত্র ছিলাম ইংল্যান্ডে তখন একটা নামকরা বই বেরিয়েছিল এখন আমার কাছে সেটা নেই। অনেক খোঁজ করেছি আজকে, পাই নি। এটা হল, private life and public morality-র উপর। মুখে বলব সমাজতন্ত্রের কথা, আর কাজে, 'বোহেমিয়ান' প্রাইভেট লাইফ, সম্পূর্ণ অসমাজতান্ত্রিক কাজ করব? এটা হতে পারে না। এই double standard আমাদেরকে abandon করতে হবে, মাননীয় স্পীকার। politics শুধু rhetoric হতে পারে না। সেই জন্য আমরা আজকে ছোট শিল্পের উপরে জোর দিয়েছি।

এদেশে যদি আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনতে চাই, এই দেশের মানুষের যদি ক্রয় ক্ষমতা আমরা বাড়াতে চাই–এই যে বলেন পাটের দাম নেই, তার পরে বলেন আমাদের রাস্তা নেই, বিদ্যুৎ নেই, এক এক জন লম্বা লিস্ট দিয়েছেন, কোত্থেকে আসবে টাকা যদি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা না থাকে? ক্রয় ক্ষমতা থাকলে উৎপাদন বাড়বে। উৎপাদন বাড়লে কারখানা হবে। কারখানা হলে প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে। এই জন্য আমাদেরকে অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে হবে। এই অর্থনীতির চাকা ঘোরানোর জন্য যে নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, এই সরকার সেই নীতি গ্রহণ করেছেন। এখানে কোন double standard নেই, মাননীয় স্পীকার।

আমরা small engineering-এ জোর দিয়েছি। আমরা কাঁচামালের উপরে শুল্ক কমিয়েছি কারণ small engineering-এ আমাদের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে, electronics-এ আমাদের একটা বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে, chemicals, pharmaceuticals, textiles-এ আমাদের বিরাট সম্ভাবনা

www.pathagar.com

রয়েছে। এগুলির দিকে নজর রেখেই আমরা কয়েকটা সেক্টরকে পুনর্বিন্যাস করেছি। একটা হল Steel Sector, আর একটা হল Chemical Sector, একটা হল Engineering Sector, একটা হল Pharmaceutical। এই সব সেক্টরে আমরা কর পুনর্বিন্যাস করেছি যাতে করে আমাদের দেশে শিল্প গড়ে ওঠে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা প্রতিটি জেলায় ১৯৯০ সালের মধ্যে একটা করে শিল্পনগরী গড়ে তুলব এবং সেটা করব জরুরী ভিত্তিতে। রাষ্ট্রপতি এটার অনুমোদন দিয়েছেন। এটা আমাদের ADP-র অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যেসব উপজেলায় রাস্তা আছে, বিদ্যুৎ আছে, সেসব উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ১৯৯৫ সালের মধ্যে ইনশাআল্লাহ্ উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে শিল্পনগরী গড়ে তোলা হবে।

মাননীয় স্পীকার, ছোট শিল্পের জন্য আমরা একটা শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি। একটার অনুমোদন দিয়েছি, আর একটার অনুমোদনের জন্য application invite করা হয়েছে। এ দুটোই private sector-এ হবে। কারণ commercial bankগুলির শিল্পায়নে অর্থদান করার ব্যাপারে অবকাঠামোগত experience নেই। কিন্তু আমরা এই ব্যাপারে banking পদ্ধতিকে জোরদার করছি এবং ঋণদান পদ্ধতি সহজ করার চেষ্টা করছি, যাতে মানুষ সহজে ঋণ লাভ করতে পারে। এবং ঋণ যাতে ফেরত দিতে পারে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় স্পীকার, ছোট শিল্পের জন্য আমরা ১০% সুদের হার রেখেছি। এই প্রথমবারের মত এ সরকার এই বৈপ্লবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। দেশের প্রায় ৩ হাজার বেকার ইঞ্জিনিয়ার আছে, তার মধ্যে ৬/৭ শত গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার, বাকি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার।

আমি পেপারে advertise করেছিলাম, তাদেরকে ডেকেছিলাম। শিক্ষিত যুবকদের জন্য ৮০:২০ equity রেখেছি। অর্থাৎ ২০% equity দিলে সে কারখানা করতে পারবে এবং যখন কোন loan-এর জন্য ব্যাংকে যাবে, তখন ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত loan-এর জন্য কোন শিক্ষিত যুবককে কোন জামানত দিতে হবে না, কোন রকম collateral security দিতে হবে না।

[হর্ষধ্বনি]

মাননীয় স্পীকার, ছোট শিল্পের জন্য capital machinery আমদানীর উপর import duty রাখা হয়নি; তা যে শহরে হোক, রাজধানীতে হোক, শহরের বাইরে হোক, যেখানেই হোক না কেন, to encourage small industry।

ঢাকার কাছে জোয়ার সাহারায় 'কারুপল্লী' তৈরি করা হবে, মাননীয় স্পীকার, যাতে আমাদের দেশে যে প্রতিভা আছে, সেই প্রতিভাগুলিকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। এই 'কারুপল্লী' তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সারা বাংলাদেশে যত ক্ষুদ্র শিল্প আছে তাদেরকে তাদের তৈরি জিনিসপত্র দেখানোর জন্য যাতে একটা সুযোগ দিতে পারি। এছাড়াও প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন, ঋণদান পদ্ধতি—এগুলির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ছোট শিল্পের অনুমোদনের জন্য আগে ৩/৪ বছর সময় লাগত, আজকাল আমরা ঠিক করেছি যে, ৩ মাসের মধ্যে তার অনুমোদন দিতে হবে। আর এটা নাহলে কী কারণে অনুমোদন দেওয়া হল না, তার উত্তর দিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আওয়ামী লীগ নিজেদেরকে সমাজতান্ত্রিক দল বলে দাবি করেন। কিন্তু আমি বলব, আওয়ামী লীগ কোনদিন সমাজতান্ত্রিক দল হতে পারে না। কারণ তাঁদের যে শ্রেণী চরিত্র, যে শ্রেণীস্বার্থে তাঁরা বিশ্বাস করেন এবং যে শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন, সেই শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে আর সব কিছু হওয়া যায়, socialist হওয়া যায় না।

তাঁদের এই self-contradiction-এর জন্য তাঁরা প্রথমে বলেছিলেন, গণতন্ত্র করবেন, সমাজতন্ত্র করবেন। জলিল সাহেব বলেছিলেন, 'চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা একদলীয় শাসন কায়েম করা হয়েছিল কেন? কারণ আমরা সমাজতন্ত্র করতে চেয়েছিলাম।' অর্থাৎ তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্র একসঙ্গে কায়েম করা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য তাঁরা গণতন্ত্রের পথ ছেড়ে দিয়ে একদলীয় একনায়কত্ব সরকার কায়েম করেছিলেন দেশে সমাজতন্ত্র তৈরি করার জন্য।

মাননীয় স্পীকার, যদি সেই কথাটা সত্যি হয়, তাহলে আমরা কি ধরে নেব যে, আজকে যখন আবার তাঁরা গণতন্ত্রে ফিরে এসেছেন, তখন সমাজতন্ত্রটাকে কি বাদ দিয়ে এসেছেন, না সমাজতন্ত্রকে সাথে

www.pathagar.com

নিয়ে এসেছেন? এই সমাজতন্ত্র define করতে হবে। কারণ আজকাল রাজনীতি হবে economic issue-র উপরে, not on political rhetorics, not on jargons, not on cliches। ভবিষ্যৎ রাজনীতি নির্ধারিত হবে economic issue-র উপরে, double standard দিয়ে হবে না।

মাননীয় স্পীকার, আমি তাঁদের ইতিহাস বলি। আজকে তাঁরা সমাজতন্ত্রের কথা বলে থাকেন। প্রফেসর রেহমান সোবহানের বিরাট বই, Public Enterprise In An Intermediate Regime; আওয়ামী লীগ সরকারের মত সরকারদেরকে intermediate regime হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আপনি দেখুন, কীভাবে পর্যায়ক্রমে এই আওয়ামী লীগ আমলেই বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রথম শুরু হয়েছিল। ১৩০টি কারখানা বলতে গেলে বিনামূল্যে তাঁরা ব্যক্তিমালিকানায় ফেরৎ দিয়েছিলেন।

আমি ১৯৭৩ সালের investment policy পড়ছি। উক্ত বইয়ের Page-257-এ বলা হয়েছে যে, ceiling তাঁরা প্রথম শুরু করেছিলেন আড়াই লাখ টাকা দিয়ে। পরে তাঁরা ceiling নিয়ে আসলেন তিন কোটি টাকায়। ১৯৭৫-৭৬ সালে আমাদের এ. আর. মল্লিক সাহেব এটাকে নিয়ে আসলেন ১০ কোটি টাকায়। Investment-এর জন্য উক্ত ২৫৭ নং পৃষ্ঠায় আছে : ceilng on investment in the Private Sector; foreign private investment; remittance facility to foreign investment; moratorium on nationalization-এর উপর নীতি মালার কথা।

"আমরা কোন বিদেশী সংস্থাকে nationalize করব না, কোন কারখানাকে tax holiday and other incentive আমরা যা দিয়েছি সেটাই থাকবে।"

মাননীয় স্পীকার, তাঁরা আমাদের অর্থমন্ত্রী সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন, সুরঞ্জিত বাবুর মত ব্যক্তিও raise করেছেন, আমার বন্ধু প্রফেসর মতিন তার খুব ভাল করে জবাব দিয়েছেন।

ড. এ. আর. মল্লিক আমার শিক্ষক ছিলেন। তিনি কি সংসদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন? তিনি যদি সংসদে বসে ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট পেশ করতে পারেন, তাহলে সাইদুজ্জামান সাহেব পারবেন না কেন? তাঁরা তাঁদের ইতিহাস ভুলে যেতে চান। বার বার করে বলেন যে, '৭২ থেকে '৭৫ সাল কেন টানেন? কেন? '৭২ থেকে '৭৫ সাল কি বাংলাদেশের ইতিহাস নয়? '৭২ থেকে '৭৫ সাল টানলে আপনাদের তো গর্ব হওয়ার কথা। আপনারা defensive-এ যান কেন?

মাননীয় স্পীকার, প্রফেসর রেহমান সোবহান তাঁদের সম্পর্কে লিখেছেন, জাতীয়করণ করার পরে কী অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। ১৭ মাস nationalized sector-এর জন্য কোন Rules of Business তাঁরা frame করতে পারেন নি। কারণ, Rules of Business তৈয়ার করলে লুট-পাট করতে অসুবিধা হত।

Rules of Business for the Nationalized Industries, Annexure 119, Page 440, এখানে তিনি বলেছেন :

> "Areas of responsibility have to be defined through the Rules of Business. Seventeen months have elapsed since the nationalization decrees, and no Rules of Business have yet been adopted for this vital sector."

সেই জাতীয়করণ ভাঁওতাবাজি হবে না তো কী হবে? এখানে আরও বলা হয়েছে ব্যর্থতার কারণের মধ্যে ছিল:

> Bureaucratic methods in lieu of commercial problems as the basis for running nationalized enterprises, diffusion of responsibility for consequent inability to establish accountability for failure of a general and specific nature within the sectors, ইত্যাদি।

মাননীয় স্পীকার, আজও তো আমরা এটাই করার চেষ্টা করছি। We are trying to bring the accountability of the public sector industry.

উনাদের আমলের অর্থনীতিবিদ প্রফেসর নূরুল ইসলাম চাকুরী ছাড়ার পর চলে গেলেন বিদেশে। বড় চাকুরী করেন। We are not jealous of it. We are proud of him. He is an economist of international status। কিন্তু উনাদের সম্পর্কে তিনি কী লিখে গিয়েছেন সেটা দেখতে হবে। উনি চলে গিয়েছেন বাংলাদেশের প্রথম Five-Year Plan তৈরি করে। চলে যাওয়ার

www.pathagar.com

পরে তিনি বলেছেন, এই পুরা বইটাই, it is called the Development Planning of Bangladesh—A Study of Political Economy by Prof. Nurul Islam,

উনি চলে যাওয়ার পরে এই বই ছাপিয়েছেন, পরে এটা বাংলাদেশে বেরিয়েছে। এই পুরো বইয়ের মূল বক্তব্য:

> 'The leadership of Awami League was incapable of maintaining nationalized sector, not to speak of socialist form.'

তাঁদের class character সম্পূর্ণভাবে এখানে define করা আছে, তাঁদের class interest define করা আছে। আমার বন্ধু তালুকদার মনিরুজ্জামান উনাদেরকে define করেছেন, as petty bourgeois, national bourgeois হওয়া তো দূরের কথা। আমরা double standard-এ ভুগব না। আমরা মুখে এক কথা বলব আর কাজে আর একটা করব, সেটা করব না।

রেলওয়ে বাজেটের থার্ড ক্লাশের টিকিটের কথা বলেন। মাননীয় স্পীকার, উনারা একজনও থার্ড ক্লাশে চড়েন না। আখতারুজ্জামান বাবু সাহেব সুযোগ পেলে প্লেন চার্টার্ড করতেন। ট্রেনের থার্ড ক্লাশে যাওয়া তো দূরের কথা। এখানে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা আমাদের মত মানুষকে employ করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা মুখে বলবেন সমাজতন্ত্রের কথা।

আজকে শেখ সেলিম ঠাট্টা করে বলেছেন আমি নাকি ওকালতি ভাল করি। শেখ সেলিমের নিশ্চয়ই মনে আছে ১৯৭৫ সালের পরে 'মধুমতী প্রিন্টার্স' উকিল খুঁজে পায় নি। তার *বাংলার বাণী*র যে প্রেস ছিল এটা একটা পরিত্যক্ত বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শেখ ফজলুল হক মনির দুটি মাসুম বাচ্চাকে defend করার জন্য 'ল-ইয়ার' খুঁজে পাওয়া যায় নি। I had to go to the court during this difficult time and I had the house completly restored। তারপরেও শেখ সেলিম সন্দেহ করেন যে, আমি ঠিকমত ওকালতি করেছি কিনা?

মাননীয় স্পীকার, সুযোগ পেলেই উনারা আমাকে আর আমার বন্ধু মতিন সাহেবকে ব্যক্তিগত attack করেন। খুব ভাল কথা। attack করেন। আমাকে বলেন যে, আমি দুর্নীতির জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলাম – এটা ঠিক কথা। এই উপমহাদেশে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রাজনীতিবিদদের অভিযুক্ত হওয়াটা একটা রুটিন matter হয়ে গেছে। তাঁরা হয়তো ভুলে গিয়েছেন যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তার মানে এই নয় যে, তিনি দুর্নীতিবাজ ছিলেন।

এইসব কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। আমাদের এখানেও অনেকেই আছেন, এটা হল নিয়ম। যে judgment এবং conviction set aside হয়ে গেছে সেটা সম্পর্কে এখানে না বললেই ভাল হত। এই ধরনের কেস হুসেইন সোহরাওয়ার্দী, এ. কে. ফজলুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান–এঁদের নামেও হয়েছে। এসব আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে।

তবে একটা জিনিস বলতে চাই, সামরিক শাসনের আমলে বিচার পেয়েছি, রিভিউয়ের দরখাস্ত করেছি সেটা জজ সাহেবরা দেখেছেন, আমি কি করেছি। তাঁরা বললেন যে নথিপত্র নেই, এই মামলা দাঁড়ায় না। আর ইস্ট-ওয়েস্ট ইন্টারকানেকটর-এর যে কেস ছিল তাতে তো আমাকে খালাসই দেওয়া হয়েছে। ঐ অর্ডার যদি তখন না দিতাম, আজকে উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ যেত না।

মাননীয় স্পীকার, ১৯৭৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর জরুরী আইন ঘোষণা করার একদিন পরে আমাকে আটক করা হয়েছিল, আওয়ামী লীগ আমলে। এই আমলে মিলিটারী আদালত হলেও একটা বিচার করা হয়েছে। সেই আওয়ামী লীগ আমলে কোন বিচার করে নি। বিনা বিচারে অহেতুক আমাকে ৩ মাস আটক করে রাখা হয়েছিল।

মাননীয় স্পীকার, আমি যখন P. O. 27-এর amendment আনলাম, মাওলানা মুজিবর রহমান সাহেব শুধু বিরোধিতাই করেন নি, ওয়াক আউটও করেছিলেন। P. O. 27, it was a plan to involve the party in public enterprises। সেটাই সমর্থন করেন নি, জাতীয়করণ তো আরও অনেক দূরের কথা। কমরেড ফরহাদের পাশে বসে মুজিবর রহমান সাহেব হাত মিলাচ্ছেন। তবে মুজিবর রহমান সাহেব যতই আঁতাত করেন, সময় আসলে আপনাদেরকে উনারা সাথে রাখবেন না।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, আমরা ১২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৫ হাজার টন ইউরিয়া সার রপ্তানী করেছি। আমরা ১ লক্ষ ৮২ হাজার টন চিনি উৎপাদন করেছি। টার্গেট ছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন। আগামী বছর ইনশাল্লাহ আরও বেশি উৎপাদিত হবে। আমরা চিনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হব।

খলিলুর রহমান সাহেব ১৫ আগস্টের পর জয়েন্ট চীফ-অব-স্টাফ ছিলেন। এখন তিনি discover করেছেন যে, ওটা counter-revolutionery government ছিল। উনি বলেছেন যে, "আমি তো সরকারী চাকুরী করেছি।" যদি তিনি মনে করে থাকেন সেটা counter-revolutionery government ছিল, তাহলে তিনি resign তো করতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেন নি।

মাননীয় স্পীকার, পাটের মণ ৫০০ টাকা দেবেন? আমি ওখানে বসলে, ১০০০ টাকা দিতাম, কেন বলব না, অসুবিধা তো নেই কিছু। কিন্তু উনারা যখন সরকারে ছিলেন তখন কত টাকা দিয়েছিলেন? ভবিষ্যতে যদি সরকারে যান তখন দেখব কত টাকা দেন।

গতবার তো আট আনা সের চাল খাওয়াবেন বলেছিলেন, খাইয়েছেন তো ১০ টাকা সের। ওটা কি আমরা ভুলে গেছি? সুতরাং এবার ৫০০ টাকা বলেছেন, কত টাকা দেবেন কে জানে? সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের আজকের বক্তৃতা আমার ভাল লাগেনি। It was not up to the mark. I expected a much more substantial speech। কিন্তু তিনি bite হারিয়ে ফেলেছেন, কামড় নেই। সারাক্ষণ বসে শুনলাম, কোন humour নেই, কোন wit নেই।

তবে তাঁকে ধন্যবাদ দিই যে, তিনি অন্তত কোন আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখেন নি। সেইজন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেছেন সামরিক শাসন কেন? ঐ শেখ সেলিমকে জিজ্ঞাসা করেন, সামরিক আইন কেন আসে? আবার পড়বো নাকি, "একটা গুলি পড়ে নাই", "একটা ফুলও ঝরে নাই," এই রকম সম্পাদকীয়র পর সম্পাদকীয় লিখেছে। *বাংলার বাণী* ও *সংবাদ* কি অভিভাষণ, কী রকম সম্ভাষণ জানিয়েছে সামরিক অভ্যুত্থানকে। কী মুগ্ধ তারা। *বাংলার বাণী* আর *সংবাদ*-এর মাধ্যমে যদি সন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন, সুরঞ্জিত বাবু, যে মার্শাল ল' কেন আসে, তাহলে I will recommend Samuel Huntington-এর Soldier and the State বা A. C Finer's book The Man on Horse Back পড়ার জন্য।

[বাধাপ্রদান]

আপনারা বেগম খালেদা জিয়াকে জিজ্ঞাসা করবেন এগুলি। যখন একসাথে হরতাল করেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি উত্তরটা দিয়ে দেবেন। আর যদি তাঁদেরকে চান, তাঁদেরকে আনার ব্যবস্থাও আমরা করতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, আমাদেরকে বলা হচ্ছে, আমরা নাকি মার্শাল ল'র বেনিফিসিয়ারি। ওনারা যাঁরা এখানে বসে আছেন তাঁরাও মার্শাল ল'র বেনিফিসিয়ারি। মুখে চুনকালি মেখে মার্শাল ল'র অধীনে নির্বাচন করেছেন ২২ দলের সঙ্গে, ১৫-দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এবং আজকে মার্শাল ল'র অধীনে স্পীকারের কাছে শপথ গ্রহণ করেছেন। ২১ মার্চ গভীর রাত দু'টায় আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন।

মাননীয় স্পীকার, আমি কোন তিক্ততা বাড়াতে চাই না। তাঁরা বলেছেন যে, হেনরি কিসিঞ্জার আর শেখ সেলিম বোধ হয় উপস্থিত ছিলেন তখন। আমি ছিলাম না; সুতরাং আমি বলতে পারব না। তবে এটুকু জানি জনাব তাজউদ্দীনকে বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারা আসার ছ'দিন আগে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তখন আপনারা কেউ কিছু বলেন নি। এত ভালবাসা, এত শ্রদ্ধা তাজউদ্দীন সাহেবের জন্য। তাজউদ্দীন সাহেব, যাঁর weight একটু অন্যদিকে ছিল, socialism-এর কথা বলতেন, ম্যাকনামারা আসার আগে বেচারার চাকুরী গেল। আমি তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম, এখনও করি। কিন্তু যাঁরা এখন তাঁর কথা বলেন; তাঁরা সেদিন তাঁর জন্য কোন প্রতিক্রিয়া দেখান নি। তাঁরা খুশি হয়েছেন যে, ম্যাকনামারা বাংলাদেশে আসছেন, খুব খুশি। তাঁরা reception দিয়েছেন। কিসিঞ্জার সাহেবকে খাইয়েছেন। সবকিছুই করছেন। আরও কতকিছু করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, আমরা যদি আমাদের দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আগামী ২/৪ বৎসরের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে আনতে না পারি, তাহলে অনাহার, দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, বেকারত্ব

www.pathagar.com

আমাদেরকে গ্রাস করবে। আমাদেরকে মানে আমাদের সবাইকে। আজকে সেইজন্য আমাদের সবাইকে সময়ের কথা চিন্তা করতে হবে।

বাংলাদেশ একটি খুব সম্ভাবনাময় দেশ। অসম্ভব সম্ভাবনা এই দেশের মানুষের মধ্যে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ আছে অনেক। আমাদের গ্যাস আছে, কয়লা আছে, চুনাপাথর আছে, তেল আছে, অনেকে বলেন, সোনা আছে। আমাদের সমুদ্র আছে, উপকূল এলাকা আছে, আমাদের এফ. আর. খানের মত স্থপতি আছে, যিনি সারা বিশ্বের এক নম্বর আর্কিটেক্ট বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। আর আছেন হুমায়ুন কবির, ঢাকা কলেজের ছাত্র। রিমোট কন্ট্রোলে হেলিকপ্টার আবিষ্কার করেছে এই বাংলাদেশের ছেলে। ২০০ মাইল যেতে পারে পাইলট ছাড়া। এই হেলিকপ্টার আমেরিকার এয়ার ফোর্স ব্যবহার করছে।

আমরা যে মাছ রপ্তানী করি তার চেয়ে আরও ১০ গুণ বেশি রপ্তানী করতে পারি।

আমাদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি– socialism করব, আবার democracy করব, আবার one party করব। আপনারা এখন democracy করছেন। আবার socialism করার জন্য one party-র কথা বলে যাবেন। এটা চলবে না। ক্ষুদ্র দলীয় রাজনীতি ত্যাগ করতে হবে এবং ভাবাবেগের অবস্থা থেকে ফিরে এসে অর্থনীতিকে অত্যন্ত hard realiy-র সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। আর তা না হলে দেশের জনসংখ্যা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা আমাদেরকে গ্রাস করবে।

মাননীয় স্পীকার, আমি বক্তব্য শেষ করার আগে বলতে চাই যে, এখানে অনেকে বলেছেন যে সেমিনার হয়েছে, বিনিয়োগ ফোরাম হয়েছে। আমি জানাতে চাই আনন্দের সঙ্গে যে, ৯৩টি সমঝোতা স্বাক্ষর হয়েছে। ২৪৪ জন বিদেশী উদ্যোক্তা এই বিনিয়োগ ফোরামে যোগদান করেছেন। ১৮৬ জন বিদেশ থেকে এসেছেন। তার ফলে ১৫৪টি joint venture আমরা এর মধ্যে অনুমোদন করেছি। এবং এই প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিমালিকানায় ১২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে আরেকটি পাঁচ তাঁরা হোটেল হবে আপনাদের জন্য।

মাননীয় স্পীকার, আজকে এইগুলি হয়েছে এই জন্য যে, বাংলাদেশের উপরে বহির্বিশ্বের আস্থা ফিরে এসেছে। মানুষের আস্থাই কিন্তু বড় কথা। সেজন্য আজকে আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে দেশের যে সমস্যাগুলি–এই নিরক্ষরতার সমস্যা, এই জনসংখ্যার সমস্যা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলির দেশের জন্য নিজস্ব কোন কর্মসূচী নেই সরকারের সমালোচনা করা ছাড়া। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য আওয়ামী লীগের কোন কর্মী কোন গ্রামের জন্য কোরবান হয়েছে—সেটা তারা হলফ করে বলতে পারবেন না। তাদের কোন প্রোগ্রাম নেই।

মাননীয় স্পীকার, আজ সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। এই নিরক্ষরতা politically দূর করতে হবে, এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ politically করতে হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় সমঝোতার ভিত্তিতে জাতীয় সমস্যাগুলি যদি আমরা সম্মিলিতভাবে সমাধান করার ব্যবস্থা করি, তাহলে বাংলাদেশকে যে স্বপ্ন নিয়ে, যে আশা নিয়ে, যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছিলাম তা অবশ্যই সফল হবে, বাস্তবায়িত হবে।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম আর ইসলামী রাষ্ট্র এক কথা নয়

সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮

৭ জুন ১৯৮৮

সংবিধানের এই সংশোধনীতে দুটি প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় রয়েছে। প্রথমটি ছিল বিচার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদের সংশোধনকল্পে ঢাকা ছাড়া দেশের ছয়টি জেলায় হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা, যা পরে সুপ্রীম কোর্ট সাংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী বলে একটি রায়ের বলে (41 DLR, 1989 AD p 165) বাতিল করে দেয়। অন্যটি ছিল সংবিধানের অন্যতম মূলস্তম্ভ ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে ইসলামকে দেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা। ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে এই বিতর্কে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমি, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়, ১৯৬৯ সালে গোলটেবিল বৈঠকের পর ছয় দফার উপর ভিত্তি করে আইয়ুব খানের কাছে প্রেরিত ১৯৬২ সালের সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব, নির্বাচনে জয়লাভ করার পর আওয়ামী লীগ কর্তৃক ১৯৭১ সালে প্রণীত পাকিস্তানের জন্য খসড়া সংবিধান এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রণীত "স্বাধীনতার সনদ" (Proclamation of Independence)-এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপরোক্ত কোন পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয় নি কিন্তু স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে (অনুচ্ছেদ ৮) রাষ্ট্রের চারটি অঙ্গীকারমূলক মূল লক্ষ্যের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এই বক্তব্যে মূলত ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার সকল যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা হয় এবং এই সংশোধনী রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন এবং স্থায়ী আদর্শিক ভিত্তি রচনা করে। সংসদ নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এটাই ছিল আমার প্রথম বক্তৃতা।

মাননীয় স্পীকার

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আজকে সাত দিন হল আমরা এই বিল সংসদে বিবেচনার জন্য উত্থাপন করেছি। এখানে অনেক মূল্যবান আলোচনা হয়েছে। যাঁরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, সংসদের ৫৭ জন সম্মানিত সংসদ-সদস্য বিরোধীদলের সহ, সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি প্রথমেই বিরোধীদলের নেতা বিল সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন, তার জবাব দিতে চাই। উনি এটা না তুললেও এই বিলের প্রবর্তক হিসাবে, উত্থাপক হিসাবে আমি এটা আপনার কাছে পেশ করতাম।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের সংবিধানে ১৫৩ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বাংলা এবং ইংরেজীতে বিল সম্পর্কে সুন্দরভাবে বলা আছে কীভাবে বাংলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

জনাব আ.স.ম. আবদুর রব বলেছেন যে, আমাদের এটা technically defective bill। জনাব রব সাহেবকে সংবিধান সম্পর্কে আরও কিছু জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তার কারণ অনেক বিচার-বিবেচনা করে আমাদের সরকারের অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই বিল নিয়ে নাড়াচাড়া করেন এবং আইন প্রণয়ন করেন। আইন প্রণয়ন করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আমাদের রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর সরকারকে নিতে হয়। আইন ড্রাফট্ করার জন্য আইন-মন্ত্রণালয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা পারদর্শী এ বিষয়ে। উনি তিনটি technical point raise করেছেন। সেটার উত্তর আমি দিয়ে দেই আপনাকে।

মাননীয় স্পীকার, উনি আমার জন্য কোন সময় রাখেন নি। আমার ১৫ মিনিট সময় উনি নিয়ে নিয়েছেন। সেজন্য আমাকে দ্রুত যেতে হবে।

ইংরেজীর তুলনায় আমাদের এই বাংলায় ত্রুটি সংশোধনী কম আছে, তার কারণ সেই তিনটি সংশোধনী বাংলাতে প্রয়োজন নেই যেমন 'ঢাকা', ঢাকা ইংরেজীতে বানান এক রকম আর বাংলায়

www.pathagar.com

বানান এক রকম। আগে ছিল "Dacca". কিন্তু বাংলা সংবিধানে ঢাকা ঠিকই। সুতরাং, এতে সংশোধনী প্রয়োজন পড়ে না। শুধু ইংরেজীতে পরিবর্তন করে বলা হয়েছে "Dhaka"। ২ নং হল, বাংলা। যাঁরা তখন ইংরেজীতে সংবিধান রচনা করেছিলেন তাঁরা "Bengali" লিখেছিলেন। রাষ্ট্রভাষা হবে Bengali; 'state language shall be Bengali'। কিন্তু আমরা সেটা যখন বাংলায় লিখেছিলাম তখন লেখা হয়েছিল প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা 'বাংলা'। সুতরাং, এটা পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন পড়ে না। শুধু এখন ইংরেজীতে বলা হচ্ছে "Bangla"।

আর তিন নম্বর হল, বাংলার ১০৩ অনুচ্ছেদ। এই ১০৩ অনুচ্ছেদ যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন এখানেও কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। তার কারণ ১০৩(২)-এ বলা আছে যে, 'হাইকোর্ট বিভাগের রায়, আদেশ ও দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে' ইত্যাদি। তারপরে বলা আছে যে, "কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন,"–বাংলায় এখানে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, কিন্তু ইংরেজীতে প্রয়োজন আছে এবং সেইজন্য আমাকে ইংরেজীতে পরিবর্তনটা আনতে হয়েছে। যেটা আগে ছিল 'transportation' সেটাকে পরিবর্তন করে 'imprisonment' লেখা হচ্ছে। এই হল তফাৎ, যার জন্য বাংলায় ১টা অনুচ্ছেদ কম আছে।

এটা হল রেওয়াজ। কারণ, আমাদের সংবিধান বলে যে, 'বাংলা প্রাধান্য পাবে'। কোন পরিবর্তন করতে হলে তা বাংলায় আনতে হবে এবং বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীতেও। যেহেতু original constitution ইংরেজীতে ছিল, সেজন্য এবং অনেক অনুচ্ছেদ বিভিন্ন সময়ে ইংরেজীতে – সামরিক আইন চলাকালীন সময়ে, জিয়াউর রহমান সাহেবের সময়, সংবিধানের পরিবর্তন করা হয়েছে। এই সামরিক শাসনের সময় সংবিধানের কোন পরিবর্তন করা হয় নি। গতবারে অনেক পরিবর্তন ইংরেজীতে করা হয়েছে, সেগুলিকে পরে বাংলায় করা হয়েছে। এটার একটা ছোট ইতিহাস আমি বলতে চাই।

বাংলাদেশের সংবিধান originally কিন্তু বাংলায় হয় নি, কিন্তু বাংলাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আ. স. ম. আবদুর রব সাহেব এটা জানেন কিনা? Originally it was drafted in English। ইংরেজীটাকে বাংলা করে বাংলাটার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং interpretation-এ বলা হয়েছে, 'বাংলা অগ্রাধিকার পাবে।' কিন্তু আসলে লেখা হয়েছে ইংরেজীতে। এটা করতে হয়েছে, কারণ আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং বাংলাকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে, বাংলার প্রাধান্য রাখতে হবে। সেজন্য এই ব্যবস্থাটা তখন করা হয়েছিল।

তাই আজকে এখানে দুটি বিল একই সঙ্গে উত্থাপন করা হয়েছে একই বিষয়ের উপর, একটি বাংলায়, একটি ইংরেজীতে এবং সেইজন্য একই সাথে একই বিষয়ের উপর বলে সংবিধানের পরিবর্তন আনতে হলে বিধিগত যে রেওয়াজ আছে সেই রেওয়াজ অনুসারে আমরা এই সংশোধনী এনেছি এবং দুটা বিলই একসাথে পাস করানোর জন্য আপনার কাছে প্রস্তাব রাখব এবং ইনশাআল্লাহ আশা করি, আমরা সকলে মিলে এই বিল পাস করব।

তাতেও যদি জনাব আবদুর রবের আপত্তি থাকে, তাহলে তাঁর উচিত ছিল বিল যখন উত্থাপন করা হয় তখন তাঁর এই প্রশ্ন তোলা। তাহলে আমরা পরীক্ষা করে দেখতাম, You are too late। এখন চিৎকার করলে লাভ হবে না, কথা শুনতে হবে। আপনার অনেক অশুদ্ধ interpretation আমরা অনেক মনোযোগের সঙ্গে শুনেছি। আমি আপনার কোন কথা accept করি না, এই বিলের উপর যা বলেছেন সমস্ত কথা আমি totally reject করি।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতি এরশাদের যুগান্তকারী সংস্কার হল প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। এই জাতি গর্ব করে, দেশে এবং বিদেশে আমাদের অনেক সুনাম হয়েছে। শত শত বছরের পুরনো প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে আমরা একটা প্রগতিশীল নতুন শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং তার একটা অংশ হল বিচার ব্যবস্থা।

এই বিচার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে করা হয়েছে। ১৯৮২ সালে যখন সামরিক সরকার আসে, তখন তাঁরা এই বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এবং তার ফলে ৪টা division এ–প্রথমে খুলনা division-এর যশোরে, রাজশাহী division-এর রংপুরে, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

division-এর চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লায় এবং ঢাকায় যেটা permanent seat আছে সেটাসহ প্রথমে এই কয়টি Court করা হয়। তারপরে অবস্থার প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন এলাকার দাবিদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিচার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণে সাফল্য অর্জনের কারণে খুলনা বিভাগের বরিশালে, চট্টগ্রামে আরও একটি– সিলেটে, এই দুটি Benches in Session under Article 100 করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা এগুলির পরীক্ষা, মূল্যায়ন এবং পর্যালোচনা করেছি। এই courtগুলি অত্যন্ত ভালোভাবে, সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়েছে। আজকে তাই সময় এসেছে আমাদের অনুচ্ছেদ ১০০তে আছে যে, benchগুলি in session বসবে তাতে সেগুলিতে কিছুটা প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাগত অসুবিধা দেখা দিয়েছে। সেটা দূরীকরণের জন্য এবং এদেশের মানুষের বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এবং বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণকে সার্থক করার জন্য আজকে এই benchগুলিকে যেগুলি already function করছে সেগুলিকে স্থায়ী bench করার জন্য এই পরিবর্তন, এই সংশোধনী আনা হয়েছে।

আজকে article-100কে আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপিত করেছি, এবং সেখানে ঢাকায় permanent seat of court থাকবে এবং আরও ৬টি জেলা শহরে court হবে এবং এগুলি permanent court হিসাবে function করবে। তাদের exclusive jurisdiction থাকবে in all matters। আবদুর রব সাহেব আমাদের এই বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, আরও ৩টি Bench করা প্রয়োজন। আরও ৩টি Bench করার পরে আবদুর রব সাহেব যদি এসে বলেন যে, লক্ষ্মীপুরে আর একটি Bench করতে হবে, তখন আমরা কোথায় যাব? আমরা সেই পথ বন্ধ রাখার জন্য এই ৬টাকে লিখে দিয়ে, সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছি, যাতে ঐ ধরনের দাবিদাওয়া আর আসতে না পারে যে, লক্ষ্মীপুর বা গোফরান সাহেবের[১] রামগঞ্জ, শাজাহান সাহেবের[২] টাঙ্গাইলে অর্থাৎ তারা যেখানে যেখানে বসবাস করেন, সব জায়গায় High Court-এর একটা permanent bench করতে হবে। ওটাকে বন্ধ করার জন্য আমরা এই ছয়টি জায়গাতেই স্থায়ী Bench স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

মাননীয় স্পীকার, জনাব শাজাহান সিরাজ এবং বিরোধীদলের প্রায় সকল সংসদ-সদস্য, আবদুর রব সাহেব সহ, জনমত যাচাইয়ের কথা বলেছেন। রাষ্ট্রপতি এই সংসদকে উদ্দেশ করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, প্রয়োজন হলে জনমত যাচাই করা হবে। মাননীয় স্পীকার, আমরা যারা এখানে বসে আছি, আমাদের অনেকেই আমাদের বক্তৃতায়, বিবৃতিতে আমরা বলেছি যে, প্রয়োজন হলে জনমত যাচাই করা হবে।

জনমত এক জিনিস, আর গণভোট আর এক জিনিস। গণভোট হল referendum। আমরা referendum-এর কথা বলি নি। কারণ এই সংবিধানে referendum-এর জন্য মাত্র ৬টি article আছে। সেই articleগুলি যদি পরিবর্তন করি, তাহলে referendum-এ যেতে হবে। এটা সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলক, compulsion রয়েছে। আর কোন article বা সংবিধানের অন্য কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন করার জন্য referedum-এ যাওয়ার কোন provision এই সংবিধানে নেই।

জনমত যাচাই অবশ্যই হয়েছে। গত ছয় মাস যাবৎ ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করার কথা আমরা বলে এসেছি, আমাদের রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আমরা সবাই বলেছি। মাননীয় স্পীকার, এখানে আমার কাছে শুধু এক মাসের পেপার ক্লিপিংস আছে। এবং তা যদি আমি পড়া শুরু করি, তাহলে আমাদেরকে আজকে অনেকক্ষণ এই অধিবেশন চালিয়ে যেতে হবে। জনমত যথেষ্ট যাচাই হয়েছে এবং আমরা এখানে সবাই নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং এই সংসদ is completely competent to pass any bill it likes।

[হর্ষধ্বনি]

---

১. এম এ গোফরান, লক্ষ্মীপুর-১ আসনে নির্বাচিত সদস্য।

২. শাজাহান সিরাজ, টাঙ্গাইল-৪ আসনে নির্বাচিত সদস্য।

www.pathagar.com

আমরা আমাদের নিজেদেরকে undermine করতে চাই না। যথেষ্ট জনমত যাচাই হয়েছে এটার উপরে, রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর সরকার জাতির কাছে যে ওয়াদা দিয়েছিল জনমত যাচাই করা হবে, সেটা আমরা যাচাই করেছি এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আজকে আমরা এই বিল বিবেচনার জন্য এখানে এনেছি এবং পাস করার জন্য প্রস্তাব করব।

মাননীয় স্পীকার, এখন আমি আসছি ধর্মনিরপেক্ষতার উপরে। আমি জানি না যে, ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে আমরা কী বুঝাই? ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন তখনই এসেছিল যখন ধর্মযুদ্ধ হতো, মানুষে মানুষে যখন হানাহানি হত ধর্মগত কারণে। সেই জন্য political science-এ নতুন terminology 16th century-তে প্রথম আসে। যদিও ম্যাকিয়াভেলী বলেছেন, আমি কিন্তু সেটাকে share করতে চাই না, তিনি বলেছেন!

"secularism was a device originated to allow control by an absolute monarch".

ডিক্টেটরশীপ চালু রাখার জন্য secularism-এর প্রস্তাবনা করা হয়েছিল তখন, because of the fight between the monarch and the church। সেই জন্য যদি আমাদের দেশে আমরা এখন পর্যালোচনা করি, 'secularism' শব্দটা যখন এসেছিল তখন আমরা দেখব ১৯৫৪ সালের ২১-দফায় 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটা ছিল না। ১৯৬৬ সালের ৬ দফাতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দ ছিল না, ১৯৬৯ সালে জনাব শাজাহান সিরাজ এবং আ. স. ম. আবদুর রব the spitfire orators তখনকার সময়ের, the leaders of the people, তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ১১-দফার আন্দোলনে কোনকালেই বলেন নি।

তারপরে, আমরা ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গোলটেবিল বৈঠকে গিয়েছিলাম আইয়ুব খান সাহেবের সঙ্গে negotiate করতে। আইয়ুব খান সাহেব তখন চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, ছয় দফাকে অন্তর্ভুক্ত করে কোন সংবিধান একক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারবে না। সেই সংবিধানকে সংশোধন করে ১০০টি amendment আনা হয়েছিল একক রাষ্ট্র হিসাবে রাখার জন্য।

মাননীয় স্পীকার, এই ১০০টি সংশোধনী পাকিস্তানের ১৯৬২-এর Constitution-কে amend করে আনা হয়েছিল। কিন্তু সেই সংবিধানে ইসলামের উপরে যত কথা লিখিত ছিল, একটা শব্দেরও পরিবর্তন করা হয় নি including the title, "Islamic Republic of Pakistan".

খুব ভাল কথা, তখন আমরা পাকিস্তানের framework-এ ছিলাম। সুতরাং, Islamic Republic রাখতেই হবে, না রাখলে ওদের সঙ্গে আপোস করা যাবে না। It could be a fair strategy। কিন্তু সত্তর সালের নির্বাচনে যখন আওয়ামী লীগ সারা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেন, তাঁরা পাকিস্তান ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর ১৬৭টি আসন পেলেন, তাঁদের উপর দায়িত্ব অর্পিত হল সারা পাকিস্তানের জন্য সংবিধান রচনা করার। ৩১ সদস্যবিশিষ্ট Constitution Committee করা হয়েছিল। তার মধ্যে আমার বন্ধু শাহ মোয়াজ্জেম সাহেব ছিলেন। I am sure কোরবান আলী সাহেব ছিলেন, আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আমার শ্রদ্ধেয় মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেবও ছিলেন নিশ্চয়। এসব 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' দ্বিতীয় খণ্ডে আছে।

অত্যন্ত interesting ব্যাপার হল আওয়ামী লীগের সংবিধান কমিটি কর্তৃক ৬ দফার ভিত্তিতে প্রণীত 'পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্র,' ড. কামাল হোসেন হলেন সূত্র। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের একটি তারিখ দেওয়া হয়েছে। "Draft Constitution of the Federal Republic of Pakistan"-এর মধ্যে বলা হয়েছে, 'secularism'তো দূরের কথা, তার মধ্যে ছিলঃ

"...Collectively to order their lives in accordance with the teachings of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah..."

তারপরে বলছে,

...Directive Principles of Policy-তে আছে Islam। "No law shall be repugnat—to the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah."

www.pathagar.com

যাঁরা আজকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই মুহূর্তে ঢাকা শহরে সভা করে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছেন তাঁরা যখন এই সংবিধান ড্রাফট করেছিলেন তখন তাঁরা এগুলি কেন লিখেছিলেন? তখন তো প্রায় আমরা স্বাধিকারের পথে চলে গিয়েছিলাম।

আমার এখনও মনে আছে, পূর্বাণী হোটেলের সেই সভা ১ মার্চ পর্যন্ত চলেছিল। ১ মার্চে যখন ইয়াহিয়া খান পার্লামেন্ট বসাটা বন্ধ করে দিলেন, তখন আমরা মিছিল করেছিলাম। সেই Constitution Draft Committee তখন পূর্বাণী হোটেলে বৈঠকে ছিলেন। আমরা তাঁদেরকে সেখান থেকে বের করে এনেছিলাম। তখন তাঁরা এটা রচনা করেছিলেন। খুব ভাল কথা, তখনও আমরা পাকিস্তানের framework-এর মধ্যে ছিলাম। সুতরাং ইসলামের কথা তো বলতেই হবে, তাই না?

মাননীয় স্পীকার, তারপরে কী হয়েছে? ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নাকি ভূলুণ্ঠিত হবে, আজকের এই বিল পাস হলে। স্বাধীনতার যুদ্ধ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হবে। এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের দু-একজন ছাড়া সবাই একথা বলেছেন।

'Proclamation of Independence' অর্থাৎ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার সনদ' বাংলায় লেখা হয় নি, ইংরেজীতে লেখা হয়েছিল। ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সাল। Not a word called secularism was included in this document। ধর্মনিরপেক্ষতা যদি স্বাধীনতার চেতনা এবং উৎস হয়ে থাকত, তাহলে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তখন কেন তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা লেখেন নি?

মাননীয় স্পীকার, আজকে এখানে যাঁরা বিরোধীদলে আছেন, তাঁদের সঙ্গে যাঁরা বাইরে বিরোধীদলে আছেন, নির্বাচন বর্জনকারী বিরোধীদল, তাঁদের মধ্যে আমি একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাই। তাঁরা যেমন সেখানে তিনভাগে বিভক্ত, এখানেও তিনভাগে বিভক্ত। কিছু কিছু মাননীয় সংসদ-সদস্য বলেছেন যে, পূর্ণ ইসলাম করা দরকার, এটা যথেষ্ট নয়। আমাদের বজলুল হুদা সাহেব ও মান্নান সাহেব[৩] এখানে বলেছেন যে, it is not enough। একই কথা যেটা জামায়াতে ইসলামীরা বলেন বাইরে। আর কেউ কেউ বলেন এটার প্রয়োজন কী? আমরা ৯০ ভাগ মুসলমান, এটার কোন প্রয়োজন নেই। আর বাকি যাঁরা আছেন, তাঁরা আ. স. ম. আবদুর রব সাহেবের নেতৃত্বে বলছেন, যেটা বাইরে আওয়ামী লীগ বলেন—স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত হবে, স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাসহ আমাদের সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে, মৌলবাদ আসবে, সাম্প্রদায়িকতা বাড়বে, এবং আমরা ধর্মের নামে রাজনীতি করার চেষ্টা করছি।

এই কথাগুলি অত্যন্ত সুপরিচিত কথা। আমার সময় নেই, তা না হলে আমি কিছু কিছু বাইরের বর্জনকারী নেত্রীর কিছু বক্তব্য, যেটা ওনাদের সঙ্গে হুবহু ১০০% এক, সেটা আজকে তুলে ধরতাম। বাড়িতে গিয়ে খবরের কাগজে বাইরের নেত্রীর যে সমস্ত বক্তব্য পড়ি, এই গত সাতদিন পার্লামেন্টের ভিতরে এসে সেই একই কথা আমাকে শুনতে হয়েছে। সুতরাং, home-work করতে আমার কোন অসুবিধা হয় নি।

কেন তাহলে এই ধর্মনিরপেক্ষতা? ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন আসে, যদি discrimination, man to man করা হয়, ধর্মীয় কারণে, সেটা দূর করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করা দরকার কিন্তু it is not an ideology, at best it can be a principle, principleটা কেন? যাতে man to man on religious ground discrimination না হয়। As a matter of fact, এই ধর্মনিরপেক্ষতা, একমাত্র ভারত আর বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর কোন সংবিধানে এইভাবে লেখা নেই।

কেন লেখা নেই? Because, democracy is a cohesive concept। যেখানে democracy function করে সেখানে secularism আলাদা করে লেখার দরকার নেই, it is a redundant word। যদি equality before law থাকে, যদি man and man এর মধ্যে কোন unequal treatment না থাকে, তাহলে আলাদা করে লেখার তো কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি

৩. মাওলানা এম এ মান্নান, চাঁদপুর-১ আসনে নির্বাচিত সদস্য।

www.pathagar.com

ভারতের সংবিধানে state principle-এর মধ্যে লেখা নেই। একটি শব্দ use করেছে শুধু preamble-এর প্রথম প্যারাগ্রাফে, 'We would like to have a secular democratic national government in India.'

কিন্তু আমরা একটু আগে বেড়ে গিয়েছি। আমরা শুধু আমাদের preamble-এ লিখি নি, ১৯৭২-এর কথা বলছি, আমরা আমাদের state principle-এর মধ্যে—এটা incorporate করেছি। কারণ, আমাদের মনের মধ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে নিয়ে বোধহয় একটু ভয় ছিল, তখন এই শব্দটা নিয়ে আমাদের অনেক দুর্বলতা ছিল। আমাদের মনে সন্দেহ জেগেছিল যার জন্য আমরা প্রভাবিত হয়েছিলাম এবং প্রভাবিত হয়ে যেখানে গণতন্ত্রের কথা বলেছি, সেখানে সেকুলারিজম-এর কথাও বলেছি।

This is not an ideology। It's a right given to all citizens–equal right on ground of religion. যাতে কোন discrimination না হয়, সেটাকে ধর্মনিরপেক্ষতার principle বলা হয়। সেইজন্য ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর একটা পরিবর্তন আসে। তারও একটা কারণ ছিল। ধর্মনিরপেক্ষতা itself is a good thing, নিশ্চয়, we do not believe in discrimination between man and man on ground of religion। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার পর কয়েক বছরের আচারে ব্যবহারে, দেশীয় নীতিতে বৈদেশিক নীতিতে কিছু অশুভ সংকেত দেখে দেশের মানুষ ভীত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সেটাকে মানুষ ভয় পায়।

যখন পটপরিবর্তন ঘটে, তখন এই সন্দেহ দূর করার জন্য as a reaction সেকুলারিজম শব্দকে প্রতিস্থাপিত করা হয় আমাদের নিজস্ব ধর্ম ইসলাম দিয়ে–আল্লাহর প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস এবং আস্থার কথা জানিয়ে এটাকে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এটাই হল এটার political background।

আজকে এটা শুরু হয়েছে ১৯৭৭ সাল থেকে। ১৯৭৭ সালের ২৩ এপ্রিল constitution amend করা হয়। যে কতগুলি amendment আনা হয় তার মধ্যে অন্যতম একটি amendment হল যে, preamble-এর উপরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজন করা। 'Secularism'-এর শব্দ substitute করা হয় 'আল্লাহর উপরে অসীম আস্থা এবং বিশ্বাস' শব্দগুলি দিয়ে। state principle-এর মধ্যে 'secularism' শব্দের জায়গায় একই শব্দ প্রতিস্থাপিত হয়। সেই দিন থেকে এখন পর্যন্ত এই সংবিধান সেভাবেই রয়েছে, যেভাবে এটা সংশোধন করা হয়েছিল। তখন কোন প্রতিবাদের ঝড় ওঠে নি। কারণ তখনতো 'secularism' শব্দটাই প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। এদিকে আমরা যেটা করছি, সেটা হচ্ছে একটা missing link. সংযোজন করছি। সেই missing link হল যে, সব কিছু আছে, কিন্তু নিজেদের যে ধর্ম সেই ধর্মের কথা নেই। সে জন্যই আজকে আমরা constitution-এর প্রস্তাবনা section-এ fundamental right-এর মধ্যে নয়, state principle-এর মধ্যে নয়, আমরা প্রস্তাবনার মধ্যে সংযোজন করেছি। অনেকে আবার বলেছেন যে, আমরা ৮০/৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান, সুতরাং আমাদের এটা দেওয়ার কী দরকার? আমরা তো ইসলামের পক্ষে আছিই।

মাননীয় স্পীকার, আমরা তো ৯৯ ভাগ মানুষ বাংলায় কথা বলি, তাহলে why should we have the state language 'Bangla' written in the constitution? শাপলা ফুল আমরা সব জায়গায় দেখি, তাহলে এটা লিখতে হবে কেন সংবিধানে? 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' আমরা সব সময় বলি, তাহলে এটা সংবিধানে কেন লিখতে হবে? বাংলাদেশের যে territorial description আছে, সে description অনুযায়ী বাংলাদেশ রয়েছেই। এটা সংবিধানে describe করার কী দরকার আছে, কোন তো দরকার নেই। We know the boundary of Bangladesh।

আজকে আমরা বাংলাভাষায় কথা বলি। আমাদের নাগরিকরা কী বলে আখ্যায়িত হয়, সেটাও আমরা লিখেছি 'বাঙ্গালী'। ১৯৭৭ সালে সেটাকে পরিবর্তন করে করা হয়েছে 'বাংলাদেশী'। যাতে সবাইকে, যাদের কথা রব সাহেব বলেছেন, বাঙ্কারে শুয়ে যাদের নিয়ে যুদ্ধ করেছেন, সেই উপ-জাতীয়দের সঙ্গে, হিন্দুদের সঙ্গে, মুসলমানদের সঙ্গে, খ্রিস্টানদের সঙ্গে, বৌদ্ধদের সঙ্গে, একসাথে

www.pathagar.com

যুদ্ধ করেছেন, তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য 'বাংলাদেশী' বলা হয়েছে। আজকে সেই জন্য এই সংবিধানের সংশোধনের প্রয়োজন হল। যেখানে এদেশের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষের অনুভূতি, বিশ্বাস, অনুপ্রেরণা যেই ধর্ম বিশ্বাস থেকে আসে, সেটা আজকে এখানে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে।

তাতে কি আমাদের নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য বাড়ানো হয়েছে? Secularism-এর কথাটা তখনই আসে, 16th century-র কথা বলছি মাননীয় স্পীকার, religious ground-এ নাগরিকদের মধ্যে যাতে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ না করা হয়। সেটাতো আমাদের সংবিধানে fundamental rights-এর মধ্যে article 26 থেকে শুরু করে article 43 পর্যন্ত লেখা আছে। ধর্মের সম্পূর্ণ সাংবিধানিক নিশ্চয়তা এই সংবিধান দিয়েছে।

সুতরাং, অসুবিধা কোথায়? আমরা কি কারো অধিকার কেড়ে নিয়েছি? আমরা কি কোন হিন্দু, খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ বা কোন উপ-জাতীয়দের অধিকার কেড়ে নিয়েছি? প্রশ্ন আসে মাননীয় স্পীকার, freedom is indivisible. It can't be separated, can't be qualified. Democracy and freedom রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে একটি cohesive concept।

যতদিন পর্যন্ত এই সংবিধানে মৌলিক অধিকারের chapter থাকবে ততদিন পর্যন্ত সকল নাগরিকের, সে যে কোন ধর্মাবলম্বী হোক না কেন, তাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা থাকবে এই সংবিধানে। And that is called democracy এবং secularism is inherent in democracy, যেমন secularism is inherent in Islam। সেই বিষয়ে আমি একটু পরে বলছি।

আজকে আমাদের প্রশ্ন হবে যে, দেশের মৌলিক অধিকার আছে কিনা, সেটাই হবে প্রথম প্রশ্ন। Man to man discriminate-এর কোন article সংবিধানে আছে কিনা, আমরা এমন কিছু করছি কিনা যে, ধর্মের কারণে আমাদের দেশের নাগরিক বেকায়দায় পড়ে? আমরা কি তাদেরকে চাকুরী থেকে বিচ্যুত করছি? আমরা কি তাদেরকে এই পার্লামেন্টে ঢুকতে বারণ করেছি? আমরা কি কোন educational institution-কে হিন্দু ধর্মের উপরে লেখাপড়া করায় তাদেরকে বারণ করেছি? আমরা কি ban করার আইন করেছি?

আজকাল অনেক উন্নত দেশে কালো চামড়ার লোকেরা বাড়ি ভাড়া পায় না, অথচ আইনগতভাবে মানা করতে পারে না। বাড়িতে vacancy-র কথা লেখা থাকলে 'নক' করার পরে বাড়িওয়ালা যখন দেখে যে, একটা কালো চামড়ার লোক এসেছে, তখন খুব polite ভাবে বলে যে আমার বাড়িটা ভাড়া হয়ে গিয়েছে। ঐ discrimination এখনও রয়েছে। আমাদের কি ঐ ধরনের কোন আইন আছে বা কোন practice আছে? এমন কেউ বলতে পারবে যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য বলে কোন সরকারী চাকুরী পায় নি, কোন হাসপাতালে ঢুকতে পারে নি, পার্লামেন্টে আসতে পারে নি? এ কথা কেউ বলতে পারবে না।

মাননীয় স্পীকার, এ ব্যাপারে আমি দুই-একটি সমীক্ষা দিতে চাই। এই সরকার হিন্দুদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছেন। ঢাকেশ্বরী মন্দির যেটা ১৫ বছর জীর্ণ অবস্থায় ছিল সেটাকে মেরামত করেছেন। লাঙ্গলবন্ধ ঘাট, তারাকান্দি শ্রীহরি ঠাকুরের আশ্রম প্রভৃতির সংস্কার সাধন এবং উন্নয়ন করা হয়েছে। হিন্দুদের বিভিন্ন মন্দির এবং আশ্রমে আর্থিক সহায়তা ও অনুদান দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে অনুন্নত তফশীল সম্প্রদায়ের জন্য চাকুরীর বয়সসীমা দুই বছর হ্রাস করা হয়েছে। তফশীল সম্প্রদায়ের জন্য তফশীলী কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। শ্রীহরি ঠাকুরের জন্মদিনকে ঐচ্ছিক ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। Is it not the example of secular state? রাষ্ট্রীয় ধর্ম এবং ধর্মীয় রাষ্ট্র এক জিনিস নয়। দু'টি আলাদা জিনিস, মনে রাখতে হবে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। এই সরকার করেছে। বৌদ্ধ বিহারের সংস্কার ও উন্নয়ন করেছে। বৌদ্ধদের প্রার্থনা স্কুল উন্নয়নের জন্য আর্থিক অনুদান দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের চিতাভস্ম চীন থেকে আনা হয়েছে এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে। উপজাতীয় বৌদ্ধদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, এই ধরনের অনেক উদাহরণ আমি দিতে পারি। কিন্তু আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে, সংবিধানের অধিকার equality before law has been ensured for all citizens in Bangladesh. Articls 27, 28, 31 দেখুন।

আমরা ইসলাম সম্পর্কে যাঁরা কিছু লেখাপড়া করেছি, হয়তো মুফতি সাহেবের মতো লেখাপড়া করি নি বা আরও অনেকে আছেন এই পার্লামেন্টে বা পার্লামেন্টের বাইরে, তারাও অবগত আছি যে, Islam is a secular religion।

আমি পবিত্র কোরআনের অনেক কোটেশন নিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে তুলে ধরার জন্য কিন্তু সময়ের অভাবে আমি সেইগুলি তুলছি না।

এখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে এটাতে সাম্প্রদায়িকতা বেড়ে যাবে। সাম্প্রদায়িকতা নির্ভর করে দেশের মানুষের মানসিকতার উপরে। সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আছে। অনেক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেখানে হয়। কিন্তু তার পরেও আমরা বলব না যে, সেটা একটা secular state নয়।

কিন্তু আমাদের এখানে শত শত বছর ধরে চেষ্টা করেও সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা সম্ভবপর হয় নি। কারণ আমাদের এলাকার মানুষ, আমাদের দেশের মানুষ শত বছর ধরে হিন্দুদের সঙ্গে, খ্রিস্টানদের সঙ্গে, বৌদ্ধদের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করছে। দশ বছর আগে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" সংবিধানে লেখা হয়েছে। কোন মুসলমান গিয়ে কোন হিন্দুকে কতল করেছে? কোন খ্রিস্টানকে অপমান করেছে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" লেখা হয়েছে বলে?

আজকে এখন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার জন্য আমাদের দেশের মানুষকে এত undermine করা ঠিক নয়। আমাদের দেশের মানুষ অনেক সচেতন। সুতরাং, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘুদের উপরে যে কথাবার্তা এসেছে, এগুলি তাৎক্ষণিক। এগুলি আমরা নিজেরা ছড়িয়ে, এসব সম্পর্কে কথা বলে, তাদের মনে ভয়ভীতি সঞ্চার করার চেষ্টা করছি।

মাননীয় স্পীকার, এমনকি মওলানা মান্নানও সাম্প্রদায়িক নন, জিজ্ঞাস করে দেখুন। তারপরে বলা হয়েছে, মৌলবাদে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি, রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম হলে দেশে মৌলবাদের পথ সুপ্রশস্ত হবে। এদেশের মানুষ যেমন সাম্প্রদায়িকতাকে গ্রহণ করে না, তেমনি মৌলবাদকেও গ্রহণ করে না। যদি তাই হতো, তাহলে আজকে এই শাজাহান সিরাজ সাহেব আমাকে বলেছেন, "মওলানা মওদুদ আহমদ।" আমার সেই জ্ঞান নেই 'মওলানা' উপাধি গ্রহণ করার। কিন্তু "নাস্তিক শাজাহান সিরাজ" উপাধি আমার ইচ্ছা থাকলেও আমি তাঁকে দিতে পারছি না।

মাননীয় স্পীকার, 'neo-traditionalism', যেটাকে 'fundamentalism' বলা হয়। 'neo-traditionalism' এবং 'state atheism' দুটাই হল regimented societyর একটি দর্শন। সেখানে যারা ভিন্ন মতাবলম্বী, তাদের অনেক অধিকার দেওয়া হয় না। মৌলবাদী রাষ্ট্রে যারা ভিন্ন মতাবলম্বী, তাদের অনেক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়। তাদের গির্জায় যেতে দেওয়া হয় না, মসজিদে যেতে দেওয়া হয় না। সেটা atheist society। শাজাহান সিরাজ সাহেব সেই স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু তিনি অনেক আগেই ঐ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এই পার্লামেন্টের পথে এসেছেন।

সুতরাং, কোন অসুবিধা নেই আমাদের, যা ইচ্ছা তাই বলবেন। কিন্তু 'মওলানা' উপাধি আমি গ্রহণ করতে পারছি না, আপনার কাছ থেকে পারছি না। যদি মওলানা ওয়াক্কাস সাহেব দিতেন তাও একটা কথা, চিন্তা করে দেখতাম।

আ. স. ম. রব সাহেব, আপনি বলেছেন, "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" একটা কৃত্রিম জিনিস। I reject your opinion, কারণ এটা আছে আমাদের মাটিতে, আমাদের পানিতে, আমাদের ভাষায়, আমাদের চিন্তাধারায়, আমাদের সংস্কৃতিতে। এই জাতীয়তাবাদ 'বাংলাদেশী' জাতীয়তার প্রতীক। এই 'জাতীয়তাবাদ' ততদিন থাকবে, যতদিন বাংলাদেশ পৃথিবীর ইতিহাসে থাকবে।

আপনারা যাঁরা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের কথা বলেন তাঁরা পাকিস্তানের context-এ চিন্তা করছেন। তখন প্রয়োজন ছিল। তখন পাকিস্তানের framework-এ বাংলাদেশকে স্বাধীন করার

www.pathagar.com

জন্য বাঙালী জাতীয়তাবাদের উপরে ভিত্তি করে সেই আন্দোলন করতে হয়েছে। কারণ তখন, it was between us and them—it was only one thing that we had। কিন্তু রাষ্ট্র যখন স্বাধীন হয়েছে, দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, তখন আমাদের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য নতুন আদর্শের প্রয়োজন হয়। এ ব্যাপারে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

আমি এখানে সংক্ষেপে বলতে চাই যে, এই 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' আমাদের আদর্শ, লক্ষ্যের একটি অন্যতম স্তম্ভ। আর একটি হল ইসলামী মূল্যবোধ। বাংলাদেশের নয় কোটি মানুষের অনুভূতি, তাদের aspiration, তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির প্রতিফলন যদি সংবিধানে না থাকে, তাহলে কিসের প্রতিফলন থাকবে সংবিধানে? নির্বাচনের সময় আমরা পুরো ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করেছি জাতির কাছে। তার মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ ছিল বিশেষ অংশ।

মাননীয় স্পীকার, আমরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি না এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতিতে বিশ্বাসও করি না। ধর্ম নিয়ে রাজনীতিকে বন্ধ করার জন্যই আজকে এই সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ইসলামকে সংযোজন করা হল। মৌলবাদকে প্রতিহত করার জন্য এবং মৌলবাদীদের তৎপরতাকে প্রতিহত করার জন্য ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে সন্নিবেশিত করা হল।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতি এরশাদ একজন উদারপন্থী প্রগতিশীল আধুনিক চিন্তা-চেতনার মানুষ। যদি কেউ মনে করেন যে, তাঁর মাধ্যমে এই দেশে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদের প্রবর্তন হবে বা আমরা পিছিয়ে যাব, আমরা সামনের দিকে যেতে পারব না, তাঁরা ভুল করবেন। কারণ সেইজন্য আমরা এই সংশোধনী আজকে আনছি না। কোন জাতি সচেতনভাবে, কোন সরকার সচেতনভাবে নিজেদেরকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন কিছু করে না।

জাতীয় ঐক্যের কথা বলেন। ওনারা বলেন যে, এই বিলের দ্বারা জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে। জাতীয় ঐক্যের conceptটা কী? আমরা কি ১১ কোটি মানুষ কোন দিন একত্র হতে পারব? এটা কি গ্রীক্ সিটি স্টেট? আমরা সবাই একসাথে বসে সিদ্ধান্ত নিতে পারব? এটা প্রতিনিধিত্বশীল সরকার, এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই জনগণের মতামত প্রতিফলিত হবে। এবং সেজন্য জাতীয় ঐক্য মানে হল consensus, consensus of the majority। মাইনোরিটির উপরে consensus নির্ভর করে না। It is the majority opinion that constitutes the consensus।

Majority কারা? It is a democratic concept through which a consensus is arrived at। যাঁরা বলছেন যে, জাতীয় ঐক্য নষ্ট হয়ে যাবে, তাঁরা জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাস করেন না। সেইজন্য তাঁরা এই কথা বলেন। যাঁরা জাতীয় ঐক্যকে concept হিসাবে গ্রহণ করতে চান তাঁরা কক্ষণো বলবেন না যে, এই সংশোধনী আনলে জাতীয় ঐক্য নষ্ট হবে। এটা দার্শনিক ব্যাপার। যাঁরা বাইরে বসে জল্পনা করছেন এটা তাঁদের বক্তব্য। তাঁরা স্বাধীনতা-সনদের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার কথা সেদিন তাঁরা স্বাধীনতা সনদে উল্লেখ করেন নি। আজকে তাঁরা অশ্রু বিসর্জন করছেন।

মাননীয় স্পীকার, ইসলাম হল শান্তির ধর্ম। এখানে অনেক বক্তা ইসলামের উপর সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছেন, আমি সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। সুরা বাকারার 'লা ইকরা ফিদ্দিন' এবং সুরা কাফেরুন-এর 'লাকুম দীনুকুম ওয়ালিইয়াদিন' এই পার্লামেন্টে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে।

Islam is a religion of tolerance। আমাদের Prophet হজরত মোহাম্মদ (দঃ), why he is considered as the most outstanding leader of mankind? তার অন্যতম কারণ হল যে:

> "He combined in himself a leadership both of religion and secularism. That is why he is rated the greatest leader of mankind."

আজকে এখানে আমি আরও উদ্ধৃতি দিতে পারতাম কিন্তু সময় লাগবে। 'লা ইকরা ফিদ্দিন... অর্থাৎ right stands distinguished from wrong. আজকে এই মর্মে যে secular element আছে তার জন্য এই ইসলাম ধর্ম বিশ্বের সব জায়গায় আজকে সমাদৃত।

মাইকেল হার্টের একটা বই 'The hundred' এখানে আমার কাছে আছে। আমি একটু আগে যে কথাটা বলছিলাম, আমাদের prophet সম্পর্কে এতে বলছে:

www.pathagar.com

"It is this unparallel combination of secular and religious influence which, I feel, entitled Mohammed (Sm) to be considered as the most influential single figure in human history."

আমরা নিজেরা কথার ছলে অনেক কথা বলি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি যে, আমাদের সে কথাগুলি জনগণ গ্রহণ করে না। আর যেগুলি আমরা মনে করি জনগণ গ্রহণ করে, সেগুলি যখন আমরা উপস্থাপন করি তখন সেগুলির সমালোচনা এই পার্লামেন্টে করি।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের বলা হয়েছে যে, এই বিল পাস হলে আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হবে। প্রত্যেক দিনই নেতৃবৃন্দরা একই বক্তৃতা দিচ্ছেন যে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হবে। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে, এই জাতির জন্য, এই সংসদের জন্য, আজকে এটা একটা ঐতিহাসিক দিন। যাঁরা মনে করেন যে, এই দিনের জন্য আমরা একদিন অনুশোচনা করব, তাঁদেরকে উদ্দেশ করে আমি বলতে চাই যে, এই বিলের বিরোধিতা করার জন্য আপনারা একদিন অনুশোচনা করবেন।

[হর্ষধ্বনি]

কারণ এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ় হবে। সুসংহত হবে। আমরা চিরদিন এখানে থাকব না, মাননীয় স্পীকার। আমি ঠাট্টা করে বলিনি বরং seriously বলছি যে, we are not the last government and I am not the last Prime Minister of Bangladesh। আমরা চলে যাব, কিন্তু এই সংসদ থেকে যাবে, এদেশের মানুষ থাকবে, তারা সেদিন আমাদের জন্য দোয়া করবে যে, তাদেরকে আমরা একটা জাতীয় সত্তা, জাতীয় স্বীকৃতি, জাতীয় পরিচিতি দিয়ে গেছি এই সংবিধানে।

মাননীয় স্পীকার, this amendment with inclusion of Islam as a state religion is an expression of our will to consolidate our independence and sovereignty.

[হর্ষধ্বনি]

এখানে কারো ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। দেশের ভিতরে যাঁরা আছেন, তাঁদেরও ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। যাঁরা আমাদের দেশের আশেপাশে আছেন, তাঁদেরও ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ, আমরা সৌহার্দ্যপূর্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাসী।

আজকে এ কথাগুলি বলে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।*

[হর্ষধ্বনি]

---

*বিলটি ১৯৮৮ সালের ৭ই জুন সংসদে পাস হয়।

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতা এবং মেধাই হবে অগ্রগতির চালিকাশক্তি

রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণের উপর সমাপনী বক্তব্য

১৫ জুন ১৯৮৮

১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করে নি। সেই কারণে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক ছিল। অন্যদিকে জাসদ নেতা জনাব আ স ম আব্দুর রবের নেতৃত্বে একটি সম্মিলিত বিরোধী জোট নির্বাচনে ৩৫টি আসন লাভ করে সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। সংবিধানের ৭৩(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণ দেন। এই আলোচনায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সংস্কারসমূহসহ দেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার বিষয় উত্থাপিত হয়। ১৯৮৭ সালের বন্যা-উত্তর ব্যবস্থায় সাফল্য, উপজেলা পদ্ধতি এবং ৪ দফা কর্মসূচীর উপর বক্তব্য রাখা হয়। A good governance is good politics-এর themeটাকে আরও develop করা হয়। সংসদ নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই বক্তব্য রাখা হয়।

মাননীয় স্পীকার

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আজকে আমরা রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনা শেষ করতে যাচ্ছি। এই আলোচনায় অনেক মূল্যবান তথ্য বেরিয়ে এসেছে এবং খুব সুন্দর আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনায় আমি এবং বিরোধীদলীয় নেতা ছাড়া ৯৩ জন সম্মানিত সংসদ-সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রায় ২৪ ঘণ্টা এই আলোচনা করেছি। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনেক জাতীয় সমস্যা আমাদের সামনে তুলে ধরা এবং আমাদের মধ্যে যে সব মতভেদ আছে, সেগুলিকেও আমরা তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছি। যাঁরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন সরকারী দলের পক্ষ থেকে এবং বিরোধীদলের পক্ষ থেকে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিরোধীদলের প্রায় সকল সদস্যই এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বাকি ছিলেন, তিনি আজ সকালবেলা বলেছেন।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রতি বছর সংবিধান অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। তাঁর ভাষণ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, দেশে একটি রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা এখন রয়েছে। সেই জন্য গতানুগতিক রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তব্যের তুলনায় সরকারপ্রধান হিসাবে যখন রাষ্ট্রপ্রধান ভাষণ দেন তার গুরুত্ব অনেক বেশি থাকে। তাঁর বক্তব্য ছিল রাষ্ট্রনায়কোচিত এবং তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে একটি দিক-নির্দেশনা এই জাতিকে দিয়েছেন। এই সরকারের ব্যর্থতার কথা যেমন উল্লেখ করেছেন, এই সরকারের সফলতার কথাও রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন। আমরা রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, গতিশীল, দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখার জন্য।

মাননীয় স্পীকার, বিরোধীদলের বক্তব্য আমি খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছি। তাঁরা সকলেই প্রায় একই কথা বলেছেন, দুই-একজন ছাড়া মোটামুটিভাবে তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে আছে তাঁরা পেশাভিত্তিক ৫০০ আসনবিশিষ্ট একটি সংসদ চান, পেশাভিত্তিক জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার তাঁরা এদেশে চান এবং তার উপরে তাঁরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিরোধীদলের নেতা আজকে ৪৫ মিনিট, শুধু এটার উপর আলোচনা করেছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আজকে সামাজিক শক্তির কথা এসেছে। কারণ ঐ পেশাভিত্তিক বলতে ওনারা কি বোঝান সেটা আমরা জানি, আমরা বুঝি। ওনারা কাকে উদ্দেশ করে কথা বলতে চান, কিসের জন্য চান, কার জন্য চান তাও আমরা জানি। কিন্তু সময়ে সময়ে এইগুলির উত্তর দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

কেউ কেউ বলেছেন যে, এই ভাষণে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে নি। মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা সাহেব বলেছেন যে, গত ছয় বছরে কিছুই হয় নি, উনি কিছুই দেখেন নি।

মাননীয় স্পীকার, বজলুল হুদা সাহেব যদি এইগুলি দেখতে না পারেন তাহলে তিনি আমার সহকর্মী সম্মানিত উপ-নেতা বাংলাদেশের সবচাইতে বড় ও বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. মতিনকে কনসাল্ট করতে পারেন। আমি আশ্বাস দিতে পারি যে, ড. মতিন কোন ফি নেবে না আপনার কাছ থেকে।

জাতীয় ঐক্য এবং সামাজিক শক্তির উপরে আমরা এখানে বক্তব্য শুনেছি, সারগর্ভ বক্তব্য। আ. স. ম. আবদুর রব সাহেব তাঁর অত্যন্ত প্রিয় subject-এর উপর এখানে বক্তব্য রেখেছেন।

মাননীয় স্পীকার, তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি হল সিরাজুল আলম খান এবং জিল্লুর রহমান খানের লেখা 'শাসনতন্ত্র এবং শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা'। এটাই হল তাঁর দিক দর্শন। আমি এই বইটা পড়েছি; এটার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মতামত এখানে দিতে চাই না, কারণ তাতে তিনি হতাশ হয়ে যাবেন; সেজন্য আমি কোন মতামত দিতে চাই না। কিন্তু শুধু বলতে চাই যে, এটাই হল তাঁর ভিত্তি। ভবিষ্যতে অন্য কোন ফোরামে যদি তাঁরা আমাকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেন তাহলে সেখানে আমি আমার বক্তব্য, আমার মতামত দেব, এই ফ্লোরে না দিয়ে।

তবে একটা কথা বলি, আমরা এখানে যারা সংসদ-সদস্য আছি, particularly এই সাইডে, তিনি যে কী বলেছেন তা আমরা কেউ বুঝি নি। আমাদেরকে যদি তিনি বুঝাতে না পারেন তাহলে বাইরে অন্যকে কী করে বুঝাবেন? এই পার্লামেন্টে বসে আমরা যদি না বুঝি, আমরা হলাম জনগণের প্রতিনিধি—তাহলে তিনি সাধারণ মানুষকে কী করে বুঝাবেন, মাননীয় স্পীকার?

আমি তাঁদের বক্তব্যের কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর আমার বক্তব্যের মাঝখানে দেওয়ার চেষ্টা করব। শাজাহান সিরাজ সাহেব হাসছেন, তিনি অপেক্ষা করছেন আমি তাঁর সম্পর্কে কী বলি? তাঁর সম্পর্কেও বলা হবে। কিন্তু আমি আগে মূল বিষয়ে যেতে চাই, তারপর যদি সময় থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাদের দুই একটি কথার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতির ভাষণে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। সেসব দিকগুলির মধ্যে অন্যতম একটি দিক হল—আজকে দেশে একটি সংবিধান আছে, একটি গণতান্ত্রিক সরকার আছে—একটি নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল সরকার দেশ পরিচালনা করছে। দেশে মৌলিক অধিকার আছে এবং একটি সংবিধান আছে। A rule by law and not by decree—এটাই হল রাষ্ট্রপতির ভাষণের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে আমি মনে করি। আমরা যদি পিছনের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা দেখব যে আমরা কত কষ্ট করে ২৪ বছর কত ত্যাগ স্বীকার করে আমরা এদেশকে স্বাধীন করেছিলাম। আমরা এখানে অনেকে আছি, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং একটি স্বপ্ন দেখে আমরা এদেশকে স্বাধীন করার জন্য হাতিয়ার হাতে নিয়েছিলাম।

স্বপ্ন আমাদের দুটি ছিল—একটি ছিল যে, আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করব, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে এদেশকে আমরা মুক্ত করব এবং সেই দেশে গণতন্ত্র থাকবে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকবে, ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকবে, রাজনৈতিক দল এবং মত প্রকাশ করার অধিকার থাকবে; আর একটি স্বপ্ন ছিল যে, দেশটাকে আমরা এমনভাবে পরিচালনা করব, আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ দেশকে এমনভাবে পরিচালনা করবেন যাতে করে এদেশে আমরা অর্থনৈতিকভাবে অনেক উন্নতি করতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, আমরা দেশ স্বাধীন করেছি ঠিকই। আমাদের সংবিধানে দেশের মানুষের ২৪ বছরের আন্দোলনের সবগুলি না হলেও অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। কিন্তু যে সরকার মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বের দাবি নিয়ে সরকারে এসেছিলেন, গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে, সংবিধান রচনা করে, সেই সংবিধানের উপর ভিত্তি করে, নির্বাচন করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেরাই এই গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতাকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছিলেন। আজকে তাঁরা এই সংসদে নেই। তাঁরা থাকলে আমার কথাটা আরও শোভন হত, আরও ভাল করে বলতাম।

www.pathagar.com

তারপরে আমরা দেখেছি, আমাদের দেশে দুইবার সামরিক শাসন এসেছে, সামরিক আইন এসেছে। এদেশের মানুষ গণতন্ত্রপ্রিয় এবং রাষ্ট্রপতি এরশাদ এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে রক্ত দিয়ে হলেও দেশে আমি গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখব। সেই ওয়াদা অর্থাৎ তিনি জনগণের কাছে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন সেটা তিনি পূরণ করেছেন। শুধু এটুকু বলতে চাই যে, বিগত ডিসেম্বর মাসের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যাঁরা এই সংসদে এসেছিলেন সামরিক আইনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, রাষ্ট্রপতি এরশাদকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে মেনে নিয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা এবং যাঁরা নির্বাচন বর্জন করেছিলেন তাঁরা দুইপক্ষই এই সংসদকে অবমাননা, অবহেলা, অপমান এবং লজ্জা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

একদল যাঁরা ভিতরে ছিলেন, তাঁরা যেমন এই সংসদকে বলেছিলেন যে এই সংসদের আর কার্যকারিতা নেই, যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁরাও বলেছিলেন যে এই সংসদ অর্থহীন।

আ. স. ম. আবদুর রব সাহেব আজকে বলেছেন যে, বাইরের বিরোধীদলগুলির সাথে কোন সমঝোতা করতে রাজি নন। অথচ জাতীয় consensus-এ তিনি arrive করতে চান। A democrat will always be responsible to the people's demand, to the opposition's demand - সেই opposition ক্ষুদ্র হোক, বিশাল হোক, তাতে কিছু আসে যায় না।

রাষ্ট্রপতি এদের দাবি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নিজের সংসদ, যেখানে ৩৩০ জনের মধ্যে তাঁর ২১২ জন সংসদ-সদস্য ছিল, তিনি সেটা বাতিল করে দিয়েছিলেন একটি আন্তরিক ইচ্ছায় যে, সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন এবং তার ফলে একটি সংসদ নির্বাচিত হবে এবং তাতে জাতীয় যত চিন্তাচেতনা আছে, যত রকমের রাজনৈতিক মতামত আছে সব কিছুরই প্রতিনিধিত্ব হবে। কিন্তু দুটি প্রধান বিরোধী জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন নি।

আবদুর রব সাহেব বলেছেন যে যারা বোমাবাজি করে তাদের সঙ্গে সমঝোতা কিসের? দল হিসাবে বোমাবাজির দল কোন্টা, বলাটা কঠিন ব্যাপার। আমরা মনে করি, বাংলাদেশে যত রাজনৈতিক দল আছে, আজকে দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৭ বছর হয়েছে, সকল রাজনৈতিক দলই দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল এবং সকল রাজনৈতিক দলই চায় যে, দেশের মঙ্গল আসুক। কিন্তু তাঁরা অনেক সময় বিপথগামী হন নেতৃত্বের কারণে, আদর্শগত কারণে, ব্যক্তিত্বের কোন্দলের কারণে, তাঁদের দলের অভ্যন্তরীণ অবস্থার কারণে তাঁরা তাঁদের সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন না।

সেজন্য আমি আবদুর রব সাহেবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি। রাষ্ট্রপতি এরশাদ এই সংসদ নির্বাচন দিয়ে তাঁর ওয়াদা জনগণের কাছে পূরণ করেছেন। এবং এই সংসদ ততদিনই থাকবে যতদিনের জন্য এই সংসদ নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যাঁরা বিরোধীদল বাইরে আছেন তাঁদেরকে আমরা স্বীকার করে নেব না। বাস্তবকে অস্বীকার করা হবে যদি আমরা আমাদের এই সংসদের বাইরে যে রাজনৈতিক দলগুলি আছে তাঁদেরকে আমরা মনে করি তারা অস্তিত্ববিহীন রাজনৈতিক দল। আমি তাঁদেরকে বড় রাজনৈতিক দল হিসাবে দেখতে চাই না, ছোট হিসাবেও খাটো করতে চাই না। যেমন আমাদের কাছে সরকারের কাছে সংসদের ভেতরে যেমন বিরোধীদল আছে, সংসদের বাইরেও বিরোধী দল আছে। এটাই হল আজকের বাস্তব সত্য।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি এরশাদ অনেক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে এই সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছেন। অনেক হুমকি দেওয়া হয়েছিল এই সংসদ করতে দেওয়া হবে না। শাজাহান সিরাজ সাহেব বলেছেন যে, তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন যে, সামরিক বাহিনী কেন দেশ শাসন করবে। এই সামরিক বাহিনী সেই সামরিক বাহিনী নয় যেটা আপনি চিন্তা করেছেন। এটা একটা দেশপ্রেমিক সামাজিক শক্তি। তাঁরা শাসন করবে যদি আমাদের মত রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে মজবুত করতে না পারি তাহলে। আজকে সেইজন্য কতকগুলি বই-এর reference দেব একটু পরে।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতি এরশাদের জন্য এই নির্বাচন একটি মস্ত বড় বিজয়। এটাই ছিল তাঁর ছয় বছরের সব চাইতে বড় রাজনৈতিক বিজয়। এই গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রাখতে পেরেছেন তাঁর সাহস এবং গতিশীল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক চেতনা বোধের জন্য। সেই জন্য আমরা সকলে তাঁকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

www.pathagar.com

Good governance is good politics। পুরনো আমলের রাজনীতির দিন শেষ হয়ে গেছে। গতানুগতিক রাজনৈতিক দিন শেষ হয়ে গেছে–এটাই আজকে এই ভাষণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলার চেষ্টা করেছেন।

সতের বছর হয়েছে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। এখনো আমরা আমাদের দেশের আশেপাশের অনেক দেশের তুলনায় পিছিয়ে আছি। আমাদের দারিদ্র্য এত গভীর, আমাদের বিত্তহীনতা এত ব্যাপক, আমাদের চাহিদা এত বেশি–আমাদের এই বাস্তব সত্যগুলি স্বীকার করতে হবে।

আজকে যদি আমরা এই দেশকে সত্যিকার অর্থে সামনের দিকে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে সবচাইতে আগে 'good governance'-এর মতাদর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে। যে সরকার কল্যাণমুখী, যে সরকার দেশের বৃহত্তর সাধারণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নীতি নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে এবং শৃঙ্খলাবোধ ফিরিয়ে আনে সমাজে, প্রশাসনে নৈরাজ্যকে দূর করে এবং সুসংগঠিত করবে জনগোষ্ঠীকে, তাকেই আমরা 'good governance' বলব। এই জন্য রাষ্ট্রপতি এরশাদের অনেক সংস্কারের জন্য তাঁকে মহান সংস্কারক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আমরা অনেকগুলি সংস্কারের কথা এখানে উল্লেখ করেছি। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কথা, বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, ঔষধনীতির কথা বলেছি, ভূমি সংস্কারের কথা, নারী নির্যাতন রোধ করার জন্য বিভিন্ন আইন, শিল্পনীতি এবং আরও অনেক নীতির কথা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। এই সব সংস্কারের মাধ্যমে দেশের প্রশাসনে একটা গতিশীলতা আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের ঔষধনীতির উপর ২১ মে-র *Indian Express*-এর একটা উদ্ধৃতি আমি এখানে দিতে চাই। আমাদের এই ঔষধনীতি পৃথিবীতে প্রশংসিত হয়েছে। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতও এখনও তাদের ঔষধনীতি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় নি। তাদের এই পত্রিকার editorial-এ বলছে:

> "We have the example of Bangladesh which has adopted a rational drug policy, thereby eliminating the prolification of useless formulation of the market and ensuring the supply of cheap and basic drug sold under their generic name."

রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন সংস্কারের কথা উল্লেখ করে বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রে যে উন্নয়ন আনা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই মে মাসের *Reader's Digest*-এ যে কথা বলা হয়েছে, এখানে আমি তার উদ্ধৃতি দিতে চাই। এখানে বলেছে যে:

> "One of the developing world's more spectacular examples of denationalisation, rapidly transformed into one with far greater reliance on the private sector is Bangladesh ... Within two years the new textile mill owners were making substantial profits compared to heavy losses suffered by the same mills under government ownership"

এখানে এই article-এ ইংল্যান্ডে মার্গারেট থ্যাচার যে নতুন নীতি প্রণয়ন করেছেন এবং যার success-এর জন্য আজকে basic world economy অনেক improve করেছে তার সঙ্গে আমাদের কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়াও আমেরিকা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকা এখানে বলছে:

> "The economy of Bangladesh is growing as its people's confidence in the future."

তার পরে বলছে:

> "Like the Thatcher Government in England, the Ershad Government in Bangladesh seeks to create a share-owning democracy. Now that the common man has taken free market in the economy, what will happen to the communist idea in Bangladesh?"

www.pathagar.com

আমি জানি না শাজাহান সিরাজ সাহেব কী মত পোষণ করেন? অর্থাৎ কথাগুলি আমি এই জন্যই বলছি যে বিরোধীদলের সদস্যরা আমাদের অনেক সমালোচনা করেছেন। অবশ্য এই সমালোচনা তাঁরা করবেন, সমালোচনা তাঁদের করতেই হবে এবং সমালোচনা করার কারণও আছে। কোন government-ই perfect government নয়, কোন systemই perfect system নয়। আমাদের systemও perfect system নয়, এটা আমরা স্বীকার করি। তাই সমালোচনা তো করতেই হবে, না করলে আমরা আমাদেরকে শুদ্ধ করব কী করে? এই জন্য আমরা সমালোচনা গ্রহণ করি এবং সেই সমালোচনায় আমরা react করতে চাই এবং as a reaction এই বক্তব্যগুলি আমি রাখছি।

আজকে বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন কর্মসূচীতে আমরা যে সফলতা অর্জন করেছি সারা বিশ্বে এর জন্য আমরা প্রশংসা কুড়িয়েছি। এটাও একটা good governance-এর পরিচয়। Secretariat-এ অনেক সংস্কার করা হয়েছে, মন্ত্রণালয়গুলিকে আগের চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। Public Sector Corporationগুলিকেও অনেক বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। Government-এর control from commercial and industrial organisation তুলে নেওয়া হচ্ছে।

এগুলিই হল সংস্কার, এগুলিই হল good governance-এর নজির এবং জাতীয় পার্টি এই politics-এ বিশ্বাস করে। যে রাজনীতি দেশকে একটি সুষ্ঠু সরকার ও প্রশাসন দেবে সেই রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি। আমি 'polimics'-এ যেতে চাই না; 'polimics'-এ গেলে অনেক সময় লাগবে এবং সেজন্য আমাদেরকে আর একটা দিন ধার্য করতে হবে।

এই সংস্কারগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। এটা আমরা সবাই বলেছি। এটাকে আমরা একটি ঐতিহাসিক সংস্কার বলে আখ্যায়িত করেছি। আমাদের দেশে যত আন্দোলন হয়েছে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত, এর সকল আন্দোলনে স্থানীয় সরকারকে জোরদার করার জন্য এবং স্থানীয় পর্যায়ে নতুন নেতৃত্ব নিয়ে আসার জন্য বলা হয়েছে। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা এটা চিন্তা করেছেন এবং সেই অনুযায়ী ১৯৭২ সালের সংবিধানে, এটা হল আমাদের original constitution, অনুচ্ছেদ ৫৯ এবং ৬০-এর দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

স্থানীয় প্রশাসন কী হওয়া উচিত, তার উল্লেখ এখানে রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে:

"৫৯। (১) আইনানুগ নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে;

ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;
খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা;
গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।"

"৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকারিতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাঁরা এই সংবিধান রচনা করেছিলেন, আজকে তাঁরা এখানে নেই। তাঁরা যদি থাকতেন, তাহলে আমি তাঁদেরকে বলতাম যে, এই সংবিধান রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছিল। চতুর্থ সংশোধনী এনে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ১১ মিনিটে আইন পাস করে অনেক কিছু বদলিয়ে ছিলেন। তার মধ্যে এই স্থানীয় শাসনের উপরে এই যে chapterটা constitution-এ আছে, এই

www.pathagar.com

পুরো chapterটা রহিত করে দেওয়া হয়েছে। তার বদলে governorship আনা হয়েছিল administrative order-এ। এই অনুচ্ছেদ, এমনকি পরবর্তীকালেও পুনরুজ্জীবিত করা হয় নি।

এ দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য এই ঘুণে ধরা প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে রাষ্ট্রপতি এরশাদ উপজেলা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করেছেন। আজকে এইজন্য প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সমূহ ক্ষমতা উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কী হবে? এর অনেক সুবিধা আছে। কোন সংস্কারই তার সুফল একদিনে বহন করে আনতে পারে না। এজন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আজকে সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই জেলা পরিষদ বিল করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে? আমি আমার বাজেট বক্তৃতায় বলব যে, এই উপজেলাগুলিতে আমরা কত টাকা খরচ করেছি এই পর্যন্ত। কিন্তু এই টাকার একটা accountability রাখার কোন ব্যবস্থা আমাদের নেই। এখন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এগুলি দেখাশুনা করেন। কোন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ৪৬০টি উপজেলা তদারকি করা সম্ভবপর নয়।

সেই জন্য আমরা আমাদের হাতে সেই দায়িত্ব না রেখে, প্রশাসনের উপর দায়িত্ব না দিয়ে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর সেই উপজেলা পরিষদের কার্যকারিতা, তদারকির দায়িত্বভার জেলা পরিষদের উপর দিয়েছি।

[হর্ষধ্বনি]

মাননীয় স্পীকার, এর ফলে কী হবে? আজকে বাংলাদেশে নেতৃত্বের সংকট, ব্যবস্থাপনার সংকট। আমরা যে টাকা বিনিয়োগ করি, বিভিন্ন খাতে যে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করি, এর কোন রিটার্ন আমরা পাই না। রিটার্ন না পাওয়ার একটা অন্যতম কারণ হল, আমাদের ব্যবস্থাপনা সংকট এবং নেতৃত্বের সংকট। এটা সর্ব পর্যায়েই রয়েছে। আজকে এই নেতৃত্বের নতুন সম্ভাবনা আমরা দেখছি। যে গ্রামকে আমরা অবহেলা করি, যে গ্রামাঞ্চলে আমাদের দেশের ৯০ ভাগ মানুষ বাস করে এবং সেখান থেকে আমরা যারা অনেকেই এখানে এসেছি, বেশির ভাগই আমরা গ্রামেরই ছেলে, সে গ্রামই আমাদের আসল শক্তি। সেখানেই নতুন নেতৃত্বের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। এই উপজেলা এবং জেলা পরিষদের মাধ্যমে সেটাই বেরিয়ে আসবে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যত, আজ থেকে দশ বছর বিশ বছর পরে, নতুন নেতৃত্বের জন্ম দেবে এই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি। বর্তমান সংস্কারের মাধ্যমে সেই নতুন নেতৃত্ব বাংলাদেশে জন্ম নেবে। দেশের জন্য এই কার্যক্রম গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতি এরশাদ একটি দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কোচিত নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন বলে আমি মনে করি।

মাননীয় স্পীকার, জাতি হিসাবে we should be in a hurry। জাতি হিসাবে আমাদেরকে কেন দ্রুতগতিতে চলতে হবে? তার কারণ হল, বিশ্বে টেকনোলজি খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি লাভ করে যাচ্ছে, ধনী দেশ ও গরিব দেশের মধ্যে বৈষম্য খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। আমরা যদি চুপ করে থাকি এবং আমরা যদি গতানুগতিকভাবে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার চিন্তা করি বা রাজনীতি করার চিন্তা করি, তাহলে আমরা আরও অনেক পিছিয়ে যাব। এই জন্য আমাদের দরকার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সেটা অর্জন করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আমরা সকলে সব সময় বলে এসেছি যে, আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দরকার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া আমাদের কোন বিকল্প নেই।

কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে সত্যিকারের অর্থে কী বুঝি? আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশের সম্পদ সীমিত এবং এই রকম সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা যদি কোন আইন প্রণয়ন করতে যাই সেই ক্ষেত্রে আমরা পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হই। আমরা যদি কোন নীতি গ্রহণ করতে যাই সেই নীতির বাস্তবায়নে আমরা বাধাপ্রাপ্ত হই। কারণ আমাদের নানা রকম প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু যেই সব দেশ একদিন আমাদের দেশের পিছনে ছিল সেই সব দেশকে আমরা যখন দেখি আমাদের দেশের তুলনায় সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, তাহলে দেখব যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে কতকগুলি নির্ধারিত এবং চিহ্নিত পথ তারা অনুসরণ

www.pathagar.com

করেছিল এবং সেই জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করার জন্য তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করেছে। এর ফলেই এরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

আমাদের দেশে গত ছয় বছরে আমরা অনেক অবকাঠামো তৈরি করেছি। গত চার বছরে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন চারগুণ বৃদ্ধি করেছি। আমাদের দেশের রাস্তাঘাটের অবকাঠামো অনেক উন্নত হয়েছে। আমরা দেখছি যে, আমাদের প্রবৃদ্ধির হার বাড়ে; কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়ার সাথে সাথে সেই প্রবৃদ্ধির সুফল আমরা পাই না। সেই জন্য আজকে রাষ্ট্রপতি অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করার জন্য চিহ্নিত করেছেন কতকগুলি বিষয়, তারমধ্যে একটি হল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। এবং এই জন্য বিশেষ পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছেন। এমন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে যাতে করে প্রান্তিক কৃষকরা তাদের উপকরণ সহজে পান, যাতে করে আমাদের খাদ্যের ৫৫% ভাগ এই প্রান্তিক কৃষকরা উৎপাদন করতে পারেন সেই ব্যবস্থাই আমরা করছি। এদের জমি ১ একরের নিচে। তারাই সবচেয়ে বেশি উৎপাদনে সক্ষম জনশক্তি আমাদের দেশে।

এই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা যেদিন আমরা অর্জন করতে পারব সেদিন আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে, ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, সাথে সাথে চাহিদা বাড়বে এবং উৎপাদনও বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে। কর্মসংস্থান হলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে এবং দেশের মানুষকে যে স্বপ্ন দেখিয়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম সে স্বপ্ন আমরা সফল করতে সক্ষম হব।

সরকারের ৮ দফা কর্মসূচীর মধ্যে ৪টি কর্মসূচী হল প্রধান। একটি হল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। দুই নম্বর হল, আমাদের শিক্ষিতের হার বাড়াতে হবে। জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিতের হার বাড়াতে যতটা উচিত ছিল আমরা ততটা পারি নি। তার অনেক কারণ আছে। তার একটি উত্তর আমাদের শিক্ষামন্ত্রী এই ফ্লোরে দিয়েছেন।

আমি এখানে বলতে চাই, শিক্ষা খাতে এই সরকার সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ চলতি অর্থবছরে দিয়েছিলেন ১ হাজার ২২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। প্রাইমারী খাতে ৪২৩ কোটি, সেকেন্ডারী খাতে ৪০৯ কোটি, টেকনিক্যাল এডুকেশন খাতে ৬৪ কোটি, অন্যান্য খাতে ৩৭ কোটি এবং বিশ্ববিদ্যালয় খাতে ৮৭ কোটি টাকা আমরা ব্যয় করেছি। আমরা ইউনিভার্সিটির প্রতিটি ছাত্রের জন্য ১৭,০০০ টাকা মাথাপিছু এই গরিব দেশের মানুষের টাকা খরচ করেছি।

আজকে দুঃখের বিষয় যে, যে ছাত্র ১৯৮৫ সালে ভর্তি হয়েছে সেই ছাত্রের ক্লাশ ১৯৮৭ সালে শুরু হয় নি। যার ১৯৮৫ সালে পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল আজকে ১৯৮৮ সালেও তার পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নি। কারা এর জন্য দায়ী? ১৯৭৩ সালে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন দিয়েছি। আমরা কি তাদের পরীক্ষার সময়সূচী তৈরি করি? আমরা কি সিলেবাস তৈরি করি? কোন্ ডিপার্টমেন্টে কে চেয়ারম্যান হবেন সেটা আমরা কি নির্ধারণ করি, বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস-চ্যান্সেলর কে হবেন তাও কি আমরা নির্ধারণ করি?

এই এত টাকা এবং এত স্বায়ত্তশাসন থাকা সত্ত্বেও আজকে এই সেশনজটের জন্য দায়ী কে সেটা চিহ্নিত করতে হবে। আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অভিভাবক এবং রাজনীতিবিদদেরকে সচেতন হতে হবে এবং এই সমস্যার সমাধান করতে হবে তাদেরকে যাদের উপর এ দায়িত্ব আছে।

এই বছরে সরকার যত খরচ করেছে সারা বাংলাদেশের জন্য তার ৯.৩% আমরা খরচ করেছি শিক্ষা খাতে। কোন সরকার অতীতে এত অর্থ শিক্ষা খাতে ব্যয় করে নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বলতে হয় যে, এর রিটার্ন জাতি কতটুকু পেয়েছে, আজকে সে প্রশ্ন আমাদের সকলের মনে জেগেছে।

তিন নম্বর হল, আমাদেরকে জনসংখ্যা রোধ করতে হবে। শিক্ষার প্রসার বাড়ানো এবং জনসংখ্যা রোধ করার জন্য যদি আমরা প্রশাসনিক উপায়ে গতানুগতিকভাবে এগোই তাহলে আমরা আর পারব না। আমাদের আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিতে হবে, এবং রাজনৈতিক দলগুলির দলীয় কর্মসূচী নিতে হবে, এদেশের শিক্ষিতের হার বাড়ানো এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্ব-স্ব কর্মসূচী থাকবে। তা না হলে এই সমস্যাকে যদি আমরা শুধু মনে করি, এটা সরকারের সমস্যা, তাহলে ভুল হবে। আমরা জানি, এ কথা সত্য নয়। যারা এ রকম মনে করেন, এ কথা বলেন, তাঁরা অনেকেই সরকারে ছিলেন। সুতরাং, আজকে আমাদেরকে জাতীয় পর্যায়ে চিন্তা করতে হবে।

www.pathagar.com

আর চার নম্বর হল কর্মসংস্থান। আজকে এই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য একটি গতিশীল, উদার শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতি যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এ দেশে যে প্রকট বেকার সমস্যা রয়েছে, সেটা আমরা সমাধান করতে পারব।

মাননীয় স্পীকার, বাইরে যে সব বিরোধী দল আছেন, যদিও আ. স. ম. আবদুর রব সাহেব বলেন যে, তাদের সাথে আমাদের সমঝোতার দরকার নেই, আমরাই এখানে পাঁচ বছর থাকব। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সমঝোতা করা যাবে না, এবং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ignore করতে হবে, এটাতে আমি বিশ্বাস করি না। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার জন্য এখানকার বিরোধীদলরা হরতাল পালন করেন নি। কিন্তু বাইরের বিরোধীদলগুলি এর বিরুদ্ধে হরতাল ডেকেছিলেন। এই তফাৎ ছাড়া অন্য কোন তফাৎ দেখি না।

এই প্রসঙ্গে আমার কোন কিছু বলার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যেহেতু অনেক সদস্য এটা বলেছেন এবং রব সাহেব আজকে আবার এই ইস্যুটাকে reopen করার চেষ্টা করেছেন, তিনি বোধ হয় আমার বক্তব্য শোনেন নি যে, আমি বলেছিলাম, প্রয়োজন হলে জনমত যাচাই করা হবে। এই কথাই রাষ্ট্রপতি বলেছেন। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রপতি এক কথা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী আর এক কথা বলছেন। এটা ঠিক নয়। রাষ্ট্রপতি যা বলেছেন প্রধানমন্ত্রীও তাই বলেছেন এবং তাই করবেন। আমি বলেছি জনমত যাচাই আর গণভোট এক জিনিস নয়। গণভোট, ছয়টি অনুচ্ছেদ, এবং 142-এর উপর হতে পারে। সংবিধানের অন্য কোন সংশোধনীর জন্য গণভোটের প্রয়োজন নেই।

আমি বলেছি, ছয় মাস যাবৎ এই বিতর্ক চলছে। প্রত্যেকদিন খবরের কাগজে বক্তব্য এসেছে। সকল রাজনৈতিক দল, ছোট-বড় সবাই তাদের মতামত দিয়েছেন। এরপর আমরা মনে করি নি যে, গণভোটের প্রয়োজন আছে। যথেষ্ট জনমত যাচাই হয়েছে। জিনিসটি কেন তিনি reopen করেছেন, আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি দু'টি কথা বলতে চাই। আজকে যাঁরা হরতাল ডেকেছেন তারা দু'একটি গাড়ি ভাঙচুর করেছেন। কিন্তু তাঁদেরকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৭৪ সালের কথা। যেদিন লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে প্রয়াত নেতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের উপর দিয়ে উড়োজাহাজে করে লাহোরে গিয়েছিলেন, সেইদিন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে তাঁর কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়েছিল।

এই কথাটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। আজকে তাঁরাই বাইরে হরতাল ডেকে গরিব মানুষের ক্ষতি করছেন এবং সরকারী যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করছেন। এটাই হল নিয়তির পরিহাস। তাঁরা হয়তো সেদিনকার কথা ভুলে গেছেন, যেদিন এই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের বিভিন্ন শহরে তাঁদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়েছে।

আর একটি কথা বলা দরকার। জনৈক নেত্রী বলেছেন যে, সুযোগ পেলে অষ্টম সংশোধনী বিল অর্থাৎ রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে বাতিল করে দেবেন। আ. স. ম. আবদুর রব সাহেবও তাই মনে করেন। কারণ, তিনিও এটার বিরোধিতা করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই যে, এই বিল বাতিল করার ক্ষমতা কোন রাজনৈতিক দলের এই বাংলাদেশের মাটিতে নেই। আমি তাঁদেরকে জানাতে চাই বিল বাতিল করতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগবে। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সংবিধানকে মেনে চলতে হবে। সংবিধানের বাইরে কোন কিছু করার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং, সেই দলের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়ে এই সংসদে আসার ক্ষমতা আছে কি নেই এটা আপনিই বিবেচনা করে দেখবেন।

তিনি বলেছেন যে, কোন ইসলামিক রাষ্ট্রে নাকি এই ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে নেই। মাননীয় স্পীকার, আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে যেহেতু আমাদের সংসদের কার্যবিবরণী পুরোপুরি প্রকাশিত হয় না সেই জন্য তিনি হয়ত জানেন না যে, এখানে অনেক মাননীয় সংসদ-সদস্য কোন্ কোন্ রাষ্ট্রে ইসলাম ধর্ম আছে সেটা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যেই ব্যক্তি এটা বলেছেন, আমি আশা করেছিলাম যে, তাঁর আশেপাশে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা যাঁরা আছেন তাঁকে জানিয়ে দেবেন যে, কোন্ কোন্ দেশে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম আছে।

www.pathagar.com

আমি এটা পড়ে শুনাতে চাই না, আমি শুধু জানাতে চাই যে, এটা সত্যি না। বাহরাইন, ব্রুনাই, ইজিপ্ট, ইরান, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মারিতানিয়া, মরক্কো, ওমান, পাকিস্তান, কাতার, সাউদী আরাবিয়া, সোমালিয়া, সুদান, তিউনিশিয়া, ইউএই, ইয়েমেন, সাউথ ইয়েমেন, নর্থ ইয়েমেন সব জায়গায় ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম আছে।

শুধু ইসলাম নয়, আর্জেন্টিনাতে রোমান ক্যাথলিকইজম আছে, কোষ্টারিকাতে রোমান ক্যাথলিকইজম আছে, ভুটানে বুদ্ধিইজম আছে, ডেনমার্কে ইভান জেলিক্যাল, গ্রীসে ইস্টার্ন অর্থডক্স ক্রিশ্চিয়ানিটি রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে আছে। গ্রীনল্যান্ডে লুথারনিজম, হাইতিতে রোমান ক্যাথলিকইজম, আইসল্যাণ্ডে ইভানজেলিক, আয়ারল্যাণ্ডে রোমান ক্যাথলিকইজম রয়েছে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে।

মাননীয় স্পীকার, আমি এই কথাগুলি এই জন্য বললাম যে, যাতে এই কথাটি সত্য বলে প্রমাণিত না হয় যে, ইসলাম শুধুমাত্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসাবেই আছে। ইংল্যান্ড কি সেকুলার স্টেট নয়? সুইডেন কি সেকুলার স্টেট নয়? অথচ সেই দেশগুলি আজকে তাদের ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে নিয়েছে। সেই সব দেশের সমস্ত আর্টিক্যাল, কোন্ সংবিধানের কোন্ আর্টিক্যাল সব আমার কাছে এখানে আছে। ইজিপ্টে আর্টিক্যাল-২, লিবিয়াতে আর্টিক্যাল-২, বাংলাদেশেও আর্টিক্যাল-২, মরক্কোতে আর্টিক্যাল-৬, তিউনিশিয়াতে আর্টিক্যাল-১, সাউথ ইয়েমেনে আর্টিক্যাল-৪৭, নর্থ ইয়েমেনে আর্টিক্যাল-৩, আফগানিস্তানে আর্টিক্যাল-৫, এই কথাটাও আমি ভেবেছি যে বলার প্রয়োজন আছে।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে কিছু রাজনীতিবিদদের কথা উল্লেখ করেছেন যাঁরা দেশে রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন না করতে পেরে বিদেশে গেছেন। এবং তিনি বলেছেন যে, ওয়াশিংটন, প্যারিস, মস্কো, লণ্ডন এইসব জায়গায় গিয়ে তাঁরা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কথা বলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

আমেরিকার কংগ্রেসের একজন সদস্য স্টিফেন সোলারস নিউইয়র্কের ব্রুকলিন constituency থেকে নির্বাচিত। আমেরিকার এইড দেওয়ার জন্য একটা বিল already তাঁদের দেশে আছে। সেখানে একটি amendment এনে তিনি চেষ্টা করেছেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার জন্য।

আমেরিকা একটি স্বাধীন দেশ, গণতান্ত্রিক দেশ। সে দেশে যে কোন ব্যক্তির যে কোন মত প্রকাশ করার অধিকার আছে এবং কংগ্রেসে স্টিফেন সোলার্সেরও অনুরূপভাবে এই মত প্রকাশ করার অধিকার আছে। তিনি বলেছেন বাংলাদেশে সাহায্যের জন্য পাঁচটি condition থাকতে হবে। বাংলাদেশে একটি effective government, একটি effective Parliament, freedom of press, elected local Government এবং একটি independent judiciary এই পাঁচটি জিনিস যে বাংলাদেশ আছে এ কথাটি যেন তাঁদের প্রেসিডেন্টের কাছে report করা হয়।

এটা কোন বাধ্যতামূলক কিছু নয়; এবং এটাতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব পরিবর্তনের কোন কথা নেই এবং এটা অত্যন্ত একটি মামুলি সাধারণ জিনিস। কিন্তু আমাদের দেশের কিছু কিছু রাজনৈতিক দল এবং কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এটাকে নিয়ে overplay করার চেষ্টা করছেন এবং এমনকি তাঁদের আন্দোলন যখন এখানে ব্যর্থ হয়েছে, বিফল হয়েছে তখন তাঁরা বিদেশে গিয়ে আমাদের দেশের মানুষ, দেশের সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করারই চেষ্টা করেন নি বরং তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন।

তাঁরা আমাদের সমালোচনা করেন, আমরা নাকি অর্থনীতিতে দেশকে পরনির্ভরশীল করে ফেলেছি। আমি, তুলনা দিতে চাই না কারণ এখন সময় নেই, অর্থনৈতিকভাবে কারা, কাদের সরকার কতটুকু পরনির্ভরশীল ছিল, সেটা আমি বাজেট সেশনে বলব।

আমি শুধু একথাই জানাতে চাই যে, অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল কতটুকু আছি জানি না, তবে তাঁরা এটুকু প্রমাণ করেছেন যে রাজনৈতিকভাবে তাঁরা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন—এটাই তাঁরা প্রমাণ করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, উপরোক্ত amendmentটা কোন mandatory amendment নয়; এটা হচ্ছে যে, এদেশে ঐ পাঁচটি condition বিরাজ করে কিনা এবং সেটা আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে

www.pathagar.com

জানাতে হবে শুধু এইটুকুই। এটার সাথে flow of aid-এর কোন সম্পর্ক নেই। এটার সাথে বাংলাদেশের সরকারের effectiveness-এর কোন সম্পর্ক নেই। এই পাঁচটি শর্ত সম্পূর্ণভাবে এদেশে বহাল আছে বলেই, আজকে যাঁরা বাইরে গিয়েছিলেন তাঁদের সেই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাঁরা কিছুই করতে পারেন নি।

শুধু আমাদের দুঃখ লাগছে এই যে, তাঁরা আমাদের দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন, নিজেদেরও ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন। দেশের এই ১১ কোটি সাধারণ গরিব মানুষের, স্বাধীনতাপ্রিয় গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের ভাবমূর্তি তাঁরা বিদেশে নষ্ট করেছেন। আশা করি, তাঁরা ভবিষ্যতে যাই কিছু করুন না কেন, যত বড় মতবিরোধ থাকুক না কেন, যত আদর্শগত পার্থক্য থাকুক না কেন, এহেন কাজ তাঁরা যদি ভবিষ্যতে আর না করেন তাহলে আমরা দেশবাসী খুশি হব।

মাননীয় স্পীকার, আজকে আমার কাছে একটা দলিল আছে। এটা হল, এই সংশোধনী বিলে, সোলার্স কমিটিতে, আমাদের দেশের একজন স্বনামধন্য নাগরিক যিনি একসময় এদেশে একজন মন্ত্রী ছিলেন তাঁর pamphlet আমার কাছে আছে, সংক্ষেপে বলি, তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয়:

> "If you were called into the oval office in the White House for a meeting with the President of the United States and he asked you your advice about what he should do with respect to our Aid Programme in Bangladesh what would you say?"

আমি ভদ্রলোকের নামটা পড়লাম না। তার উত্তরে তিনি বলেছেন যে, এই পাঁচটি condition-এর কোনটা বাংলাদেশে বিরাজ করে না। এটা একটা মিথ্যা কথা তিনি বলেছেন। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণভাবে আলাদা, সংবিধানবলে আলাদা। আমরা তো একটা সংবিধান অনুযায়ী দেশ চালাচ্ছি, আমরা তো by decree, by order দেশ চালাচ্ছি না। এখানে মৌলিক অধিকার রয়েছে, নির্বাচিত স্থানীয় সরকার রয়েছে, একটি পার্লামেন্ট রয়েছে। তারপরেও তিনি বলেছেন, "none of the conditions exists in Bangladesh".

তারপরে মি. সোলারস তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন, "so would you then say to him that the aid should be terminated?" তার উত্তরে তিনি বলেছেন 'yes'। এর চাইতে লজ্জার বিষয় এই জাতির জন্য, কারও জন্য হতে পারে না। কথাগুলি এজন্য বলতে হল, কারণ রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে এর উল্লেখ করেছিলেন।

মাননীয় স্পীকার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করব একটু পরে। রাষ্ট্রপতি এরশাদ ঐক্যের ডাক দিয়েছেন; আ. স. ম. আবদুর রব সাহেব তার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মেজরিটি দিয়ে consensus হয় না; আমি মনে করি, majority is always the basis of consensus তবে consensusকে broadened করার জন্য অবশ্যই বিরোধীদলের মতামতকে গ্রহণ করতে হবে, বিবেচনা করতে হবে। সেজন্যই আজকে জাতীয় সমঝোতা এবং জাতীয় ঐক্যের প্রশ্ন রয়েছে।

আ. স. ম. রব সাহেব ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। তাঁর বক্তৃতার প্রথম ৪৫ মিনিট তিনি বলেছেন এই সংসদ ভেঙে যাচ্ছে এবং তাঁর কী হবে, আমাদের কী হবে? আমি তাঁকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, তবে এটুকু আমাদের মানতে হবে যে, জাতীয় মৌলিক সমস্যাগুলি নিরসনের জন্য, জাতীয় মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে যত বেশি সমঝোতা অর্জন করা যায় ততই আমাদের জন্য, জাতির জন্য ভাল। সেজন্য এই সরকার সব সময় তার দ্বার উন্মুক্ত রাখবে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যে কোন সমঝোতা অর্জন করতে। আজকে এটাতে অবিশ্বাস বা সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আজকে এই সংবিধানের অধীনে এবং এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এই সংসদের মাধ্যমে যদি আমরা আরও সমঝোতা অর্জন করতে পারি, তাতে বাধা কি? তার মানে এই নয় যে, নির্বাচনই একমাত্র পথ। নির্বাচন তাঁরা বর্জন করেছিলেন। সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করতে হতো ৯০ দিনের মধ্যে। It was a matter of choice। তাঁরা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। নির্বাচন করাটাও গণতান্ত্রিক অধিকার, নির্বাচন বর্জন

www.pathagar.com

করার অধিকারটাও গণতান্ত্রিক অধিকার। তাঁরা তাঁদের সেই অধিকার প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা ইচ্ছা করেই সংসদের বাইরে আছেন। আজকে তাঁরা নিশ্চয়ই আফসোস করছেন। নির্বাচন বর্জনকারীরা যেমন অতীতে ব্যর্থ হয়েছে, ভবিষ্যতেও তাঁরা ব্যর্থ হবেন। এইজন্য যে তাঁদের আদর্শগত দ্বন্দ্ব রয়েছে। একটি জোট বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা বলে, আর একটি জোট বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা বলে। একটি জোট বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্র তাঁরা চান যদিও তাঁরা সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে একনায়কত্ব সরকার কায়েম করেছিলেন এক সময়। আর একটি দল সেদিন বলেছেন তাঁরা '৮২-র সংবিধান চান, তাঁরা রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা চান।

তারপর তাঁদের নেতৃত্বের কোন্দল রয়েছে। একজন নেতা আর একজন নেতাকে গ্রহণ করতে পারেন না। তার পরে তাঁদের নেতিবাচক আন্দোলন। তাঁরা জাতির কাছে এমন কোন কর্মসূচী, আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী উপস্থাপন করতে পারেন নি যেটা গভর্নমেন্ট অর্থনীতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। সেটা তাঁরা পারেন নি এবং এমন কর্মসূচী তাঁরা গ্রহণ করেছেন যার ফলে তাদের জনপ্রিয়তা কমেছে, জনগণ থেকে তাঁরা বিছিন্ন হয়েছেন। এবং ভবিষ্যতেও যদি তাঁরা এই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন তাঁরা আরও বিছিন্ন হয়ে পড়বেন।

আর মাননীয় স্পীকার, তাঁদের নিজেদের দলের অভ্যন্তরে কোন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নেই। এই চারটি মূল কারণে আজকে বিরোধীদল বিভক্ত, divided and half-hearted as the opposition, এখানেও half-hearted, divided। এই divided opposition বাইরে যেমন আছে, এই সংসদের ভেতরেও আছে।

মাননীয় স্পীকার, একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আ. স. ম. আবদুর রব সাহেব বলেছেন যে, আমাদের এখানে সব সময় ঐকমত্য থাকে, আমরা যেহেতু সবাই এককণ্ঠে কথা বলি, article 70-র কারণে। আপনিও যেদিন মফিজুর রহমান রোকন সাহেব walkout করেন নি প্রথম দিন, সেদিন আপনি তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। আপনিও সংবিধানের article 70- invoke করতে চেয়েছিলেন। article-70 আজকে ভারতও follow করে। ইংল্যাণ্ডেও পার্টি হুইপ করলে পার্টি লাইনে ভোট দিতে হয়। কিন্তু তাদের কতকগুলি legislation আছে যেগুলিকে তারা বলে conscience legislation অর্থাৎ যেমন capital punishment, ফাঁসি শাস্তি হিসাবে থাকবে কি থাকবে না, এটাতে পার্টি হুইপ করে না। মেম্বারদেরকে liberty দেওয়া হয়। to go to vote in any way they like, সেটা হল conscience voting। Otherswise party whip করলে সেই ভোট তাদেরকে গতানুগতিকভাবে দিতেই হবে। না দিলে কী হবে সেটা অন্য কথা। ইংল্যাণ্ডে আইন নেই কিন্তু আমাদের এখানে আইন আছে। সুতরাং আমাদের constitution বলে যে, membership will cease। সেটাই আমাদের মানতে হবে। আপনাদের সবাইকে, যাঁরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একটি দরিদ্র দেশের বাজেট প্রণয়ন করা খুবই কঠিন কাজ

১৯৮৮-৮৯ সালের বাজেট এবং সমাপনী ভাষণ

১০ এবং ১১ জুলাই ১৯৮৮

অভাবের রাজনীতির dynamics হয় ভিন্ন। সম্পদ যেখানে অতি সীমিত সে দেশের বাজেট প্রণয়ন একটি কঠিন কাজ। কিন্তু তারপরও বাজেট একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই বাজেটের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ এবং ব্যবহারের কৌশল নির্ধারণ করা হয়। এই বাজেটে রাষ্ট্র সম্পদ বৃদ্ধি করে অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ ঘটানোর একটি দিক নির্দেশনার ইঙ্গিত দেয়া হয়। এই বক্তৃতায় বাংলাদেশে অর্থনীতির বিবর্তন, বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার, বিরাষ্ট্রীকরণ প্রক্রিয়া, কৃষি উৎপাদন, শিল্পায়ন এবং সংযোজন শিল্পের বিকাশের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। বাজেট অধিবেশনের শেষে অর্থমন্ত্রীর সমাপনী বক্তৃতার আগে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই বক্তব্য রাখা হয়।

মাননীয় স্পীকার

এই সংসদে যাঁরা এই বাজেটের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে বিরোধীদলের নেতাসহ সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কারণ, বাজেটের উপর আলোচনা করা একদিকে যেমন সহজ, আর এক দিকে তেমনি কঠিন। আমাদের মতো একটা অনুন্নত দেশের, একটা দরিদ্র দেশের বাজেট প্রণয়ন করা খুবই কঠিন কাজ।

মাননীয় স্পীকার, মাইরন ওয়াইনার M.I.T.-র একজন অধ্যাপক। তিনি মাঝে মাঝে হারভার্ডে পড়ান। তাঁর লেখা একটা বই আছে। তার নাম হচ্ছে "Politics of Scarcity." অর্থাৎ অভাবের রাজনীতি, দারিদ্র্যের রাজনীতি। দরিদ্র দেশের রাজনীতি। এখানে তিনি বলছেন:

> "In an economy of scarcity, it is only common that every budget will be subject to criticism whatever the planners do."

যেভাবেই বাজেট তৈরি হোক না কেন, সমালোচনার সম্মুখীন হতেই হবে এবং শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সকল দেশে বাজেট সমালোচিত হয় এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশে আগে যত বাজেট হয়েছে, ১৯৭৩-৭৪, ১৯৭৪-৭৫, ১৯৭৫-৭৬, ১৯৭৯-৮০, ১৯৮০-৮১, ১৯৮১-৮২ অর্থবছরের এই ৬টি বাজেট এবং আমাদের সরকারের এটা দ্বিতীয় বাজেট, এই সকল বাজেটের এবং এই উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের বাজেটের ছক এবং কাঠামো মোটামুটিভাবে এক।

কিন্তু এর পরেও প্রত্যেকটা বাজেটের একটা স্বকীয়তা থাকে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটা বাজেটে কতকগুলি গুণগত বৈশিষ্ট্য থাকে। আমাদের এই বাজেট আমাদের সরকারের মৌলিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটিয়েছে, কিভাবে ঘটিয়েছে সেটা আমি ব্যাখ্যা করে বলব। কতকগুলি মৌলিক অর্থনৈতিক প্রশ্নে সরকারের বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতিফলন এ বাজেটের মধ্য দিয়ে ঘটানো হয়েছে। এটাকে যদি আমরা বিচ্ছিন্নভাবে দেখি, তাহলে ভুল করব। হিসাব-নিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি চিন্তা করি তাহলেও সঠিক হবে না। তাই, আমি আমার বক্তব্য অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না। কোন দেশের কোন বাজেটই সকল শ্রেণীর মানুষের সুখ আনতে পারে না বা সকলকে খুশি করতে পারে না। আমাদের এখানেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। কোন বাজেটই perfect নয়।

আমাদের উন্নয়ন বাজেট যদি আমরা ৫ হাজার কোটি ধরি, আর আমাদের জনসংখ্যা যদি ১০ কোটি ধরি, তাহলে মাথাপিছু ব্যয় আসে ৫শ' টাকা। আমাদের ট্যাক্স বা কর যদি আমরা ৫০০ কোটি টাকা ধরি আর আমাদের জনসংখ্যা যদি ১০ কোটি ধরি, তাহলে মাথাপিছু কর ৫০ টাকা হয়। সুতরাং

www.pathagar.com

আমাদের অর্থনৈতিক স্বল্পতা, সামান্যতা, ক্ষুদ্রতা এই অংকগুলির মাধমেই প্রমাণিত হয়। অতএব, আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, আমরা কোন্ দেশের বাজেট নিয়ে আলোচনা করছি?

আ. স. ম. রব সাহেব বলেছেন যে, এই বাজেট আন্দাজে প্রণয়ন করা হয়েছে। কোন বাজেটই আন্দাজে প্রণয়ন করা হয় না। তিনি বলেছেন যে, এই বাজেট একটা গতানুগতিক বাজেট। মাননীয় স্পীকার, তাঁর উত্তরে আমি বলতে চাই যে, উনাদের সমালোচনাটাই হয়েছে গতানুগতিক সমালোচনা। ব্যতিক্রমধর্মী কোন সমালোচনা হয় নি। সমস্ত বাজেটের সমালোচনাগুলি এখানে আমার কাছে আছে। আমি সবগুলি বলব না, শুধু আপনাকে ১৯৭৪ সালের বাজেটের কথাই বলি। "জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রীর সুষম বাজেট-রাজস্ব বাজেট, ৫২৫ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট, ৮৯.১৪ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর।" তাতে চিনির সের ১ টাকা বাড়ল। এই বাজেট হল ১৯৭৪ সালের বাজেট। এখানে ৫২৫ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে ৮৯.১৪ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর বসানো হয়েছিল। এটা যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে, উন্নয়ন বাজেটে প্রায় ১৬ শতাংশ কর ১৯৭৪ সালে সরকার আরোপ করেছিলেন। আমরা আজকে ৫,৩১৫ কোটি টাকার বাজেটে ৫১৭ কোটি টাকার কর ধার্য করেছি যেটা ৯.২ শতাংশ আসে।

এখানে বাজেটের সমালোচনায় বলা হচ্ছে, 'বুভুক্ষু মানুষকে বাজেটের নতিজা ভোগ করতে হবে।' 'বাজেট মরণ আঘাত নিয়ে আসছে।' তারপর 'সরকারের এই বাজেট ব্যর্থ হতে বাধ্য।' এটা ১৯৭৪ সালে জাসদের উক্তি, 'এই বাজেট জনগণকে হতাশ করবে।' আজও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। 'আগামী দিনে এই বাজেট অশুভ ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে আসবে, জনগণের দুর্ভোগ বাড়াবে।' 'সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পন্থায় এই বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে।'

আমি কেন এই কথাগুলি বলছি, মাননীয় স্পীকার, একটু পরে তা আপনাকে জানাব। তারপরে আছে 'নয়া বাজেট পণ্যের বাজারে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির শামিল।' একই শব্দ এই বাজেট সেশনেও এখানে বলা হয়েছে—সামঞ্জস্য, অসম্ভব সামঞ্জস্য এই ১৯৭৪ সালের বক্তব্যের সঙ্গে আজকের বক্তব্যের। বাজেট সম্পর্কে মহিলা পরিষদের বিবৃতি। বেগম সুফিয়া কামাল তখন বলেছিলেন:

> "বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে দিন দিন যখন সংকটে জর্জরিত তখন '৭৪-৭৫ সালের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে চিনি, পোস্ট কার্ড, ঢেউটিন, সিমেন্ট প্রভৃতির উপর করারোপ করে এবং রেলভাড়া বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষের জীবনে আরও দুর্ভোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।"

আমাদের কমরেড ফরহাদও বলেছেন, বাজেটে সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা বাড়ানো হয়েছে এবং ধনীদের কার্যত রেহাই দেওয়া হয়েছে। বন্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠু না হলে তিনি অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন। আমাদের এখানে কেউ অন্তত আমাদের অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন নি, আর করার চান্সও নেই।

তারপর, 'মানুষ আরও গভীর সংকটের কবলে পড়বে।' '৮৫% বৈদেশিক সাহায্যের উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন কিংবা সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নয়।' 'সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে'—এই একই কথা। 'এই বাজেটে কোন আশার আলো নেই'—এটা বজলুল হুদা সাহেব বলেছেন।

এই কথাগুলি এই জন্য বলছি যে, এখন যদি আমি এই বছরের বাজেটের সমালোচনাগুলি দেখি একই ভাষা, একই রকম কথা। বিভিন্ন মহলের যে প্রতিক্রিয়া, আমাদের বিরোধীদল যাঁরা সংসদের ভিতরে এবং বাইরে তাঁদের ভাষাও এক।

মাননীয় স্পীকার, এই বাজেটের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল যে, এই বাজেটে সর্বপ্রথম পরোক্ষ করের চেয়ে প্রত্যক্ষ করের পরিসর বাড়ানো হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে যে পরিসর ছিল ৬% সেটা বাড়িয়ে আমরা আজকে প্রায় ২৯%-এ আনতে পেরেছি, অর্থাৎ ৫৭০ কোটি টাকার মধ্যে ১৫০ কোটি টাকা আমরা প্রত্যক্ষ কর আরোপ করে আমাদের সঞ্চয় বাড়িয়েছি এবং এটা একটা বিজয় বলে আমি মনে করি। এই কারণে বাজেট যাঁরা প্রণয়ন করেছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না।

এই প্রত্যক্ষ কর এটাই বুঝায় যে, যাঁরা দিতে পারেন তাঁদের উপরে বেশি কর আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুই নম্বর হল, এই বাজেট সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক এবং

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে। সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছার সুদৃঢ় বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। দারিদ্র্য মোচন ও পল্লীগ্রামের উন্নয়নে অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করেছে। বিনিয়োগ ও শিল্পোন্নয়নের সুযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে।

মাননীয় স্পীকার, প্রশ্ন ওঠে যে, আমরা কি চাই? পৃথিবীতে দুটি স্বীকৃত পথ আছে উন্নয়নের। একটি হল, Regimented Economy—Socialist Economy; আর একটি হল, Democratic Welfare Economy। State Capitalism আর Democratic Capitalism—একটিতে all means of production will be under state control, আর একটিতে, ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রতিযোগিতা এবং ব্যক্তি উদ্যোগ হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি।

১৯৭১ সালে আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলাম। হাতিয়ার হাতে নিয়েছিলাম একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার জন্য। এখানে অনেকেই আছেন যাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর আমরা যে শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম সেই শক্তিকে নির্জীব করে দেওয়া হয়েছিল। সমাজতন্ত্রের নামে জাতীয়করণ করে প্রায় ৯০% শিল্প-সম্পত্তি, ৮৫% ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স বিজনেস সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সরকার জনগণের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে নিলেন overnight, যার জন্য সরকার প্রস্তুত ছিলেন না।

এই জাতীয়করণের মাধ্যমে স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং তার আগেকার সকল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের মধ্যে যে জাগরণ, যে উদ্যোগ, যে উৎসাহ, যে অনুপ্রেরণা, যে স্বপ্ন রচিত হয়েছিল সেই প্রতিভাকে, সেই মেধাকে নির্জীব করে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে যদিও সরকার জনগণের সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করলেন কিন্তু চরমভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেন।

মাননীয় স্পীকার, ১৯৭৩ সালের প্রথম যে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়, এটাও ছিল socialist transformation-এর জন্য বলা হয়েছিল:

> "since socialism was laid down as one of the four principles on which Bangladesh was founded, the Plan was directed towards achieving these objectives through peaceful means within a democratic framework."

তারপর আমরা কী দেখেছি? আমরা দেখেছি যে, এই সমাজতন্ত্রের নামে অর্থনৈতিক নৈরাজ্য সারাদেশকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আমাদের অর্থনীতিকে ভেঙে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে যে শক্তি ছিল, সেই শক্তিকে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রথম কয়েক বছরের ভ্রান্ত, ভুল চিন্তা-চেতনা এবং ধারণার জন্য দিতে হয়েছে অনেক মাশুল। Socialist transformation-এর জন্য socialist leadership-এর প্রয়োজন ছিল, socialist cadre-এর প্রয়োজন, socialist party-র প্রয়োজন। তখন যে রাজনৈতিক দল এই দেশকে পরিচালনা করছিল তাদের তিনটার কোনটাই ছিল না, যার জন্য স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তার খেসারত এখন পর্যন্ত এই জাতিকে দিয়ে চলতে হয়েছে। কারণ সেই hang-over থেকে আমরা এখনও মুক্ত হতে পারি নি।

তার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১-৮২ সাল পর্যন্ত যে সরকার আসলেন তাঁরা চেষ্টা করেছেন এর কিছু পরিবর্তন করতে। আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ যিনি তখন প্লানিং কমিশনের সদস্য ছিলেন এবং এই socialist transformation-এর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করতে সরকারকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর একটি উদ্ধৃতি আমি দিতে চাই। 'Public Enterprise In An Intermediate Regime'— এটা হল রেহমান সোবহান, যিনি তখন প্লানিং কমিশনের মেম্বার ছিলেন, আর মুজাফ্ফর আহমদ সাহেব, যিনি পরবর্তীকালে বস্ত্র-মন্ত্রী হয়েছিলেন তাঁদের লেখা বই। তাঁরা এখানে বলেছেন, কী করে জাতীয়করণ নীতি ব্যর্থ হল—এর কিছু কারণ এখানে দিয়েছেন। তার মধ্যে তারা বলছেন:

> "Areas of responsibility have to be defined through the Rules of Business. Seventeen months have elapsed since the nationalisation and no Rules of Business have yet been adopted for this vital sector."

www.pathagar.com

অর্থাৎ এই যে জাতীয়করণের ফলে যেসব কল-কারখানা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে গেল, সেই কল কারখানাগুলি ব্যবস্থাপনার কোন Rules of Business সরকার সতের মাস পর্যন্ত তৈরি করতে পারেন নি। এবং তার পরবর্তীকালে আমার নিজের জ্ঞান অনুযায়ী আমি বলছি যে, কোন সময় সেটা করা সম্ভবপর হয় নি, যতদিন পর্যন্ত সেই সরকার ক্ষমতায় ছিলেন।

কিন্তু তাঁরাও চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের socialist economy-র মধ্যেই কিছু কিছু private enterpriseকে সাহায্য করার জন্য, উৎসাহ দেওয়ার জন্য। প্রথমে তাঁরা ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের সিলিং রেখেছিলেন, তারপর সেটা ৩ কোটি টাকা করা হয়েছিল, তারপর ১৯৭৪ সালে শেষের দিকে এসে এবং '৭৫ সালে এটা ১০ কোটিতে উন্নীত করা হয়। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় নি। তার কারণ ততদিনে সেই সরকার একদলীয় একনায়কত্ব কায়েম করলেন এবং socialist transformationকে সফল করার জন্য তাঁরা সমস্ত সংবিধানকে পরিবর্তন করে একটি নতুন ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করলেন একদলীয় সরকারের মাধ্যমে।

মাননীয় স্পীকার, এইগুলি ছিল আমাদের দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের কতকগুলি মূল্যবান বছর, যে বছরগুলিতে আমরা অনেক উন্নতি লাভ করতে পারতাম। আজকে যে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের কথা আমরা বলছি, আজকে বিরোধীদলের নেতা যেসব কথা উল্লেখ করেছেন–অনেক সারগর্ভ বক্তৃতা করেছেন তিনি। অনেক তাত্ত্বিক কথাবার্তা বলেছেন তিনি–কিন্তু এগুলির সময় ছিল যখন তখন আমরা সেই সময়টার সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারি নি। আজকে আমাদেরকে নতুন করে, অনেক কষ্ট করে, অনেক অসুবিধা, অনেক বাধাবিপত্তি, অনেক প্রশাসনিক এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করে এবং জটিলতার সম্মুখীন হয়ে আমাদেরকে একটি নতুন চিন্তা চেতনা, নতুন দর্শনের পথ দেখাতে হয়েছে এই জাতিকে।

মাননীয় স্পীকার, আজকে সেজন্য এই বাজেটের সাথে অন্য বাজেটের অনেক পার্থক্য রয়েছে। এই বাজেট এক বছরের খতিয়ান নয়। এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার রাজনৈতিক ইচ্ছা এই বাজেটের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এবং সেই জন্যই এই বাজেটের বৈশিষ্ট্য অতীতের সকল বাজেটের চাইতে অনেকটা ভিন্ন ধরনের।

ব্যক্তি উদ্যোগ, ব্যক্তি প্রতিভা, ব্যক্তি মেধার স্বীকৃতি এবং বিকাশ ঘটাতে চাই আমরা। আমরা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই, এমন এক ধরনের সমাজ তৈরি করতে চাই, যে পরিবেশে এবং যে সমাজে প্রতিটি নাগরিক তার ভেতরে যে শক্তি আছে, যে উদ্যোগ আছে সেটাকে যাতে ব্যবহার করে সমাজে অবদান রাখতে পারে। আমরা political কোন deception-এ জনগণকে নিতে চাই না। আমরা double standard follow করতে চাই না। Public morality of private life and private morality of public life—এই double standard-এ আমরা আমাদের অর্থনীতিকে পরিচালনা করতে চাই না। এটা একটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, সাহসী, বাস্তবধর্মী নীতি, যে নীতি আমাদের রাষ্ট্রপতি এই দেশকে উপহার দিয়েছেন। অনেক সংস্কার তিনি করেছেন। অনেক কাজ করেছেন যেগুলি জনপ্রিয় নয়। প্রয়োজন হলে এই সরকার আরও অনেক সংস্কার করবেন। এই সংস্কারগুলির মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নতি আসবে। যে স্বপ্ন নিয়ে এই দেশের মানুষ সংগ্রাম করেছিল সেই স্বপ্নকে সফল করার জন্য এই সংস্কারগুলি আনা হবে। আমরা এমন একটি সমাজ চাই যেখানে প্রতিযোগিতা থাকবে, যেখানে দক্ষতার মূল্যায়ন থাকবে, যেখানে ব্যক্তি সম্মান এবং ব্যক্তি মর্যাদা থাকবে এবং জবাবদিহি থাকবে, accountability থাকবে।

মাননীয় স্পীকার, আজকে সরকারী খাতে এখনও আমাদের দেশের ৪৫% ভাগ Industrial Assets রয়েছে। আগে ৯০% ভাগ ছিল, আমরা তার থেকে কমিয়ে ৪৫ শতাংশে এনেছি। বাংলাদেশ বোধ হয় তৃতীয় বিশ্বের একমাত্র দেশ যে দেশের পক্ষে এই ধরনের একটি নীতি এবং দর্শন এত অল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়েছে।

আজকে এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারী খাতে আমরা এ পর্যন্ত পাঁচ হাজার কোটি টাকার ঊর্ধ্বে বিনিয়োগ করেছি। কিন্তু আমরা return পেয়েছি শতকরা ১.৫৩ ভাগ।

যদি সরকারী খাত বলতে এই বুঝায় যে, আমাদের বছরের পর বছর লোকসান দিতে হবে, যদি এই বুঝায় যে, যে কারখানায় পাঁচশত শ্রমিকের প্রয়োজন সেখানে আমাদেরকে একহাজার শ্রমিক রাখতে হবে, তাহলে সেই সরকারী খাত আমরা চাই না।

www.pathagar.com

এই সরকারী খাতে যে অনিয়ম, যে অর্থনৈতিক নৈরাজ্য ছিল গত পাঁচ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেগুলির মধ্যে আমরা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছি। আজকে যদি সরকারী খাত বলতে এই বুঝায় যে, বছরের পর বছর লোকসান দিতে হবে তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। মোহাম্মদ শাহজাহান সাহেব বলেছেন Industrial management-এর কথা। তাঁকে আমরা বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী, যেটার বর্তমান মূল্য ৪০০ কোটি টাকা, সেখানে তাঁকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর করতে রাজি আছি। তিনি যদি আমাকে এই assurance দেন যে, ৭ কোটি টাকা, যেটা এ বছর লোকসান হয়েছে, সেই লোকসান তিনি কমাতে পারবেন, তাহলে তাঁকে ১০% কমিশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

[হর্ষধ্বনি]

তিনি পারবেন না। কারণ যেখানে দেড় হাজার শ্রমিকের প্রয়োজন সেখানে আছে তিন হাজার শ্রমিক। আমরা এরূপ সরকারী খাত চাই না, মাননীয় স্পীকার। চিটাগাং ড্রাই-ডক, খুলনায় শিপ-ইয়ার্ড, টঙ্গির ব্লেড ফ্যাক্টরী, এই ডিজেল প্লান্ট শত শত কোটি টাকায়, গরিব মানুষের টাকায় তৈরি এই কারখানাগুলি। প্রত্যেকটি কারখানা আজকে লোকসানে চলছে। এই লোকসান আগে অনেক বেশি ছিল এটা ঠিক কথা। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এই লোকসানের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল, এখন অনেক কমানো হয়েছে, অনেক discipline আনা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও আজকে এই ডিজেল প্লান্ট বছরে আড়াই কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। কার জন্য দেয়, কারা এটা চালায়? এ জন্য এই ধরনের শিল্প থেকে আমরা সরকারের যে নিয়ন্ত্রণ আছে সেটা প্রত্যাহার করে নিতে চাই।

অর্থাৎ অনিয়ম ও লোকসান সরকারী খাত থেকে কমাতে হবে। এজন্য এই সরকার এই প্রথমবারের মত সরকারী খাতকে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আমরা প্রতিটি কল-কারখানাকে স্বাধীনতা দিয়েছি, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি, তাদের কেনাবেচায় সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, থাকবে না, কোন হস্তক্ষেপ নেই। আমরা তাদেরকে নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছি সরকারের তরফ থেকে। সরকারের যে মৌলিক নীতিগুলি আছে সেগুলি পালন করে তাঁরা এই কল-কারখানা চালাবেন। আমরা তাঁদের জন্য Public Corporation Management Ordinance করেছি। এই অর্ডিন্যান্স করে আমরা তাঁদেরকে টার্গেট দিয়েছি, evaluation করব এবং জবাবদিহি তাদেরকে করতে হবে জনগণের কাছে। এই সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ করে, বিনিয়োগ করে return তাদেরকে যেমন করে হোক দিতে হবে। এই হল আমাদের সরকারের শিল্পোন্নয়নে অর্থনৈতিক দিক্-নির্দেশনা এবং নীতি।

মাননীয় স্পীকার, আজকে সরকারী খাতে আমাদের যেসব কল-কারখানা আছে, এসব কল-কারখানার পুঁজি আমরা পুনর্বিন্যাস করছি এবং পুনর্বিন্যাস করে আমরা এই কল-কারখানাগুলি পর্যায়ক্রমে শতকরা ৪৯ ভাগ জনগণের কাছে বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছি।

প্রত্যেকটা Public Industrial Corporationকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং তাঁরাই সরকারের ৫১% শেয়ারের মালিক হবেন এবং তাঁদের অধীনে যেসব কলকারখানা আছে সেগুলিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত করা হবে এবং সে কোম্পানীগুলির ৪৯% শেয়ারের মধ্যে ১৫% শেয়ার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

মাননীয় স্পীকার, এই প্রথমবারের মত এই উপমহাদেশে democratic economy যাকে বলে, আজকে এই প্রথমবারের মত একটি কারখানার শ্রমিকদের ন্যায্য এবং আইনগত অধিকার দেওয়া হচ্ছে ব্যবস্থাপনাতে। মালিকানার কথা ১৯৭৩-৭৪ সালের সরকার বলেছিলেন। বলেছিলেন জাতীয়করণ হবে, শ্রমিকরা কারখানার মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁরা তাদেরকে মালিক করতে পারেন নি। আজকে আমরা এমন এক ব্যবস্থা করেছি, প্রতিটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটে ৯ জন করে পরিচালক থাকবেন, ৯ জনের মধ্যে ৫ জন থাকবেন কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে, আর বাকি ৪ জনের মধ্যে ৩ জন থাকবেন নতুন শেয়ার হোল্ডারদের মধ্য থেকে, আর ১ জন থাকবেন শ্রমিকদের মধ্য থেকে। এই ৯ জন বসে এই কারখানার ভবিষ্যত নির্ধারণ করবেন। এ রকম ব্যবস্থা এদেশে এর আগে কোন সরকার করতে পারেন নি।

মাননীয় স্পীকার, আমরা এ জন্য অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, বিরোধীদলের প্রায় সকল সদস্যই আমাদের এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

www.pathagar.com

সেজন্য আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমি তাঁদেরকে জানাতে চাই যে, এই প্রচেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে এবং এই অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা সরকারী খাতকে প্রতিযোগিতামূলক করতে পারব, সরকারী খাতকে মুনাফাতে নিতে পারব, সরকারী খাতের কারখানাগুলিতে সরকার, বেসরকারী খাত এবং শ্রমিক কর্মচারীদের মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং অংশীদারিত্বের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারব। এই সব কারণে রাষ্ট্রপতি এরশাদের বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংস্কার হল শিল্পনীতি।

আমাদের দেশে যে কৃষি, সেই কৃষিতে আমরা অনেক বেশি উৎপাদন করতে পারি, কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ এই কৃষি খাতে কম। আমি উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই যে, দক্ষিণ কোরিয়াকে আজকাল আমরা বলি এশিয়ার সব চাইতে সফল দেশ। আয়তনে এই দেশ আমাদের চাইতে অনেক বেশি। কিন্তু মাথাপিছু কৃষিজমিতে এখনও আমরা তাদের তুলনায় দ্বিগুণ আছি ।

এই কোরিয়ার কথা আমরা যখন-তখন বলি। কিন্তু কোরিয়ার জনসংখ্যা আমাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ, আয়তনে তারা অনেক বড়, কিন্তু আমাদের তুলনায় তাদের কৃষিজমি অনেক কম। তাদের হল ১৭%, আমাদের হল ৩১%। কিন্তু তাদের ফসল উৎপাদন আমাদের চাইতে চারগুণ বেশি। প্রতি হেক্টরে যেখানে তারা ৩৩০ কিলো সার ব্যবহার করে সেখানে আমরা ব্যবহার করি মাত্র ৪০ থেকে ৫০ কিলো; অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের দেশের কৃষিতে অর্থ বিনিয়োগ করি, আমরা যদি উপকরণ দিই, আমরা যদি কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চাই, তাহলে অতি সহজে এটা হওয়া সম্ভবপর বলে আমি মনে করি।

কিন্তু এই কৃষিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত কম, ১ থেকে ২ শতাংশের বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। সুতরাং খাদ্যে যেমন একদিকে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছি, অন্যদিকে আমাদেরকে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং শিল্পায়নই হবে উন্নয়নের একমাত্র পথ, এটাই হবে সরকারের লক্ষ্য।

মাননীয় স্পীকার, পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন জাগরণ এসেছে, উন্নয়নের নতুন জাগরণ। ১০ বছর আগেও কেউ ভাবতে পারে নি যে, এসব এলাকায় এই দেশগুলি এত দ্রুত শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। প্রথম ঢেউ আসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপানে। জাপানী জিনিসপত্র আমরা পেলে, আমার মনে আছে, ছোটকালে আমরা ব্যবহার করতাম না নিম্নমানের কারণে। আজকে সেই জাপান আমেরিকার সাথে প্রতিযোগিতা করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা জয়লাভ করছে।

এশিয়ায় ৪টি এশিয়ান টাইগার আছে, তারা হল হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান এবং কোরিয়া। এদেশগুলির মধ্যে বিশেষ করে কোরিয়ায় আমাদের দেশের তুলানায় ১৯৬২ সালে ২০ ডলার কম ছিল তাদের মাথাপিছু আয়। আজকে তাদের মাথাপিছু আয় হল আড়াই হাজার ডলার।

এই চারটি দেশের প্রতিযোগিতার মুখে আমেরিকা আজকে restriction impose করেছে তাদের import-এর উপর এবং ১০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা তারা হারিয়েছে। কারণ আমেরিকার শিল্পপতিরা এদের শিল্পসামগ্রীর সংগে প্রতিযোগিতা করে পারছে না। আজকে তৃতীয় যে স্রোত এসেছে, ঢেউ এসেছে এই দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে তাতে আছে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ড।

তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে আমরা যদি এই দেশগুলির দিকে তাকাই, তাহলে দেখব, এই দেশগুলির প্রায় প্রতিটি দেশ আমাদেরই মত কৃষি নির্ভরশীল দেশ ছিল। কিন্তু আজকে তারা একটি নতুন নীতি অনুসরণ করে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। থাইল্যান্ডের উপরে সেদিন একটা কাগজ পড়ছিলাম যে, মাগুর মাছ এবং tin food তারা রপ্তানী করে। আমাদের চা, হিমায়িত মাছ, চামড়া থেকে যা আয় হয় তার থেকে বেশি তারা রপ্তানী করে মাগুর মাছ আর tin food থেকে। এটা কী করে সম্ভবপর হয়েছে, মাননীয় স্পীকার? কেউ কি গিয়ে তাদেরকে এটা করিয়ে দিয়েছে? না তারা নিজেরাই করেছে। নিজেদের উদ্যোগে তারা করেছে।

আজকে তাই কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের যে অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেটা অর্জন করার জন্য আমাদেরকে দ্রুত এগুতে হবে। আমাদের হাতে সময় অত্যন্ত কম। আমরা ১৭ বছরের অনেকগুলি বছর নষ্ট করেছি এবং এখনো আমরা বক্তৃতা, বিবৃতি, মিছিল, মিটিং দিয়ে আমাদের অর্থনীতির চাকাকে ঘুরাতে চাই। সেটা কখনই সম্ভবপর নয়। অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে হলে

www.pathagar.com

প্লানিংয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। সুপরিকল্পিতভাবে দেশের জনগণের মধ্যে যে শক্তি, যে উদ্যোগ, যে অনুপ্রেরণা আছে তাকে কাজে লাগানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, শিল্পায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে। এগুলির জন্য কী করতে হবে? আমি জানাতে চাই যে, এই সরকারের অন্যতম সাফল্য হল, কাঁচামালের শুল্ক বিন্যাস করা হয়েছে।

১৯৮৬ সালের আগ পর্যন্ত আমাদের দেশে finished products-এর উপরে শুল্ক কম ছিল, আর কাঁচামালের উপর ছিল বেশি। এটা সম্পূর্ণভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এখন কাঁচামালের উপর শুল্ক ১৯% এর নিচে আনতে হবে। Intermediate raw materials হলে ৩০% এবং ২০% হবে। আর যদি finished product হয় তাহলে ৫০% এবং ২০% অর্থাৎ ৭০% কর হবে শুল্ক এবং বিক্রয় কর। তাতে আমরা ৭২ কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। এবং এই টাকা আমরা রেয়াত দিয়েছি কাঁচামাল আমদানী করা যাতে সহজ হয়ে যায়, কম খরচে যাতে আমদানী করা যায়। তাহলে এইভাবেই আমাদের দেশের শিল্পকে গড়ে তুলতে পারি।

এখানে অনেক সদস্য বলেছেন যে, চলতি মূলধনের অভাবে অনেক শিল্প চলে না। তাঁদেরকে আমি বলতে চাই এই প্রথমবারের মত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যেই ব্যাংক যে শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করে সেই ব্যাংকের চলতি মূলধন দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে, যাতে করে সেই ব্যাংক যদি মূলধনের ব্যবস্থা না করে, তাহলে সেই ব্যাংক নিজের উদ্যোগে অন্যান্য ব্যাংকের সংগে consortium করে চলতি মূলধনের ব্যবস্থা করবে।

মাননীয় স্পীকার, ব্যাংকের ক্ষমতা আমরা বিকেন্দ্রীকরণ করেছি। দিনাজপুরের একজন ক্ষুদ্রশিল্প মালিককে যদি ১ লক্ষ টাকা ধার নিতে হয়, তাহালে তাকে ঢাকায় আসতে হত। আজকে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ধার দেওয়ার ব্যাপারে Local Regional Manager এবং Divisional Manager-এর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে করে এই বিকেন্দ্রীকরণের ফলে তাঁরা শিল্পে বিনিয়োগ করতে পারেন। শিল্প ব্যাংকে এখন যে নিয়ম আছে, শিল্প প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প মূল্যায়ন, ঋণদান, ঋণ বিতরণ, sanction করা, disburse করা, এই সমস্ত procedure change করা হয়েছে এ বছর ১ জুলাই থেকে। ৩ মাসের মধ্যে এ সমস্ত প্রকল্পকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং ব্যাংককে সিদ্ধান্ত দিতে হবে এবং যদি ঋণ না দিতে পারে, তাহলে সেটা in writing communicate করতে হবে। ছয় মাসের মধ্যে L. C. open করতে হবে এবং নয় মাসের মধ্যে সেই মালামাল বাংলাদেশে পৌঁছাতে হবে। এই নতুন নিয়ম করা হয়েছে ১ জুলাই, ১৯৮৮ সাল থেকে।

মাননীয় স্পীকার, গতকাল বলেছি এবং আজকের কাগজেও এসেছে, যে ইনশা আল্লাহ্ এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মত ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের বিকাশ এবং সম্প্রসারণে সহায়তা করার জন্য ক্ষুদ্র শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হবে। আমরা গত বছর পোশাক রপ্তানী করেছি ১২৯৬ কোটি টাকার। আমরা চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানী করেছি ৪২৮ কোটি টাকার। আমরা হিমায়িত মাছ রপ্তানী করেছি ৩৯১ কোটি টাকার। আমরা চা রপ্তানী করেছি ১২৬ কোটি টাকার। এটাই যথেষ্ট নয়, বাংলাদেশ ১১ কোটি মানুষের দেশ। আগামী দুই বছর এই রপ্তানী দ্বিগুণ করতে হবে এবং এই দ্বিগুণ করার জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচী এই সরকার নেবে। এটা দ্বিগুণ করা সম্ভবপর অতি সহজে এবং সেটার সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হবে।

মাননীয় স্পীকার, সংযোজন শিল্পের কথায় অনেকে ঠাট্টা করে বলেছেন যে, বড়লোকেরা V. C. R., V. C. P. ব্যবহার করে। আশা করি ওনারা কেউ ব্যবহার করেন না। V. C. R., V. C. P. আমরা বড়লোকের জন্য তৈরি করছি না। বাংলাদেশের তৈরি V. C. R., V. C. P. আমরা অস্ট্রেলিয়া এবং সিঙ্গাপুরে রপ্তানী করছি। এ বছর অনেক V. C. R., V. C. P. ভারতে চোরাচালান হয়ে গেছে। বায়তুল মোকাররমে যদি যান, তাহলে কোন বিদেশী V. C. R. আর দেখবেন না, দেশে সংযোজন করা V. C. R. দেখবেন। এটা আমাদের বিরাট সাফল্য।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের অনেকের মধ্যে inhibition আছে, lack of knowledge-এর জন্য। V. C. R., V. C. P. বলতে উনারা মনে করেন যে, এটা বোধহয় বড়লোকদের জন্য। কিন্তু

www.pathagar.com

তা নয়। কোরিয়া আজকে আড়াই হাজার ডলার মাথাপিছু আয় করছে। তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের দেশের তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগও নেই। বাইরে থেকে জিনিস এনে জোড়া লাগিয়ে তারা বিদেশে বিক্রি করছে। আমাদের ধোলাইখালের চুনু মিয়া এদেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ সৃষ্টি করবে। কারণ তার কাছে যা নিয়ে যাবেন তাই সে আপনাকে নকল করে দেবে। ছাত্রদের কাছ থেকে অনেকে পরীক্ষার নকলের দাবি জানিয়েছে। আমি আশা করি আমাদের বিরোধীদলের সদস্যরা তাদেরকে সমর্থন করেন না। পরীক্ষায় নকল না করে আমরা যদি এই যন্ত্রাংশ নকলে মনোনিবেশ করতাম, তাহলে দেশ অনেক এগিয়ে যেত। আজকে electronics বলতে আমরা সেটাই বুঝাই। আজকে migration of capital, migration of technology হচ্ছে।

আজকে কোরিয়া, থাইল্যান্ড এই সব দেশ high-tech-এ চলে যাচ্ছে। Primary electronic products যেগুলি, সেগুলি সংযোজন করার জন্য বাংলাদেশ একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে আজকে চিহ্নিত হয়েছে এবং এখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার বিপুল সুযোগ রয়েছে এবং রপ্তানীরও বিপুল সুযোগ রয়েছে। ৫ বছর আগে যাঁরা পোশাক শিল্পে ছিলেন তাঁরা বিশ্বাস করেননি পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ এত উন্নতি লাভ করবে। আজকে ৫ বছর পরে যুক্তরাষ্ট্রের মত পৃথিবীর সবচাইতে ধনী দেশ বাংলাদেশের মত পৃথিবীর সবচাইতে গরিব দেশের পোশাক নিচ্ছে। এই দেশের অশিক্ষিত মেয়েদের হাতে সেলাই করা শার্ট, জামাকাপড় আজকে আমেরিকার মানুষ ব্যবহার করছে। আমরা হলাম যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম বৃহত্তম পোশাক রপ্তানীকারক দেশ। এটা সম্ভবপর হচ্ছে, কারণ আমরা বেসরকারী খাতকে জোরদার করেছি। আজকে ৪ লক্ষ মহিলা এই পোশাক শিল্পে কাজ করে–একটা মাত্র শিল্পে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এটা সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী খাতের একটা অবদান।

মাননীয় স্পীকার, চামড়ার ক্ষেত্রে আমরা এখনো ৭০ ভাগ কাঁচা চামড়া রপ্তানী করে থাকি, যার মূল্য খুব কম। এই কাঁচা চামড়াকে যদি আমরা প্রক্রিয়াকরণ করি, তাহলে আজকে আমরা যেখানে ৪২৮ কোটি টাকার চামড়া রপ্তানী করি, সেখানে আমরা এই খাতে আরও অনেক বেশি টাকা আয় করতে পারব। সেই জন্য আগামী দুই বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১ জুলাই ১৯৯০ সাল থেকে কাঁচা চামড়া রপ্তানী বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ঘোষণা করেছি, কোন কাঁচা চামড়া বাংলাদেশ থেকে যাবে না।

মাননীয় স্পীকার, ভারতের মত দেশে এখন তারা পাকা চামড়া পর্যন্ত রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ Bharat has made a tremendous success in export of footwear, চামড়ার জুতা রপ্তানী করে। পাকিস্তান চামড়ার ব্যাগ ও জ্যাকেট তৈরি করে আজকে কোটি কোটি টাকা অর্জন করছে। আমরা তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আপনারা জানেন, গত বছরেই এটা ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই খাতে ৪২৮ কোটি টাকা বাড়িয়ে ১ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব হবে।

মাননীয় স্পীকার, এই বছরই electronic complex-এর ভিত্তিপ্রস্তর রাষ্ট্রপতি এরশাদ স্থাপন করবেন। আমরা electronic complex করব। আমরা বেসরকারী খাতকে আরও শক্তিশালী করব, তাদের মাধ্যমে এ দেশের অর্থনৈতিক চাকা আমরা ঘোরাব এবং এই চাকা আমাদের আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে ঘোরাতে হবে। তা না হলে আমরা, আপনারা, যারা এখানে বসে আছি এবং যাঁরা বাইরে আছেন, এদেশে যে নৈরাজ্য বাড়বে, এদেশের অর্থনীতিতে যে অভিশাপ আসবে, বেকারত্ব ও ভূমিহীনতা যেভাবে বাড়বে তাতে আমাদের পরবর্তী generation-এর জন্য এই সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভবপর হবে না, তারা আমাদের ধিক্কার দেবে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা বিদ্যুৎ নগরী করতে যাচ্ছি। আমরা কদমতলী এলাকায় বিদ্যুৎ নগরী করব। এবং এই বছরই নারায়ণগঞ্জের কাছে একটি হোসিয়ারী নগর স্থাপনের বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। আমরা হোসিয়ারী নগর হিসাবে একটা শিল্প এলাকা করতে যাচ্ছি। কারণ আমাদের দেশের তৈরি গেঞ্জি বাইরে খুব সমাদৃত। এটা রপ্তানীর বিরাট সুযোগ রয়েছে আমাদের জন্য। সেজন্য আমরা এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছি।

Electronic সম্পর্কে আপনাদের ভুল ধারণা করা ঠিক হবে না। আমি সেদিন একটা ছোট flat-এ গিয়েছিলাম। একজন যুবক ছেলে এবং তার স্ত্রী, তারা ৮৫০ বর্গ ফুটের একটি flat ভাড়া করেছেন। সেই flat-এর মধ্যে bed room-এ করেছেন অফিস ঘর, আর second bed room-এ করেছেন স্টোর। আর ছোট খাওয়ার ঘর এবং বসার ঘরে লম্বা করে টেবিল বিছিয়ে দিয়েছেন। চৌদ্দটি প্রায়

www.pathagar.com

অশিক্ষিতা মেয়ে, তারা সেখানে pocket radio assemble করছেন। এটা ছোট একটা pocket redio, দাম ১০০ টাকা। চৌদ্দজন মেয়ে এটা সংযোজন করছেন, আর একজন বসে বসে দেখছেন, ওটা চলে কিনা। তাঁরা প্রতিদিন বাজারে ১০০ পিস বিক্রি করে এবং বেতন ইত্যাদি দেওয়ার পরে তাঁর মোট খরচ হয় প্রতি রেডিওতে ৮০ টাকা। আর প্রতিটি রেডিওতে ২০ টাকা লাভ হয়। এতে তাঁর প্রতিদিন ২ হাজার টাকা লাভ হয়। এ ভদ্রলোক মাত্র দুলক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছেন। অথচ তিনি এতে নিয়োগ করেছেন সব মিলিয়ে মোট ১৭/১৮ জন লোক। তাঁকে আমরা ৮ লাখ টাকা ধার দিয়েছি। ওখানে তিনি আরও ১০০ লোকের কর্মসংস্থান করবেন। এটাকেই বলে ছোট আকারে electronic শিল্প।

আজকে বাংলাদেশে যে Computer সংযোজন করা হচ্ছে, আমি আপনাদের উদ্দেশে জানাতে চাই যে, এ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে সংযোজিত চারশ' Computer আমেরিকায় রপ্তানী করা হবে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা নিরাশার বাণী শুনেছি। অনেক নিরাশার বাণী আমরা শুনে থাকি। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রের পেছনে আমরা বছরে ১৭ হাজার টাকা খরচ করে থাকি। তাতে ধরেন চার বছরে প্রায় লাখখানেক টাকা খরচ করি। এই টাকা খরচ করার পরে তাঁদের জন্য আমরা স্কলারশীপের ব্যবস্থা করি। তাঁরা বিদেশে যান, পিএইচ.ডি. করে দেশে ফিরে আসেন, অর্থনীতিবিদ হন। তারপর তাঁরা এসে বলেন যে, দেশের অর্থনীতির কোন ভবিষ্যত নেই। এত পয়সা খরচ করছি নিরাশার বাণী শোনার জন্য নয়।

আমরা গত বছর আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ফোরাম করেছিলাম। ২৪৬ জন বিদেশী উদ্যোক্তা এই ফোরামে এটেন্ড করেছিলেন। আমরা তখন ঠিক করেছিলাম যে ৩০০ মিলিয়ন U.S. Dollar-ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আমাদের দরকার। মাননীয় স্পীকার, আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাকে জানাতে চাই যে, যদিও এই ৩০০ মিলিয়ন foreign exchange-এর মাত্র ৫% আমি আশা করেছিলাম, কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত ২৯টি যৌথ উদ্যোগকে অনুমোদন দিয়েছি এবং এর মাধ্যমে দেশে ২৬০ মিলিয়ন U.S. Dollar এর ফরেন ইনভেস্টমেন্ট হবে।

যাঁরা এদেশে একবার এসেছেন, এদেশের উপর তাঁদের আস্থা বেড়েছে। আমাদের রাজনীতিবিদরা, যাঁরা বাইরে গিয়ে আমাদের দুর্নাম করেন তাঁরা তাঁদেরই ভাবমূর্তি নষ্ট করেন। কিন্তু যাঁরা বাইরে থেকে বাংলাদেশে এসেছেন, গত কয়েক বছরে, বিশেষ করে গত দুবছরে, আমি যে জিনিসটি দেখেছি, তাঁরা কখনো নিরাশ হয়ে বাংলাদেশ থেকে চলে যাননি। সেদিন জাপানের মিনিকোলা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এসেছিলেন, এক শব্দও ইংরেজী জানেন না। তিনি ফিলিপিনসে গিয়েছিলেন, থাইল্যান্ডে গিয়েছেন এবং বাংলাদেশে এসেছেন। তিনি ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স করবেন। এখানে তৈরি করে বিদেশে রফতানী করবেন। তিনি দুটো দেশ দেখেই বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই, তিনি এখানে যে সাতদিন ছিলেন তার মধ্যেই চুক্তি করে জমি নিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে গিয়েছেন যে, ফিলিপিনস্ এবং থাইল্যান্ডে বিনিয়োগ করবেন না, বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবেন।

We must not lose faith in man, মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা ঠিক নয়। আপনারা হারিয়েছেন বলছি না, তবে আগে যাঁরা হারিয়েছিলেন তাঁদের কথাই বলছি। কিন্তু যে দেশের মধ্যে ১৯৭১ সালের শক্তি রয়েছে সেই দেশের মানুষের উপর বিশ্বাস হারালে আমরা এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা যেটা বলছি সেটা কখনোই অর্জন করতে পারব না।

মাননীয় স্পীকার, শ্রমিক ও শিল্প প্রসঙ্গে বলতে হয়, আমাদের দেশে যে আইন আছে, এই আইন সঠিক নয়, পরিবর্তনের প্রয়োজন। আমরা যদি শিল্পায়নকে, শিল্পনীতিকে বাস্তবায়িত করতে চাই তাহলে আমাদেরকে শ্রমনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে। এত বড় একটি মহান সংসদে এই মুহূর্তে এর চাইতে বেশি আর বলতে চাই না। কিন্তু আমাদেরকে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে আমাদের শ্রমিকদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। কারণ শ্রমিকদের মধ্যে যদি শৃঙ্খলা ফিরে না আসে এবং শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে যদি সুসম্পর্ক না থাকে, তাহলে আমাদের দেশে কোনদিনই, আমরা যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলছি, সেটা অর্জন করতে পারব না।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, সামরিক বাহিনীর কথা এখানে বলা হয়েছে, যা আমাদের একটি দেশপ্রেমিক সামাজিক শক্তি। আমরা একটি সুসজ্জিত, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী চাই এবং বিরোধীদলের সকলেই বলেছেন যে, সামরিক বাহিনী এই বাজেটে অসন্তুষ্ট নয়। তাঁরা কেউ এর সমালোচনা করেন নি।

মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দেশ। এদেশে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অনেক জনসম্পদ আছে। আমাদের কয়লা আছে, গ্যাস আছে, তেল আছে। আমরা আসলে গরিব নই। আমরা গরিব কারণ আমাদের সম্পদ ব্যবহার করতে জানি না বলেই আমরা গরিব। আমাদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্বের অভাব আছে বলেই আমরা গরিব। এই নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনার বিকাশ সাধন করা over night সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে আমরা পিছনে হেলান দিয়ে বসে থাকব সেটাও সঠিক হবে না।

মাননীয় স্পীকার, একবার আ. স. ম. রব সাহেব বললেন যে, অনেক বৈদেশিক ঋণ আসুক এটা উনি চান। কোন্‌টা উনি সঠিক বলেছেন আমার পক্ষে বোঝা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমি জানাতে চাই যে, বৈদেশিক মুদ্রা প্রচুর আমাদের জন্য আছে, সাহায্য আছে কিন্তু আমরা মাত্র ১৭% থেকে ১৯% ব্যবহার করতে পারি। আমরা ব্যবহার করতে পারি না, তার কারণ আমাদের নিজস্ব রাজস্ব আয় কম। আমাদের অর্থনৈতিক শক্তি সবটা নেই।

অর্থাৎ আমরা যদি আজকে ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত raise করতে পারি, তাহলে বিদেশের ৪০০ কোটি টাকা পাইপলাইনে অপেক্ষা করছে ব্যবহার করার জন্য। আজকে আমাদের ক্ষমতা নেই সেই বিদেশী ঋণ, বিদেশী সাহায্য ব্যবহার করার। আজকে যদি আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে সেই সামর্থ্য থাকত, তাহলে আমরা ৫০০ কোটি টাকার বদলে আরও ২,০০০ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্য আমাদের দেশে ব্যবহার করতে পারতাম।

বিদেশী সাহায্যকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। তার কারণ, এই group '77। আমার বন্ধুবর কাজী জাফর আহমদ এক সময় এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং এখনও আছেন। এক new economic order অর্জন করার জন্য আজকে উন্নত দেশগুলিকে বাধ্য করতে হবে অনুন্নত দেশের অর্থনীতিকে সাহায্য করার জন্য। এটা আমাদের অধিকার, এটা আমাদের right over the resources of the globe। আজকে টরেন্টোতে ৭টি শিল্পোন্নত দেশের যে শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেল সেখানে কী হয়েছে? আমাদের জন্য খবর আছে। কারণ, তারা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বাড়াতে হবে। মানে, অনুন্নত দেশকে আরও সাহায্য করতে হবে। দুই নম্বর হল, ঋণ মওকুফ করতে হবে, ঋণকে অনুদান করতে হবে। আমি এখানে জানাতে চাই, তার ফলে, মাত্র জাপান, একটি মাত্র দেশ ২.১৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণ আমাদের কাছে পাবে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত। আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই যে এই ২.১৭ বিলিয়ন ডলার এটা দাঁড়াবে আমাদের দেশে প্রায় ৬.৫ হাজার কোটি টাকা, এটাকে তাঁরা অনুদান হিসাবে grant করে দিয়েছেন এই টরেন্টো কনফারেন্সে।

এর ফলে কী হল? আমাদের যে debt servicing ছিল প্রায় ২৫% অর্থাৎ রপ্তানী করে যে টাকা আয় করি তার ২৫% এর মত debt servicing ছিল, এটা আপনারা অনেকেই সমালোচনা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য অনুন্নত দেশের তুলনায়, সাউথ আমেরিকার কথা বাদই দিলাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস্, মালয়েশিয়া এসব দেশের তুলনায় আমাদের debt servicing ratio অনেক কম। আজকে টরেন্টো শীর্ষ বৈঠকের ফলে জাপানের, একটিমাত্র দেশের ঋণকে অনুদান করে দেওয়ার ফলে আমাদের debt servicing liability ২০% কমে যাবে। অর্থাৎ ২৫% এর জায়গায় ২০% এসে দাঁড়াবে আগামী বছর থেকে। সুতরাং যত বেশি সম্ভব আমাদের বিদেশী টেকনোলজী, বিদেশী সাহায্য ব্যবহার করতে হবে। এবং এটার জন্য প্রয়োজনে নিজস্ব টাকা, নিজস্ব সম্পদ আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আজকে সারা পৃথিবীতে নতুন আলোড়ন এসেছে। ব্যক্তি উদ্যোগের উপর চতুর্দিকে আজকে আলোড়ন এসেছে। মিখাইল গর্বাচভ সোভিয়েত ইউনিয়নে বক্তব্য দিয়েছেন, একটা কোটেশন আমি পড়ে শোনাই।

www.pathagar.com

"The Soviet people wanted clear perspective, full-fledged and unconditional democracy. Respect in all things big and small, respect for hard work and broader society. We need no social utopia."

অর্থাৎ, মাননীয় স্পীকার, main theory অনুযায়ী state will wither away, state থাকবে না বলা হয়েছিল, অথচ communist country-তে, আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি যে, দিন দিন state আরও বেশি শক্তিশালী হয়েছে। সেইসব দেশেও আজকে দেখতে পাই গর্বাচভের দৃষ্টিতে কী করে তারা তাদের নিজেদের অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাচ্ছে। আজকে আমাদের জন্যও প্রয়োজন হল সাহস, সাহসের প্রয়োজন। দেশের সার্বিক স্বার্থ, দেশের জনসাধারণের স্বার্থের জন্য, প্রজন্মদের জন্য যে কাজ ভাল মনে করা হবে, সেই কাজ করা হবে এবং সেই সংস্কার এই সরকার আনবে–জনপ্রিয়তার জন্য এই সরকার অপেক্ষা করে থাকবে না।

মাননীয় স্পীকার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করব এখন। a good government comes out of good politics। এই সরকারের রাজনৈতিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য। economy-কে manage করতে পেরেছি বলেই আজকে রাজনীতিতে আমরা জয়ী হয়েছি। কী করে একটা good governmentকে যাচাই করা যায়? একটা good government যাচাই করতে হবে একটা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে। আমরা ১৯৭৪ সালে সঙ্কট দেখেছি। সেই সঙ্কট তখনকার সরকার মোকাবেলা করতে পারেন নি। So it was not a competent government.

তারচেয়ে অনেক বেশি সঙ্কট, সত্তর বছরে যে বন্যা হয় নি, এতবড় বন্যা হয়েছে গত বছর। এই বন্যায় ৩৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ঘাটতি হবে বলে আমরা ভেবেছিলাম। সেই বন্যার্তের পুনর্বাসন কর্মসূচীকে competently, দক্ষতার সঙ্গে মোকাবেলা করা হয়েছে। এটাই হল testimony of a competent government, good government.

কেন আমরা আমাদেরকে বলি একটা competent government, একটা দক্ষ government, কারণ আমাদের খাদ্য মওজুদ এখন ১৪ লক্ষ টনের উপর আছে। এইজন্য এটা competent government। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা one billion dollar আছে, one billion dollar. এইজন্য আমরা competent government। আমাদের বাংলাদেশী যাঁরা বাইরে কাজ করেন, তাঁরা ৭০০ মিলিয়ন ডলার এবার পাঠিয়েছেন। গভর্নমেন্টের উপর কনফিডেন্স না থাকলে এই বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ কি বাড়ত? একটা competent government দেশে আছে।

মাননীয় স্পীকার, সরকার চার হাজার অপ্রয়োজনীয় ঔষধকে নিষিদ্ধ করেছে। পেরেছে কোন সরকার? Multinational সব কোম্পানি লবি করেছিল এই সরকারের বিরুদ্ধে। Popularity, আমি আগেই বলেছি, যে কোন সংস্কারই কোন না কোন শ্রেণীর মানুষকে affect করে এবং জনপ্রিয় হয় না। আজকে চার হাজার অপ্রয়োজনীয় ঔষধকে নিষিদ্ধ করেছে এই সরকার। Because, it is a competent government। সেইজন্য পেরেছে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা ভূমি সংস্কার করেছি। বর্গাদারদের অধিকার দিয়েছি। বর্গাদারদের আইনগত অধিকার এই সরকার দিয়েছে। That is why it is a good government. প্রশাসনকে আমরা বিকেন্দ্রীকরণ করেছি। চারশত কোটি টাকা কৃষিঋণ মওকুফ করে দিয়েছে এই সরকার। কোন সরকার কোনদিন এরকম করতে পারে নি। বিদ্যুৎ উৎপাদন, কয়েক বছর আগে আমি যখন বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছিলাম, লোডশেডিং-এর সমালোচনায় নিজের মাথা হেঁট হয়ে যেত। আজকে মাত্র চার বছরে ৬০০ মেগাওয়াট থেকে আড়াই গুণ ১৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে এই সরকার। তাই, এই সরকার একটি competent সরকার।

১৮০টি উপজেলায় পল্লী বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার পাকা রাস্তা ছিল সেখানে আজকে সাড়ে এগার হাজার কিলোমিটার পাকা রাস্তা করেছে এই সরকার। এই কয়েক বছরে।

ক্ষুদ্র শিল্পে এক কোটি টাকার বিনিয়োগ ছিল না। ১৯৮৫-৮৬ সালে ৬ কোটি টাকার বিনিয়োগ ছিল। আজকে ১৭২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগের জন্য রাখা হয়েছে। শিক্ষায় চারগুণ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে এই গত ৬ বছরে। These are testimonies of a competent government

www.pathagar.com

এবং সেই জন্যই এই government টিকে আছে এবং ভবিষ্যতেও এই কারণেই এই সরকার টিকে থাকবে। Political rhetories নয়, political jargons নয়, economic managementই হবে রাজনীতির সঠিক নিয়ামক শক্তি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাই রাজনীতির নিয়ামক শক্তি হবে বাংলাদেশের মাটিতে।

মাননীয় স্পীকার, আমি রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর দুই-একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। আমরা আগেই বলেছিলাম, বর্জনকারী বিরোধী দলগুলির রাজনীতি সঠিক ছিল না। কারণ তাঁদের মধ্যে রয়েছে, চরম আদর্শগত মতপার্থক্য, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, এবং একজন আরেকজনকে পছন্দ করেন না। আর্থ-সামাজিক বিকল্প কোন কর্মসূচী নেই তাঁদের। নেতিবাচক কর্মসূচী জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। তাঁদের দলের মধ্যে গণতন্ত্র নেই।

আমি এর চাইতে বেশি বলতে চাই না। এই কারণগুলির জন্যই আজকে বর্জনকারী বিরোধীদলগুলির অবস্থা পার্লামেন্টের ভিতরের বিরোধী দলের অবস্থার চাইতে অনেক খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আগে বলেছিলাম যে, বাইরের বিরোধীদলগুলি যেমন half-hearted এবং divided, সংসদের ভিতরের বিরোধীদলও half-hearted এবং divided।

আমরা চাই দেশে গণতন্ত্র সুদৃঢ় হোক, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক, গণতান্ত্রিক ধারা ও প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকুক, বিরোধীদলগুলি—বর্জনকারী বিরোধীদলগুলি তাঁদের নিজস্ব ভূমিকা পালন করুন। এই ব্যবস্থায় আমাদের আনন্দিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিরোধীদলের এই নেতিবাচক রাজনীতি কোন গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য সুখকর হতে পারে না।

আসুন, আজ আমরা বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে গণতন্ত্রকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য কাজ করি, মৌলিক জাতীয় ইস্যুগুলিতে আমরা সমঝোতায় উপনীত হই এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে একমাত্র জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করি। জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সমবেতভাবে আমরা কাজ করে যাই। তবে মতভেদ থাকবে। বিরোধিতা থাকবে। কিন্তু এরপরেও আসুন নেতিবাচক রাজনীতি পরিহার করে সাংবিধানিক রাজনীতিকে আমরা আরও শক্তিশালী করি।

মাননীয় স্পীকার, John F. Kennedy, the illustrious President of the United States, বলেছিলেন,

> "Try to improve on what you have." Let us try to improve on what we already have.

এই সংসদ, এই সংবিধান, এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, এই অর্থনৈতিক নীতিমালা, তার প্রক্রিয়া এবং তার বাস্তবায়নের জন্য let us all try to improve on what we already have.

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।

সমাপনী ভাষণ

১১ জুলাই, ১৯৮৮

সংসদের প্রতিটি অধিবেশনের সমাপ্তির দিনে প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হিসাবে একটি সমাপনী বক্তৃতা দেওয়া সংসদীয় ব্যবস্থার একটি রেওয়াজ। যদিও এটা অনেকটা আনুষ্ঠানিকতা কিন্তু সমাপনী ভাষণের বিষয়টি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য এই বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়েছে। এই দীর্ঘ অধিবেশন ২ মাস ১৭ দিন যাবত চলে এবং এর মোট কার্য ঘণ্টা ছিল ২৩০ ঘণ্টা। এই অধিবেশনে ৪৭টি বৈঠক বসেছে। এই ধরনের সমাপনী ভাষণে সাধারণত কোন বিতর্কিত বক্তব্য রাখা হয় না।

মাননীয় স্পীকার

শুনতে পারলাম যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী এই সংসদ prorogue করতে যাচ্ছেন।

আমি এই অধিবেশনের এই শেষ দিনে আপনাকে এবং স্পীকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীকে এবং members of panel of chairman-এর যাঁরা সময় সময় আমাদের এই সংসদের সভাপতিত্ব করেছেন তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

আপনি এই সংসদের অধিবেশন যে নিপুণতা এবং দক্ষতার সাথে এবং অনেক সময় আমাদের অনেক উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও ধৈর্যের সাথে পরিচালনা করেছেন সেজন্য আপনাকে এই সংসদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

একই সময়ে আমাদের প্রিয় স্পীকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, যদিও এই বারে উনাকে তুলনামূলকভাবে স্বাস্থ্যগত কারণে আমরা অল্প সময়ের জন্য পেয়েছি, তথাপি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে বলতে চাই যে, তিনি যখনই এই হাউসে এসেছেন, তাঁর মুখের হাসির মাধ্যমে তিনি এই সংসদে সব সময়ই প্রাণের সঞ্চার করেছেন। তাঁর বিজ্ঞতা, তাঁর গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতা এগুলি আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে চাই। আপনাদের দুজনের ভূমিকা আমাদের এই সংসদীয় ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

একই সাথে আমি আমার সহকর্মী সকল মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীকেও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। কোন সংসদই chief whip এবং whips ছাড়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। সেই জন্য আমি সরকার পক্ষের chief whip জনাব আবদুস ছাত্তার এবং আমাদের যে চারজন whip অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, এই ২ মাস ১৭ দিন যাবত, তাঁদের আমি এই সংসদের তরফ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের সংসদের অনেক সংসদ-সদস্য নতুন এসেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই–এটা রেকর্ডে রাখতে চাই যে–তাঁরা এই সংসদের কার্যক্রমে যেভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, তাতে মনে হয়েছে যে, তাঁরা যেন অনেকদিন যাবত এই সংসদের সদস্য হিসাবে কাজ করে আসছেন। আমি তাঁদেরকে মোবারকবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই তাঁদের এই ভূমিকার জন্য। এবং তার সাথে সাথে সকল সংসদ-সদস্য নতুন এবং পুরনো, তাঁরা সকলেই এই সংসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন সেজন্য আমি তাঁদেরকে আপনার মাধ্যমে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মাননীয় স্পীকার, আমি বিরোধীদলের নেতাকে আমার বিশেষ মোবারকবাদ জানাই। বিরোধীদলের নেতা হিসাবে জনাব আ. স. ম. আবদুর রব একটি প্রশংসনীয় ভূমিকা এই সংসদে রেখেছেন। তিনি এবং তাঁর উপনেতা, তাঁরা দু'জনেই বিরোধীদলের সংসদ-সদস্যদের কার্যক্রম যেভাবে পরিচালনা করেছেন, যা এই সংসদকে অর্থবহ করেছে, কার্যকর করেছে এবং তাঁদের এই অবদানও আমাদের এই সংসদীয় ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য অবদান হিসাবে স্বীকৃত হয়ে থাকবে।

এর সাথে সাথে আমি বিরোধীদলের আরও যাঁরা নেতৃবৃন্দ আছেন এখানে জনাব শাজাহান সিরাজ সাহেব আছেন, বজলুল হুদা সাহেব আছেন, মোহাম্মদ শাহ্জাহান সাহেব আছেন এবং Group Leader যাঁরা এখানে আছেন এবং স্বতন্ত্র সদস্য যাঁরা এখানে আছেন, মুক্তিযোদ্ধা যাঁরা সংসদ-সদস্য আছেন, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই তাঁদের বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য। এই সংসদে তাঁদের ভূমিকা অনবদ্য ছিল বলে আমি উল্লেখ করতে চাই। বিরোধীদলের চীফ হুইপ এবং আর যাঁরা হুইপের কাজ করেছেন তাঁদেরকে এই সুযোগে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

এই সংসদ পরিচালনা করা অসম্ভব হতো যদি এই সংসদ সচিবালয়ে যাঁরা কর্মচারী এবং কর্মকর্তা আছেন তাঁরা সুন্দরভাবে কাজ না করতেন, দক্ষতার সঙ্গে কাজ না করতেন। এই সংসদকে কার্যকর এবং অর্থবহ করার জন্য তাঁদের অবদানকে আজকে আমি প্রশংসার সাথে উল্লেখ করতে চাই। বিশেষ করে, আমাদের পার্লামেন্টের সচিব জনাব আইয়ুবুর রহমান, যুগ্ম-সচিব খন্দকার আবদুল হক মিয়া, উপ-সচিব জনাব মোঃ বদিউজ্জামান এবং সহকারী সচিব আবদুস সামাদ, তাঁরা সকলে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এই সংসদ চলাকালীন অবস্থায় তাঁরা সকালে বিকালে রাত্রে এখানে থেকে এই সংসদ পরিচালনায় সাহায্য করেছেন। তাঁদেরকে আমি এই সংসদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাছাড়া এখানে শর্টহ্যাণ্ডে আমাদের প্রসিডিংস যাঁরা লিখেছেন এবং পার্লামেন্ট সেক্রেটারিয়েটের বিভিন্ন কর্মকর্তা, কর্মচারী যাঁরা অন্তরালে থেকে কাজ করেছেন, যাঁরা অভ্যন্তরে কাজ করেছেন, যদিও আমরা সব সময় দেখিনি, যাঁরা নোটিশ সেকশনে কাজ করেছেন, যাঁরা প্রশ্নোত্তর সেকশনে কাজ করেছেন, বিভিন্ন সেকশনে যাঁরা কাজ করেছেন এবং এখানকার প্রত্যেক কর্মকর্তা, কর্মচারী সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, এই সংসদ ভবন দেখাশোনা করেন PWD-এর কর্মচারী এবং কর্মকর্তাগণ। আমি সেই সব ইঞ্জিনিয়ারদেরকে, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সংসদ চলাকালীন অবস্থায় সুষ্ঠুভাবে সব সময় আমরা সব কিছুই পেয়েছি এবং এই সংসদ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁদের একটা বিরাট অবদান ছিল, তাঁদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। যাঁরা মাইক্রোফোনের চার্জে ছিলেন, যাঁরা লাইটিং-এর চার্জে ছিলেন তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মাননীয় স্পীকার, অন্যান্য কিছু কিছু মন্ত্রণালয়ের অফিসার এবং স্টাফরাও এই সংসদের কার্য পরিচালনায় অবদান রেখেছেন। তাঁদেরকে আজকে আমি কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, সংবাদপত্র এবং সংবাদ মিডিয়ার সম্মানিত সদস্যদের আপনার মাধ্যমে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাদের সহযোগিতা ছাড়া এবং তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া এই সংসদের অর্থবহতা এবং কার্যকারিতা দেশের মানুষের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভবপর হত না। আমি তাই প্রেস মিডিয়া, সাংবাদিক বন্ধুদের, নিউজ এজেন্সিদের এবং রেডিও, টেলিভিশনের সকলকে এই সংসদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই।

মাননীয় স্পীকার, এই সংসদে অনেক সময় উত্তেজনা হয়েছে, অনেক সময় আমরা নানারকম humour করেছি। একজন আর একজনকে সমালোচনা করেছি। কিন্তু এর পরেও এই সংসদে আমরা রীতিমত কার্য পরিচালনা করেছি। সেই জন্য বিশেষ করে আমি বিরোধীদলের নেতা, উপনেতা এবং সকল সংসদ-সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁরা মাঝে মাঝে ওয়াক-আউট করেছেন, সংসদের তাই-ই নিয়ম। বিরোধীদলের এটা একটা অধিকার, তাঁরা সেই অধিকার প্রয়োগ করেছেন এবং সংগত কারণেই করেছেন। সেই জন্য আমরা মনে করি যে, তাঁরা তাঁদের গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করেছেন। তাতে এই সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় নি, বরং এর মর্যাদা এবং অর্থবহতা আরও বেড়েছে। মাননীয় স্পীকার, আমি আমার পরবর্তী বিষয়ে যাওয়ার আগে এখানে কিছু কথা উল্লেখ করতে চাই যেটা গতকাল সময়ের অভাবে আমার পক্ষে উল্লেখ করা সম্ভবপর হয় নি।

বাজেট আমরা পাস করেছি। সুতরাং এটাই কার্যকর হয়ে থাকবে। এই বাজেট অধিবেশনে বিরোধীদল থেকে অনেকগুলি প্রশ্ন এবং অনেকগুলি দাবি উথাপন করা হয়েছিল। তাঁরা সরকারের প্রতি আরজি করেছিলেন বা দাবি তুলেছিলেন যে, কিছু কিছু বিষয় সরকারের পুনর্বিবেচনা করা উচিত। যেমন তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন যে, নাট-বল্টু, সাইকেলের যন্ত্রাংশ, প্লাস্টিক শিল্প, আলকাতরা, চা, চিনি ইত্যাদির বিষয়ে।

এটা নিয়ম, বিরোধীদলের এটাই ভূমিকা। আরও অনেকগুলি বিষয়ে ওনারা বলেছেন, তেল, সয়াবিন ইত্যাদি। এই বিষয়ে আমি শুধু বলতে চাই, এই মুহূর্তে আমার পক্ষে এই বিষয়ে কোন বক্তব্য রাখা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে চাই যে, শুল্ক, করের যে কাঠামো, আমাদের একটি বিঘোষিত নীতি আছে, এই নীতির মধ্যে যদি কোন শিল্পের কাঁচামাল তুলনামূলকভাবে finished product-এর চেয়ে বেশি হয়ে থাকে এবং সরকারের যে শুল্ক কর কাঠামো নতুন করে আমরা তৈরি করেছি, সেটার সঙ্গে যদি সামঞ্জস্য না থেকে থাকে, তাহলে, সেটা সরকার অবশ্যই সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবেন। তাঁদের দাবির আলোকে আমরা বিবেচনা করে দেখব যে কিছু করা যায় কিনা। এ বিষয়ে আমাদের সরকারী দলের পক্ষ থেকেও অনেক মাননীয় সংসদ সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন, আমরা এ বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখছি।

মাননীয় স্পীকার, আজকে আমাদের জন্য একটি অত্যন্ত আনন্দের দিন। আমি কিছু সমীক্ষা উল্লেখ করতে চাই। বাংলাদেশের ইতিহাসে এবং পাকিস্তানের আমল থেকে দীর্ঘতম সময়ের জন্য এই অধিবেশন বসেছিল। এই জন্য এই অধিবেশনের গুরুত্ব আমাদের সংসদীয় ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে থাকবে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা ২৫ এপ্রিল, ১৯৮৮ সালে এই অধিবেশন শুরু করেছিলাম, আজকে ১১ জুলাই, ১৯৮৮ সাল–দুই মাস সতের দিন এই অধিবেশন চলেছে। মোট ৪৭টি বৈঠকে আমরা বসেছি। অধিবেশনের মোট কার্যঘণ্টা প্রায় ২৩০ ঘণ্টা ছিল।

এই অধিবেশনে আমরা স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করেছি। রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং ভাষণের উপর আলোচনা করেছি এবং ধন্যবাদ প্রস্তাব পাস করেছি। সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী

www.pathagar.com

বিল আমরা আইন আকারে এই সংসদে পাস করেছি। ১৯৮৭-৮৮ সালের সম্পূরক বাজেট এবং ১৯৮৮-৮৯ সালের বাজেট আলোচনা করেছি, পাস করেছি। সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে সকল সংসদীয় কমিটি আমরা গঠন করেছি এবং এগুলির সংখ্যা হল ৪৪টি। এই ৪৪টি কমিটির মধ্যে, আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই যে, ৩৪টি কমিটি মোট ৪০টি বৈঠকে এরই মধ্যে মিলিত হয়েছেন। আমাদের জন্য এটি একটি বিরাট সাফল্যের বার্তা বহন করে। এছাড়াও আমি জানাতে চাই যে, কমিটিসমূহ গঠিত হওয়ার পর প্রায় প্রতিদিনই এক বা একাধিক কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যপ্রণালী বিধির বিধান মোতাবেক এই প্রক্রিয়া সংসদের অধিবেশন না থাকলেও অব্যাহত থাকবে। প্রতি ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিটি কমিটির বৈঠক বসাতে হবে। আমি আশা করব, এই কমিটিগুলি কার্যকরভাবে কাজ করে যাবেন যার ফলে এই সংসদের মর্যাদা বাড়বে। আমি শুনলাম যে, আজকে এই রকম একটি কমিটির বৈঠক হয়ে গেছে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা এই সংসদে অতীতের তুলনায় অনেক বেশি বিল পাস করেছি। এই সংসদে আমরা মোট ৩৮টি বিল আলোচনা করেছি এবং পাস করেছি। এর মধ্যে ৩/৪টা বিল ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেমন জেলা পরিষদ বিল, মাদকদ্রব্য বিরোধী বিল, নারী পাচার বিরোধী বিল এবং অষ্টম সংশোধনী বিল।

মাননীয় স্পীকার, এই সংসদে এই বিলগুলি পাস হওয়ার কারণে আমাদের জাতির গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এই সংসদ উল্লেখযোগ্যভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আপনি জানেন এই প্রত্যেকটি বিল অসীম গুরুত্ব বহন করে। জেলা পরিষদ বিলের মাধ্যমে আমরা এ দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছি। সংসদ-সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, উপজেলা চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য প্রতিনিধি নিয়ে এই জেলা পরিষদ আজ গঠিত হতে যাচ্ছে। এবং এতে দেশে গণতন্ত্র আরও সুদৃঢ় হবে, শক্তিশালী হবে। মাননীয় স্পীকার মাদকদ্রব্য বিরোধী ও নারী পাচার বিরোধী বিল; এই দুটি বিলও আমাদের আপামর জনসাধারণ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে একটি অনন্য ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

মাননীয় স্পীকার, এই সংসদে মোট প্রশ্নের নোটিশ ছিল ৪২৮২ এবং গৃহীত প্রশ্নের সংখ্যা ১৯২৮টি। সংসদে উত্তর প্রদান করা হয়েছে ১৯২১টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের এবং লিখিত উত্তর ছিল মোট ২১৪৭টি। আলোচিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের সংখ্যা ১৭টি এবং আমরা পাস করেছি ১টি। ৭১ বিধি অনুযায়ী নোটিশ ছিল ৩৬টি, শোক-প্রস্তাব ছিল ২৬টি। আমাদের সংসদ-সদস্যদের মধ্যে সরকারী দলের মোট ২৩৪ জন সদস্য বিভিন্ন পর্যায়ে বক্তব্য রেখেছেন। বিরোধীদলের সংখ্যা যদিও ৪৯ জন কিন্তু তাঁদের অনেকেই ২/৩ বার করে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছেন এবং ১১২ বার বক্তব্য রেখেছেন।

মাননীয় স্পীকার, এই জাতীয় সংসদ তার এই কার্যক্রমের মাধ্যমে আজকে জাতির কাছে প্রমাণ করেছে যে এটা একটা বলিষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিল এই সংসদের পরিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি সংসদীয় ঐতিহ্য বজায় রেখে সকল কিছু করার জন্য এবং কোন ব্যাপারেই আমরা তাড়াহুড়া করি নি। সকল বিল পর্যাপ্ত আলোচনার পর এই সংসদে গৃহীত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৪টি বিল ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে কথা আমি উল্লেখ করেছি।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতি এরশাদ একজন গণতন্ত্রমনা ব্যক্তি। আজকে আমরা অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এসেছি, বিশেষ করে সংসদ বাতিল করার পর ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত রাখার জন্য রাষ্ট্রপতি এরশাদ রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা পালন করেছেন। সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য আজ আমরা এখানে বসতে পেরেছি এবং দেশে গণতন্ত্র অব্যাহত রাখতে পেরেছি। এই সংসদের সকলের পক্ষ থেকে আজ তাই তাঁকে জানাই কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ।

মাননীয় স্পীকার, এই দীর্ঘতম অধিবেশনের কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে এই সংসদ আজ জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই সংসদ সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল ধারক-বাহক হিসাবে কাজ করে যাবে। আমার বিশ্বাস এই সংসদের কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে দেশে সাংবিধানিক রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুদৃঢ় হবে এবং দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আরও শক্তিশালী হবে।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, ইদানীং বিভিন্ন কাগজে মাঝে মাঝে এই সংসদের আয়ু সম্পর্কে কথাবার্তা বলা হয়। আমি আজকে স্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এই সংসদ নির্বাচিত হয়েছে। সংবিধানের অধীনে যতদিনের জন্য এই সংসদ নির্বাচিত হয়েছে ততদিনের জন্য এই সাংবিধানিক সংসদ থাকবে। এবং এই সংসদের মাধ্যমেই এই দেশের গণতন্ত্র আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হবে।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, সকল সংসদ-সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার

www.pathagar.com

বন্যাউত্তর বিশেষ অধিবেশন

১৯ অক্টোবর ১৯৮৮

দেশের কোন ভয়াবহ দুর্যোগ বা সঙ্কটের সময় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করার রেওয়াজ অন্যান্য দেশে থাকলেও বাংলাদেশে এই প্রথমবার, ১৯৮৮ সালে দেশের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। এই অধিবেশনে বন্যার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, বন্যা পুনর্বাসন, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার, বন্যার কারণসমূহ, আন্তর্জাতিক নদী আইনের নিয়মনীতি, ভাটির দেশের অধিকার, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে বন্যা সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানের বিষয়টি আলোচিত হয়।

মাননীয় স্পীকার

আমার বক্তব্য শুরু করার আগে আমি স্মরণ করি তাঁদেরকে যাঁরা এই মহাপ্লাবনে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যাঁরা ত্রাণ কাজে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়ে অমূল্য প্রাণ হারিয়েছেন। আমি তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

আমি ধন্যবাদ জানাই রাষ্ট্রপতি এরশাদকে। জাতির একটি ভয়াবহ বন্যার প্রেক্ষাপটে—যেটাকে এখন আমরা সব চাইতে বড় জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছি—এই রকম একটি প্রশ্নে জাতীয় সংসদের এই অধিবেশন আহ্বান করে তিনি একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমরা আশা করব, আমাদের ভবিষ্যতের পার্লামেন্টেরিয়ানরা, গণতন্ত্রকামী নেতৃবৃন্দ এই ধরনের সমস্যা যখনই আমাদের জাতীয় জীবনে আসবে, তখন জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করে জাতিকে তাঁরা আস্থায় আনবেন এবং গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করবেন।

মাননীয় স্পীকার, এই বন্যার সময়, এখানে অনেক সম্মানিত সংসদ-সদস্য বক্তব্যে বলেছেন, জাতি এক দৃঢ় ঐক্যে পৌঁছে গেছে। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় এদেশের মানুষ যে ঐক্যের পরিচয় দিয়েছিল এবারও বিপর্যয়ের সময় তেমনি এদেশের মানুষ একই রকমের ঐক্যের পরিচয় দিয়েছে। আজ জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডেকে রাষ্ট্রপতি সেই জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। আমি আশা করব যে, এই অধিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য আরও সুদৃঢ় হবে।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বন্যা সমস্যা সমাধান করার জন্য একটি কর্মসূচী উপস্থাপন করেছেন। এটাও আমাদের দেশে একটা নতুন দৃষ্টান্ত। বছরের পর বছর এদেশে বন্যা হয়েছে। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এই ৩৪ বছরে ৬ বছর বাদ দিলে, প্রায় সকল বছরেই বন্যা হয়েছে। ১৯৭১ সাল থেকে যদি আমরা ধরি, এই ১৭ বছরে ৪ বছর ছাড়া প্রতি বছরেই বন্যা হয়েছে, তবে এই বছরের বন্যায় আমাদের অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

কিন্তু এই বন্যা সমস্যার সমাধান করার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী কোন সরকারই দেন নি। বন্যা এসেছে, বন্যার জন্য কাজ করেছি, ত্রাণকার্য শেষ হয়ে গিয়েছে, তার পরে বন্যার কথা আমরা ভুলে গিয়েছি। কিন্তু আজকে প্রথমবারের মতো আমরা এই সমস্যাটাকে জাতীয়ভাবে address করছি। জাতীয়ভাবে আমরা এই প্রশ্নটার, এই সমস্যার সমাধান করার একটা প্রয়াস নিয়েছি। এই জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানাতে হয়।

মাননীয় স্পীকার, বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে রাষ্ট্রপতির ভাষণের মাধ্যমে। শুধু দিক্-নির্দেশনাই নয়, একটা পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী উপহার দিয়েছেন। গতবছর আমাদের প্রবৃদ্ধির হার ধার্য করেছি ৫.১ ভাগ, সেখানে আমরা অর্জন করেছি ২.৬ ভাগ।

www.pathagar.com

তার কারণ বন্যায় আমাদের বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু এবছর আমরা ভেবেছিলাম যে, গত বছরের বন্যার পানির পলি পড়ে আমাদের জমি উর্বর থাকবে। তাই এবছর আমরা আশা করেছিলাম যে, আমাদের দেশে আরও অনেক বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদিত হবে, আমাদের bumper crop হবে এবং আমরা একটা good harvest expect করেছিলাম।

আমাদের ১৫ লক্ষ টন খাদ্য মজুদ ছিল এই বন্যার আগ পর্যন্ত। ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত যখন দেশে বন্যার প্রকোপ ততোটা দেখা যায় নি, বরং একটা সাধারণ বছর হিসাবে আমরা দেখেছি, তখন আমাদের অনেকের মধ্যে একটা নতুন স্বপ্ন জেগেছিল যে, এবছর হবে আমাদের সবচাইতে ভাল বছর। শুধু কৃষিক্ষেত্রেই নয়, পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা একটা নতুন স্বপ্ন দেখেছিলাম, এবছর শিল্প খাতে একটা নতুন চাঙ্গাভাব আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে দেখব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আগস্ট মাসের শেষ পর্যায়ে এসে আমাদেরকে বন্যা গ্রাস করেছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সারা দেশকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, এর একটা বিপুল প্রতিক্রিয়া হবে আমাদের অর্থনীতির উপর। আমরা এ বছর ৬.১ ভাগ প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করেছিলাম। যদিও আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব আমাদের এই প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করতে, কিন্তু বন্যায় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই ক্ষয়ক্ষতি আমাদেরকে পুষিয়ে নিতে বেশ সময় লাগবে। আমি দু-একটা উদাহরণ আপনাকে দিতে চাই। এবছর ১,২২,০০০ বর্গ কিলোমিটারের বেশি এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ৫ কোটি মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২৭,৯৯,৫৭৯ ঘরবাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে এবং আরও ৯২ লক্ষ ঘরবাড়ি আংশিকভাবে ধ্বংস হয়েছে।

১৯৮৭ সালের তুলনায় এবছরের ক্ষয়ক্ষতি আরও অনেক বেশি ভয়াবহ। ২৯৩৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তা নষ্ট হয়েছে। গত বছর কাঁচা রাস্তা নষ্ট হয়েছে ৫১,০৭৯ কিলোমিটার, আর এবছর ভেসে গিয়েছে ৬৫,৮৯২ কিলোমিটার। ৫৩টি জেলা, ৩২৩টি উপজেলা এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর বর্ণনা রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে দিয়েছেন; এগুলির পুনরাবৃত্তি আমি করতে চাই না। শুধু এই কথা বলতে চাই যে এই ক্ষয়ক্ষতির প্রতিক্রিয়া আমাদের মতো দরিদ্র দেশে বারবার করে প্রতিবছর বহন করা সম্ভবপর নয়। আমাদের মত গরিব, দরিদ্র, বলতে গেলে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ, আমরা যখন উন্নয়নের স্বপ্ন দেখি, যখন পরিকল্পনা গ্রহণ করি তার সাথে সাথে এধরনের বন্যা যখন আসে, তখন আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে দেয়, বিনষ্ট করে দেয়। এর একটা প্রতিকার অবশ্যই প্রয়োজন এবং তার দিক্-নির্দেশনা আমরা আজকে পেয়েছি।

মাননীয় স্পীকার, এদেশে বন্যা বহুবার হয়েছে, এবং বহু সরকার এসেছে, গিয়েছে কিন্তু আগামী বছর যদি বন্যা হয় তাহলে আমরা কী করব?

এই বন্যার পানি, বিজ্ঞানীরা বলেন, ৯৩ ভাগ বাইরে থেকে এসেছে অর্থাৎ বাংলাদেশের সীমানার বাইরে থেকে এসেছে এবং ৭ ভাগ পানি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার ভিতর থেকে এসেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ দেশের ৯০ ভাগ পানি সীমান্তের বাইরে থেকে আসে। এই নদীগুলি যেহেতু আমাদের দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সেজন্য এইসব নদীর পানিতে আমাদের দেশ প্লাবিত হয়ে যায়। এ রকম ৫৪টি প্রধান নদী আছে এবং ছোটখাটো নদী মিলিয়ে ১৪০টি। কিন্তু প্রধান প্রধান নদীর সবগুলির উৎস আমাদের সীমান্তের বাইরে। সেজন্য এগুলিকে আমরা আন্তর্জাতিক নদী হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকি।

আমি আপনাকে জানাতে চাই যে, এবারের বন্যায় আমাদের স্বাভাবিক বছরের তুলনায় ১.৫ অর্থাৎ, আমাদের নদীগুলির যে capacity আছে, তার চেয়ে দেড়গুণ বেশি পানি এইসব নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ২৮ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আমাদের দেশের নদীগুলির এই পানি বহন করার ক্ষমতা নেই।

এই বন্যা বলতে আমরা পানিকেই বুঝি। পানিই হল বন্যা। যখন পানি বেশি আসে, তখন তাকে আমরা বন্যা বলি। আমাদের যেখানে capacity হল ১ লক্ষ ২০ হাজার ৫শ M3S, সেখানে এই সময়ে ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯শ M3S, কিউবিক মিটার per second. পানি আমাদের দেশে এসেছে। আমাদের দেশের বাইরে যে catchment area, সেটা হচ্ছে ৯২.৫%, আর বাকি ৭.৫% হচ্ছে আমাদের দেশে।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, আমাদের দেশে অল্প-বেশি প্রতি বছরই বন্যা হয়। কেউ বলেন, এক-পঞ্চমাংশ ভাগ জমি প্রতিবছর পানির নিচে যায়, আবার কেউ বলেন এক-তৃতীয়াংশ ভাগ জমি প্রতি বছর পানির নিচে যায় তাই আমাদের দেশের মানুষ বন্যার সাথে লড়াই করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

কিন্তু এবারের বন্যা আমাদের কী শিক্ষা দিয়েছে? এত বন্যা হয় কেন? একটি হচ্ছে, আমাদের উত্তরাঞ্চলে হিমালয়ের পাদদেশে বনাঞ্চল উজাড় করে দেওয়া হচ্ছে। বনাঞ্চল এবং গাছপালা ভুটানে প্রতি বছর ৯১% কাটা হয়। তারপর নেপালে ৮৮%, ভারতে ৯১%, চীনে ৯০%। এই সব এলাকায় প্রতি মিনিটে ৪০ থেকে ৫০ একর জমির গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। এবং এটাও বন্যার একটি অন্যতম কারণ, যার জন্য পানি সংরক্ষণ করতে পারছে না। হিমালয় যখন গলা শুরু করে, তখন পানিকে ধরে রাখার কোন উপায় নেই। এই পানি ক্রমান্বয়ে ভেসে আসতে থাকে। আর এই নদীর প্রবাহ কোন রাজনৈতিক সীমানা মানে না। We cannot choose our neighbours. অনেক কিছু choose করা যায়। যেমন নির্বাচনে দাঁড়ানো, না দাঁড়ানো choose করা যায়। কেউ যদি কাউকে জীবন সঙ্গিনী করতে চান, সেখানেও choose করা যায়, কিংবা refuse করা যায়। কিন্তু প্রতিবেশীকে refuse করা যায় না এবং chooseও করা যায় না।

It is there. আমাদের নদীগুলি তাই একটি ভৌগোলিক অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে এসেছে। এই প্রসংগে আমি আপনাকে বলতে চাই যে, এক সময় আমেরিক, ইণ্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং এন্টার্কটিকা, আমরা এক সংগে ছিলাম ১৩ কোটি বছর আগে। ৫ কোটি বছর আগে হিমালয় পর্বতের গঠন শুরু হয় এবং তারপরই আমরা বিচ্ছিন্ন হই। এবং ভারত উপমহাদেশ ধীরে ধীরে আলাদা দেশে, আলাদা অঞ্চলে পরিণত হয়। এবং ধীরে ধীরে বঙ্গোপসাগর যাকে আমরা বলি, সেটা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপে, Delta Region-এ পরিণত হয়। এবং এতে যে deltaic featureগুলি আছে তার ফলে বালি, মাটি, কাদা এসব চলে আসে। প্রায় ২.৪, ২.৫ বিলিয়ন tons of পলি মাটি নদীগুলি প্রতি বছরে carry করে। যার ফলে আমাদের দেশের উপর একদিকে যেমন একটা বিরাট আশীর্বাদ, অন্যদিকে জনগণের উপরে একটা বিরাট বিপর্যয় প্রতি বছর হুমকি হিসাবে দেখা দেয়।

এই অবস্থায় বন্যা এবং পানি একসংগে আমাদেরকে বিবেচনা করে দেখতে হবে। এই বন্যার পানি এসেছে আমাদের সীমান্তের বাইরে থেকে এবং নদীর মধ্য দিয়ে এসেছে। এই নদীর পানির ব্যাপারে আমরা একমাত্র গঙ্গার পানির হিস্যা বন্টন করেছি। কিন্তু অন্যান্য নদীগুলির কোন হিস্যা আমরা বন্টন করতে পারি নি। কিন্তু এই নদীর আইন, আন্তর্জাতিক আইন, যদিও এখনও কোন convention হিসাবে adopted হয় নি, কিন্তু customary law, rules এবং precedence-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নদী আইনের একটি কাঠামো, একটি frame-work এখন তৈরি হয়েছে।

অতীতে বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র, উজান দেশে যারা থাকত, গরিব হোক আর না হোক, ছোট দেশকে তাঁরা তোয়াক্কা করত না। তাঁরা উজানের পানি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করতে পারত এবং করার চেষ্টা করত। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এক সময় চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পর্যায়ক্রমে আইনের চিন্তাধারার মধ্যে সভ্যতার পরিবর্তন হয়েছে। কতগুলি মৌলিক নীতি এখন বিশ্বে স্বীকৃত হয়েছে এবং সেগুলিকে আন্তর্জাতিক নদী আইন বলে আখ্যায়িত করা হয়।

মাননীয় স্পীকার, ১৯৬৬ সালে হেলসিংকিতে rules adopted হয়। এটা এখন পুরনো হয়ে গেছে। যদিও অনেক পণ্ডিত এটার উপরে ভিত্তি করে equitable distribution of water-এর কথা বলেন। যারা ভাটির দেশের মানুষ তারা সেটা গ্রহণ করে না। শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীব্যাপী যত ভাটির দেশ আছে তারা এটা গ্রহণ করে না। ভাটির দেশের মানুষ যাদের শত শত বছর ধরে জীবিকা নির্ভর করে আসছে একটি নদীর পানির উপর, তাদের চাষ, তাদের কৃষি, তাদের জীবন, তাদের মরণ সব কিছুই নির্ভর করে একটি নদীর পানির উপর। সেই পানির গতিধারা ব্যাহত করার অধিকার উজান দেশকে দেওয়া হয় নি।

www.pathagar.com

নিয়ম হচ্ছে, সম্মতি নিতে হবে, আলোচনা করতে হবে। উজানের পানি divert করা অর্থাৎ এই পানির উপর কোন বাধা সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদের নেই। যদি তাই হয়, তাহলে আজকে ভাটির দেশের মানুষের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, এই পৃথিবীর সভ্যতার আলোকে, তাদের কোন স্থানই থাকে না। সেইজন্য এই Helsinki Rules পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে International Law Commission, United Nations-এর জন্য একটি নতুন convention draft তৈরি করেছে। এই ড্রাফটে ভাটির দেশের অধিকারকে সর্বাধিক এবং সবচেয়ে বেশি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আমাদের জীবনকে হুমকির সম্মুখে নিয়ে, আমাদের জমিকে চরে পরিণত করে, আমাদের উজানের পানি থেকে বঞ্চিত করার অধিকার এই কনভেনশনে দেওয়া হয়নি।

বাংলাদেশ একটি ভাটির দেশ। বাংলাদেশ এই আইন কখনও কাউকে ভঙ্গ করতে দিতে পারে না। আমাদেরকে ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা হলে আমরা তা প্রতিহত করব, আমরা তার প্রতিবাদ জানাব, আমরা এদেশের মানুষকে সংঘবদ্ধ করব যাতে আমাদের ন্যায্য হিস্যা যাতে পেতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, এটা কোন আবেগজনক বক্তৃতা নয়। It is founded and established on the international law। আজকে এই rules and principles অনুযায়ী, কতকগুলি নীতি, কতকগুলি দিক-নির্দেশনা যা এই draft convention-এ সন্নিবেশিত, তা আজকে প্র্যাকটিস্ করছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ। যেমন আছে, theory of absolute territorial sovereignty, theory of absolute territorial integrity এবং theory of common approach. Common approach তো আজকাল খুব important হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, আমরা গঙ্গার ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে বসে আলোচনা করে একটা agreement-এ আসার চেষ্টা করেছি। এ প্রচেষ্টা বা এই নীতিকে theory of common approach বলা হয়।

পঞ্চশীলা নীতি যেটা পর্যায়ক্রমে এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে, এটা principle of state sovereignty এবং principle of agreement and respect-এর উপর নির্ভরশীল। এটা সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের অধিকারকে সংরক্ষিত করে, এই পঞ্চশীলা নীতি। এই principle of common approach-এর অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আছে। কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমার সহকর্মীরা দিয়েছেন। Dannial convention-1948, Legal agreement-1929 এবং 49, Recon convention-1950 এবং 55, Indus Treaty-1963, নাইজার এগ্রিমেন্ট ১৯৬৩, ১৯৬৪ এবং ১৯৭৩, আমাজান ট্রিটি ১৯৭৮, এগুলি based on the principle of common approach। তাঁরা নিজেরা যুক্তি করে চুক্তি করে এগুলি আদায় করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, আরও ২/১টি উদাহরণ আপনাকে দেই। আমার বিরোধীদলের এক বন্ধু মেকং নদীর কথা উল্লেখ করেছেন। মেকং নদী চীন থেকে আসে। লাওস, কম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম থাইল্যাণ্ড হল ভাটির দেশ, তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে চুক্তি করে সেই পানিকে ব্যবহার করে। কিন্তু মহান চীন দেশ এই নদী থেকে এক ফোঁটা পানি একতরফাভাবে নেয় নি। কেন করে নি? Because they believe in this principle that the lower riparian countries are to enjoy their water right.

আরও উদাহরণ আছে, কারণ আজকে উজানের কোন দেশের কোন কাজের জন্য যদি ভাটির দেশের কোন ক্ষতি হয়, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কৃষির জন্য, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে জীবনের জন্য, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সব কিছুর জন্য, তার উদাহরণ আমাদের কাছে আছে। আমরা যদি ইউনাইটেড স্টেটস এবং মেক্সিকোর দৃষ্টান্ত দেখি, কলারাডো নদীর জন্য আমেরিকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে মেক্সিকোকে, কারণ তাদের নদীর পানি আটকানোর জন্য মেক্সিকোর অনেক ক্ষতি হয়েছিল। আমেরিকাকে re-imbursible grants দিতে হয়েছে, desalting plant তৈরি করতে হয়েছে। পানির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেই desalting plant তৈরি করে মেক্সিকোকে শুদ্ধ পানি দেওয়ার ব্যবস্থা আমেরিকা গ্রহণ করেছে।

মাননীয় স্পীকার, take a similar case, কানাডা পানি ব্যবহার করেছিল, উজান দেশের পানি, ইউনাইটেড স্টেটসকে দেয় নি। তখন আমেরিকা যে রকম মেক্সিকোর পানি ব্যবহার করার

www.pathagar.com

চেষ্টা করেছিল কলোরাডো নদীর, সেরকম এখন আবার আমেরিকা লোয়ার রাইপেরিয়ান হল। আপার রাইপেরিয়ান হল কানাডা। কিন্তু কানাডাকে আন্তর্জাতিক arbitration-এর মাধ্যমে সেইজন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল।

লাওস, কম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যাণ্ডের joint arrangement এবং মহান চীনের সেই মেকং নদী একেবারে নির্বিঘ্নে প্রবাহিত করার যে tradition establish করেছে, আমি আশা করব, আমাদের এই এলাকাতেও এই ট্রাডিশন, এই ঐতিহ্য established হবে।

মাননীয় স্পীকার, বন্যার আর একটি কারণ হল, উজান দেশে ভারত বাঁধ তৈরি করেছে। ব্যারেজ, ড্যাম, গ্রোয়েন, স্পার এগুলি তারা তৈরি করেছে। এবং এর ফলে আমাদের দেশের ভিতর স্বাভাবিকভাবে যে পানি প্রবাহিত হত, সেগুলি প্রবাহিত হচ্ছে না। তারা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে নি। এবং আমরা জানি যে, ভারত ১২টি বৃহৎ নদীর উপর ড্যাম তৈরি করছে। তারা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। আমরা তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। আমরা সার্কের সদস্য। আমরা সার্কের চেতনা বজায় রাখতে চাই। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন লজ্ঘিত হোক, আমাদের sovereign right in principle লজ্ঘিত হোক এটা কখনও আমরা চাইতে পারি না। আমরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে যাব। এবং আমরা মনে করব যে, এটা আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী কাজ। আমরা চাইব যে, সমঝোতার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলি সমাধান হোক, যাতে করে এই নদীগুলির পানি যেগুলি আমাদের দিকে আসার কথা একটি স্বাভাবিক প্রবাহের মাধ্যমে সেভাবে আসুক।

কিন্তু আজকে সেগুলি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এবং তার ফলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং এর ফলে আমাদের state security threatened হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, তাই একতরফা পানি তুলে নেওয়ার অধিকার কোন উজান দেশের নেই এবং তার ফলেই প্রথমে ১৯৭৪ সনের ২৮ মে আমাদের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, পানির হিস্যা ঠিক করার আগে এই ফারাক্কা ব্যারেজ ওপেন করা হবে না। কিন্তু আমরা দেখেছি unilateral withdrawal of water হয়েছে। যখন ভারত চুক্তি করতে রাজি হয় নি, তখন আমরা জাতিসংঘে গিয়েছিলাম ১৯৭৭ সালে। এবং তারফলে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অর্থাৎ আমরা একটা সমঝোতায় আসি, এটাও পঞ্চশীলার principle, principle of agreement, principle of common approach. যেটা আমি বলেছি, সেই নীতি গ্রহণ করেই একটা সমঝোতা আসার চেষ্টা করা হয়েছিল।

মাননীয় স্পীকার, এ দেশের বন্যার সময় যে দুঃখ-দুর্দশা আমাদের দেশের মানুষের উপর নেমে আসে, তার বর্ণনা কোন কবি, কোন সাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিকের পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর নয়। এটা একটা অবর্ণনীয় দৃশ্য। এবং আমরা যারা দেশের ভিতর ছিলাম, আমরা সবাই ঐক্যেরই পরিচয় দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যাঁরা বাইরে ছিলেন, কেউ বিশ্বাস করেন নি যে, বাংলাদেশ এরকম একটি ভয়াবহ অবস্থার মোকাবেলা করতে পারবে। তারা আমাদেরকে চিনতো ও জানতো যে, আমরা হলাম পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ, আমাদের কোন infrastructure নেই, আমাদের কোন economic margin নেই। আমাদের জীবনযাত্রার মান lowest in the world এবং আমাদের দেশে বন্যা, হাহাকার, মহামারী এইসব ছাড়া আর কিছু হয় না। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের আগে অনেক দেশের অনেকে ভাবতো যে, বাংলাদেশের মানুষ ছোটখাটো, ছিন্ন, জীর্ণ, এরা কী করে যুদ্ধ করবে? এরা কোন দিন অস্ত্র হাতে নিতে পারবে না। কিন্তু সেদিন যেমন আমরা প্রমাণ করেছিলাম যে, আমরা আমাদের জাতীয় বিপর্যয়কে মোকাবিলা করতে পারি, আজকেও এই বন্যায় এই দেশের মানুষ আবার বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করেছে এই দেশের মানুষের শক্তি এবং ঐক্য। আরেকটি জিনিস প্রমাণিত হয়েছে যে, We have a competent government।

মাননীয় স্পীকার, আমার কাছে এখানে অনেক foreign paper cuttings আছে কিন্তু আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। আমাদের রাষ্ট্রপতিকে বলা হয়েছে যে, 'one of the rare crisis managers of the world ever'—এই বলে আখ্যায়িত করেছে। সংকট নিরসনের জন্য, সংকট মোকাবিলায় এই সরকার একটা competent government হিসাবে পৃথিবীতে আজকে

www.pathagar.com

established হয়েছে, যার জন্য আজকে জাতিসংঘে ১৬ নভেম্বর বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের একটি সভা হতে যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক সভা। এবং খুব সম্ভব ১৮ নভেম্বর বা তার কাছাকাছি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন বসবে বাংলাদেশের বন্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য। সারা পৃথিবীর সকল সদস্য-রাষ্ট্র এই অধিবেশনে যোগদান করবে এবং বাংলাদেশের বন্যার সমস্যা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করবেন। এর চাইতে বড় গৌরবের বিষয় আর কী হতে পারে।

আমরা সাফল্যের পরিচয় দিয়েছি। এত বড় একটি মহাবিপদকে আমরা যে সফলতার সাথে মোকাবিলা করেছি সেই জন্য আজকে আমরা পৃথিবী থেকে যে প্রশংসা পেয়েছি এটা বাংলাদেশের জন্য একটি goodwill। এই sympathy বাংলাদেশের জন্য হঠাৎ করে আসেনি, এটার জন্য সময় লাগে। তাঁরা দেখেন আমরা কী করছি, আমাদের নীতি কী, আমাদের policy কী, আমরা কীভাবে দেশ পরিচালনা করছি–সেটা দেখেই তাঁরা বিচার করেন। এর সাথে বলতে হয় যে, শুধু সরকার নয়, এই দেশের সকল স্তরের মানুষ, সকল রাজনৈতিক দল, সকল সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা সকলে মিলে এই সফলতার নিশ্চয়ই অংশীদার এতে কোন সন্দেহ নেই।

মাননীয় স্পীকার, কিন্তু একজন মানুষের কথা এখানে বলতে হয়। তিনি ১০৫টি উপজেলা পরিদর্শন করেছেন। ২৮ আগস্ট থেকে ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে, এবং ২৯ আগস্ট থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৭টা জেলায় গেছেন। ঢাকা শহরের এমন কোন এলাকা নেই যেখানে তিনি যান নি। ১৯ ঘণ্টা কাজ করেছেন এই ২৪ দিনে যখন সারাদেশ পানির নিচে ছিল। অনেক সময় হেলিকপ্টারে গেছেন কিন্তু নামতে পারেন নি। কারণ শুকনো জায়গা পাননি। তারপরেও দিনে ৪টি উপজেলা এবং একটি জেলায় সরেজমিনে গিয়ে দেখে এসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, এটার নজির আমরা কোন দিন পাইনি, তিনি হলেন রাষ্ট্রপতি এরশাদ।

শুধু তাই নয় আমাদের অনেক রাজনৈতিক নেতা, রাজনৈতিক কর্মী, নেত্রী, রাজনৈতিক সংগঠন এবার সবকিছু ভুলে গিয়ে, বন্যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করেছেন। এর সাথে সাথে আমাদের ফার্স্ট লেডি তিনিও ১০টা জেলায় গেছেন। ২৪টি ত্রাণ শিবির নিজে গিয়ে তদারকি করেছেন। এ পর্যন্ত যে দৃষ্টান্তগুলি বললাম এটা কাউকে খুশি করার জন্য নয় ভবিষ্যতে রাজনীতিবিদদের জন্য যাতে এটা একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকে সেইজন্য এই কথাগুলি বললাম।

মাননীয় স্পীকার, আজকে হয়ত আমরা ক্ষুব্ধ যে পার্লামেন্টের মেম্বার হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে কেন ত্রাণ কার্যে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত করা হল না। তবে পার্টিগতভাবে আমরা সবাই নিয়োজিত ছিলাম। আমাদের পার্টি থেকে কিছুটা ত্রাণ কার্য আমরা পরিচালনা করেছি। আমরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক সংসদ-সদস্য নিজস্ব তহবিল থেকে এই ত্রাণ কার্যে ব্যয় করেছেন। কিন্তু আমরা সরকারীভাবে তাঁদেরকে নিয়োজিত করি নি। না করাতেই আজকে শাজাহান সিরাজ সাহেবের এই 'কমপ্লিমেন্ট' আমরা পাচ্ছি। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমাদের সশস্ত্রবাহিনীকে দিতে হয়, কারণ আমরা তাদের মাধ্যমে এই ত্রাণ কার্য পরিচালনা করেছি বলেই আজকে সারা বিশ্বে ত্রাণসামগ্রী আত্মসাতের অপবাদ আমাদেরকে শুনতে হয় নি।

আপনারা অনেকেই বলেছেন যে, ত্রাণ মন্ত্রণালয় কিছু করে নি। আমাদের সম্মানিত মন্ত্রীরা এক-একজন প্রতিটি এলাকায় ১০ দিন, ১৫ দিন, ২০ দিন পর্যন্ত ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা তাঁদের এলাকায় ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছেন, পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাঁরা তদারকি করেছেন। তাঁদের সাথে সাথে তাঁরা এলাকায় সম্মানিত সংসদ-সদস্যদের নিয়েও ঐ কাজ করেছেন। আজকে আমি বলব যে, জরুরী ত্রাণ যেটা আমরা পরিচালনা করেছি সেখানেও এই সরকার আরও একটি সফলতা অর্জন করেছে। সেটা হল, এখানে দুর্নীতির কোন সুযোগ ছিল না। রাজনীতিবিদদের যদি দায়িত্ব দেওয়া হয় কোন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে, তাহলে সাধারণত আমরা কী করি? আমাদের উপর pressure আসে, যাঁরা আমাদের আশেপাশে কাজ করেন তাঁদেরও উপর pressure আসে, তখন আমরা discriminate করি। এটা স্বাভাবিক। কারণ আমরা রাজনীতি করি, আমাদের সবারই এলাকায় নিজস্ব কিছু লোকজন আছে। তাঁরা এসেই প্রথমে আমাদিগকে বলবে লুঙ্গিগুলি বিতরণের ভার আমাকে দেন, শাড়িগুলি বিতরণের দায়িত্ব আমাকে দেন, গম আমাকে দেন, তাছাড়া আমাকেও দিতে হবে কারণ আমি পার্টির কর্মী, যেটা ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগের সময় তারা করেছিল। তারা

www.pathagar.com

তখন ত্রাণ তৎপরতা পার্টি-ওয়াইজ করেছিল, যার জন্য আজ পর্যন্ত তাদের কপালে যে কালো দাগ পড়েছিল সেই কালিমা এখন পর্যন্ত মোছা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি।

আজকে সেদিক থেকে আমি বলব, আপনারা আপনাদের খুশিমত সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু জাতীয় পার্টিকে ত্রাণ বিতরণে কোন প্রকার দুর্নীতির কলঙ্ক আপনারা কখনই দিতে পারবেন না।

মাননীয় স্পীকার, বন্যা সমস্যার সমাধান একটি জটিল এবং দীর্ঘমেয়াদী বিষয়। এর সমাধান এক দিনে বা এক বছরে সম্ভবপর নয়। এর জন্য যেমন একদিকে প্রয়োজন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রয়াস, অন্যদিকে আমাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদিগকে সংঘবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দেশব্যাপী প্রবাহিত আমাদের পানির ন্যায্য হিস্যা যদি কেউ হরণ করে নিতে চায়, তাহলে সেটাকে আমরা আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি আঘাত হিসাবেই আখ্যায়িত করব এবং এদেশের এগার কোটি মানুষ সকল ত্যাগের বিনিময়ে সেটাকে প্রতিহত করবে।

বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। আমাদের দেশ ছোট হতে পারে, আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু প্রয়োজন হলে আমরা শাকসব্জি খাব। কিন্তু আমাদের দেশের পানির হিস্যার ন্যায্য অধিকার থেকে নিজেদেরকে কোনভাবেই বঞ্চিত হতে দেব না।

মাননীয় স্পীকার, একদিকে যেমন আমাদের নদীনালার পানি সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে বন্যার একটা স্থায়ী সমাধান আনার অবিরাম প্রচেষ্টা আমাদিগকে চালাতে হবে। এর জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে সংযম প্রদর্শন এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

কিন্তু আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যে কোন সমস্যা সমাধান একটু দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া হবে, সময় লাগবে। Expert রা বসবেন, তাঁরা একটা ঐকমত্যে আসবেন, বিদেশী সাহায্য আনতে হবে। Ten, fifteen, twenty billion ডলারের ব্যবস্থা করতে হবে। সবাই যখন বলে সাহায্য করবে একথা মনে করবেন না যে কালকেই এসে সাহায্য করবে।

তাই, আমরা কি বসে থাকব? আগামী বছর যদি বন্যা হয়, তাহলে কি আমরা এইভাবে পার্লামেন্ট ডেকে আলোচনা করে শেষ করে দেব? এর উপরেই আমাদের জোর দিতে হবে যদি আমরা আত্মনির্ভরশীল হতে চাই, যদি আমরা আমাদের পানিসম্পদের সদ্ব্যবহার করতে চাই। তাহলে আমাদেরকে এখন থেকেই চিন্তা করতে হবে যে, আমাদের দেশের মধ্যে যে পানি আছে বা যে পানি আমরা পাই, এ পানিকে আমরা কীভাবে ব্যবহার করব এর জন্য একটা জাতীয় পরিকল্পনা আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য আমাদের রাষ্ট্রপতি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে ভারতে গেছেন। আপনারা অনেকে সমালোচনা করেছেন; আপনারা বলেছেন কী পেয়েছেন তিনি? নেপালে গেছেন, ভুটানে গেছেন। আপনারা কেউ কেউ বলেছেন তিনি কী এনেছেন আমাদের জন্য? তিনি একটা জিনিস এনেছেন আমাদের জন্য এবং সেটা হল যে, সারা দুনিয়ার কাছে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, বাংলাদেশ তার এই সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। আর কী অর্জন করেছি? সম্ভবত আমরা তাদেরকে রাজি করাতে পেরেছি এ ব্যাপারে বসার জন্য Expert level-এ। স্বীকৃতি আদায় করেছি যে, এই বাংলাদেশে একটা বন্যা হয়েছে এবং এই বন্যার কারণগুলির বেশিরভাগই উজান দেশ থেকে এসেছে এবং এই পানির জন্য এই দেশ ভেসে গেছে। তারই স্বীকৃতি হয়েছে এই সফরগুলির মাধ্যমে এবং রাষ্ট্রপতি এরশাদ Founder Chairman of SAARC, একথা ভুলে যাবেন না। তিনি সেই সার্ক-এর spirit দেখিয়েছেন এই সফরগুলির মাধ্যমে।

আজকে দুনিয়াতে একথা কেউ বলতে পারবে না যে, বাংলাদেশ তাদের নিজেদের সমস্যা তারা নিজেরা সমাধান করতে চায় না বা ইচ্ছুক নয়, আজকে সেজন্যই তাঁর যাওয়াটার অত্যন্ত দরকার ছিল এবং আমি তাঁকে মোবারকবাদ জানাই তাঁর এই উদ্যোগের জন্য।

মাননীয় স্পীকার, আজকে বিশ্ব জনমত, বিশ্ব সমর্থন আমাদের পক্ষে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত, সকল নেতা বাংলাদেশের এই অবস্থার জন্য সহানুভূতি জানিয়েছেন এবং সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন।

www.pathagar.com

আমার কাছে এখানে আছে "Hundred Congress-Second Session-A Bill Concerning Disaster Assistance to Bangladesh।" কে এই বিল এনেছেন? Mr. Stephen Solars, যাঁর কাছে কিছুদিন আগে এদেশের কিছু রাজনীতিবিদ গিয়ে বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, বাংলাদেশে কোন সরকার নেই। আজকে এই স্টিফেন সোলারস এই বিলের উদ্যোক্তা। আমি আপনার কাছে জমা দেব, মাননীয় স্পীকার। এবং এটা লাইব্রেরিতে থাকা উচিত। বিল আনছেন, কিসের জন্য? বাংলাদেশকে disaster assistance দেবার জন্য। আইন করছে আমেরিকাতে বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য। এই ঘটনা কোন দিন ঘটে নি। কোন দেশের বেলায় ঘটে নি। কিন্তু ব্যক্তিটি একই। আজকে এটা Act হতে যাচ্ছে, because it has gone through the House of Representatives. It will go to the Congress. It will be passed.

আজকে E.E.C. পার্লামেন্টে একই রকমের বিল এসেছে, একই ধরনের বিল, বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য অর্থাৎ আইন করছে এই বাংলাদেশকে disaster থেকে মুক্ত করার জন্য। এটা প্রমাণ করে, good-will for Bangladesh, support for Bangladesh, sympathy for Bangladesh and confidence in the Government of President Ershad। না হলে একই ব্যক্তি এই বিল আনতে পারে? He has changed his opinion about us। এই যে বিশ্বাস, এই যে আস্থা এই সরকারের উপর তা manifested হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী। কিছুদিন আগে I. M. F. এর মিটিং হয়েছে। আমাদের অর্থমন্ত্রী ছিলেন, পরিকল্পনামন্ত্রী ছিলেন। এমন কেউ নেই যারা বাংলাদেশের জন্য concerned feel করেন নি এবং সাহায্য দেওয়ার জন্য West Germanyর চ্যান্সেলার বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেছেন যে, উজানের কোন দেশের অধিকার নেই ভাটির দেশের ক্ষতিসাধন করার। এত বড় বক্তৃতা জার্মানির চ্যান্সেলার থেকে আমরা পেয়েছি। এটাই তো আমাদের জন্য sufficient।

আজকে, আমি শুধু বলতে চাই যে, এই ধরনের আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করতে হলে সমঝোতা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতেই আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিকে নিয়ে আমাদের এই সমস্যা সমাধান করতে হবে।

আমি আশা করব সার্কের স্পিরিট–যদিও সার্কের পারভিউতে এটা পড়ে না–কিন্তু সার্কের purviewতে নিশ্চয়ই এটা পড়ে যে আমরা আমাদের সমস্যা আমরা নিজেরা সমাধান করার চেষ্টা করব। সেটাই হবে আমাদের জন্য উত্তম উপায়। এবং আজকে আন্তর্জাতিকভাবে সারা বিশ্ব হাত প্রসারিত করে রেখেছে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য।

আর এর মধ্যে আগামী বছর যাতে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি কম হয়, যাতে গবাদিপশু কম মরে, মানুষ যাতে কম মরে, শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা কম কষ্ট পায়, যাতে আমাদের দেশের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মক্তব কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আমাদের দেশের মাছ সম্পদ যেটা এবছর বন্যার পানিতে ভেসে গেছে, এগুলি যাতে সংরক্ষিত হয় সেজন্য আমাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের নদী খনন করতে হবে, খাল খনন করতে হবে, আমাদের বাঁধ তৈরি করতে হবে। পানি-মন্ত্রী বলেছেন, আমাদের Brahmaputra Barrage, Ganges Barrage এগুলি তৈরি করতে হবে। এতদিন এগুলিকে আমরা অবহেলা করে এসেছি। আমাদের নিজেদের পায়ে নিজেদের দাঁড়ানোর একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আমি এর আগে বহুবার বলেছি যে, বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে অনেক মেধা, অনেক প্রতিভা, অনেক শক্তি, অনেক উদ্যোগ, অনেক উদ্যম আছে কিন্তু আমরা সেগুলি ব্যবহার করতে পারি নি। আজকে আমি মনে করি, আমাদের মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে, যে ঐক্য আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি, সেই ঐক্য যদি আমরা সুদৃঢ় করতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের এই বন্যা সমস্যার সমাধান করতে পারব। এবং তার সাথে সাথে এই শক্তিকে যদি আমরা আজকে কৃষিতে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত করতে পারি, তাহলে যে কারণে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম, যে স্বপ্ন দেখেছিলাম এই দেশকে গড়ে তোলার জন্য, প্রতিষ্ঠা করার জন্য, স্বাধীন করার জন্য, সেটা নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করবে।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস রেগুলেশন রহিত আইন, ১৯৮৯ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনসমূহ, ১৯৮৯

২৪ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্যগতভাবে একটি প্রতিষ্ঠিত উপজাতীয় এলাকা। যুগের পর যুগ এই অঞ্চলকে একটি বিচ্ছিন্ন এবং পশ্চাৎপদ এলাকা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষ বহুকাল যাবত তাদের নিজস্ব নিয়মনীতি ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে তাদের জীবন-জীবিকা চালিয়ে এসেছে। ব্রিটিশ শাসকরাও এই অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর হস্তক্ষেপ করে নি, বরং ১৯০০ সালের রেগুলেশনের মাধ্যমে তাদেরকে আরও আলাদা করে দেওয়া হয়, যার ফলে তাদের উন্নয়নের কোন উদ্যোগ আর নেওয়া হয়নি। পাকিস্তান সরকারও ১৯৬২ সালের সংবিধানে এই অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখলেও ১৯০০ সালের রেগুলেশন রহিত করে নি। ১৯৭২ সালের সংবিধানে উপজাতীয়দের আলাদা অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এই অঞ্চলকে মূল একক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তদানীন্তন সরকার সমতলভূমি থেকে অ-উপজাতীয়দের এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু অপরদিকে ১৯০০ সালের রেগুলেশনও চালু রাখে। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কাপ্তাইয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য লক্ষাধিক উপজাতীয়কে উচ্ছেদ এবং ১৯৭২ সালের সাংবিধানিক ব্যবস্থার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, যার পরিণতিতে বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ দেখা দেয়। প্রথমদিকে প্রায় একযুগ যাবত এই সমস্যার একটি সামরিক সমাধান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা হয়, যা উপজাতীয়দের আরও উগ্রবাদী করে তোলে। সামরিক অভিযানের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার সমাধানের পথ পরিহার করে ক্রমান্বয়ে এই সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের উপায় বের করার চেষ্টা চালানো হয়। এরশাদ সরকারের সময় এই প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা হয় এবং উপজাতীয়দের সাথে একটি সমঝোতায় আসা সম্ভব হয়। এই সমঝোতার ভিত্তিতে সরকার রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি জেলার জন্য তিনটি স্বতন্ত্র স্থানীয় সরকার আইন প্রণয়ন করে। আইনগত দিক ছাড়াও এই সমস্ত বিলের উপর আলোচনাকালে পার্বত্য অঞ্চলের ইতিহাস, রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং এই সমস্যার সমাধানের বিভিন্ন পর্যায়ের উপর বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়। ১৯০০ সালের রেগুলেশন রহিত করে একটি নতুন self-contained আইন করা হয়, যার মাধ্যমে একদিকে উপজাতীয়দের জীবন-জীবিকা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান করা হয় এবং অন্যদিকে এই এলাকার উন্নয়নের জন্য এই অঞ্চলে দেশের অন্যান্য আইনসমূহকে প্রযোজ্য করার ব্যবস্থা করা হয়।

মাননীয় স্পীকার

এই বিলটি সম্পর্কে আমাদের সম্মানিত ভূমিমন্ত্রী সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু এই আইনটি সম্পর্কে যে কয়েকটি প্রশ্ন উঠেছে, তার প্রেক্ষাপটে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, ১৮৬০ সালের আগে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে কেউ খুব বেশি মাথা ঘামায়নি। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের আমলে এই এলাকা সম্পূর্ণভাবে তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল বলা যেতে পারে। ১৮৬০ সালে প্রথম এটাকে একটা আলাদা জেলা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং তার আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম জেলার একটা অংশ ছিল। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দফায় কিছু কিছু নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। প্রথমে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম, একটি জেলা হিসাবে একজন সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। সেই সুপারিন্টেন্ডেন্ট একজন সর্বেসর্বা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সব কিছুর মালিক ছিলেন সেখানে। তারপরে সেটা পরিবর্তন করে সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। তারপরে আবার সুপারিন্টেন্ডেন্টকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। এভাবে এটা পরিবর্তন করে করে শেষ পর্যায়ে এসে যখন ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল, তখন ডেপুটি

www.pathagar.com

কমিশনারকে, তখনকার দিনের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে আবার এই ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং প্রচণ্ড ক্ষমতা তার হাতে দেওয়া হয়েছিল to govern every thing of that area। ১৯০০ সালের regulation যখন ব্রিটিশরা প্রবর্তন করে, তখন এটাকে একটা tribal area হিসাবে recognition দেওয়া হয় এবং সেই হিসাবে এটা পরিচালনার দায়িত্ব যেটা আমি বলছিলাম, প্রশাসকের উপরে দেওয়া হয়েছিল।

আজকে অনেকে সমালোচনা করেছেন যে, ডি.সি.-র ক্ষমতা অনেক বেশি। কিন্তু তাঁরা যদি Regulation-টা পড়েন, তাহলে দেখবেন যে, Deputy Commissioner was almost, not almost, more than a king। তিনি নিজেই ছিলেন প্রশাসক, নিজেই ছিলেন জজ, নিজেই ছিলেন প্রসিকিউটার, তিনি নিজেই সব কিছুর কর্তাব্যক্তি ছিলেন।

মাননীয় স্পীকার, পাকিস্তান হওয়ার পর ১৯৬২ সালের সংবিধানে চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টসকে centralise করা হয়। এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে District Magistrate সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের যত ক্ষমতা ছিল, সব ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানের একটি সংশোধনী এনে ১০ জানুয়ারি ১৯৬৩ সালে এই tribal statusটাকে তুলে দেওয়া হয়। তখন থেকে এই এলাকার উপজাতীয়দের প্রথম resentment শুরু হয়। তারা এটার আপত্তি করতে থাকে। তারপর কাপ্তাই ড্যাম তৈরি করা হয়, সেই কাপ্তাই ড্যামের ফলে এক লক্ষ উপজাতীয় সেই এলাকা থেকে বাস্তুহারা হয়, তাদেরকে অন্য জায়গায় settle করতে হয়। তার ফলে তাদের মধ্যে একটা বিক্ষোভ দানা বাঁধে।

১৯৭২ সালের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আলাদা কোন অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়নি। এইখানে বলার প্রয়োজন যে, ১৯৬২ সালের সংবিধানে Central Government-এর কাছে authority নিয়ে নেওয়া হল। তখন এই ১৯০০ সালের রেগুলেশন, এটা আর প্রচলিত থাকার কথা ছিল না, কিন্তু এটাকে রহিত করা হয় নি। যার জন্য এখন পর্যন্ত এই ১৯০০ সালের regulation বলবৎ রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী তারা উপজাতীয়দের জীবন-জীবিকা চালিয়ে এসেছেন, কিন্তু technically আইনত ১৯৬২ সালের সংবিধান প্রবর্তনের পর এই ১৯০০ সালের রেগুলেশনটা আর প্রযোজ্য হবার কথা ছিল না। কিন্তু by practice, by tradition এটা প্রয়োগ হয়ে এসেছে।

কেউ সেটাতে আপত্তি করে নি। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা যখন রাখা হয় নি, তখনও এই ১৯০০ সালের regulationটাকে রহিত করারও কোন ব্যবস্থা হয় নি। অর্থাৎ ১৯০০ সালের সেই রেগুলেশন continue করতে থাকে। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কোন সার্বিক প্রচেষ্টা বা এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য কোন পদক্ষেপ কোন পর্যায়েই নেওয়া হয় নি। আজকে এই সরকারের আমলে সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের জন্য বিশেষ একটি বিল হাজির করা হয়েছে।

উপজাতীয়দের যে একটি সমস্যা আছে, তাদের সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্য, তাদের জীবন-জীবিকার ধারাবাহিকতার যে একটা সমস্যা রয়েছে, সেটা সমাধান করার একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ এই সরকার নিয়েছেন। এবং তারই ফলশ্রুতিতে আজকে এই ১৯০০ সালের রেগুলেশনকে রহিত করার জন্য এবং একটি নতুন আইন তৈরি করার জন্য এই সংসদে আমরা এই বিল উপস্থাপন করেছি।

মাননীয় স্পীকার, একটা জিনিসের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যেটা কোন সংসদ সদস্য উল্লেখ করেন নি। বিলের ৪ ধারায় লেখা আছে:

> "১৯০০ সালের Regulation রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল আইন পার্বত্য জেলাসমূহে প্রযোজ্য ছিল না, সেই সকল আইন উক্ত আইন প্রবর্তনের সাথে সাথে উক্ত জেলায় প্রযোজ্য হইবে।"

অর্থাৎ, এই জেলায় দেশের প্রচলিত কতকগুলি আইন প্রযোজ্য ছিল না, specifically আইন প্রণয়ন করার সময় বলে দেওয়া হতো যে, এই আইন ওখানে প্রযোজ্য হবে না। যেমন ধরুন, civil procedure-এর বিষয় আছে, criminal procedure-এর বিষয় আছে, যেগুলি সারা দেশে

www.pathagar.com

প্রচলিত ছিল, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত ছিল না। আইনের মধ্যেই ওটা বলে দেওয়া হতো। এক দিকে যেমন তাদের জীবনের ধারাবাহিকতা, তাদের যেসব প্রথাগত নিয়ম-কানুন ছিল, তাদের ঐতিহ্য ছিল, সেগুলিকে আমরা বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, অন্য দিকে সারা দেশে যেসব আইন প্রযোজ্য ছিল আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে, সেইসব আইন আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামেও প্রযোজ্য হবে এই সংশোধনীটাও আমরা আনছি এই আইনের মাধ্যমে।

তারপরে, এখানে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, হেডম্যান সম্পর্কে। বিশেষ করে বিরোধীদলের নেতাও বলেছেন যে, ধারা ১৩, ১৪ এবং ১৫-র ব্যাপারে আমরা কী চাচ্ছি? এই আইনের মধ্যে এগুলি সবই আছে। আমরা চাচ্ছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের যে একটি নিজস্ব কৃষ্টি, নিজস্ব একটি জীবন-ধারা আছে, নিজেদের একটা style of living আছে, এটাকে preserve করার চেষ্টা করেছি আমরা। এদের নিজেদের মধ্যে ভুলত্রুটি থাকতে পারে, within their own framework, these may be instruments of exploitation, কিন্তু আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে তাদের সেই জীবনটাকে restore করে দেওয়া।

মাননীয় স্পীকার, আমি আগামীতে যখন তিনটা বিলের উপর আলোচনা করব, তখন আমি আমার মূল বক্তব্য রাখব, তাহলে জিনিসটা আরও পরিষ্কার হবে এবং বোঝা যাবে কেন জিনিসটার এই প্রাসঙ্গিকতা এবং কেন আজকে ১৩, ১৪, ১৫ এই ধারাগুলি এইভাবে রাখছি? এটাই তাদের style of life। আমি বলব যে, আমরা তাদের জীবনকে restrict করি নি, বরং ১৩, ১৪, ১৫—এগুলিকে আমরা concession হিসাবে মনে করি, in the sense যে, এতদিন তারা যেভাবে তাদের জীবন চালিয়ে এসেছে, যে tradition-এর উপর ভিত্তি করে, সেটাকে আমরা intact রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

যে প্রশ্নগুলি তোলা হয়েছে, সেখানে কিছুটা যুক্তি আছে। কিন্তু এই আলোচনার প্রেক্ষাপট এখানে শেষ নয়, আমি আমার মূল বক্তব্য যখন ওই তিনটা বিলের উপর রাখব, তখন পুরো বক্তব্যটা এই সংসদে উত্থাপন করব, যেই বিষয়ে শাজাহান সিরাজ, নূরে আলম জিকু সাহেব এবং আরও অনেক সংসদ সদস্য বলেছেন।

এই তিনটা বিল আজকে হঠাৎ করে উত্থাপন করা হচ্ছে না, এই বক্তব্য সঠিক নয়। অনেক অনেক আলাপ-আলোচনা পর্দার অন্তরালে হয়েছে, মাননীয় স্পীকার। প্রকাশ্যেও হয়েছে এবং সেই সব আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে আজকে স্বীকৃত একটি formulaর উপর base করে এই সংশোধনী আনা হয়েছে। তার ফলে আমি আগেই বলেছি যে, ১৯০০ সালের regulation যেটা out date ছিল, সেটাই চালু ছিল তবে সেটা চালু থাকা উচিত হয় নি। ১৯৬২ সালের পরে চালু থাকা উচিত হয় নি। কিন্তু তারা alternative কোন কিছু দিতে পারে নি, পাকিস্তান সরকার।

বাংলাদেশ সরকার সেজন্য একটা compromise formula হিসাবে ১৯০০ সালের regulationকে continue করেছে, although it was not correct। আজকে যেহেতু এই সরকার একটি সুষ্ঠু সমাধান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সফল হয়েছেন, সেজন্য আমরা একটি বিকল্প বিল আনতেও সক্ষম হয়েছি। মাননীয় স্পীকার, সেইজন্য আমরা ১৯০০ সালের regulation-এর যেসব দিক পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছে, সেগুলিকে দূর করে দিয়েছি।

আর যে বিষয়গুলিকে নিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের ঐতিহ্য, তাদের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে, পরিপুষ্ট হয়েছে, সেগুলিকে আমরা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছি। তারপর অতিরিক্ত কী করেছি বা কী করতে চাই, সে সম্পর্কে বাকি তিনটা বিল যখন এই হাউসে আলোচনার জন্য আসবে তখন আমরা সবাই সেটা আলোচনা করব এবং সেই বিষয়ে আমি যখন বক্তব্য রাখব তখন পুরো পরিকল্পনা এবং তার পটভূমি এই সংসদের সামনে উপস্থাপন করার আশা রাখি।

সংক্ষেপে বলতে চাই যে, Chittagong Hill Tracts Regulation দেশের এবং বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। বর্তমানের এই আইন দিয়ে আমরা ওই regulationকে রহিত করছি। এই আইন প্রণীত হলে সর্বস্তরের জনসাধারণ বিশেষ করে পার্বত্য

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় সকলের নিরাপত্তা বিধান করা হবে, নিরাপত্তা জোরদার হবে। অনগ্রসর শ্রেণীর দ্রুত উন্নতি ও আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা যাবে।

পূর্বে যেখানে regulation of 1900-এর অধীনে সম্পত্তির অধিকার, সংরক্ষণ ও হস্তান্তর restricted ছিল, এখন সেটা স্বাভাবিক ও সহজতর হবে। এই আইনের মাধ্যমে উপজাতীয়দের প্রথাগত সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে এবং দেশে প্রচলিত অন্যান্য আইনসমূহকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।*

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনসমূহ
২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

মাননীয় স্পীকার

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। জনাব নাজিউর রহমান সাহেব এই তিনটি বিলের উপর অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর আগে যেদিন আমরা ১৯০০ সালের রেগুলেশন রহিতকরণের জন্য বিল এনেছিলাম, আমি কিছু বক্তব্য রেখেছিলাম। সম্মানিত স্থানীয় সরকারের প্রতিমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্যকে পুনরাবৃত্তি না করে দু'একটি বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে আমি সেদিনও বলেছিলাম, করাচীতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং জেলার প্রশাসকদের মাধ্যমে তাদের পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর আর একটি কারণ ছিল যে কাপ্তাই ড্যামের উপরে, সেখানে ১৮,০০০ পরিবার, সব মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ উপজাতীয় এবং প্রায় সকলেই চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত উপজাতীয়, তাঁদেরকে এই এলাকা থেকে চলে যেতে হয়। কিন্তু যে ক্ষতিপূরণ তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখনকার সময়ের ৪ কোটি রুপী, এক লক্ষ মানুষের মধ্যে তাও পুরো টাকাটা দেওয়া হয় নি। দুই কোটি ৩০ লক্ষ টাকা তখনকার সময়ে দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে এক কোটি ৬০ লক্ষ টাকা infrastructure, অবকাঠামো তৈরি করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ ৭০ লক্ষ টাকা মাত্র ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। ৭০ লক্ষ টাকা এক লক্ষ মানুষের মধ্যে বিতরণ করলে মাথাপিছু ৭০ টাকা হয় তখনকার সময়ে। এই অবিচার তিক্ততা সৃষ্টি করেছিল উপজাতীয়দের মধ্যে।

মাননীয় স্পীকার, স্বাধীনতার পর কি হয়েছে সেই কথা আর একটু বিস্তারিত বলতে চাই। ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে চার-দফা একটি দাবি তখনকার প্রধানমন্ত্রীর হাতে দেওয়া হয়। তার মধ্যে প্রথমটি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা বা জেলা থাকবে।

১৯০০ সালের যে রেগুলেশন সেটাকে ১৯৭২ সালের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এটা ছিল দ্বিতীয় দাবি। তৃতীয় দাবি ছিল যে, ট্রাইবাল চীফ্ আগে যেভাবে ছিলেন, ১৯০০ সালের রেগুলেশনের অধীনে, সেটা তাদেরকে continue করতে দিতে হবে। আর ৪নং হল, নন-ট্রাইবালদিগকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যাওয়ার যে relaxation করা হয়েছিল সেটা বন্ধ করে বাইরের অ-উপজাতীয় মানুষদেরকে উপজাতীয় এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা।

মাননীয় স্পীকার, সেইদিন যদি এই সমস্যাগুলি রাজনৈতিকভাবে দেখা হতো, তাহলে আজকে এতদিন পর, ১৭ বছর, কষ্ট নির্যাতন, রক্তক্ষয় এড়ানো যেত এবং সমস্যাটি তখনই সমাধান করা সম্ভবপর হত। এই সমস্যাগুলি সমাধান করতে তখনকার সরকার রাজি হন নি। তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বলে একটি সংস্থা গড়ে ওঠে যেখানে এম. এন. লারমা সেক্রেটারি এবং জে. এল. ত্রিপুরা as joint secretary হিসাবে কাজ করা শুরু করেন। ১৯৭৫ সালের সরকারের পরিবর্তনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃত্বের একটি অংশ সংঘাতের পথ বেছে নেয়। ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝিতে কিছু সংখ্যক উপজাতীয় ব্যক্তিদের এবং law enforcing agency-র মধ্যে প্রথম সংঘাত ঘটে।

* বিলটি ১৯৮৯ সালের ১লা মার্চ সংসদে পাস হয়।

www.pathagar.com

১৯৭৬ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে, 'ট্রাইবাল মেমোরেন্ডাম' নামে একটি মেমোরেন্ডামে ১৬ দফা একটি দাবি সরকারের কাছে place করা হয়। তার মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি আমি বলছি:

বাইরের flow of illegal infiltration বন্ধ করে দিতে হবে, অর্থাৎ অ-উপজাতীয় অর্থাৎ main land থেকে কোন নাগরিককে পার্বত্য জেলায় যেতে দেওয়াটা বন্ধ করতে হবে। এটা ছিল তাদের প্রথম দাবি।

দ্বিতীয় দাবি ছিল যে, যারা জমি এ্যাকুয়ার করেছেন, settlement করেছেন বেআইনীভাবে, সেই বেআইনী হস্তান্তরিত জমি তাদের থেকে নিয়ে নিতে হবে এবং তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করতে হবে।

তৃতীয় হল যে, রাংগামাটি থেকে মহালছড়ি এবং খাগড়াছড়ি পর্যন্ত all weather road তৈরি করে দিতে হবে।

তারপরে হল যে, রাংগামাটি ভায়া চন্দ্রঘোনা টু বান্দরবানের রাস্তা তৈরি করে দিতে হবে। আরও দুটো রাস্তা–খাগড়াছড়ি থেকে পানছড়ি এবং খাগড়াছড়ি থেকে দীঘিনালা এই দুটো রাস্তা পাকা করে দিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। আর কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক তাদের যে lighter pump supply করে তা একটা reasonable rent-এ তাদেরকে দিতে হবে।

আমি কেন এগুলি পড়ছি, মাননীয় স্পীকার? আজকে জাতির কাছে এই সংসদের নেতা এবং এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এটা আমার দায়িত্ব জাতির সামনে এই সংসদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে সকল তথ্য উপস্থাপন করা। এই conditionগুলি যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব তখনকার সরকারও এই conditionগুলিকে অত্যন্ত মামুলীভাবে গ্রহণ করেন অথচ এই শর্তগুলি আমরা অনেকটা নিজের থেকেই পূরণ করে দিয়েছি। এই সমস্ত দাবি, যেগুলি আমি এখানে পড়ে শোনালাম, সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ দাবি। সুতরাং ৭৬ সালে যদি এই শর্তগুলি মেনে নেওয়া এবং এগুলি পূরণ ও প্রতিপালন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত, তাহলে আজকে আমরা হয়তো এই অবস্থায় এসে দাঁড়াতাম না।

মাননীয় স্পীকার, তার পরে, এই দাবিদাওয়ার পরিবর্তে ১৯৭৯ থেকে '৮০ সালের মধ্যে তদানীন্তন সরকার খাসজমি শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদেরকে পুনর্বাসনের জন্য নয়, সেটা relax করে দিলেন, ২৫ একর থেকে ১০০ একর পর্যন্ত জমি এই বহিরাগতদের পক্ষে settlement দেওয়ার জন্য বিধি সংশোধন করে দিলেন। অর্থাৎ বাইরে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁরা উপজাতীয় এলাকায় যেতে পারবেন। এর দ্বারা আগে যে রকম restriction ছিল, সেটা আরও তুলে দেওয়া হল এবং জমি settlement-এর জন্য অনুমতি দেওয়া হল। এর ফলে উপজাতীয়দের মধ্যে আরও তিক্ততা বৃদ্ধি পায়।

মাননীয় স্পীকার, স্বাধীনতার পর থেকে মার্চ, ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ২১০টি acts of terrorism সংঘটিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসমূলক কাণ্ড ঘটেছে। এর ফলে ৬৩১ জন বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু ঘটেছে, উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় মিলিয়ে আরও আহত হয়েছে ৪৩৬ জন। অপহরণ ঘটেছে ৬৮টি এবং ২ হাজার ৩শ ৩টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে ৩৮ জন অ-উপজাতীয় শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাকে হত্যা করা হয় এবং ২৪ জনকে আহত করা হয়।

এইভাবে অবস্থার যখন অবনতি ঘটে, তখন রাষ্ট্রপতি এরশাদ এবং তাঁর সরকার সম্পূর্ণ জিনিসটিকে পুনর্বিবেচনা করেন। তারই প্রেক্ষিতে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন committee গঠন করা হয়। এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ. কে. খন্দকারের সভাপতিত্বে সেখানে জাতীয় পর্যায়ের সকল ক্ষেত্র থেকে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দিয়ে এই কমিটি গঠন করে এই সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পিত হয়।

মাননীয় স্পীকার, এই কমিটি গত প্রায় দুই বছর যাবত ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ, এমনকি গ্রাম পর্যায়ে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন এবং ২৪টি আনুষ্ঠানিক দীর্ঘ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে এই কমিটির কিছু সুপারিশ

www.pathagar.com

অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কিছু নির্দেশ দেন এবং সেই নির্দেশগুলি বাস্তবায়নের জন্য তাৎক্ষণিক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

মাননীয় স্পীকার, সেই সব পদক্ষেপগুলি ছিল এই যে ৬০০ উপজাতীয় ব্যক্তিদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে সরকারী এবং বিভিন্ন আধা-সরকারী সংস্থাসমূহে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে এবং সেটা করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যত সরকারী ঠিকাদারী আছে তার মধ্যে কমপক্ষে ১০ শতাংশ কোটা উপজাতীয়দের মধ্যে দেওয়ার সিদ্ধান্ত স্থির হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়মূলক কর্মসূচীর কমপক্ষে ১০ শতাংশ শ্রমিক উপজাতীয়দের মধ্য হতে নিয়োগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সেটা হল যখন রাতের অন্ধকারে অস্ত্রধারীরা এসে নিরীহ উপজাতীয়দের এবং অ-উপজাতীয় ব্যক্তিদের উপর নির্যাতন এবং অত্যাচার করত তখন retaliation, প্রতিহিংসার যে প্রবণতা জনগণের মধ্যে দেখা দিত, সেটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার ফলে হত্যা এবং হানাহানির সংখ্যা কমে যায়, অর্থাৎ Act of Retaliationকে stop করে দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্টন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আরও একটি কাজ করা হয়েছে যে, নতুন কোন অ-উপজাতীয় নাগরিককে উপজাতীয় এলাকায় অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করার জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেওয়া হয়, এবং সেই নিষিদ্ধ ঘোষণা এখন পর্যন্ত বলবত আছে। টেলিভিশন এবং রেডিওতে পার্বত্য চট্টগ্রাম, বিশেষ করে উপজাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটিয়ে নতুন নতুন অনুষ্ঠানসূচীর ব্যবস্থা করা হয়। তারপর বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট এবং উপজাতীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়, তাদের মধ্যে আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য।

মাননীয় স্পীকার, এই সরকারই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য এলাকার তুলনায় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এই পাঁচ বছরে ২৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এবং এছাড়াও সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে ১৯০ কোটি টাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বরাদ্দ করা হয় অর্থাৎ মোট পাঁচ বছরে ৪৫২ কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সরকার গ্রহণ করেন।

মাননীয় স্পীকার, এই ছিল তাৎক্ষণিক এবং স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ। এরপর এই আলোচনাগুলি যখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছায় তখন ১৯৮৮ সালের জুন এবং সেপ্টেম্বর মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য একটি খসড়া রূপরেখা তৈরি করা হয়। এই খসড়া রূপরেখার উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা হয়। রাঙ্গামাটি এলাকায় নেতৃবৃন্দের সাথে অক্টোবর মাসের ৫, ১৭ এবং ১৮ তারিখে, বান্দরবান জেলার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অক্টোবর মাসের ৬, ২৯ তারিখে, নভেম্বর মাসের ৫ ও ৬ তারিখে এবং খাগড়াছড়ি এলাকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অক্টোবর মাসের ৮, ২২ ও ২৩ তারিখে চূড়ান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এইসব সভায় নীতিগতভাবে কতগুলি সিদ্ধান্ত সমঝোতার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। এরপর যখন এই সিদ্ধান্তগুলি সরকার বিবেচনা করে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন, তারপরে রাষ্ট্রপতি উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের দাওয়াতে তিনটি জনসভা করেছেন। আপনাদের হয়ত অনেকের মনে আছে, খাগড়াছড়িতে ৮ নভেম্বর, রাঙ্গামাটিতে ৯ নভেম্বর এবং বান্দরবানে ১০ নভেম্বর এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় স্পীকার, আমি এখানে জানাতে চাই যে, এই সভাগুলি সম্পূর্ণভাবে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে এই তিনটি জনসভার মতো এত স্বতঃস্ফূর্ত বিশাল জনসভা কোনদিন অনুষ্ঠিত হয় নি। এই সভাগুলির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ জনগণ এই সমঝোতার প্রতি সমর্থন জানান। রাষ্ট্রপতি যখন এই সমঝোতার ঘোষণা দেন তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁরা এই ঘোষণাকে গ্রহণ করেন।

আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার প্রেক্ষিতে তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, একটি হল পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত জাতীয় কমিটি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ৫ অক্টোবর ১৯৮৮ তারিখে। এখানে উপজাতীয়দের পক্ষ থেকে যাঁরা বৈঠকে যোগদান করেছেন, তাঁদের সকলের দস্তখত আছে। খাগড়াছড়ির সভাটি হয় ৮ অক্টোবর। খাগড়াছড়ির যাঁরা নেতৃবৃন্দ আছেন, তাঁদের দস্তখত এখানে আছে। এবং বান্দরবান জেলার সভা হয় ২০ অক্টোবর এবং সেখানে

www.pathagar.com

যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং সই করেছেন, তাঁরা সকলেই উপজাতীয় এলাকার মানুষের নেতৃবৃন্দ। তাঁদের সকলের সই নিয়ে এই চুক্তিগুলি হয়। যার ফলে রাষ্ট্রপতি সেইসব এলাকায় গিয়ে জনসভা করেন এবং সেই জনসভায় স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন তিনি দেখে আসেন। তারই উপর ভিত্তি করে এই আইনগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই তিনটি চুক্তিতে মোট ৫৪ জন উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করেছেন এবং ২৫টি উপজেলার চেয়ারম্যান এই চুক্তিগুলিতে স্বাক্ষর করেছেন। সবাই তাঁরা এইসব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, এখানে কথা উঠেছে যে, শান্তি বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে কি না। আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই যে, শান্তি বাহিনীর সঙ্গেও সরকারী নেতৃবৃন্দের আলোচনা হয়েছে। তাদের সাথে ৬টি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে ১০ দফা আলোচনা হয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ সালের এক বছরেই ৯ দফা আলোচনা হয় ৫টি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে। এর পরে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরকার যখন একটি সমঝোতায় আসেন, তখন ১৪ এবং ১৫ ডিসেম্বর এই রূপরেখার উপরে কিছু সংশোধনী এনে তারা একটি চিঠি লেখেন। এর পরে তাদের সাথে আবার বৈঠক হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তারা সেই বৈঠকে আসেন নি।

মাননীয় স্পীকার, আমি এখানে জানাতে চাই যে, গুটিকয়েক চরমপন্থী, মুষ্টিমেয় অস্ত্রধারী ব্যক্তি, যারা আমাদের সার্বভৌমত্ববিরোধী শক্তির মদদপুষ্ট, তারা এই বর্তমান রাজনৈতিক সমাধানের যে কাঠামো আমরা দিয়েছি তার সঙ্গে একমত নন, এটা ঠিক কথা। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় অস্ত্রধারী চরমপন্থী সার্বভৌমত্ববিরোধী শক্তির মদদপুষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমাদের বিরোধীদলীয় অনেক সংসদ-সদস্য বলেছেন যে, তাদের সঙ্গে না বসলে বা তাদের সঙ্গে কোন চুক্তি না হলে এই সমস্যার সমাধান হবে না, এই কথাটা ঠিক নয়। তার কারণ আমরা জানি যে, এই পদক্ষেপ নেওয়ার পর বান্দরবান, খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটির উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে, সাধারণ জনগণের মধ্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এই বিলগুলি যাতে সংসদে তাড়াতাড়ি আসে এবং আমরা যাতে এই সিদ্ধান্তগুলি খুব শীঘ্র বাস্তবায়ন করি সেজন্য তাঁরা আমাদের তাগিদ দিতে থাকেন। শিগগির আপনারা বিভিন্ন সংবাদপত্রে দেখতে পাবেন যে, এই মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামে series of meetings, উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ উপজাতীয় জনগণের সঙ্গে করছেন, জনসভা করছেন। তাঁরা আমাদের রাষ্ট্রপতির কাছে একটি আকুল আবেদন জানিয়েছেন যাতে করে এই আইন প্রণয়ন শিগগির করে আমরা যৌথ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করি। তাঁরা প্রতিরোধ কমিটি করেছেন যাতে করে যাঁরা এই আইন বাস্তবায়নে বাধা দেবে তাদেরকে প্রতিরোধ করা যায়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁরা একটি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছেন। সর্বস্তরের উপজাতীয় নেতার স্বাক্ষরযুক্ত খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার ১০১ জন উপজাতীয় নেতার স্বাক্ষরযুক্ত সমর্থনমূলক প্রতিবেদন সেখানকার জেনারেল অফিসার কমান্ডিংয়ের কাছে কাল রাত্রে তারা পেশ করেছেন।

প্রতিটি উপজেলা থেকে এইভাবে সমর্থন আসা শুরু করেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং আমি মনে করি যে, প্রস্তাবিত আইনগুলির অধীনে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এই মুষ্টিমেয় চরমপন্থী অস্ত্রধারী ব্যক্তিরা দুর্বল হয়ে যাবে এবং বিভক্ত হয়ে যাবে, স্তিমিত হয়ে যাবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জয় হবে এবং সরকারের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে। আমাদের দেওয়া এই রাজনৈতিক সমাধান স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত হবে এবং তার সুফল শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয় বাংলাদেশের জনগণ সকলেই ভোগ করবে।

মাননীয় স্পীকার, এই আইনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এটা একটি পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এটা হল এক নম্বর বৈশিষ্ট্য। এখানে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন, সদস্যরা নির্বাচিত হবেন, মনোনয়নের কোন প্রভিশন নেই এবং অপসারণ করারও সরকারের কোন ক্ষমতা নেই। কীভাবে অপসারিত হবে তার একটি নির্দিষ্ট পথ এতে দেওয়া আছে। উপজাতীয়দের নিজস্ব জীবনধারা যাতে তারা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তার জন্য উপজাতীয়দের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান হবেন—এই বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অনেকে discrimination-এর প্রশ্ন তুলেছেন যে, অ-উপজাতীয় এবং উপজাতীয় মধ্যে, সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদের কথা বলেছেন, equality before law-এর কথা বলেছেন। তার উত্তরে আমি বলতে চাই যে, আপনারা নিজেরাই অনেকে উল্লেখ করেছেন article 8, article 9-এর কথা, উল্লেখ করেছেন

www.pathagar.com

article 28-এর কথা। বলেছেন যে এই সংবিধানে রাষ্ট্রের যে কোন এলাকার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। এবং বিশেষ বিধি, rules and regulation করার ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। এবং সেখানে discrimination-এর aspect আর টেকে না। কারণ ঐ একই article-এর অধীনে এই অধিকারটা সরকারের জন্য দেওয়া আছে।

মাননীয় স্পীকার, এই বিলের আরও একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য হল যে, এই আইনের অধীনে যে বিধি তৈরি করা হবে সেই rules সরকার তৈরি করে দেবেন না। আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের কথা যদি চিন্তা করেন, জেলা পরিষদের কথা যদি চিন্তা করেন, উপজেলা পরিষদের কথা যদি চিন্তা করেন, পুরনো সব ক্ষেত্রেই প্রায় সরকারের intervene করার অনেক সুযোগ রয়েছে। এবং rulesগুলি সরকার তৈরি করে দেয়। কিন্তু এই পার্বত্য চট্টগ্রামে যাতে তাদের নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবন তারা নিজেরাই পরিচালনা করতে পারে সেজন্য এসব বিধি প্রণয়নের পূর্ণ দায়িত্ব এই স্থানীয় সরকার পরিষদের উপর অর্পিত করা হয়েছে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, বিচার ব্যবস্থা। বিচারে একটি পর্যায় পর্যন্ত অর্থাৎ তাদের নিজেদের উপজাতীয় বিরোধ, পারস্পরিক বিরোধ, ঐতিহ্যগত বিরোধ নিষ্পত্তি করার দায়-দায়িত্ব স্থানীয় সরকার পরিষদের উপর অর্পিত হয়েছে। সরকার বা আমাদের অন্যান্য জেলায় বিচার পদ্ধতির যে ব্যবস্থা রয়েছে সেটা পার্বত্য চট্টগ্রামের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে, এই আইনে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সকল বিষয়ে এই স্থানীয় সরকার পরিষদই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

মাননীয় স্পীকার, আমি এই লম্বা list পড়তে চাই না। কিন্তু আজকে যদি আমরা এটা দেখি তাহলে দেখব যে, কোন্ কোন্ বিষয়ে তাদের কর্তৃত্ব থাকবে তা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তফসিলে, বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলে সমস্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া আছে। পরিষদ কর্তৃক আরোপিত কর, ঋণ, টোল এবং ফি তাঁরা নিজেরাই তুলবেন এবং তাঁরা নিজেরাই খরচ করবেন।

আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল, Assistant Sub-Inspector-এর নিচে সমস্ত পুলিশই, constable এবং সাধারণ পুলিশ সবই উপজাতীয়দের মধ্য থেকেই নিতে হবে। এটা একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। যদিও তাঁরা দেশের সার্বিক আইনের অধীনে থাকবেন, কিন্তু তাঁদের পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার পরিষদের উপরই থাকবে।

আর finally, মাননীয় স্পীকার, এতদিন পর্যন্ত জমি হস্তান্তরের যে প্রতিবন্ধকতা ছিল, এই আইনের মাধ্যমে সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়েছে এবং সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ ও হস্তান্তর স্বাভাবিক এবং সহজতর হবে।

এই আইনসমূহ বাস্তবায়িত হলে জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং আইন-শৃংখলা অবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হবে। এই আইনের মাধ্যমে উপজাতীয়দের প্রথাগত সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জনগণের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ এই আইন বয়ে আনবে। এত দিনের অমীমাংসিত একটি সমস্যার সমাধানে রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। এই পদক্ষেপ সরকারের বাস্তবমুখী, গতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ বলে আমি আখ্যায়িত করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, আরেকটি কথা না বলে পারা যায় না। সেটা হল, যদিও অতীতে রাজনৈতিক সরকার এসেছেন এবং আমরা অনেকেই তার সঙ্গে জড়িত ছিলাম, কিন্তু এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ব্যবস্থা শত শত বছর পর আজকে এরশাদই করেছেন। তাঁর এই সুদূরপ্রসারী দূরদৃষ্টির জন্য আমি তাকে সংসদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন এবং মোবারকবাদ জানাই।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের সংসদ সদস্যরা বলেছেন যে, এই সমস্যার military solution নেই। আমরা সেজন্য military solution abandon করে political solution আনার ব্যবস্থা করেছি। এটা একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। বাংলাদেশ যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ সেটাই আজকে আমরা প্রমাণ করেছি, that we have solved our own problem।

আমরা অনেকেই এটা realise করতাম যে, এটার কোন military solution হতে পারে না, there could not be a military solution to Chittagong Hill Tracts, there had to be a political solution। আজকে এতদিনকার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সেই ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছি।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই সংসদ অধিবেশন, এই বৈঠক স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এই আইনসমূহ পাস করার জন্য।

মাননীয় স্পীকার, আমি আমাদের সামরিক বাহিনীকে, যাঁরা এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাদেরকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই এই সংসদের পক্ষ থেকে। সাধারণত এইসব সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সামরিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে আসে না। কিন্তু আজকে ironically হলেও, এটা সত্য কথা যে, আজকে সেই সমাধান দিতে তাঁরাই এগিয়ে এসেছেন। বিশেষ করে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের এই দুঃখ ভরা এলাকায় বছরের পর বছর স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরীরূপে কাজ করেছেন, আজকে সেই সৈনিকদেরকে আমার নিজের অন্তর থেকে লাখো সালাম জানাই।

মাননীয় স্পীকার, প্রতিটি জেলা পরিষদের জন্য প্রস্তাবিত এই আইন একটি comprehensive law. এটাকে বলা হয়, self-contained law। যদি এই আইনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েন তাহলে দেখবেন, এটাকে jurisprudence-এ বলা হয় self-contained law। অর্থাৎ এমনভাবে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি জেলার জনগণ, উপজাতীয় অ-উপজাতীয়রা সকলেই যাঁরা ওখানে বসবাস করেন, তাঁরা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের দেখাশুনা করতে পারেন, একটি কল্যাণমুখী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারেন, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, আমাদের সার্বভৌমত্ব এবং সংবিধানের কাঠামোর অধীনে থেকে নিজেদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারেন।

মাননীয় স্পীকার, এখানে অনেক সংসদ-সদস্য একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই যে, আমরা কারো ভয়ে বা কারো প্রভাবে এই আইন প্রণয়ন করি নি। এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এই দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য। এই সরকার একটি জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক সরকার যার জন্য এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে যে সাহসের প্রয়োজন সেই সাহসের পরিচয় এই সরকার দিতে পেরেছেন। আমরা নিজেরা আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, আমাদেরই নাগরিকদের কথা চিন্তা করে, আমাদেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঞ্চলের নাগরিকদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা চিন্তা করে, দেশের সার্বিক উন্নতির কথা চিন্তা করে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই আইনগুলি আজকে এখানে উপস্থাপন করেছি।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে বিরোধী দলের সকল সদস্যদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।*

*এই তিনটি বিল ১৯৮৯ সালের ৬ই মার্চ সংসদে পাস হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিনিয়োগের পথে সবচাইতে বড় বাধা হল আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা

বিনিয়োগ বোর্ড আইন, ১৯৮৯

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

১৯৮৬ সালে ব্যক্তি খাতের উপর জোর দিয়ে সরকার একটি উদার সুদূরপ্রসারী শিল্পনীতি ঘোষণা করে। কিন্তু শিল্পায়ন এবং বিনিয়োগের সবচাইতে বড় বাধা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। একটি শিল্প গড়ে তোলার জন্য একদিকে যেমন ব্যাংকের জটিল ঋণদান এবং অর্থায়ন প্রক্রিয়া প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, অন্যদিকে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা একজন উদ্যোক্তাকে জর্জরিত করে তোলে। তার কারখানা উৎপাদনে যাওয়ার আগেই রুগ্ন হওয়ার উপক্রম হয়। তাছাড়া আছে অনভিজ্ঞতা, অদক্ষতা এবং সরকারী কর্মকর্তাদের মন-মানসিকতা। সরকারের উর্ধ্বতন পর্যায়ে যতই ভাল নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক না কেন তার সুফল নির্ভর করে সেই নীতি এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উপর। তাই শিল্পায়নের প্রক্রিয়াকে সহজতর করা এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য এই যুগান্তকারী বিলটি উত্থাপন করা হয়। দেশে দ্রুত শিল্পায়ন নিশ্চিত করা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনের জন্য এই বিলের মাধ্যমে One-Stop Service বা Single-Roof Arrangement প্রবর্তন করা হয়। আইনের মূল প্রতিপাদ্য হল একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে একটি শিল্প গড়ে তোলার জন্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় বিভিন্ন ধরনের অনুমতি লাভের জন্য আর যেতে হবে না, বিনিয়োগ বোর্ড একাই সেইসব অনুমতি বা sanction দেবে এবং এ ব্যাপারে বোর্ডের আদেশ সরকারী আদেশ বলে গণ্য হবে। বেসরকারী খাতের আদলে বোর্ড একটি দক্ষ এবং আধুনিক মনোভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিল্পবিনিয়োগের জন্য facilitator হিসাবে কাজ করবে।

মাননীয় স্পীকার

আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিলের উপরে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। বিশেষ করে বিরোধীদলের মাননীয় সংসদ-সদস্যদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। একটা জিনিস পরিষ্কার হয়েছে, সেটা হল যে, আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক কারণে, প্রশাসনিক এবং আমলাতান্ত্রিক কারণে সরকার যে নীতি প্রণয়ন করেন সে নীতি বাস্তবায়নে আমরা প্রতিবন্ধকতা পাই, বাধা পাই, কিন্তু তার সাথে সাথে এটাও পরিষ্কার হয়েছে যে, এই প্রতিবন্ধকতা আমাদের নিজেদেরকেই দূর করতে হবে। আজকে বিনিয়োগ বোর্ড করার প্রয়োজনীয়তা কেন পড়েছে এটা সম্মানিত সংসদ-সদস্যরা নিজেরাই বলেছেন। আমরা অনেক নীতি প্রণয়ন করেছি, অনেক সংস্কার এনেছি, কিন্তু তারপরেও আমরা দেখেছি যে, আমাদের এই নীতি বাস্তবায়ন করার পথে কিছু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হই। দাবি করেছি, '৮৬ সালের শিল্পনীতি দেশে বিপ্লব আনবে, অর্থনৈতিক মুক্তি আনবে। কিন্তু যখন আমরা এই শিল্পনীতি বাস্তবায়ন করতে গেলাম তখন আমরা দেখলাম যে, আরও অনেক কিছু করার প্রয়োজন এই নীতিটাকে আরও দ্রুতগতিতে বাস্তবায়ন করার জন্য।

মাননীয় স্পীকার, আজকে আমি অনেক কিছু বলতে পারতাম এবং বলার সুযোগও রয়েছে, কিন্তু আমাদের সময়ের একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেইজন্য আমাকে খুব সংক্ষেপে মূল বিষয়টির উপর দু'একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে হবে। ১৯৮৬ সালের শিল্প-নীতিতে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। '৮২ সালে শিল্পনীতি দেওয়া হয়েছিল। তারপরে ১৯৮৬ সালে একটি উন্নততর বাস্তবভিত্তিক উদারনৈতিক শিল্পনীতি আমরা দিয়েছিলাম। এই শিল্পনীতিতে মাত্র সাতটি সাব-সেক্টর ছাড়া, অর্থাৎ arms ammunitions-equipments তৈরি, power generation, Tele-communitcation system, Civil Aviation, Atomic energy. Security Printing জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় public sector-এ রাখা হয়েছে যা অনেক

www.pathagar.com

উন্নত দেশেও public sector-এ রাখা হয়ে থাকে। এগুলি ছাড়া পুরো শিল্প খাতকে, বিনিয়োগ খাতকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এই শিল্পনীতির মধ্য দিয়ে।

এই শিল্পনীতিতে একটা অগ্রাধিকার লিস্ট আছে, আর একটি নিরুৎসাহিত তালিকা আছে। নিরুৎসাহিত তালিকা এই জন্য যে, যেসব শিল্প বেশি হয়ে গেছে সেখানে বিনিয়োগ করলে লাভজনক হবে না, সেইজন্য নিরুৎসাহিত করা। কিন্তু কোন শিল্পপতি যদি তাঁর নিজের টাকায় শিল্প করতে চান, তাহলে আমাদের বাধা দেবার কোন উপায় নেই। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে, এই নিরুৎসাহিত তালিকাভুক্ত শিল্পে নিজের অর্থে যদি কেউ বিনিয়োগ করতে চান, সেটা প্রযোজ্য হবে না।

তাই আজকে এই শিল্পনীতিটা সারা দেশে এবং বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। এর মধ্যে সমস্ত কিছুই প্রায় লেখা আছে যে, শিল্পে বিনিয়োগ কী করে হবে, sanction কী করে হবে। Programme of privatisation অর্থাৎ বেসরকারীকরণের যে কর্মসূচী আমাদের আছে তার সব কিছুই এটার মধ্যে আছে। Dispersal of industry অর্থাৎ কিভাবে সারা দেশে শিল্প গড়ে তোলা হবে সে কথাও লেখা আছে। ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের জন্য এই প্রথমবারের মতো অন্যান্য শিল্পের জন্য যে সুদের হার আছে, সেটা কমিয়ে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মতামতের বিরুদ্ধে আমরা সুদের হার ১০ শতাংশ নির্ধারণ করেছি আমাদের এই শিল্পনীতির মাধ্যমে। আমাদের শিল্পের এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্পের কী অবস্থান হবে এবং কীভাবে আমাদের দেশে শিল্পকে ত্বরান্বিত করবে তার সমস্ত indication এই শিল্পনীতিতে রয়েছে।

কিন্তু, মাননীয় স্পীকার, আমরা তারপরেও দেখেছি যে, ব্যাংকের অর্থ বাদ দিয়ে নিজের অর্থে শিল্প করতে চায় এমন উদ্যোক্তার সংখ্যাই বাংলাদেশে বেশি। For your information, আমি বলতে চাই যে, যাঁরা ব্যাংক থেকে অর্থ নিয়ে, বিশেষ করে প্রকল্প সাহায্য নিয়ে, শিল্প করেন তাঁদের তুলনায় যারা নিজের অর্থে আজকে শিল্প করেছেন তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশি। তবে চলতি মূলধন সকলকেই ব্যাংক থেকে নিতে হয়। কারণ এটা একটা standard practice of business operation।

মাননীয় স্পীকার, আমার টাকা আছে আমি শিল্প করব, এইভাবে শিল্প করতে গেলে কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তারপরেও আমরা দেখেছি, তাকে অনেক জায়গায় যেতে হয়, যেমন, তার জমির দরকার, সেজন্য তাকে 'রাজউক', Works Ministry, D.C. A.D.C. (Rev) এদের কাছে যেতে হয়। তারপর বিদ্যুতের জন্য যেতে হয়। কারখানা হয়ে গিয়েছে, শিল্প দাঁড়িয়ে গিয়েছে, শিল্প ব্যাংক হয়তো সেই শিল্পের জন্য ৫ কোটি টাকা দিয়েছে, কিন্তু বিদ্যুতের লাইন পাচ্ছে না, এই বিদ্যুতের লাইন পাওয়ার জন্য তাকে আর একটা department-এ যেতে হয়। এই রকমভাবে raw material import করার জন্য licencing board-এর কাছে যেতে হয়। তারপর public limited company করতে হলে তার যে নিয়ম আছে তার অনুমোদন পাওয়ার জন্য Controller of Capital Issues-এর কাছে যেতে হয়। এইভাবে, প্রায় ১৫ থেকে ২০ জায়গায় এই শিল্প উদ্যোক্তাদের যেতে হয় তার শিল্প স্থাপন করার জন্য। বেশি জায়গায় যাওয়া মানে বেশি বাধা, বেশি হয়রানি, বেশি দুর্নীতি এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা।

আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা কী? উদ্দেশ্যটা হল দেশে শিল্পায়নের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা, পুঁজি বিনিয়োগের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা, একটা আস্থা, একটা বিশ্বাস সৃষ্টি করা। এটাই হল সরকারের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। এই নীতি একটা দর্শন। এটার উপর এখন আলোচনা করার সময় নেই। আমি যখন রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর বক্তব্য রাখব তখন সেই বক্তব্যে আমি চেষ্টা করব এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে। এই সরকারের একটি অর্থনৈতিক দর্শন রয়েছে এবং সেই দর্শনের উপর ভিত্তি করে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, এবং এই নীতিকে সফল করার জন্য আজকে আমাদেরকে এই বিনিয়োগ বোর্ড তৈরি করতে হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দুটি স্বীকৃত পথ আছে। একটি হল regimented পথ যেখানে all means of production will be controlled by the state, আর একটা হল democratic economy যেখানে ব্যক্তি উদ্যোগ, ব্যক্তি প্রতিভা, ব্যক্তি ইচ্ছা, ব্যক্তি স্বপ্ন, ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

www.pathagar.com

আজকে দুনিয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, যেসব দেশ উৎপাদনের সমস্ত যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তারাও নিজেদেরকে সংশোধন করছে। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের দেশের অভ্যন্তরের মানুষের মধ্যে যে শক্তি আছে, সেই শক্তিকে তারা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারেন নি, যার জন্য আজকে তাদেরকে বেসরকারী খাতকে শক্তিশালী করার জন্য নতুন পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। তাই আজকে আমি মনে করি যে, বাংলাদেশের এই বর্তমান সরকার, এই দেশকে একটি সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে এই দেশের মানুষের মধ্যে যে শক্তি, যে প্রতিভা, যে উদ্যোগ, যে উদ্যম আছে, তাকে কাজে লাগানোর জন্য একটি পরিষ্কার শিল্পনীতি। এটাই হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলশক্তি আমাদের। এর মধ্যে অনেক দুর্বলতা থাকবে, অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকবে, অনেক ভুল-ত্রুটি থাকবে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক।

আমরা একটি নতুন সমাজ, নতুন স্বাধীনতা পেয়েছি। আমাদের expert-এর অভাব, আমাদের সম্পদের অভাব, আমাদের অর্থের অভাব, আমাদের প্রযুক্তির অভাব, আমাদের পুঁজির অভাব কিন্তু চেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। এই নীতি অনুসরণ করছি এবং এই নীতিকে বাস্তবায়ন করার জন্য এই বিনিয়োগ বোর্ড গঠন করতে হয়েছে, তার back ground-টা আমি আপনাকে দিচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, আমি এমনও উদাহরণ দিতে পারি যে, সরকারী টাকায় বা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির টাকায় যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান হচ্ছে, তাতে দু'বছর হয়েছে কারখানার মেশিনারি এসে গিয়েছে, দালান উঠে গিয়েছে কিন্তু বিদ্যুতের 'কানেকশন' পায় না। আমি কাকেও দোষারোপ করছি না। এটা system। আজকে আমাদের licencing boardগুলি সব নানা জায়গায়। বিদ্যুতের অফিস একটা, ওয়াসার অফিস আর একটা। এছাড়াও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত আর একটা clearance নিতে হয়। তার অফিস হল আর একটা জায়গায়। কোন যন্ত্রপাতি যদি ধারে আনতে চান, তার জন্য একটা আলাদা কমিটি আছে। আজকে টেলিফোনের জন্য টেলিফোন-মন্ত্রীর কাছে প্রধানমন্ত্রীকে recommend করতে হয়। আজকে আমরা এই অসুবিধাগুলিকে দূর করতে চাই। এগুলি দূর করার জন্য আজকে আমাদেরকে এই বোর্ড গঠন করতে হচ্ছে। Single roof system-এ যেতে হয়েছে, one-stop service-এ যেতে হয়েছে, আইন করতে হয়েছে। এতদিন এটা মৌখিকভাবে ছিল, high powered facilities board ছিল, কাজ হয় নি। অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমাদেরকে এইসব জিনিস শিখতে হবে। এটা overnight শেখার কোন উপায় নেই। There is no short cut way for development। উন্নয়নের কোন সংক্ষিপ্ত পথ নেই।

মাননীয় স্পীকার, আজকে সেজন্য এই single roof system-এর ব্যাপারে আপনারা যদি ১১ ধারার (৪) এবং (৫) উপ-ধারা দেখেন, তাহলে দেখবেন যে, এই বিনিয়োগ বোর্ড, অর্থাৎ একই সংস্থার মাধ্যমে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। অর্থাৎ জমি বরাদ্দ, supply and credit-এর ব্যবস্থা, তারপর বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়ঃপ্রণালী, টেলিযোগাযোগ, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ এবং কাঁচামালের ক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্রকরণ, পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত ছাড়পত্র এই বিনিয়োগ বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করবে। কী করে করবে? এই আইনে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সে অধিকারের বলে করবে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই আইনে তাদের এই ক্ষমতাগুলি দেওয়া হয়েছে কি না যে ক্ষমতা ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের কাছে রয়েছে, বিদ্যুৎ বোর্ডের কাছে রয়েছে। হ্যাঁ, এই আইনের ১৪ ধারায় এটা পরিষ্কারভাবে বলা আছে। ১৪, ১৮, ৪ এবং ৫-এর বিভিন্ন ধারার মধ্যে এই সমস্ত ক্ষমতা এই বিনিয়োগ বোর্ডকেও দেওয়া হয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। এটাই হল বিনিয়োগ বোর্ডের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এখানে কোয়ালিটির ব্যাপার আছে, সেটার জন্য আরেকটা কমিটি ছিল। মোট প্রায় ১৩/১৪টি কমিটি, সংস্থা এবং বিভিন্ন দফতরের কাছে এই কাজগুলি থাকাতে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে, এর গতি কমেছে।

আজকে আশা করি এই বিনিয়োগ বোর্ড যদি তাদের উপর অর্পিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারে তাহলে সেইসব অসুবিধা অবশ্যই দূর হবে। কিন্তু এরপরেও মাননীয় স্পীকার, আপনার মাধ্যমে আমি জানাতে চাই যে, আমাদের আরও ২টি সমস্যা থেকে যাবে এই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে। একটি হল, ব্যাংক ব্যবস্থা, অর্থায়ন ব্যবস্থা। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করার কথা সরকার চিন্তাভাবনা করছেন যাতে করে দেশের কৃষি এবং শিল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে এখন যে সব অসুবিধা

www.pathagar.com

রয়েছে সেগুলি দূর করা যায় এবং সেটা আমাদের করতে হবে। আর একটি অসুবিধা আমাদের আছে সেটা হল আমদানী-রপ্তানী ক্ষেত্রে। অর্থাৎ এখন যাঁরা এটা নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁদের পদ্ধতি আরও সহজতর করতে হবে যাতে করে এই আমদানী এবং রপ্তানীর ক্ষেত্রে আমাদের যেসব অসুবিধা আছে সেগুলি দূর করে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, শিল্পায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। আপনারা অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে, শিল্পায়নের জন্য কতকিছু করা হচ্ছে, কিন্তু বিনিয়োগ কেন বাড়ছে না? সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য আজকে এই বিনিয়োগ বোর্ডকে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে আমরা অব্যাহত রাখতে চাই।

আজকে আর একটি কথা আপনারা বলেছেন যে, ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের জন্য এই বিনিয়োগ বোর্ডে তেমন কোন বিধান রাখা হয় নি। এটা ঠিক নয়। এই বিনিয়োগ বোর্ড বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্পকে কিছুটা সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু আমি আপনার মাধ্যমে ঘোষণা করতে চাই যে, ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের বিকাশ এবং সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিনিয়োগ বোর্ডের মতো অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের একটি প্রস্তাব আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। আশা করা যায়, অতি অল্প দিনের মধ্যে আমরা আপনাদের এই বিশেষ উদ্বেগের অবসান ঘটাতে পারব।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের নীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমরা আমদানীর বিকল্প import substitute, export oriented and labour intensive শিল্পের উপর জোর দিচ্ছি। আমার কাছে অনেক তথ্য আছে আমি আপনাদের দিতে পারতাম এবং আমি কিছু বইপত্রও এনেছিলাম আপনাদের কাছে উল্লেখ করার জন্য। কিন্তু সময়ের অভাবে আমার পক্ষে এটা করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

আমি এইটুকুই বলতে চাই, দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য বিনিয়োগ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং বিনিয়োগ বোর্ডের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা সম্ভবপর হবে। বিনিয়োগ বোর্ডের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হলে দেশে শিল্প বিপ্লব আসবে, এটা একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। বেসরকারী খাতকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। বিনিয়োগ বোর্ড গঠন দেশী বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এই বিনিয়োগ বোর্ড সাহায্য করবে। এই আইন অর্থনৈতিক মুক্তির একটি সনদ হিসাবে আমাদের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

মাননীয় স্পীকার, দুই একটি কথাঁর উত্তর না দিয়ে পারছি না। প্রথমে নূরুল ইসলাম মনি সাহেব বলেছেন, এই বিলের উদ্দেশ্য এবং কারণ নেই। উদ্দেশ্য ও কারণ এখানে লিখিত আছে। এছাড়া আমরা সকলেই উদ্দেশ্য ও কারণ নিয়ে আলোচনা করেছি। সুতরাং, এটা ঠিক নয় যে, এটার উদ্দেশ্য ও কারণ নেই। ৩০ কোটি টাকা তিনি কোথায় পেলেন আমি জানি না।

প্রথম কথা হল, যদি কেউ নিজের অর্থ বিনিয়োগ করেন তাহলে বিনিয়োগ বোর্ডে যাওয়ারই প্রয়োজন নেই। এমনকি যৌথ উদ্যোগে যদি কেউ বিদেশ থেকে টাকা এনে শিল্প করতে চান এবং সেটা যদি ১০ কোটি টাকার উর্ধ্বে না হয়, আর ৪৯% ভাগের বেশি শেয়ার বিদেশীদের না হয় তাহলে তাকেও এই বিনিয়োগ বোর্ডে যেতে হবে না। কিন্তু তাঁরা যেসব ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হবেন, যেমন জমি, বিদ্যুৎ, টেলেক্স মেশিন ইত্যাদি যদি না পান, তাহলে এই বিনিয়োগ বোর্ড তাঁকে সহায়তা দেবে এবং একই sanction order-এ এই সমস্ত সুবিধাদি লিপিবদ্ধ থাকবে। এটা হল এই বিনিয়োগ বোর্ডের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই বিনিয়োগ বোর্ডের আদেশকে সরকারী আদেশ ধরে নিতে হবে। আগে শিল্প ডিপার্টমেন্ট একটি অর্ডার দিলে সেটাকে সরকারী অর্ডার হিসাবে ধরা হত না, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অর্ডারের প্রয়োজন হত। সেইজন্য এই বোর্ডের অর্ডারকে সরকারী অর্ডার হিসাবে ধরে নিতে হবে। আলাদাভাবে অন্য কোন মন্ত্রণালয়ের কাছে যেতে হবে না। সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই বিনিয়োগ বোর্ডই দেবে এবং সেই নির্দেশ বা চিঠি সরকারী চিঠি বলে গণ্য হবে।

মাননীয় স্পীকার, এখানে রুগ্ন শিল্পের কথা উঠেছে। একটি শিল্প রুগ্ন হয় নানা কারণে। এটা যদি মনে করা হয় চলতি মূলধন দিচ্ছে না বলে শিল্প রুগ্ন হয়ে গেছে—এটা ঠিক না। কারণ আমাদের উদ্যোক্তারা হলেন প্রথম জেনারেশনের উদ্যোক্তা। তাদের অভিজ্ঞতার অনেক অভাব আছে। প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং ব্যবস্থাপনায় অনেক রকম দুর্বলতা আছে। নিজের ভাইকে জেনারেল ম্যানেজার বানিয়ে

www.pathagar.com

দেন অথচ তার qalification নেই। Professional কাউকে manager করতে ভয় পান, কারণ যা কিছু অর্জন করেছেন তা যদি আবার হারিয়ে ফেলেন।

সেইজন্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, বিনিয়োগ প্রকল্পের মধ্যে দুর্বলতা থাকতে পারে, মূল্যায়নে থাকতে পারে, ওভার ইনভয়েসিংয়ে দুর্বলতা থাকতে পারে, নানা কারণে একটা শিল্প দুর্বল হতে পারে, রুগ্ন হয়ে যেতে পারে। তারপরও আমরা রুগ্ন শিল্পের উপর একটা study team, একটা consultancy firm appoint করেছিলাম। দেশীয় consultancy, বিদেশী নয়। সেই রিপোর্ট আমাদের কাছে এসেছে। আমরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি যে, কোন্ কোন্ কারণে কোন্ কোন্ শিল্পগুলিকে রুগ্ন শিল্প হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। একটা শিল্প বসে আছে, সেইজন্য তাকে রুগ্ন শিল্প বলা যাবে না, কারণ দেখা যাচ্ছে, সেই শিল্পে যে টাকা বিনিয়োগ হয়েছে, তার চেয়ে তিনগুণ টাকা মুনাফা করে এটার মালিক সাহেব এখন রুগ্ন declare করে আরও কিছু টাকা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। এরকম অবস্থাও আছে। সুতরাং, এসব ব্যাপারে একটি বিস্তারিত সমীক্ষা করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে আশা করি, অনতিবিলম্বে আমরা একটি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব।

মাননীয় স্পীকার, ব্যাংকের সুদ এবং ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আমি আগেই বলেছি, এটা আমরা চিন্তাভাবনা করছি কী করে ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস করা যায়।

শাজাহান সিরাজ সাহেব খুব একটা মূল্যবান কথা বলেছেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রসঙ্গে। তিনি বলেছেন, শিল্প বিনিয়োগের পরিবেশ নেই। আমার কাছে statistics আছে, এবং আমার কাছে আরও অনেক তথ্য আছে। শুধু এইটুকু বলি যে, সাত বছর এক সরকার এক নীতি অনুসরণ করে দেশ পরিচালনা করছে। এরচেয়ে বড় স্থিতিশীলতা দেশে আর কী আসবে? আর দেশে কোন্ সরকার আছে, এটা বড় কথা নয়। নীতি হল বড় কথা। কোন্ নীতি সরকার অনুসরণ করছে এটাই হল বড় কথা। এই নীতির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে, আজকে যে নীতি আমরা অনুসরণ করছি, একই নীতি আজকে বাংলাদেশে প্রচলিত আছে, অনুসরণ করা হচ্ছে এবং এই নীতিই পরিবেশ সৃষ্টি করার একটি অন্যতম লক্ষণীয় বিষয়।

জাপানে প্রতি দুই বছর সরকার বদল হয়। তার মানে এই নয় যে, ঐ দেশে স্থিতিশীলতা নেই। আছে। মালয়েশিয়াতে রাজা বদল হয়। থাইল্যান্ডে ঘনঘন সরকার বদল হয়। তার মানে এই নয় যে ঐ সব দেশে স্থিতিশীলতা নেই, তাদের নীতির স্থিতিশীলতা আছে। ভারতের কী অবস্থা চিন্তা করে দেখুন। খবরের কাগজ খুললে, ভারতের যে কোন কাগজ যদি খোলেন, দেখবেন, এবং শাজাহান সিরাজের মতো একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিও বলবেন না যে, ভারতে স্থিতিশীলতা আছে। কিন্তু আছে। এইজন্য যে, একই নীতি কার্যকর করা হচ্ছে, সেইজন্য। কারণ সরকার বদল হলেও সব সরকার এখন একই বিনিয়োগ নীতি অনুসরণ করছে।

বাংলাদেশ হওয়ার পর আমরা সম্পূর্ণ socialist transformation-এ চলে গিয়েছিলাম। তখন তাঁদের ক্ষোভ ছিল যে, কেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র করা হচ্ছে না। মানে আরও extreme নীতি অবলম্বন করা। মাননীয় স্পীকার, আমার মনে আছে, শাজাহান সিরাজ সাহেব, আ. স. ম. আবদুর রব সাহেবের দাবি ছিল, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র করতে হবে। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান যখন ২৫শে মার্চ '৭২ সালে সমস্ত শিল্প, ৯৫% industrial assets nationalise করলেন এবং ৮৫% banks and insurance companies nationalise করলেন by the stroke of a pen, they were not happy, these Hon'ble Members of Parliament were not happy। তাঁরা বলেছিলেন, it is not enough। আপনাকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র করতে হবে।

আজকে সেই শাজাহান সিরাজ সাহেব বলছেন, আমরা এক কোনা থেকে আর এক কোনায় এসেছি। আমরা এক কোনায় আসি নি। এখনও ৪০ শতাংশ শিল্প ইউনিট সরকারী খাতে রয়েছে। আমরা সরকারী এবং বেসরকারী খাতের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি। এটাই হল আমাদের এই সরকারের একটা অন্যতম নীতি। তবে সরকারী খাত এতদিন যেভাবে চলে এসেছে সেভাবে চলতে দেব না। তাদেরকে জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হবে। জবাবদিহির জন্য কঠোর নীতি অনুসরণ করতে হবে। তাদেরকে প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে। এটার উপরে এর আগেও আমি

www.pathagar.com

বক্তব্য রেখেছি, এর পরেও আবার রাখব। শুধু এইটুকুই এখন যথেষ্ট যে, 'extreme' থেকে আরেক 'extreme'-এ আমরা এখনও যাই নি।

উনি বলেছেন, আমরা আই. এল. ও. কনভেনশন ভঙ্গ করছি। এটা ঠিক নয়। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ আই. এল. ও. কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী নয়। কিন্তু বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ হয়েও, আমাদের অর্থনীতি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আমরা আই. এল. ও. কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী সদস্য। আমরা চেষ্টা করি এটা মেনে চলতে। কিন্তু শিল্প ক্ষেত্রে যদি আমরা শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে একটি ভাল সম্পর্ক বজায় না রাখতে পারি, তাহলে শিল্পায়নের যে নীতি আমরা গ্রহণ করেছি সেটাতে আমরা সফল হতে পারব না। সেইজন্য প্রয়োজন হলে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে, জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদেরকে compromise করতে হবে। কারণ I. L. O Convention is never above the sovereign law of Bangladesh। আমরা মানবো। কিন্তু আমাদের জাতীয় স্বার্থ যেখানে আসবে সেখানে আমাদেরকে কিছু কিছু compromise করতে হবে। এবং সেখানে আমি আশা করব, আমাদের বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দ সহযোগিতা করবেন যখন আমরা আগামী অধিবেশনে labour law amend করার জন্য বিল আনব।

আমরা এখন 1.2 billion dollar-এর রপ্তানী করি। One hundred and ten million people-এর জন্য এটা অতি ক্ষুদ্র। এই রপ্তানীকে বাড়িয়ে ৪ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার করা সম্ভবপর এবং করতে হবে এবং করা যাবে। কিন্তু এটার জন্য integrated যে strategyর প্রয়োজন সেটার অভাব আছে আমাদের মধ্যে। Government within government, fifty governments within one government যদি operate করে তাহলে এটা সম্ভবপর নয়। সরকারী খাত এবং বেসরকারী খাত এক হয়ে কাজ করতে হবে। জনগণ এবং সরকারের মধ্যে কোন দেওয়াল থাকতে পারবে না, তাহলে উন্নয়ন আসতে বাধ্য। যেসব দেশে উন্নতি এসেছে তারা এইভাবেই এনেছে।

মাননীয় স্পীকার, আজকে আ. স. ম. আবদুর রব সাহেব বলেছেন, 'হায় হায় কোম্পানি' 'খাই খাই রোগ'। একই ব্যক্তিরা উন্নয়ন বোর্ড, বিনিয়োগ বোর্ড চালাবেন। It is a very correct observation।

কিন্তু আমাদের উপায় কী? আমরা কি বাইরে থেকে মানুষ আনব? বাইরে থেকে মানুষ আনলে তারা কি আমাদেরকে নতুন পথ, ভাল পথ দেখাতে পারবে? কখনও নয়। আমাদের নিজেদের মানুষের ভেতর থেকেই এটা আসতে হবে। Orientation-এর প্রয়োজন। আজকে যদি আমরা চীন দেশের দিকে তাকাই তাহলে দেখব তারা কি বাইরে থেকে মানুষ এনে উন্নতি করছে? আজকে কি কোরিয়া বাইরে থেকে লোক এনে উন্নতি করেছে? ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখেন, পাকিস্তানের দিকে, শ্রীলংকার দিকে তাকিয়ে দেখেন, তারা যদি পারে আমরা কেন পারব না? সুতরাং আমাদের মানুষকে দিয়েই করতে হবে। এটা নির্ভর করে রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং মনোবলের উপরে। সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা ও মনোবল যদি থাকে, আর যদি বিরোধীদলের এবং বিরোধীদলগুলি যারা বাইরে আছেন তাদেরও যদি সমর্থন পাওয়া যায়, তাহলে সেটা অবশ্যই অর্জন করা সম্ভবপর হবে।

অভিযোগ হল, উনি বলেছেন, আমলা ছাড়া আমরা চলতে পারি না। এই সরকার আমলাভিত্তিক। মাননীয় স্পীকার, আমলা ছাড়া বিরোধীদল থাকে? বিরোধীদলের নেতা কোথায় যাবেন সেখানকার ডি. সি.-কে বলতে হয়। বিরোধীদলের নেতা অমুক জায়গায় যাবেন তার জন্য আমলাকে বলতে হয়। আমলাদেরকে special কোন position দেওয়ার জন্য আমি এই কথাটা সেদিন বলি নি। শুধু একথা বলেছি যে, এটা একটা institution। আমরা একটা institution, তারাও একটা institution। পুনর্বিন্যাস করতে হবে, পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের দেশের চাহিদা অনুযায়ী উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে ঠিক করতে হবে। কিন্তু যদি সরকারী দল আমলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, আমি মনে করি, বিরোধীদল বেশি না হলেও কম নির্ভরশীল নয় আমলাদের উপর।

মাননীয় স্পীকার আপনাকে ধন্যবাদ।*

---

*বিলটি ১৯৮৯ সালের ২রা মার্চ সংসদে পাস হয়।

www.pathagar.com

১১ কোটি মানুষের শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে

রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণের সমাপনী বক্তব্য

২ মার্চ ১৯৮৯

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই ভাষণে উত্থাপিত বিষয়সমূহ ছাড়াও এই বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদের নেতা হিসাবে দেশের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়। এই বক্তব্যে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, বন্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান, ভূমি সংস্কার, প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ, আমলা-রাজনীতিবিদের সম্পর্ক, প্রশাসনে পুরস্কার আর তিরস্কারের নীতি, বেসরকারী খাতের গুরুত্ব, সরকারী খাতের ভারসাম্য, ক্ষুদ্র শিল্প ও কর্মসংস্থানের প্রসার, রপ্তানীর সাফল্য ও সম্ভাবনা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নয়ন, বিশ্ব পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এবং তার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান—এই সকল বিষয়সমূহ একটি broader canvas-এ পর্যালোচনা করা হয়।

মাননীয় স্পীকার

রাষ্ট্রপতির মূল্যবান এবং সুন্দর ভাষণের জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আরও ধন্যবাদ জানাই তরুণ উদীয়মান পার্লামেন্টারিয়ান জনাব আহসান হাবিব লিঙ্কন এবং জনাব মনিরুল হক চৌধুরীকে, যাঁরা এই ধন্যবাদ প্রস্তাব এনেছেন প্রস্তাবক ও সমর্থক হিসাবে। বিরোধীদলের সকল সদস্যকে যাঁরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, অনেক মূল্যবান ও সারগর্ভ বক্তব্য রেখেছেন, বিশেষ করে বিরোধীদলীয় নেতাকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই তাঁদের সমালোচনার জন্য এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এই সংসদে উপস্থাপন করার জন্য।

মাননীয় স্পীকার, অনেকে বলেছেন যে, রাষ্ট্রপতির ভাষণে খুব বেশি নতুন কিছু ছিল না। রাষ্ট্রপতির ভাষণে অনেক নতুন সংস্কারের কথা উল্লেখ করা আছে। তিনি কৃষকদের কথা বলেছেন, কর্মসংস্থানের কথা বলেছেন, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনীতির কথা বলেছেন এবং আমাদের দেশে সর্বগ্রাসী বন্যা এবং বন্যাউত্তরকালে সরকার কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেছেন। আমি মনে করি যে, রাষ্ট্রপতির ভাষণে জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য তাঁর সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। রাষ্ট্রপতির ভাষণে একটি সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এইসব দিক-নির্দেশনা বিরোধীদলের না দেখারই কথা। কারণ, তাদের একটি অন্যতম কর্তব্য হল সরকারের সমালোচনা করা। Government is meant to be criticised। সেই জন্যই সরকার। তাতে আমরা মোটেও ভীতি বা লজ্জাবোধ করি না।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতির ভাষণে দেশের একটি ভয়াবহ সমস্যা সমাধানের অর্থাৎ বন্যা সমস্যার সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশনা রয়েছে।

যে বর্ষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খেলার সাথী ছিল, সেই পানি বন্যার কারণ হয়ে আজকে আমাদের জাতীয় জীবনের একটি অন্যতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার জন্য দেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে এই সমস্যার সমাধানের জন্য এই সরকার কী কী করবেন এবং করেছেন তার উল্লেখই রাষ্ট্রপতি করার চেষ্টা করেছেন। প্রশাসনের পুনর্বিন্যাসের জন্য রাষ্ট্রপতির নীতি নির্ধারণী ভাষণকে জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

মাননীয় স্পীকার, বন্যা এখন নেই, এখন শুষ্ক মৌসুম। এটা স্বাভাবিক যে, বন্যার যে ভয়াবহতা ছিল সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে, যতই আমরা স্মরণ করার চেষ্টা করি না কেন, এই মুহূর্তে যেহেতু আমাদের চোখের সামনে বন্যা নেই, আমরা সেটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি বা ভুলে যেতে থাকি। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ভোলেন নি। তিনি এই পার্লামেন্টের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে জাতিকে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, "আমি আগামী বর্ষা মৌসুমের আগে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করব যাতে করে এই বন্যার

www.pathagar.com

ভয়াবহতা থেকে বাংলাদেশের গরিব দুঃখী মানুষকে যারা অট্টালিকায় বসবাস করে তাদেরকে নয়, যারা কুঁড়েঘরে বাস করে তাদের জন্য আমি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করব। যাতে করে তাদের ফসল, তাদের ভিটেবাড়ি, বসতবাড়ি যেন ধুয়ে না চলে যায়, তাদের গরু-বাছুর যেন মারা না যায়, তাদের কোলের শিশু যেন জোয়ারের পানিতে ভেসে না যায়।" এই প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন।

আমরা ভুলে যাই যে, ১ লক্ষ ২২ হাজার বর্গ কিলোমিটারের জায়গা বাংলাদেশের মাটি পানির নিচে ছিল। আমরা ভুলে যাই যে, ৫ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ৩ থেকে ৬ সপ্তাহ যাবত পানির নিচে বসবাস করেছে। আমরা ভুলে যাই যে, ২৮ লক্ষ ঘর-বাড়ি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এ বন্যার সময়। আমরা ভুলে গেছি যে, ৭৫ লক্ষ একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। পাকা রাস্তা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে ২,৯৩৫ কিলোমিটার, ৫,১৯৩ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা নষ্ট হয়েছে।

এই যে সংস্কার করা, এই রাস্তাগুলিকে পুনর্নির্মাণ করা এবং ক্ষয়ক্ষতিকে পুষিয়ে তুলে জাতিকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া কত বড় একটা কঠিন দায়িত্ব যা এই সরকারের উপর অর্পিত হয়েছিল, এটা দেশের মানুষ সকলেই বোঝে। দেশে বিদেশে এই সমস্যা মানুষ অবহিত হয়েছে, সবাই সমস্যা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সমাধান করার জন্য, আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়েও এসেছে। এই ক্ষয়ক্ষতির ফলে দেশের প্রবৃদ্ধির হার কমে যাবে, আমরা যে প্রবৃদ্ধির হার, লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম ৫.৬ শতাংশ সেটা অর্জন করা সম্ভবপর হবে না।

আমাদের পরিকল্পনা অর্থাৎ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি বিরাট অংশ উন্নয়নের খাত থেকে সরিয়ে নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য খরচ করতে হয়েছে। এর একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমাদের অর্থনীতিতে দেখা দেবে, তাতে কি আমাদের কারোর মনে কোন সন্দেহ ছিল? আটশত কোটি টাকা আমাদের প্রত্যক্ষভাবে লোকসান হয়েছে। আজকে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট যেসব প্রকল্প আছে সেই প্রকল্পে আমাদের যে counterpart currency, যেটাকে বলি দেশীয় মুদ্রা, সেই দেশীয় মুদ্রা এই বন্যার কারণে আমরা মিটাতে পারছি না, যার জন্য অনেক পরিকল্পনা, অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হবে এবং এর ফলে অর্থনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া আমরা দেখব। এ বন্যা যখন হল, তখন দেশের মানুষের মধ্যে যে উদ্বেগের কারণ ঘটেছিল, বিদেশে তার চেয়েও বেশি উদ্বেগের কারণ ঘটে। বিদেশী এক পত্রিকায় লেখা হয়:

> "Hunger and disease looms large during Bangladesh flood. Behind flood, disease and hunger stalks Bangladesh. Little hope after the storm. Famine threatens Bangladesh. Only miracle can help, only miracle can help"

মাননীয় স্পীকার, আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমতে এগুলির কোন কিছুই বাংলাদেশে ঘটে নি। Miracle ঘটেছে এইভাবে যে এদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে সেদিনকার সেই সংকট মোকাবেলা করেছে। আর তার নেতৃত্ব দিয়েছে বর্তমান সরকার।

[হর্ষধ্বনি]

মাননীয় স্পীকার, আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য বিগত ৩ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদন পাবার সাথে সাথে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল প্যারেজ দ্য কুয়েলার, যিনি আগামীকাল বাংলাদেশ সফরে আসছেন, তিনি তাঁর বিশেষ দূত ত্রাণ সমন্বয়কারী হামিদ আসাদীকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন।

১৮ অক্টোবর ৬৪টি দেশের সর্বসম্মত প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে পাস করা হয়–বাংলাদেশের পাশে সারা পৃথিবীকে দাঁড় করানোর জন্য। ১৬ নভেম্বর জাতিসংঘে বিশেষ বৈঠক হয়, সেখানে আমাদের রাষ্ট্রপতি ভাষণ দিয়েছিলেন এবং তাঁর ভাষণের পর তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থাতেই সেইখানেই পাঁচশত মিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং দ্বিপাক্ষিকভাবে সাহায্য ও সহায়তার বিভিন্ন প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করতে থাকেন। আমাদের ইসলামী সম্মেলন, Non-Aligned Movement, Commonwealth, World Bank, ADB, SAARC পৃথিবীর এ ধরনের সমস্ত সংস্থা এসে বাংলাদেশের মানুষের পাশে সেদিন দাঁড়িয়েছিল। প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের বিশেষ দূত USAID-এর তৎকালীন প্রধান জে. মরিস বাংলাদেশে এসেছিলেন। ফরাসী দেশের ফার্স্ট লেডি মিসেস মিতেরাঁ এই বন্যার সময় বাংলাদেশের মাটিতেই ছিলেন।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, এরপরে ফরাসী দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, তাঁদের দেশের রাষ্ট্রপতি মিতেরাঁর দক্ষিণহস্ত মিস্টার জ্যাক আটালী এদেশে এসেছিলেন। তাদের দেশের হিউমেনেটেরিয়ান মন্ত্রী যিনি United Nations-এর বিশেষ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন–বার্নার্ড ক্রশনা আমাদের দেশে এসে গেছেন। International Monetary Fund-এর সভাপতি–তিনিও বাংলাদেশে এসেছিলেন।

মাননীয় স্পীকার, এসব কথা বলার প্রধান উদ্দেশ্য হল, বাংলাদেশের এই ভয়াবহ সংকটের সময় বাংলাদেশের সকল বন্ধু একটি ক্ষুদ্র, দরিদ্র দেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আজকে এই মহান সংসদে দাঁড়িয়ে তাঁদের সকলকেই আমি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতি আমাদের দেশের বন্যার দুটি সমাধানের কথা বলেছেন–একটি হল স্থায়ী সমাধান–যার জন্য প্রয়োজন আঞ্চলিক সহযোগিতা। এজন্য তিনি ভারতে গেছেন, নেপালে গেছেন, ভুটানে গেছেন, চীন দেশে গেছেন এবং জাতিসংঘের বিশেষ বৈঠকে গেছেন। ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসেও গেছেন। সেখানে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছেন। ফরাসী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন, তাৎক্ষণিক এবং মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করা।

মাননীয় স্পীকার, আবার যদি বন্যা হয় আমরা কী করব? আমাদের দেশে যদি ২৫ শতাংশ জমি পানির নিচে থাকে, যেটা প্রত্যেক বছর থাকে, আমরা তাকে বন্যা বলে আখ্যায়িত করি না। কিন্তু যদি ৪৫/৫০ ভাগ জমি পানির নিচে যায়, আমরা তাকে ভয়াবহ বন্যা বলে আখ্যায়িত করি। কিন্তু যদি তার চাইতে বেশি জমি পানির নিচে যায়, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিকভাবে বেঁচে থাকার আর উপায় থাকে না।

মাননীয় স্পীকার, Taming The Flood, কী করে বন্যাকে বশে বা নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, এটা অত্যন্ত একটি বিখ্যাত বই, Jeremy Hostpur-এর বই, এখানে Shakespear, Henry IV-এ বলেছেন :

"See how this river comes me cranking in,
And cuts me from the best of all my land
A huge half-moon, a monstrous candle out.
I'll have the current in this place damn'd up
And here the smug and silver tread shall run
In a new channel, fair and evenly;
It shall not wind with such a deep indent;
To rob me of so rich a totem here"

মাননীয় স্পীকার, T. S. Eliot in Four Quatrets-এ বলেছেনঃ

"I do not know much about gods; but I think that the river, is a strong brown god–sullen untermed and intractable."

এই বইতেই এক জায়গায় আছে:

"When the next flood comes," এক flood তো আমরা ১৯৮৭ সালে দেখেছি, আরেক বন্যা ১৯৮৮ সালে দেখেছি,

"As we manage our water courses in an effort to minimise such disasters, we owe it to our children to rebuild the rivers, so many of which have been devastated."

আজকে আমরা একটা ঠিক লক্ষ্য নিয়ে এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি যাতে আবার যদি গতবারের মতো বন্যা আসে তখন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হয়, যাতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কম হয়, যাতে গরু-বাছুর কম মরে, যাতে মানুষ, শিশু, বৃদ্ধ মহিলা কম মৃত্যুবরণ করে। এটাই হল প্রধান লক্ষ্য।

আপনারা অনেকে বলেছেন যে, আপনাদের এলাকায় 'হেলিপ্যাড' হয় নি। হবে, অবশ্যই হবে। 'হেলিপ্যাড' হবে, পুকুর খনন করা হবে, নদী ড্রেজিং হবে। এগুলিই এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, এই পরিকল্পনার দুটি দিক আছে। একটি হল, সারা বাংলাদেশের জন্য যে পরিকল্পনা; এটাতে সময় লেগেছে। অনেকে বলেছেন, এতদিন কোথায় ছিলাম? এগুলির সমীক্ষা করতে হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের এগুলিকে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে, পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে। এতে ২১,৩৮৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং ১৫ থেকে ২০ বছর সময় লাগবে, যে বৃহত্তর পরিকল্পনার কথা আমরা বলছি, self-reliant হওয়ার জন্য। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমাদের নিজেদের ভৌগোলিক সীমার অধীনে যে পানি সম্পদ আছে, আমরা যদি তাকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবহার করতে চাই, লালন করতে চাই এবং আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে চাই, অনেক অর্থের প্রয়োজন হবে। আর "বৃহত্তর ঢাকা শহর বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প"–এর জন্য দেওয়া হবে ৩০০ কোটি টাকা এবং প্রথম পর্যায়ে খরচ হবে ১২৫ কোটি টাকা।

কোত্থেকে আসবে এ টাকা? বক্তৃতা দিলে আসবে? বক্তৃতা দিলে আসবে না, শ্লোগান দিলেও আসবে না, নোট ছাপালেও লাভ হবে না। এই সম্পদ হয় আমাদের নিজেদের মধ্য থেকে আহরণ করতে হবে, তা না হলে কর্জ করতে হবে। মুখে বলা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গেলে যে ঐক্যের প্রয়োজন হবে, যে রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রয়োজন হবে, যে mobilisation-এর প্রয়োজন হবে, সেটা আমাদের সকলকে দলমত নির্বিশেষে আয়োজন করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, প্রতিটি বক্তৃতায় এসেছে যে, কৃষকদের জন্য কী করা হয়েছে? তার যদি লম্বা ফিরিস্তি দিই তাহলে অনেক সময় লাগবে। কৃষিখাতে, কৃষকদের উন্নয়নের জন্য সংস্কারগুলি যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি সাধিত হবে।

আমরা যখন একটা ভাল কাজ করে ফেলি, তখন আর সেই ভাল কাজ সম্পর্কে কথা বলি না। আমরা ভুলে গেছি যে, এই দেশের বর্গাদারদের জমি তিন মাস পর পর হস্তান্তর হত। জমির মালিকরা কীভাবে ছিনিমিনি খেলতো বর্গাদারদেরকে নিয়ে। আজকে ৫ বছরের চুক্তি করতে হবে বর্গাদারকে তার জমি ভোগ করার জন্য। তার উৎপাদিত ফসলের অংশ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। 'তেভাগা আন্দোলন' করেছেন আমাদের ওদুদ চৌধুরী, হাজী দানেশ–এঁদের মতো ব্যক্তিত্বরা। আজকে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আজকে তিন ভাগের এক ভাগ ফসল কৃষক পাবে। অর্থাৎ বর্গাদার পাবে। আর তিন ভাগের এক ভাগ মালিক পাবে। আর যদি খরচ দু'জনেই দেয়, তাহলে সমপরিমাণে বাকি তিনভাগের একভাগ নেবে। আর যদি কোন একজন দেয় অর্থাৎ যদি কৃষক দেয়, তাহলে সে তিন ভাগের এক ভাগের পুরোটাই পাবে। অর্থাৎ কৃষক তিন ভাগের দুভাগ পাবে। আজকে এই জমির মালিকানা যেখানে ১০০ বিঘা ছিল সেখানে কমিয়ে ৬০ বিঘায় আনা হয়েছে।

ঠিকানা প্রকল্প–আজকে ৭ লক্ষ ২০ হাজার একর খাস জমি সরকারের কাছে আছে। ৩৬ হাজার একর জমি বণ্টন করা হয়েছে। এইগুলির মাধ্যমে যারা গৃহহীন ছিলেন ভূমিহীন ছিলেন, রাষ্ট্রপতি নিজে গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদেরকে একটা করে 'ঠিকানা' উপহার দিয়েছেন। এর চাইতে বড় উপহার সরকারের কাছ থেকে একজন গৃহহীন, ভূমিহীনের কাছে আর কী হতে পারে?

ঋণ সালিশী বোর্ড করেছি, অনেক সমালোচনা হয়েছে। মহাজনী ঋণে আজকে বাংলাদেশের কৃষককুল পর্যুদস্ত, বিপর্যস্ত। আমরা সবাই বলি ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়ছে, দারিদ্রসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু কী করতে হবে সেটা কেউ বলে নি এতোদিন। আজকে আমরা যদি এই ঋণ সালিশী আইন বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে এই প্রথমবারের মতো একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হবে এদেশের ভূমিহীনদের সংখ্যা রোধ করার জন্য এবং এদেশের দারিদ্রসীমার নিচের মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য।

মাননীয় স্পীকার, গ্রামের উন্নয়নের জন্য যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের সংস্কার সরকার এনেছেন, তাতে গত ৫ বছরে এক হাজার কোটি টাকা প্রত্যক্ষভাবে direct grant হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পল্লী উন্নয়নের জন্য গেছে। এছাড়াও অবকাঠামো তৈরি করার জন্য আরও ১৩১ কোটি টাকা গেছে। এটা কম কথা নয়। এই টাকার জন্য আমরা বিদেশী কোন সাহায্য পাই নি। বিদেশী কোন সাহায্য সংস্থা এর এক পয়সাও আমাদের দেয় নি। এটা সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অবদান, সরকারের তহবিল থেকে এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফল এর সুফল প্রত্যক্ষভাবে গ্রামের, পল্লী অঞ্চলের মানুষরাই পেয়েছে। যেসব এলাকায় ছোট্ট বাজার

www.pathagar.com

ছিল, গ্রাম ছিল, সেই গ্রামগুলি আজকে ছোট ছোট শহরে পরিণত হয়েছে। উপজেলার কেন্দ্রবিন্দুতে গেলে আজকে নতুন জীবনের চাঞ্চল্য আমরা দেখতে পাই।

আমরা প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এনেছি। আমরা নিম্ন পর্যায়ে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে পেরেছি, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে উপজেলা পরিষদ পরিচালনা করার এবং কোটি কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব তাদেরকে দিয়েছি। কিন্তু কেন্দ্রীয়ভাবে উচ্চ প্রশাসনিক পর্যায়ে আমরা সেই জবাবদিহিতার ব্যবস্থা এখনও স্থাপন করতে পারি নি।

Bureaucracy is a permanent institution, যেমন আমাদের politics একটা permanent institution, parliament একটা permanent institution। সেই জন্য আমাদেরকে পুনর্বিন্যাস কী করে করতে হবে, কীভাবে করলে ভাল হয় সেটা অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। আমি আপনাদের বলতে চাই যে, এই সরকারই প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে এই দেশে গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করবে।

Administration-এর concept কী? আমি ইংল্যাণ্ডের এক Cabinet Secretary-র diary থেকে পড়ছি, What do they think of the politicians? Diary-র একটি অংশে আছে, very interesting :

> Politicians are quite unfit for running the government. They are, however, very useful for ceremonial banquets, official openings, launch, unveillings and greeting foreign delegations...

অর্থাৎ Airport-এ যাবেন greet করতে বিদেশী মেহমানদের।
তিনি নিজেদের সম্পর্কে বলেন:

> ... having more time for the genuine work of government to those of us who have the proper training and experience.

This is what has been written in the diary of the British Cabinet Secretary, Sir Hamphrey Appleby, K. C. B., this is what they think of us। অবশ্য তাদের দেশ অনেক পুরনো, কিন্তু নিশ্চয়ই আমাদের অনেক সরকারী কর্মকর্তা আমাদের সম্পর্কে এরকমই চিন্তা করেন। আর যদি চিন্তা করেও থাকেন, তাহলে সেজন্য তাঁদেরকে আমি দোষারোপ করি না। এখানে আরও অনেক চমৎকার কথা লেখা আছে। জুনিয়র মন্ত্রীদের সম্পর্কে এখানে লেখা আছে যে, জুনিয়র মন্ত্রীরা শুধু সরকারের গুণগান গাইবেন। আর যদি মন্দ কিছু ঘটে যায়, তাহলে সেগুলির নিন্দা প্রশাসনের উপর চাপিয়ে দিবেন। আরও অনেক কথা লেখা আছে, যেটা না-ই বা বললাম। এটা শুধু একটা indication দিলাম।

মাননীয় স্পীকার, John Keneth Galbraith একজন নাম করা economist। তিনি বলেছেন যে, সরকার পরিচালনায়, আগেকার মতো সেই পুরনো ধাঁচের সরকার পরিচালনা করা তৃতীয় বিশ্বে সম্ভবপর নয়। তিনি বলছেন:

> The modern state, we may remind ourselves once more, is not the executive comittee of the bourgeoisie, but it is more nearly the executive committee of the technocrats...... responsible to people.

তিনি যে মূল কথা বলতে চান তা হচ্ছে, গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রশাসন পরিচালনা করলে, যেটায়, আমি বিরোধীদলের সঙ্গে একমত উন্নয়নের যে গতি, এখন যা আছে সেই গতি আরও শ্লথ হতে পারে, দ্রুত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। আর যদি আমরা উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহির একটি প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি স্থাপন করতে হবে। এবং এই জবাবাদিহির প্রশ্ন আসতে পারে যদি responsibility, দায়িত্ববোধ, obligation and accountability, commitment to work and commitment to people থাকে। 'commitment to people' না থাকুক, 'commitment to work' থাকলেই তো চলে। এটার জন্য প্রয়োজন হবে, একটি সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। সেটাই হবে জবাবদিহিতার একটি অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা, মূল চাবি-কাঠি।

www.pathagar.com

কী করে দায়িত্ববোধ বা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করবেন? যদি সংবিধান থাকে, যদি এই সংবিধানকে আরও জোরদার করা যায়, যদি জনপ্রতিনিধিদের হাতে আরও দায়িত্ব আসে, তাহলে public servantদের accountability will be almost automatic। সে জন্য প্রশাসনকে institution হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। তার পুনর্বিন্যাস ঘটাতে হবে, তাকে সুশৃঙ্খল করতে হবে, responsible political parties and leadership develop করতে হবে। শুধু বললেই হবে না যে, এই ডি. সি. আমার কথা শোনেন না বা অমুক অফিসার আমার কথা শোনেন না। শোনাটাই accountability নয়। That is not the barometer of accountability, এটাকে institutionalise করতে হবে।

Reward and punishment-এর concept আনতে হবে। আমাদের প্রশাসনে rewardও নেই, punishmentও নেই। কোন অফিসার যদি ভাল কাজ করেন, তাহলে তাঁর কোন আলাদা reward নেই। এমনও অফিসার আছেন, যিনি ১৮ বছর যাবত Deputy Secretary level-এ আছেন। তিনি ভাল কাজ করেন, কিন্তু একটা cadre-এর আওতায় তিনি পড়ে গিয়েছেন তাই promotion নেই। আর punishment যদি কাউকে দিতে চান তাহলে আমি, আপনি চলে যাব, তার পরেও দেখব যে, তার punishment হয় নি। কারণ, পদ্ধতিটা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার–দীর্ঘমেয়াদী। সুতরাং, প্রশাসনকে অবশ্যই পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা কী চাই, উন্নয়নের পথ কী? শাজাহান সিরাজ সাহেব বলেছেন এবং আরও অনেকেই এখানে বলেছেন যে, উন্নয়নের কোন পথ, কোন ছোঁয়া তিনি এই ভাষণের মধ্যে দেখতে পাননি। উনি দেখতে কোন দিন পাবেন না, উনার পক্ষে দেখা সম্ভবপর নয়। উনি যদি দিনের বেলা চোখ বন্ধ না করে ঘুমানোর চেষ্টা করেন আর বলেন যে উনি ঘুমাচ্ছেন, তাহলে উনি কোন দিন দেখতে পাবেন না।

আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক একটা দর্শন কার্যকর করার চেষ্টা করছি। একটি জিনিস আমাদের সবচেয়ে আগে মনে রাখতে হবে যে, আমরা গরিব দেশ। অনেকেই এখানে বলেছেন যে, ঋণের সুদ সব মাফ করে দিতে হবে। ঋণের সুদ সব মাফ করে দেন, তার চেয়ে বললেই পারেন যে, ঋণটাই ফেরত দেবেন না, মূল টাকাটাই আর ফেরত দেওয়ার দরকার নেই।

কিছুদিন আগে শাজাহান সাহেব আরও একটা ভাষণে বলেছেন যে, পল্লী অঞ্চলের সমস্ত কৃষকদেরকে রেশনে খাবার দিন। আমি হিসাব করে দেখেছি যে, তাতে বছরে আমাদের খরচ পড়বে ৮ শত ৫০ কোটি টাকা। উনি আমাদের টাকাটা দিন, আর তা না হলে উনি ফাইন্যান্স মিনিস্টার হোন আর আমাদের পল্লী অঞ্চলের সব মানুষকে কম পয়সায় রেশনে খাবার দিন, আমাদের কোন আপত্তি নেই। পারবেন না। টার্গেট তো রয়েছে, আমাদের সংবিধানেই টার্গেট রয়েছে। সেই টার্গেট তো আর এক দিনেই অর্জন করা যাবে না।

উন্নয়নের দু'টি পথই আছে। একটি হল regimented socialist economyর পথ, আর একটি হল democratic welfare economyর পথ। একটি হল state capitalism, আর একটি হল democratic capitalism। State Capitalism-এ all means of production state control-এ থাকবে। এটাই হল একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে তারা উন্নয়ন আনার চেষ্টা করেছে। আর একটি হল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তি উদ্যোগ এবং প্রতিযোগিতা।

আজকে বিরোধীদলীয় নেতা মিখাইল গর্বাচেভের বক্তব্য এখানে তুলে ধরেছেন। আমিও দুয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরছি, কী করে পৃথিবীতে পরিবর্তন আসছে। আজকে যারা রেজিমেন্টেড সোসাইটির মাধ্যমে দেশের মানুষের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেছিলেন ৬০ বছর পর তাদের নতুন পথ বেছে নেওয়ার কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। After 60 years of experience আজকে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন যে, তাঁদের নিজস্ব যে চিন্তাধারা এতদিন তাঁরা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছেন তার দ্বারা তাঁদের দেশের মানুষের ভেতর যে উদ্যোগ আছে, যে প্রতিভা আছে, সেগুলি তাঁরা ব্যবহার করতে পারেননি। মিখাইল গর্বাচেভ বলেছেন:

> An individual must know and feel that his contribution is needed, that his dignity is not being infringed, that he is being treated with trust and

www.pathagar.com

respect. When an individual sees all these, he then becomes capable of accomplishing much.

আজকে collectivism-এর কথা বলছে না, individual-এর কথা তারা বলছে। আকাশ পাতাল তফাত concept-এ, দর্শনে। তারপরে বলছেন:

We seek to affirm social justice for all, equal rights for all, one law for all, one kind of discipline for all, and high responsibilities for each. In short, we need broad democratisation of all aspects of society.

মাননীয় স্পীকার, এদিক থেকে আমরা খুব ভাগ্যবান। এই জন্য ভাগ্যবান যে, আজকে ব্যক্তি সম্মান, ব্যক্তিমর্যাদা কী করে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেটা আমাদের দেখতে হবে। এই যে ১১ কোটি মানুষ, এই মানুষকে কাজে লাগাতে হবে, এদেরকে কাজ দিতে হবে। এদের প্রত্যেকের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা আছে, একটি অসম্ভব শক্তি আছে। সেই শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সরকার নিজে দায়িত্ব নিয়ে ১১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে না, করতে পারে না। কিন্তু, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে যাতে প্রতিটি নাগরিক তার নিজের যে ক্ষমতা আছে, যে শক্তি আছে, তাকে কাজে লাগানোর একটি পরিবেশ পায়, একটি সুযোগ পায়। সেই ব্যবস্থা করার জন্যই আজকে আমরা এই নীতিগুলি গ্রহণ করেছি।

আমরা শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য, লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমরা ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের বিকাশ এবং সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য ২০০৫ সালে প্রতিটি জেলায় একটি করে শিল্পনগরী গড়ে তোলার কথা ছিল, সেটাকে আগে বাড়িয়ে এনে আমরা নব্বই সালের মধ্যে করতে যাচ্ছি। প্রতিটি উপজেলায়, যেসব উপজেলায় গ্যাস আছে, যেসব উপজেলায় বিদ্যুৎ আছে, যেসব উপজেলার সাথে শহরের পাকা রাস্তার সংযোগ আছে, সেইসব উপজেলাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়ে আমরা শিল্পনগরী স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এ বছরই প্রারম্ভিকভাবে ১০টি উপজেলাকে পরীক্ষামূলকভাবে নেওয়া হবে শিল্পনগরী গড়ে তোলার জন্য, যাতে করে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায় এই শিল্পনগরী গড়ে তোলা যায়।

পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের ব্যাপক ব্যবস্থা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ছোট ছোট কলকারখানা করতে হবে। ধোলাইখাল কনসেপ্ট আজকে বাংলাদেশে বিস্তৃত হয়েছে। আপনারা তো অনেকে জানেন না যে, আজকে বিভিন্ন জেলায় এই প্রকৌশলী এবং কারিগরি ছোট ছোট কারখানা আছে। Way side workshops রয়েছে। সেগুলিকে আজকে সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছেন। এই ধোলাইখালে ৫৬৫টি কারখানা আছে। তাদের ৩ বছর আগেও স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। এই শিল্পনীতি আসার পর আজকে আমরা তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছি। আজকে গিয়ে দেখুন, তারা কী তৈরি করছেন? কিন্তু, তাদের পথে বাধা আছে। বাধা দূর করতে হবে আমাদের। আমরা sub-contract করেছি। ১৬টি কর্পোরেশনের সঙ্গে sub-contracting agreement করেছি যে, তারা বাইরে থেকে জিনিস আনবে না। দেশে যে জিনিস তৈরি হবে সেটা দেশের এই ছোট ছোট ক্ষুদ্র কলকারখানা থেকে তৈরি করাতে হবে। এটা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে ৩০০ কোটি টাকার ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ, বাংলাদেশ যেটা আমদানী করে তার প্রায় ৯০%, বাংলাদেশে তৈরি করা সম্ভব এবং তৈরি করা হবে।

মাননীয় স্পীকার, অনেকে বলেছেন যে, বিনিয়োগ বোর্ড বা শিল্পনীতি করেছেন, কিন্তু বিনিয়োগ হয় নি। তার জবাবে আমি বলতে চাই যে, বিনিয়োগের জন্য আগে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আমরা এই সংস্কারগুলি করছি এই পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য। আজকে সেই পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আজকে যৌথ উদ্যোগে শিল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে এই মুহূর্তে ১১টি বড় বড় প্রকল্প; ৮,৪০০ কোটি টাকার এই প্রকল্প। শত শত বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ১১টি প্রকল্পে।

১৯৭৩ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ৮ বছরে ৪,০২৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১,৬০৮ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে ৩,০৪৭টি প্রতিষ্ঠানে ৮০২ কোটি টাকার বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হয়েছে। সেটা ছিল আট বছরের কথা। এই ১৯৮২ থেকে ১৯৮৮ এই ছয় বছরে ১৮,২৫৯টি প্রতিষ্ঠানে

www.pathagar.com

৫,১৯০ কোটি টাকার শিল্প অনুমোদন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত হয়েছে ৮,১৯১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই ছয় বছরে পূর্বের আট বছরের তুলনায় বিনিয়োগ ground level-এ হয়েছে দুই গুণেরও বেশি।

এতকিছু করার পরও আপনারা কি বলতে চান, বিনিয়োগ বাড়ে নি, কিন্তু এই বিনিয়োগ আরও বাড়বে। আপনার জেনে খুশি হবেন, আমি গতবার এখানে বলেছিলাম যে, বাংলাদেশে এখন V.C.R., V.C.P. assembled হয়। বায়তুল মোকাররমে গিয়ে বিদেশী V.C.R. পাবেন না, আপনারা যারা V.C.R. দেখেন, যখন কিনবেন, দেশীটাই কিনতে হবে। চার হাজার টাকা কম দাম। ২২ হাজার V.C.R. বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানী হয়েছে এ বছর। আরও শুনে খুশি হবেন, এই গত সপ্তাহে ভিয়েতনাম থেকে একটি দল এসেছিল, কিসের জন্য? তারা এসেছিল আমাদের ডিজিটাল PABX কেনার জন্য, এবং কোন্ খাত থেকে নেবে, প্রাইভেট সেক্টর থেকে নেবে, 5.5 million dollar-এর অর্ডার দিয়ে গেছে। আমাদের দেশের assembled PABX ভিয়েতনামে রপ্তানী করা হচ্ছে।

আর একটি সুখবর দেই। আপনারা তো জানেন না যে, আমাদের দেশে হাতঘড়ি assembled হয়। এক বছরের গ্যারান্টি দেবে। ৫২ টাকা খরচ পড়ে, ডিজিটাল ওয়াচ। বাজারে বিক্রি করে ১০০ টাকায়। কিন্তু এখন বিক্রি করছে ৩০০ টাকায়, কারণ competition নেই বলে। কিন্তু competition দ্রুত আসবে, যখনই মানুষ জানবে যে, electronic sector-এ সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার কথা অনেকে জানে না। আমরা ১০% duty করে দিয়েছি electronic components-এর উপর, যেটা কোন কোন ক্ষেত্রে ১৫০% ছিল।

কম্পিউটার, যেটাকে আমরা এখনও অচিন্তনীয় মনে করি। মনে করি যে, আমাদের দেশে এখনও তো কম্পিউটারের ব্যবহারই শুরু হয়নি। আপনারা জেনে খুশি হবেন অক্টোবর ১৯৮৮ সালে ২৮০টি বাংলাদেশে assembled কম্পিউটার পোল্যান্ডে রপ্তানী করা হয়েছে।

এটা আমাদের দেশের মেয়েরা করেছে। আপনার হয়ত বিশ্বাস হবে না। আরও সাত হাজার কম্পিউটার সোভিয়েত ইউনিয়নে রপ্তানী করার আলাপ-আলোচনা এই মুহূর্তে চলছে। এটা প্রাইভেট সেক্টর থেকে যাবে। ৫০০ কম্পিউটার এই বছরের মধ্যে United States-এ যাবে এই দেশ থেকে, অনেক নামকরা দেশে যাবে, পৃথিবীর খুব নামকরা কম্পিউটার।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের বেসরকারীকরণ নীতির অনেকে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু আমাদের বেসরকারীকরণ নীতির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী খাতকে মজবুত করার নীতিও রয়েছে। সরকারী খাতকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে টিকে থাকতে হবে। আমরা অনিয়ম, দুর্নীতি বন্ধ করতে চাই। এ ব্যাপারে, আমি একটা বইয়ের উল্লেখ করতে চাই। "Selling the State: Privatisation in Britain।" সবাইকে পড়তে বলছি। আমি যখন ইংল্যান্ডে পড়তাম, আমার একজন favourite কবি, W. H. Auden বলেছেন, "Private faces in public places are wiser and nicer than public faces in private places."

"Accountability in Public Sector"-এর, উপর, Sir Keith Joseph, খুব নামকরা অর্থনীতিবিদ, বলছেন:

> The main obstacle to full employment and prosperity is nationalisation. It is not the fault of those who work in the nationalised industries, but it is the immunity from fear of accountability which protects them from the necessity to adopt their performance constantly, to serve the public the customer profitably, in other words absence of accouatability in public sector.

তারা জিনিস তৈরি করে, বিক্রি করে না। গুদামজাত হয়ে আছে। কে ধরবে তাদেরকে? Who is accounntable? এই accountability আনতে হবে public sector-এ। এই accoutability আছে বেসরকারী খাতে, আমার কর্মচারী যদি কাজ না করে, তাহলে আমার দরকার নেই। এই accoutability public sector-এ নেই। এই accoutability আনতে হবে, তাহলেই public sector-কে প্রতিযোগিতামূলক করা সম্ভবপর হবে।

মাননীয় স্পীকার, আজকে সারা এশিয়াতে নতুন অর্থনৈতিক জোয়ার এসেছে। এই জোয়ার সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি আছে, একটি হচ্ছে:

www.pathagar.com

Is Asia set to become an independent growth region? It is indisputable that Eastern Asia has achieved exceptional growth in the past fifteen years.

আজকে এই যে আমাদের পূর্ব এবং দক্ষিণ এলাকার দেশগুলি আমাদের থেকে সকলেই পিছনে ছিল, কোরিয়ার কথা বলেন, ফিলিপাইনের কথা বলেন, ইন্দোনেশিয়ার কথা বলেন, থাইল্যান্ডের কথা বলেন, মালয়েশিয়ার কথা বলেন। আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তখনও জানতাম কোকো এবং রাবার তৈরি করে মালয়েশিয়া, সেই মালয়েশিয়া eight billion dollar-এর electronic goods export করেছে, 34% of their total export. কোরিয়া ১১ শতাংশ জমি চাষাবাদ করতে পারে। আর আমরা পৃথিবীর অন্যতম দেশ যেটা সবচাইতে ছোট দেশ, কিন্তু সবচাইতে বেশি জমি আমরা চাষ করতে পারি–এই region-এ, ৬৫ শতাংশ জমি। কিন্তু তারপরেও ঐ সকল দেশ আমাদের চেয়ে তিনগুণ বেশি ফসল ফলায় তাদের জমিতে। আমাদের মাটিতে সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনাকে যদি আমরা কাজে লাগাই তাহলে আমাদের উৎপাদন অনেকগুণ বাড়তে পারে।

কোরিয়ার population growth rate ২০ বছর আগে শতকরা তিন ভাগ ছিল, তাদের per capita income 84 dollar ছিল। আজকে তাদের per capita income হচ্ছে 2,800 dollars. তাদের population growth rate কমে 1.2%-এ পৌঁছেছে। তাদের natural resource বলতে কিছুই নেই। আমাদের তেল আছে, গ্যাস আছে, হার্ডরক আছে, কয়লা আছে। আমাদের কী নেই, নদীর পানি রয়েছে, বিরাট সমুদ্র সম্পদ রয়েছে, উপকূলীয় এলাকা রয়েছে, সবই রয়েছে। কিন্তু আমরা exploit করতে পারছি না। এই জন্য দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

আজকে, ৭৫ শতাংশ enrolment in schools কোরিয়া বাড়িয়েছে। ২৮ শতাংশ ছিল তাদের শিক্ষার হার। আজকে ৭৮ শতাংশে নিয়েছে। If they can do, why can't we?

মাননীয় স্পীকার, খাদ্য মজুদ, শুধু এই বারের জন্য না, এখন lean period, চিন্তার কোন কারণ নেই। ১২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুদ এই মুহূর্তে আছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ আছে 1.1 বিলিয়ন ডলার। প্রবাসী আয় গত ৬ মাসে হয়েছে ১৪শ কোটি টাকা।

এই সরকার আসার আগে বিদ্যুৎ ছিল ৬ শত মেগাওয়াট, ঢাকার demand meet করতে পারতো না। আজকে এই ৬ বছরে ১৪৫০ মেগাওয়াট ২৫০% আড়াইশ গুণ বাড়ানো হয়েছে। হাওয়াতে আসে নি, আসমান থেকে এসে কেউ এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করে যায় নি। সাবেক বিদ্যুৎ-মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ অবদান ছিল, খাটতে হয়েছে, পরিশ্রম করতে হয়েছে, professional attitude নিয়ে কাজ করতে হয়েছে বলেই এটা অর্জন করা সম্ভবপর হয়েছে। জন ফ্রেইড বলেছেন, যদি আমাদের মত অনুন্নত দেশকে আমরা দ্রুত উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে চাই তাহলে techno structure establish করতে হবে।

সড়ক নির্মাণ হয়েছে, ৫৫০০ কিলোমিটার রাস্তা ছিল, ১১শ' কিলোমিটার রাস্তা হয়েছে এই ৬ বছরে। ১৮০টি উপজেলার বিদ্যুতায়ন হয়েছে–পল্লী বিদ্যুতায়ন। আরও ১শ'টি উপজেলায় যাবে আগামী দুই-আড়াই বছরের মধ্যে। ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছে একশত কোটি টাকার উপরে। শিক্ষা খাতে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন গত ৬ বছরে বরাদ্দ ৪ গুণ বাড়ানো হয়েছে–চার গুণ।

দেশে দেশীয় শিল্পকে বাঁচানো এবং গড়ে তোলার জন্য আমরা শুল্ককর ও কাঠামোর যে পুনর্বিন্যাস করেছি তাতে সরকারের লোকসান হয়েছে ২২২ কোটি টাকা। কারণ আমরা কাঁচামালের শুল্ককর একেবারে কমিয়ে দিয়েছি। কিন্তু intermediate raw materialsটা বাড়িয়ে দিয়েছি, finished products-টা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়েছি।

মাননীয় স্পীকার আমার বক্তব্যের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমি এসে পৌঁছেছি। আজকে আন্তর্জাতিক পরিবেশ উত্তেজনামুক্ত হয়ে উঠেছে। এটা সবচেয়ে বেশি মঙ্গলজনক আমাদের মতো অনুন্নত দেশগুলির জন্য। সারা পৃথিবীর মানুষই এর ফায়দা পাবে। আমরা যারা অনুন্নত দেশে সংগ্রাম করছি মানুষকে বাঁচাবার জন্য, নিজেদেরকে বাঁচাবার জন্য, আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত ভাল সংবাদ।

আজকে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এজন্য আমরা দুই পরাশক্তিকে মোবারকবাদ জানাই কারণ উপরের দিকে tension কমলে, উত্তেজনা কমলে, নিচের দিকেও উত্তেজনা কমতে থাকে।

www.pathagar.com

ইরাক-ইরান যুদ্ধ আট বছর পর থেমেছে–প্যালেস্টাইনে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষিত হয়েছে। চীন-সোভিয়েট ১২ বছর পর আজকে summit level-এ সাক্ষাৎ করেছে। চীন ও ভারতের সাক্ষাৎ হয়েছে ২৬ বছর পর। পাকিস্তান-ভারত আজ ছয় বছর পর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সভা করেছে এবং বিশেষ করে একজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর পাকিস্তান আগমন এটা বহু বছর পর ঘটল। ১০ বছর পর আজকে আফগানিস্তানে যুদ্ধবিরতি হয়েছে। এসব ঘটনা একটার সাথে অন্যটি সম্পৃক্ত। কোনটিই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের গর্বাচেভ বলেছেন, 'আমরা আফগানিস্তানে আমাদের সৈন্য পাঠিয়ে পাপ করেছিলাম।' এই পেরেস্ত্রয়কা, গ্লাসনস্ট আর four point modernisation programme of China এগুলি সব কিছু মিলিয়ে আজকে সারা বিশ্বে একটি উত্তেজনামুক্ত ও একটি স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে আমরা আশা করতে পারি। এবং এর সুফল বাংলাদেশ অবশ্যই পাবে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিবেশও উন্নত হচ্ছে। যারা বেশি উন্নত দেশ তারা আজকে বুঝতে পারছে যে, পৃথিবীতে নতুন যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে তা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হবে, তা না হলে তাদের নিজেদের অর্থনীতি হুমকির সম্মুখীন হবে। New World Economic Order, গতবার Toronto Summit-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবছর প্যারিসে যে Summit হতে যাচ্ছে, এতে উন্নত এবং অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে সেই ব্যবধান দূর করার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা আমরা আশা করছি।

আজকে আমরা দেখি, pacific ring, বিশেষ করে Cino-Japanese pacific ring-এর দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় যে development হচ্ছে তার ফলে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আরও বেশি সহযোগিতা বাড়বে। আজকে ভিয়েতনামীরা আমাদের কাছ থেকে PABX নিয়েছে। This is an example যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই সহযোগিতা আরও জোরদার হবে।

মাননীয় স্পীকার, সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার জন্য আমরা জোর দিয়েছি। এটাকে আমাদের কায়েম করতে হবে এবং সুদৃঢ় করতে হবে। এবং আমাদের যে সংবিধান আছে সেই সংবিধানকে সুসংহত করতে হবে। এই গণতান্ত্রিক সরকারকে আমাদের সুদৃঢ় করতে হবে। গণতান্ত্রিক, গতিশীল, চাঙ্গা, উন্নয়নমুখী, কল্যাণকর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদিগকে কাজ করে যেতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, দেশের মূল সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সমঝোতার প্রয়োজন। আজকে আমি তাই আহ্বান জানাব, মৌলিক সমস্যার সমাধানের জন্য আসুন, আমরা জাতীয় পর্যায়ে সমঝোতা অর্জন করি, দল-মত নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্যকে বজায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আমাদের দেশের মূল লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করে আমরা কাজ করে যাই। আবেগ নয়, যুক্তি দিয়ে অর্থনীতিকে পরিচালনা করি।

বিরোধীদলের যিনি নেতা, তিনি আগে বলতেন ৫০০ আসনের একটি সংসদ দরকার। এখন আবার বলছেন ৯০০ আসনের একটি এন. ই. সি.– National Economic Council দরকার।

এটা আমি বুঝতে পারিনি। Kindly আমাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করবেন। I am a very ignorant man। আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। এন. ই. সি'র মিটিংয়ে আমরা মাত্র দু'শ' লোকও বসি না। সেখানে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয়। ৯০০ জন লোক বসে কী সিদ্ধান্ত নেবেন, কীভাবে নেবেন একটু বুঝিয়ে বলবেন। আর ৫০০ আসনের পার্লামেন্ট পেশাজীবীদের পার্লামেন্ট, যেটাকে আপনারা বলেন professionalদের নিয়ে গঠন করা হবে। আমরা সকলেই কোন না কোন profession থেকে এসেছি। সুতরাং এই বিষয়টিও আপনাদেরকে বুঝাতে হবে। তিনি নতুন একটা সংবিধান চান।

We will not do that. We will not tamper with the constitution. Constitution is a sacred dacument. You cannot play with this every time a new government comes.

এটা এমন একটা দলিল যে দলিলের উপর সহজে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

তবে যদি কোন দিন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়ে এই পার্লামেন্টে আসতে পারেন এবং article 142 মানতে পারেন; যেখানে বলা আছে সংবিধানের ৬টি articleকে পরিবর্তন করতে হলে আবার যেতে হবে গণভোটে, আপনারা তখন চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

www.pathagar.com

Nation will have to trust you, please go ahead with your programme.

আ. স. ম. আবদুর রব সাহেব আমার নিকট স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চেয়েছেন। স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি–জন্ম, মৃত্যু–আল্লাহ্ তায়ালার হাতে। আপনি যদি স্বাভাবিক মৃত্যু চান, আমি আপনাকে অনুরোধ করব, ৩০ দিন রোজা রাখুন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ুন, এ বছর গিয়ে হজ্ব করে আসুন এবং এই ৯০০ সদস্যবিশিষ্ট, ৫০০ সদস্যবিশিষ্ট এই সব বাদ দিয়ে ঈমান আনুন। তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই আপনার জন্য একটি স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি দেবেন।

তবে জনাব আ. স. ম. আবদুর রব সাহেবকে একটি ব্যাপারে অবশ্য ধন্যবাদ না দিলে আমি অন্যায় করব। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে আপনারা অংশগ্রহণ করে গণতন্ত্র এবং সংবিধানকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছেন। এজন্য আপনারা যে সাহসিকতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য আমি আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমাদের দেশে এই যে relief culture, অর্থাৎ বিনা পয়সায় পাওয়ার একটা সংস্কৃতি develop করেছে, আপনারা যদি responsible opposition হন, which you claim to be, তাহলে আপনাদেরকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। কোন দিন এই দেশ, এই জাতি আত্মনির্ভরশীল, স্বাবলম্বী হতে পারবে না যতদিন পর্যন্ত আমরা এই relief culture থেকে মুক্ত না হব। কোন কিছু হলেই ঋণ মাফ—বড় লোকও ঋণ মাফ চায়, গরিব লোকও ঋণ মাফ চায়। ঋণের দরজা open করে দেবেন, সকলেই চাইবে। This is a very bad thing for the economy of the country.

আমাদেরকে কতকগুলি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই শ্রমিক এবং মালিকদের ব্যাপারেও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আত্মত্যাগ করতে হবে, কোন জাতি ত্যাগ স্বীকার না করে বড় হতে পারে না। তাই আমাদেরকেও sacrifice করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুন্নত অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্জন অনেক বেশি

১৯৮৯-৯০ সালের বাজেট

৫ জুলাই ১৯৮৯

সংসদ নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এটাই ছিল এই সংসদে আমার শেষ বক্তৃতা। আমি জানতাম আর কিছুদিন পরই সংবিধান নবম সংশোধনী বিল পাস হবে আর আমি দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নেব। গতানুগতিকভাবে সরকারকে defend করা ছাড়াও এই বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল আরও বৃহত্তর পরিসরের। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রায় সকল মৌলিক ইস্যুগুলি আলোচিত হয়েছে এই বক্তৃতায়। Myron Weiner-এর "The Politics of Scarcity", Amartya Sen-এর "Poverty and Famines", W.H. Auden-এর "Selling the State", Mikhail Gorbachev-এর "Perestroika"–এসব বই বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আলোচনায় আসে। এটা ছিল বাংলাদেশের ১৮ বছরে সংসদে উত্থাপিত ৯ম বাজেট, আর বাকি ৯টি বাজেটের সাথে কোন ধরনের জনপ্রতিনিধিদের সম্পর্ক ছিল না। এটা ছিল সংসদে আমার দীর্ঘতম বক্তৃতা যার সময়কাল ছিল ২ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

মাননীয় স্পীকার

আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আজকের এই সমাপনী ভাষণের পূর্বে আমি ধন্যবাদ জানাই সম্মানিত অর্থমন্ত্রীকে যিনি ১৯৮৯-৯০ সালের বাজেট উপস্থাপন করেছেন। এর সাথে সাথে আমি ধন্যবাদ জানাই বিরোধীদলীয় সম্মানিত সদস্যদের, তাঁদের মূল্যবান বক্তব্যের জন্য।

মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশের ১৮ বছরে এটা হল নবম বাজেট যা সংসদের মাধ্যমে পাস করা হচ্ছে। ১৯৭৩, ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সালে তিনটি বাজেট সংসদে উপস্থাপিত হয়েছিল। ১৯৭৯, ১৯৮০ এবং ১৯৮১ সালে আরও তিনটি বাজেট সংসদে উপস্থাপিত হয়েছিল এবং ১৯৮৭, ১৯৮৮ এবং এই বছর অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে আর তিনটি বাজেট উপস্থাপিত হয়েছে। এই তিনটি তিনটি করে ৯টি বাজেট তিনটি ভিন্ন সরকারের আমলে উপস্থাপিত হয়েছে।

আমি এই কথাটা এই কারণে বলছি, অনেকেই বলেছেন যে, এই বাজেট আগেকার বাজেটের মতই। আমি আমার বক্তব্যের কোন এক পর্যায়ে এর জবাব দেব। আমাদের অর্থমন্ত্রীকে কিছু কিছু কটাক্ষ করা হয়েছে। তিনি একজন সংবেদনশীল ব্যক্তি, একজন নিবেদিতপ্রাণ, একজন দেশপ্রেমিক। তিনি এসব কটাক্ষের পরোয়া করেন না। প্রফেসর ওয়াহিদুল হক একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ, বিদেশে ছিলেন। দেশের সেবা করতে এসেছেন আমাদের অনুরোধে এবং ইনশাআল্লাহ, তাঁর নেতৃত্বে তাঁর নতুন চিন্তাধারার আলোকে আমরা অর্থনীতিতে একটি দিক-নির্দেশনা স্থাপন করতে পারব। যে General Equilibrium Model -এর কথা তিনি চিন্তাভাবনা করছেন, সেই রকম একটি কাঠামো তিনি জাতিকে উপহার দিয়ে যেতে পারবেন।

মাননীয় স্পীকার, এটা সত্য কথা যে, এই বাজেটের ধাঁচ দেখলে মনে হবে যে, একই ধাঁচে তৈরি হয়েছে অন্যান্য বাজেট। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুণগতভাবে এই বাজেট অনেক ভিন্ন। এই বাজেটকে হিসাব-নিকাশের একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন হিসাবে দেখলে ভুল করা হবে, বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না। বাজেটকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারকে বাস্তবায়ন করার জন্যই এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে। এটা কোন গতানুগতিক বাজেট নয়, এর উত্তরও আমি আপনাদের পরে দেব। এটা কোন অঙ্ক বা যোগ-বিয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বাজেট নয়। এই বাজেট কতগুলি মৌলিক অর্থনৈতিক প্রশ্নে সরকারের বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, কোন দেশের কোন বাজেটই সকল শ্রেণীর মানুষকে খুশি করতে পারে না। আমাদের এখানে এটা আরও দুরূহ ব্যাপার। আমাদের মত একটি দরিদ্র দেশের একটি ক্ষুদ্র অর্থনীতিকে সুচারুভাবে পরিচালনা করা এত সহজ ব্যাপার নয়। কোন বাজেটই perfect নয়। আমাদের এই বাজেটও perfect নয়। এটা স্বীকার করতে আমাদের মনে কোন রকমের দ্বিধা নেই।

মাননীয় স্পীকার, এই বাজেটের দিক-দর্শনের বাস্তবায়ন ঘটলে দেশে সমৃদ্ধি আসবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে দেশ অনেকটা মুক্ত হবে। দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর শক্তি ও প্রতিভাকে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে, স্বাধীনতার সুফল অর্জিত হবে।

মাননীয় স্পীকার, আমার কাছে একটি বই আছে, এটা হল এমআইটির প্রফেসর মাইরন ওয়াইনারের "The Politics of Scarcity", আমি এই প্রফেসারকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তিনি এক জায়গায় বলেছেন:

> In an economy of scarcity, it is only common that every budget will be subjected to criticism, whatever the planners do.

Mr. Speaker, In a poor economy, budget will always be criticised as it cannot meet the needs of all people.

আর আমাদের তো সমালোচনা করবেনই।

Government is meant to be criticised. In a country when the scale of economy is poor, the only aim ought to be to expand the economy.

মাননীয় স্পীকার, আমরা যখন আমাদের বাজেট নিয়ে আলোচনা করি, বা দেশের যে কোন মৌলিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি, তখন আমাদের অতীত নিয়ে একটু আলোচনা করা উচিত। আমাদের এই দেশ, এই অঞ্চলের মানুষ কোনদিন স্বাধীন ছিল না। কেউ কেউ বলেন যে, ১২০০ শতাব্দীতে পাল বংশের অধীনে বাংলার একটি অংশ কিছুকালের জন্য স্বাধীন ছিল, কিন্তু আমরা যারা এই অঞ্চলের মানুষ আমরা কোনদিনই স্বাধীন ছিলাম না। হাজার হাজার বছর পর এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই সর্বপ্রথম আমরা এই এলাকার মানুষ নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করার দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করেছি। তাই, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি, যে দেশ আমরা জয় করেছি, এই দেশ অসংগঠিত ছিল। এই দেশে আমরা যে প্রতিষ্ঠানগুলি উত্তাধিকারসূত্রে পেয়েছিলাম, সেগুলি একটি স্বাধীন দেশের সমস্যা বা চাহিদা মেটানোর জন্য উপযোগী ছিল না। সেইদিক থেকে যদি আমরা বিচার করি, তাহলে দেখব যে, অনেক অনুন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্জন অনেক বেশি।

আমাদের দেশে দারিদ্র্য বিরাজমান। এই বাজেটে আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, নিচে মানুষের সংখ্যা এখন কমেছে অর্থাৎ অনেক মানুষের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এই সরকারের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের গ্রামে এবং শহরে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন কিছুটা ঘটেছে। কিন্তু যেহেতু আমাদের দারিদ্র্য অনেক গভীর, এত গভীর যে, কোন সাহিত্যিক, কোন ঔপন্যাসিক বা গল্পকারের পক্ষে তা সহজে তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। এই রকম দারিদ্র্য যেহেতু এখনও রয়েছে সেহেতু যতই আমরা উন্নতি লাভ করি না কেন, যেহেতু এই অভাব-অভিযোগ, এই ক্ষোভ, এই দারিদ্র্য এখনও চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে, তাই আমাদের কাছে মনে হয় যেন আমরা কোন উন্নতি লাভ করতে পারি নি। আসলে সে কথাটা ঠিক নয়।

মাননীয় স্পীকার, আমরা স্বাধীনতার সময় অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম, এ দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার থাকবে এবং দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। মূল এই দুইটি স্বপ্ন ছিল, যে স্বপ্ন দেখে আমরা এখানে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তাই এই দেশকে গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ আমাদেরকেই গ্রহণ করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাই, তাহলে আমরা ইতিহাসের কাছে দায়ী থাকব। আমরা কখনই আমাদের প্রজন্মের কাছে জবাব দিতে পারব না। নৈতিকভাবেও নয়, রাজনৈতিকভাবেও নয়।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের অর্থমন্ত্রী ৭০৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর বসিয়েছেন। মাথাপিছু বছরে এই কর হয় ৬৩ টাকা ১০ পয়সা। আর উন্নয়ন বাজেটে ৫,৮০৩ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এর মাথাপিছু খরচ হয় ৫২৭ টাকা ৬ পয়সা। অর্থাৎ যদি গড়ে প্রতি মানুষ ৬৩ টাকা দেয় এই করের জন্য, সরকার তাহলে খরচ করবে ৫২৭ টাকা। তার মানে প্রায় আটগুণের চেয়েও বেশি। কিন্তু এটা সামান্য একটি অঙ্ক, অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি বাজেট। তবে অনেকে সমালোচনা করেছেন যে, এই বাজেটে স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশি কর আরোপ আমরা করেছি। এ কথায় এটাই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের মানুষ এখন আগের চেয়ে আরও কর দিতে পারে। আমাদের অর্থনীতি যে আরও সবল হয়েছে আরও শক্তিশালী হয়েছে, এটা তারই প্রমাণ।

আপনারা অনেকে করের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সম্পদ কী করে বাড়বে, আর কোন্ কোন্ এলাকায় কর আরোপ করতে পারি, তার কোন সুনির্দিষ্ট সুপারিশ, বা সুনির্দিষ্ট কোন সমালোচনা এই সংসদে উপস্থাপন করা হয় নি। ঢালাওভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। আজকে মাননীয় স্পীকার, আপনি জানেন আমাদের tax payerদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। আপনারা বিদ্যুতের দাবি তুলেছেন, গ্যাসের দাবি তুলেছেন। অথচ শাজাহান সিরাজ সাহেব তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, কোন ট্যাক্সের দরকার নেই, কোন ট্যাক্স দেওয়া যাবে না। আর সবাইকে বিনা সুদে ঋণ দিয়ে দিতে হবে, এমনকি ঋণ সব মাফ করে দিতে হবে। আর বৈদেশিক সাহায্য আনা যাবে না। এসব কথা গ্রহণ করলে প্রশ্ন ওঠে তাহলে বিদ্যুৎ আর গ্যাস আসবে কী করে?

এই সংসদের বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁরা যে ভাষায় বক্তব্য রাখেন, তাঁদের কথার প্রতিধ্বনি এই সংসদের অভ্যন্তরেও আমরা পেয়েছি। কার উপর আমরা কর বসাব? কোন্ শ্রেণীর উপর আমরা কর বসাব? আমাদের তো ৯০ ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন এবং তাঁরা বেশির ভাগ গরিব, দরিদ্র। সুতরাং যাঁরা দিতে পারেন কেবল তাঁদের উপর tax বসাতে হবে। আগে প্রত্যক্ষ কর ১৬ শতাংশ ছিল, সেটাকে আমরা উন্নীত করে গতবার ২৯ শতাংশ করেছিলাম। কিন্তু সেটা আমরা অর্জন করতে পারি নি, তবে ২২ শতাংশে আমরা উন্নীত করতে পেরেছি। কাদের উপর আমরা এই করভার অর্পণ করব তার কোন সুনির্দিষ্ট জবাব আমরা পাই নি।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের বাজেটের বা অর্থনৈতিক নীতির two pronged strategy রয়েছে। একটি হল দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, আরেকটি হল simultaneously প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো। এই দুটি যদি আমাদের অর্থনৈতিক নীতির মূল কৌশল হয়, তাহলে মাননীয় স্পীকার, প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে, আমরা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কী করেছি? আজকে একদিকে এই দারিদ্র্য বিমোচন এবং আরেক দিকে প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে গেলে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর দিতে হয়। সেটা হল, আমাদের planning system এবং marketing system-এর মধ্যে একটি সমন্বয় আনতে হবে।

আমাদের কতকগুলি অবকাঠামোর দ্রুত উন্নয়ন করা প্রয়োজন যেমন রাস্তা, বিদ্যুৎ, সেচ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তারপরে আসে আমাদের দেশের জনসংখ্যা এবং শিক্ষা বিস্তার। এইগুলি একটির সাথে আরেকটি গভীরভাবে জড়িত। কিন্তু এই দারিদ্র্য বিমোচন, এটা কোন value judgement নয় মাননীয় স্পীকার। এটাকে value judgement হিসাবে দেখলে চলবে না। দেশের দারিদ্র্য বিমোচন মানে দেশে গরিব যারা তাদের জন্য কিছু করা, একটা দায়সারা নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে বিষয়টিকে দেখলে চলবে না।

Professor Amartya Sen in his book entitled 'Poverty and Famines: An Eassy On Entitlement and Deprivation', said:

> The view that 'poverty is a Value Judgement' has recently been presented forcefully by many authors. It seems natural to think of poverty as something that is disapproved of, the elimination of which is regarded as morally good. Going further, it has been argued by Mollie Orshansky, an outstanding authority in the field, that 'poverty like beauty lies in the eye of the beholder'. The exercise would then, seem to be primarily a subjective one, unleashing one's personal morals on the statistics of deprivation.

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, বিরোধীদলের সদস্যরা বলেছেন যে, এই বাজেটে আমরা পল্লী উন্নয়নের জন্য কিছু করি নি। মাননীয় স্পীকার, আমি এখানে হিসাব দেওয়ার সুযোগ পেলেও হিসাব-নিকাশে যেতে চাই না। তারপরও আমি যদি হিসাব দেখাই, তাহলে দেখব যে, আমরা যত টাকা খরচ করছি এর প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ সরাসরি পল্লীর উন্নয়ন এবং পল্লীর অর্থনীতির সাথে জড়িত। তারপরে শিক্ষার জন্য উন্নয়ন খাতেই আছে প্রায় ৩২৮ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য খাতে আছে ৩০৩ কোটি টাকা, পরিবার পরিকল্পনা এবং উপজেলা অবকাঠামোর জন্য আছে ২৩০ কোটি টাকা। এগুলি সবই গ্রামের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সুতরাং, এই বাজেটের একটি বিরাট অংশ, আমি বলব যে, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রকল্প ছাড়া, এই পুরো বাজেটের সব সুফলই এদেশের জনগণ যাতে পায় সেজন্যই এই বাজেট প্রণীত হয়েছে, এই পরিকল্পনার উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়ন কর্মসূচীর আড়াই গুণ বেশি। পল্লী উন্নয়ন এবং পল্লীর জনগণের সমৃদ্ধির জন্য সরকার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সেগুলি ইতিহাসের পাতায় একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় অধিকার করে থাকবে। এগুলি সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বলতে চাই না, শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, উপজেলায় প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে এই সরকার এপর্যন্ত এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। শুধু উপজেলার অবকাঠামোর জন্য ১৩০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকাটা কিসের জন্য দেওয়া হয়েছে? এই বরাদ্দ দিয়ে খুব কম উপজেলা আছে যার সাথে জেলার melatic road-এর সংযোগ করা হয় নি। আমরা যখন কোন কিছুর সুফল পাই, সেটা আমরা ভুলে যাই। আমরা আরও কিছু পাওয়ার আশায় নতুন কথা বলি, নতুন দাবি তুলি।

মাননীয় স্পীকার, আমরা ঋণ সালিশী বোর্ড করেছি, ভূমি সংস্কার করা হয়েছে, ঠিকানা প্রকল্প করা হয়েছে, অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত শিল্পনগরী স্থাপন করা হচ্ছে। এর প্রতিটি অংশের সঙ্গে পল্লীর এবং পল্লী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ভূমি সংস্কার কিসের জন্য করা হয়েছে? আমাদের দেশের গরিব কৃষকরা দিন দিন ভূমিহীন হতে চলেছে। ভূমিহীনদের সংখ্যা এতদিন কেন বেড়েছে? কারণ সামান্য একটু জমি, এই জমিকে বন্ধক রেখে টাকা ঋণ নিয়েছে। ঋণ ব্যাংকের কাছ থেকে নিতে পারে নি গরিব কৃষক, নিয়েছে উচ্চহারে মহাজনদের কাছ থেকে। আর ব্যাংকের কাছ থেকে যদি নিয়ে থাকে সেই ঋণ তারা যে কোন কারণেই হোক পরিশোধ করতে পারে নি। তারপর এই গরিব কৃষকের সম্পদ ব্যাংক ক্রোক করেছে, তাকে তার বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছে, তাকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এখন আমরা আইন করেছি যে কোন ঋণের দায়ে কোন কৃষককে তার বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। আজকে বর্গাদারদের পাঁচ বছর পর্যন্ত জমি চাষ করার চুক্তিভিত্তিক নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, ৬০ বিঘা পর্যন্ত জমির সিলিং করে দেওয়া হয়েছে; ফসলের তেভাগার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলি কৃষি এবং কৃষকের জন্য করা হয়েছে। আমরা চাই যে, পল্লীর মূল ভিত্তি, আমাদের অর্থনীতির যে মূল ভিত্তি, কৃষক সমাজ, তাদেরকে মজবুত রাখতে, তাদেরকে যেন ভেঙে ফেলা না হয়, তারা যেন আর ভূমিহীন না হয়, তারা যেন আর গৃহহীন না হয়, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যই এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে। সরাসরি পল্লী উন্নয়নের জন্য এবারও গত বারের তুলনায় বরাদ্দ অনেক বাড়ানো হয়েছে; গতবার বরাদ্দ ছিল ১৩০ কোটি টাকা, এবছর ২৬৫ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করেছি; প্রতিটি উপজেলায় ২৬১ জন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করেন; কোনদিন এটা ঘটেছে বাংলাদেশে? আমি যখন ছোট ছিলাম, গ্রামে একজন এল.এম.এফ. ডাক্তার পেতাম না খুঁজে। আজকে ৮ জন এম.বি.বি.এস. ডাক্তার প্রতিটি উপজেলায় আছে দেশের মানুষের সেবা করার জন্য। বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে যাঁরা প্রশ্ন তোলেন তাঁদেরকে জানতে হবে, প্রতিটি উপজেলায় প্রায় ১৮০ জন শিক্ষককে সরকার হয় প্রত্যক্ষভাবে, না হয় পরোক্ষভাবে ৭০% বেতন প্রদান করে থাকেন দেশের কোষাগার থেকে। আজকে এই কথাগুলি এখানে সবাইকে জানতে হবে।

জনাব শাজাহান সিরাজ সাহেব বলেছেন যে, সব ঋণ মাফ করে দিতে হবে। আমাদের অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, ঋণ মাফ করলে টাকাটা আসবে কোত্থেকে? শাজাহান

www.pathagar.com

সিরাজ সাহেবকে কালকেই আমরা অর্থমন্ত্রী বানাব; আমরা দেখতে চাই যে, তিনি কোত্থেকে টাকা এনে এই ঋণ মওকুফ করেন? পারবেন না, সম্ভবপর নয়, বিরোধীদলের বেঞ্চে বসে যে কথা বলা যায়, সরকারী বেঞ্চে বসে সে কথা বলা খুব কঠিন।

মাননীয় স্পীকার, আমরা এ বছর কৃষিঋণ দিয়েছি ৮১০ কোটি টাকা। কৃষিঋণের ব্যাপারে শাজাহান সিরাজ সাহেব যে বললেন সব কৃষিঋণ মাফ করে দিতে হবে। তিনি হয়তো জানেন না যে ঋণগ্রহীতাদের সংখ্যা আমাদের দেশে মাত্র ১৯.৯০ লক্ষ অর্থাৎ ২০ লক্ষ। এদের মধ্যে যারা ক্ষুদ্র কৃষক, প্রান্তিক কৃষক তাদের সংখ্যা ৫% হবে। কাদের ঋণ মওকুফ করার কথা তিনি বলেছেন? যারা surplus farmer, জোতদার, তাদের ঋণ মওকুফ করে দেবে সরকার? হবে না, করতে পারে না। সার্টিফিকেট মামলা ১ লাখ ৪৪ হাজার আছে। এই সার্টিফিকেট মামলাগুলোর কথা ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছেন যে, ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত যাদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা আছে, তাদের মামলাগুলি আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করা হবে। অর্থাৎ যারা ক্ষুদ্র, যারা প্রান্তিক কৃষক, যারা সত্যিকার অর্থে গরিব, দরিদ্র, তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সরকার একটি সংবেদনশীল সরকার, এই কথাটা মনে রাখবেন।

মাননীয় স্পীকার, আমরা তো ভুলে যাই নি কী অসম্ভব রকমের বন্যা আমাদের দেশে হয়ে গেছে ১৯৮৭ সালে এবং বিশেষ করে গত বছর ১৯৮৮ সালে। আমি জানি, বিরোধীদলের অনেক সদস্য বন্যার সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সকল বন্যার্ত মানুষের সেবায়। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, এই সময়টা ছিল সরকারের জন্য খুবই সংকটময়। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা দেখতে পারব যে, এই ধরনের সংকট আমাদের মত একটা গরিব দেশের জন্য মোকাবেলা করা সহজ নয়। কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশে একটি দক্ষ সরকার আছে, তার জন্য আমরা এটা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা ১৪ লক্ষ ৬২ হাজার টন গম এবং চাল বিনা পয়সায় তিন কোটি মানুষকে এই বন্যার পরেই দিয়েছি। এই খাদ্যশস্য আমাদেরকে জোগাড় করতে হয়েছে নিজস্ব আয় থেকে। উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে কেটে এনে ১,০০০ কোটি টাকার মত খাদ্যশস্য আমাদেরকে আমদানী করতে হয়েছে, নগদ টাকায় কিনতে হয়েছে। বিষয়টা এত সহজ ছিল না।

মাননীয় স্পীকার, আমরা ৮ দফা কর্মসূচী দিয়েছি। এই ৮ দফা কর্মসূচীর মধ্যে ৪টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। একটি হল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। ১৯৯৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছি। এখানে অনেক বিরোধীদলের সদস্যরা বলেছেন যে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সরকার ইচ্ছা করলেই পারেন। আমিও মনে করি এটা অর্জন করা সম্ভব। কেন মনে করি? কারণ অনেক দেশ আছে, যাদের কৃষিজমি অনেক কম। কিন্তু তাঁরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে প্রমাণ করেছে যে, অল্প জমিতেও অধিক ফসল ফলিয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব। কোরিয়ার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। মাননীয় স্পীকার, দক্ষিণ কেরিয়ার arable land হল মাত্র ১১%, আমাদের হল ৬৫%। কিন্তু তারপরেও তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ফসল ফলায় প্রতি হেক্টরে। তার কারণ তারা প্রতি হেক্টরে ৩৩০ কিলোগ্রাম সার ব্যবহার করে। আমরা আমাদের দেশে গড়ে ৪০ কিলোগ্রাম সার ব্যবহার করি প্রতি হেক্টরে। সুতরাং আমাদের মাটিতে সেই সম্ভাবনা, সেই উর্বরতা রয়েছে। আমরা অবশ্যই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার ক্ষমতা রাখি।

মাননীয় স্পীকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ হল আমাদের দেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তার সঙ্গে রয়েছে শিক্ষার সম্প্রসারণ আর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমরা যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছি সেটা আমার সহকর্মী উপ-প্রধানমন্ত্রী ডাঃ এম এ মতিন উল্লেখ করেছেন। আমি আর পুনরুল্লেখ করতে চাই না। যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, আপনার দেশের দুটি প্রধান সমস্যা কী কী? আমি বলব জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষার বিস্তার ঘটানো, শিক্ষার হার বাড়ানো। তবে দুটি বিষয়ে আমরা অনেক সফলতা অর্জন করেছি। আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৪% যখন আমরা দেশ স্বাধীন করি। এখন সেটা ২.২% নেমে এসেছে। রাষ্ট্রপতি এ জন্য জাতিসংঘের সনদ পেয়েছেন। U. N. Award পেয়েছেন এই জন্ম নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের জন্য। কিন্তু আমি বলতে

www.pathagar.com

চাই যে আমরা এতে খুশি নই। কারণ আমরা মনে করি যে আমাদের আরও সাফল্য লাভ করা উচিত। আমাদেরকে আরও দ্রুত জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং হার আরও কমাতে হবে।

শিক্ষিতের হার আমাদের ১৪% ছিল। এখন সেটাকে বাড়িয়ে ২৪% থেকে ২৬% পর্যন্ত করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে ২৯% পর্যন্ত করেছি। কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। কারণ, আমাদের দেশের তুলনায় যারা আমাদের চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে ছিল, তারা শিক্ষিতের হার আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়েছে, জন্মের হারও কমিয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, গতানুগতিক পদ্ধতিতে যদি আমরা এ দুটি সমস্যার সমাধান করতে চাই, তাহলে আমরা কেবল গতানুগতিক সাফল্য অর্জন করব। কিন্তু কোন miracle অর্জন করতে পারব না। সে জন্য নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। আরও যাঁরা সমাজে আছেন, যেসব সমাজসেবক, সংগঠক আছেন, তাঁদের সকলকে এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। জনগণকে সুসংগঠিত করতে হবে এই দুটি সমস্যার সমাধান করার জন্য। কারণ, আমরা যদি এটা করতে না পারি, এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে না পারি, তাহলে আমরা যতই প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে চাই না কেন, those will be eaten up by the increasing population।

শিক্ষিতের হার আমাদের বাড়ানো দরকার আরও একটি কারণে। আমাদের কৃষকরা একেবারে অশিক্ষিত, শ্রমিকরা একেবারে অশিক্ষিত। তাদের উৎপাদন ক্ষমতা যদি আমরা বাড়াতে চাই তাহলে তাদের জন্য সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে তারা নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আজকের দুনিয়াটা হচ্ছে প্রযুক্তির দুনিয়া। এই নতুন প্রযুক্তিগুলি তারা কখনোই গ্রহণ করতে পারবে না, তার সুফল তারা কখনই পাবে না, যতদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে অন্তত ন্যূনতম শিক্ষার আলো আমরা দিতে না পারি। আজকে এজন্য আমাদেরকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যদি আমরা ঐ দুই ক্ষেত্রে জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই তাহলে creative measures নিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য বীজের কথা বলা হয়েছে। আমরা বীজ কর্পোরেশন করার চিন্তা-ভাবনা করছি। এখন মাত্র ৫ শতাংশ বীজ সরকারের তরফ থেকে জনগণকে এবং কৃষকদেরকে দেওয়া হয়। কিন্তু এই দেশের যে সম্ভাবনার কথা আমি উল্লেখ করেছি, যদি আমরা কৃষকদেরকে উপকরণ দিতে পারি, তাহলে তারা সে সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করতে পারবে। এই কৃষকরা বার বার প্রমাণ করেছে যে, ছোট আকারের বিনিয়োগের প্রতিদানে তারা আমাদেরকে বিরাট বিরাট উপহার দিতে পারে। ১৯৮৭ সালের বন্যার পরে পুনর্বাসনের জন্য আমরা মাত্র ৫৮ কোটি টাকা খরচ করেছিলাম। কিন্তু তার বদলে আমরা ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বেশি পেয়েছি। এই বছর আমরা ৭০ কোটি টাকা দিয়েছি বন্যাউত্তর পুনর্বাসন কর্মসূচীর জন্য। এবার আমাদের খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টন। বন্যায় ক্ষতি হয়েছে আমাদের ৩০ লক্ষ টন। কিন্তু ৭০ কোটি টাকা খরচ করে ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমরা recover করেছি। আমি স্বীকার করি যে, এটা আমাদের একার বাহবা নয়, আমাদের একার কৃতিত্ব নয়। কিন্তু নীতি আমরা প্রণয়ন করেছি, অগ্রাধিকার আমরা দিয়েছি, খরচ আমরা করেছি এবং তার প্রতিদানে আমাদের কৃষকরা অত্যন্ত positive way-তে respond করেছে—এ কথাই বলতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, তারপর আসেন কর্মসংস্থানে। দেশের এক নম্বর সমস্যা বেকারত্বের অভিশাপ থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করতে হবে। এই মুক্ত করার জন্য অর্থনৈতিক নীতি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বোঝার প্রয়োজন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়র পর থেকে এতদিন নানা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়েছি, কিন্তু কোন সঠিক পথনির্দেশনা আমরা খুঁজে পাই নি। সরকার জাতিকে একটি সঠিক, সাহসী, সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়েছে যে, কোন্ পথে এগোলে আমরা এদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারব। কোন্ পথে এগোলে আমরা এদেশের অগণিত মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারব, এদেশের কৃষকদের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িয়ে অর্থনীতির চাকা ঘুরাতে পারব।

আমরা কী চাই মাননীয় স্পীকার? আমরা চাই, এই আধা-সামন্তবাদ ও ফটকাবাজ অর্থনীতির স্তর থেকে জাতীয় পুঁজি বা বুর্জোয়া স্তরে উত্তরণের পথে দেশকে নিয়ে যেতে। এই পথ কুসুমাস্তীর্ণ

www.pathagar.com

নয়। এটা এত সহজ নয়। উন্নয়নের দুটো স্বীকৃত পথ আছে—একটি হল, Regimented Socialist Economy, আর একটি হল Democratic Welfare Economy, অনেকটা Democratic Capitalism অর্থাৎ Free Market Economy।

মাননীয় স্পীকার, যারা all means of production-কে State Control-এ রাখতে চান সে রকম কোন রাজনৈতিক দল অন্তত এখানে নেই। সুতরাং সেই ব্যাপারে নাইবা বললাম। আর একটি হল প্রতিযোগিতা। এটা ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তি উদ্যোগ এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি উদ্যোগ, প্রতিভা, মেধার স্বীকৃতি ও বিকাশ ঘটানোর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। আমাদের যে জনগোষ্ঠী আছে, এই জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করে দিতে হবে। তাদের মধ্যে যে শক্তি আছে, সেই শক্তিকে release করে দিতে হবে যাতে করে তারা এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, উৎপাদন খাতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারে।

আজকে আমরা কৃষির সাথে সাথে শিল্পায়নের উপরে জোর দিয়েছি। এই শিল্পায়ন বেসরকারী খাতে হতে হবে এবং বেসরকারী খাতকে শক্তিশালী করতে হবে। এই কারণে আজকে এই সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। অর্থনীতিকে যদি চাঙ্গা করতে হয়, সাধারণ মানুষের জীবনের মান যদি আমরা উন্নত করতে চাই, তাহলে একটিই পথ আছে, সেটা হল শিল্পায়নের পথ। এই লক্ষ্যে আমরা অনেক সংস্কার এনেছি। আমরা পুঁজিবিনিয়োগ বোর্ড করেছি। শিল্প উদ্যোক্তারা এদেশে একটি নতুন সমাজ। উদ্যোক্তারা যেমন নতুন, যাঁরা অর্থ যোগান দেন তাঁরাও নতুন। ব্যাংকের যাঁরা ম্যানেজার তাঁরাও নতুন। এটা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে বিনিয়োগের পথকে সুগম এবং সহজ করতে।

আজকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ এবং সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য আমরা একটি সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছি। ১৯৯০ সালের শেষের দিকে যেসব জেলায় শিল্পনগরী হয় নি সেইসব প্রত্যেকটি জেলায় শিল্পনগরী স্থাপন করা হবে। ১০টি উপজেলায় এই বছরেই শিল্পনগরী স্থাপন করা হবে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায়, যেসব উপজেলায় অবকাঠামো আছে, বিদ্যুৎ আছে, রাস্তা আছে, গ্যাস আছে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেই সব উপজেলায় শিল্পনগরী গড়ে তোলা হবে।

মাননীয় স্পীকার, অর্থায়নে অন্যান্য সুবিধা প্রদানে সরকারী এবং বেসরকারী খাতের বৈষম্য আমরা দূর করেছি। আমরা ঋণদান পদ্ধতি সহজতর করেছি। ব্যাংকগুলিকে আমরা অধিক ক্ষমতা দিয়েছি। আগে ডিএফআই অর্থাৎ শিল্প ব্যাংক এবং শিল্পঋণ সংস্থার ক্ষমতা সীমিত ছিল। আমরা গত মাসে ডিএফআইকে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত অনুমোদনের ক্ষমতা দিয়েছি। বিনিয়োগ বোর্ডের কাছে আসতে হবে না, তারা নিজেরাই অনুমোদন দিয়ে দিতে পারবে। ন্যাশনাল ব্যাংক ভাল প্রকল্পে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত নিজেরাই অনুমোদন দিয়ে দিতে পারবে। সরকারী কোন নিয়ন্ত্রণ এই অনুমোদনের মধ্যে থাকবে না।

মাননীয় স্পীকার, চলতি মূলধন একটি অন্যতম সমস্যা। এখানে অনেকেই উল্লেখ করেছেন। আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি যেই ব্যাংক যেই প্রকল্প অর্থায়ন করবে, সেই প্রকল্পের জন্য চলতি মূলধন সেই ব্যাংককে দেওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক করেছি। যদি সেই ব্যাংক দিতে না পারে, তাহলে সেই ব্যাংকের দায়িত্ব হবে একটি 'কনসোর্টিয়াম' করে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা। Collateral ছাড়া ঋণ দেওয়া যাবে না। কিন্তু চলতি মূলধন collateral ছাড়া দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তবে মার্জিন দিতে হবে। যদি ক্ষুদ্র শিল্প হয় তাহলে ২০%, মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্পের জন্য ৩০%।

সরকারের এই নীতি শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের মনে নিশ্চয়তা আনবে। সেইজন্য আমরা এই সুবিধাগুলি ২০০০ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছি। যেমন Tax Holiday, B.M.R করার বিষয়, ট্যাক্স রেয়াত ইত্যাদি। এটা ১৯৯০ সালের জুন মাস পর্যন্ত ঠিক করা ছিল। এটাকে বাড়িয়ে ২০০০ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে। যারা শিল্পায়নে উদ্যোগী তাদের মনে যাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, সেই জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা চাই যৌথ উদ্যোগে আমাদের দেশে বিদেশী পুঁজি আসুক, কেন চাই? আমাদের বৈদেশিক পুঁজির এবং প্রযুক্তির অভাব রয়েছে। এটা সম্ভবপর একমাত্র যৌথ উদ্যোগে,

www.pathagar.com

যদি আমাদের দেশে শিল্প গড়ে তুলতে চাই। এর সাথে আমাদের দেশে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং আমাদের দেশের নাগরিক, যুবকরা তাদের কাজ শিখতে পারবে এবং নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

মাননীয় স্পীকার, সেইজন্য আমরা বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ করার জন্য অনেকগুলি incentive দিয়েছি। তারমধ্যে অন্যতম হল বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীরা ১০০ শতাংশ equity share-এর মালিক হতে পারবেন, এবং ৪৯ শতাংশ শেয়ারের জন্য কোন বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীকে বিনিয়োগ বোর্ডে যেতে হবে না। বিনিয়োগ বোর্ডে না গিয়েই তিনি ব্যাংকের মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণ করতে পারেন, যদি তার বিদেশী মূলধন ১০ কোটি টাকার বেশি না হয়। তারা যদি এখানে কোন মুনাফা অর্জন করেন, সেই টাকা যদি তারা এখানে বিনিয়োগ করতে চান, সেটারও আমরা অনুমতি দিয়েছি। তাদের এই বিনিয়োগ বৈদেশিক মুদ্রায় করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে, কারণ এই টাকা তারা বিদেশে নিয়ে যেতে পারতেন।

মাননীয় স্পীকার, অনেকে বলেছেন যে, এতকিছু করার পরও শিল্পখাতে বিনিয়োগ বাড়ে নি। এটা ঠিক যে, আমরা যা আশা করেছিলাম, ততটা বাড়ে নি। আমরা যে লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, সে লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে পারি নি। কিন্তু একেবারে বাড়ে নি—এ কথা বলা ঠিক হবে না। এই দেশ সম্পর্কে বিদেশে একটি ভিন্ন ভাবমূর্তি রয়েছে। আমাদের দেশ সম্পর্কে বাইরের লোক মনে করেন, এমনকি আমাদের দেশেরও অনেকে মনে করেন যে, এই দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করার মতো পরিবেশ এখনও সৃষ্টি হয় নি। আমরা এখন পরিবেশ সৃষ্টি করার স্তরে আছি। সত্যিকার বিনিয়োগ করার স্তরে আমরা এখনও পুরোপুরি পৌঁছাতে পারি নি। তাদের মধ্যে confidence আনতে হবে, একটা বিশ্বাস আনতে হবে যে, এই দেশে বিনিয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে। এই নিশ্চয়তা তাদের মনে যতদিন না আসবে, ততদিন তারা পুঁজি বিনিয়োগ করবেন না।

মাননীয় স্পীকার, তবুও আমি একটি figure দেই। ১৯৭৩-৭৪ সালে বেসরকারী খাতে মোট পুঁজি ছিল ৮ কোটি ৭৪ লক্ষ। ১৯৮১-৮২ সালে সেটা বেড়ে হয় ২৮৭ কোটি। ১৯৮৮-৮৯ যে অর্থবছর এখন আমরা শেষ করলাম, ১,৬৩১ কোটি টাকার বিনিয়োগ এক বছরের মধ্যে হয়েছে। সুতরাং, বিনিয়োগ বাড়ে নি, এ কথা বলা ঠিক হবে না। এর আগের আট বছর আর গত ছয় বছর যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব, বিনিয়োগ বেড়েছে। দুইগুণের চেয়ে বেশি বিনিয়োগ বেড়েছে গত ছয় বছরে, তার আগের আট বছরের তুলনায়। যৌথ উদ্যোগে গত এক বছরে ১৮টি প্রকল্প আমরা অনুমোদন করেছি, তার ফলে ৬১৩ কোটি টাকার বিনিয়োগ বাংলাদেশে হবে এবং ৪০৬ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে বিনিয়োগ হবে।

মাননীয় স্পীকার, ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপারে আমরা প্রভূত উন্নতিলাভ করেছি। ১৯৮৬-৮৭ সালে ক্ষুদ্র শিল্পের বিনিয়োগের জন্য আমরা ১৬৩ কোটি টাকা রেখেছিলাম, বিতরণ করা হয়েছিল মাত্র ১৩ কোটি টাকা। '৮৭-৮৮ সালে এটা উন্নীত হয়ে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত আসে। কিন্তু এ বছর ২০৯ কোটি টাকার মধ্যে ১৯৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রার ৯৪ শতাংশ অর্জন করেছে। এখানে আমাদের ধোলাই খাল শিল্পের কথা বলা দরকার। এই ধোলাই খালের উদ্যোক্তাদের মধ্যে যে কারিগরি ও প্রকৌশলী প্রতিভা রয়েছে, সেগুলি ব্যবহার করার জন্য আমরা কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এর অন্যতম ব্যবস্থা হল, সাব-কন্ট্রাক্টিং। আমরা ৩০০ কোটি টাকার মত ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে আমদানী করি। এর ৯০ শতাংশ যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে তৈরি করা সম্ভব। এই 'ধোলাই খাল কনসেপ্টে' এ বছর আরও ২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে, এবং বাংলাদেশে ১৪টি জেলায় এই ধোলাই খাল কনসেপ্টের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপকে অর্থায়ন করে তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যাতে করে আমরা এই যে ৩০০ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে আমদানী করি, সেটা যাতে আমাদের আমদানী করতে না হয়। আমি আরও আপনাদেরকে বলতে চাই যে, আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে আমরা প্রমাণ করব, এই দেশের মানুষ প্রায় সব যন্ত্রাংশ নিজের দেশে তৈরি করতে পারে, বিদেশ থেকে এগুলি আমদানী করতে হবে না।

মাননীয় স্পীকার, ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য নতুন ব্যাংক করা হয়েছে, ১০ শতাংশ সুদের হার করা হয়েছে, কাঁচামালের শুল্ক বিন্যাস করা হয়েছে। কিন্তু গত বছর এবং তার আগের বছর ২২২ কোটি

www.pathagar.com

টাকা এই খাতে আমরা রেয়াত দিয়েছি duty কমিয়ে দিয়ে basic raw material আমদানী করার জন্য আমরা উৎসাহ দিয়েছি। এ বছরও আমাদের লোকসান হবে ৪৬ কোটি টাকা। কেন করা হচ্ছে? যাতে দেশে একটি শিল্পের ভিত্তি আমরা তৈরি করতে পারি সেইজন্য।

মাননীয় স্পীকার, এবার আমি রপ্তানীর দিকে আসছি। কোন দেশ যদি সে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চায়, তাহলে রপ্তানী বাড়াতে হবে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হবে। রপ্তানী বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমাদের দেশের অনেক সম্ভাবনা যে রয়েছে গত ৫/৬ বছরে সেটা প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের traditional export এবং non-traditional export-এর যে disparity ছিল—আগে traditional item-এর export ৬০% ছিল আর non-traditional item ছিল ৪০%, আজকে সেটা reverse হয়ে গেছে এবং এটা সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী খাতের উদ্যোগের জন্য সম্ভব হয়েছে। এই পোশাক শিল্পের মাধ্যমে যে আয় এ বছর হতে যাচ্ছে, ১৩৮১ কোটি টাকা, এই আয় সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী খাতের আয়। ৫১৮ কোটি টাকার হিমায়িত মাছ এবং ৪২৮ কোটি টাকার চামড়া রপ্তানী বেসরকারী খাতের উদ্যোগে সম্ভবপর হয়েছে।

কিন্তু মাননীয় স্পীকার, এটা যথেষ্ট নয়, আমাদের সম্ভাবনা অনেক বেশি রয়েছে। বাংলাদেশ অত্যন্ত সুন্দর একটি জায়গায় অবস্থিত। যারা আমাদের দক্ষিণে এবং পূর্বে আছে অর্থাৎ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর এবং হংকং এই চারটি দেশের উপর থেকে আমেরিকা GSP সুবিধা withdraw করে নিয়েছে, অর্থাৎ তারা যখন আমেরিকাতে দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানী করবে তখন তাদেরকে duty দিতে হবে, বিনা dutyতে তারা export করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের উপরে সেই restriction নেই।

মাননীয় স্পীকার, ইউরোপ 323 million people-এর market, largest single market in the world in the developed world। ইউরোপে অনেক item-এর উপরে আমাদের উপর কোন restriction নেই। কিন্তু আমাদের export ইউরোপে অত্যন্ত কম। যেই ৪টি দেশের উপর থেকে GSP withdraw করা হয়েছে, সেই চারটি দেশের শ্রমিকদের বেতন বেড়ে যাচ্ছে, তাদের জীবনের মান বেড়ে যাচ্ছে। তারা এইসব শিল্প এখন আমাদের মত দেশে relocate বা স্থানান্তর করতে চাচ্ছে। কারণ আমাদের দেশে সস্তা শ্রম রয়েছে।

সুতরাং যেখানে cheap labour পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে আসতে হবে। Migration of technology, relocation of industry হতে বাধ্য এবং তার সুবিধা বাংলাদেশ পাবে। আমরা যদি নিজেরা প্রস্তুত থাকি এবং আমরা যদি নিজেদের অবস্থানকে সুন্দর রাখতে পারি, তাহলে বাংলাদেশের জন্য একটা golden opportunity আসছে। এই দেশে পুঁজি বিনিয়োগের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর ফলে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানী অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে।

আমরা এখন চামড়া রপ্তানী করি, কিন্তু আয় খুব কম। কারণ এর ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ মাত্র finished goods হিসাবে যায়, আর বাকিটা raw hides and skin হিসাবে রপ্তানী হয়। অথচ আমাদের goat skin দুনিয়ার অন্যতম ভাল skin, এটার মূল্য আমরা পাচ্ছি না। কাঁচা চামড়া রপ্তানী ১৯৮৯ সালের ১ জুলাই থেকে ban করে দিয়েছি। এই ban withdraw করা হবে না। আমরা finished goods-এ যাব, leather goods-এ যাব এবং তার রপ্তানীর ব্যবস্থা করব। তবে মূল্য সংযোজন অনেক বেশি হবে। যে ৪২৮ কোটি টাকা আমরা চামড়া রফতানী করে পাই, এটা বাড়িয়ে ৪ গুণ করা যায়, in two years time। হিমায়তি মাছে টেকনোলজি এত improve করে গেছে এখন যে per hector-এ আমাদের দেশে যা আমরা উৎপাদন করছি, তাইওয়ানে তার চেয়ে দশগুণ বেশি উৎপাদন করছে। আজকে এই হিমায়িত মাছ, চামড়াজাত দ্রব্য, তৈরি খাদ্য, তৈরি পোশাকে যদি ইউরোপের মার্কেটে সত্যিকারভাবে রফতানী বাড়াতে পারি, তাহলে আগামী তিন বছরের মধ্যে সরকার রফতানী আয়কে double করার জন্য যে টার্গেট নির্ধারণ করেছে, তার চেয়ে আমরা আরও বেশি রফতানী বাংলাদেশ থেকে করতে পারব।

ইদানীং এখানে জাপানের একটি কোম্পানি এসেছিল। গত ছয় মাসে ১৪টি জাপানী টিম বাংলাদেশে এসেছিল পুঁজি বিনিয়োগ করার জন্য এবং কতকগুলি কোম্পানি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও রেখে

www.pathagar.com

গেছে। কারণ we provide maximum facilities now, এমনকি থাইল্যান্ডের চাইতেও বেশি। যাবে কোথায় তারা? তাদেরকে কোন না কোন জায়গায় যেতে হবে। মিনি পাইলো কোম্পনিতে এখন সাড়ে তিনশত মেয়ে কাজ করছে আমাদের export free zone-এ। এই কোম্পানির মালিক গিয়েছিলেন ফিলিপিন্‌সে, তিনি গিয়েছিলেন থাইল্যান্ডে, তার পরে এসেছিলেন বাংলাদেশে। তিনি ইংরেজী বলতে পারেন না। তিনি আগে কোনদিন বাংলাদেশে আসেন নি। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল যে, এখানে শুধু বন্যা হয়, এখানে শুধু দুর্যোগ নেমে আসে, এখানে কোন সভ্যতা নেই। কিন্তু তিনি এখানে সাত দিন ছিলেন। এই সাত দিনের শেষ দিনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বাংলাদেশেই তিনি পুঁজি বিনিয়োগ করবেন, কারণ ফিলিপিন্‌স এবং থাইল্যান্ডের চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থা বিনিয়োগের জন্য অনেক ভাল বলে তিনি মনে করেছেন।

[হর্ষধ্বনি]

তিনি ছয় মাসের মধ্যে কারখানা খুলে তা আমাকে দিয়ে উদ্বোধন করিয়েছেন। রাষ্ট্রপতিও পরে সেই কারখানা দেখে এসেছেন।

মাননীয় স্পীকার, সরকারী খাতেও আমরা কিছুটা উন্নতি লাভ করেছি। সরকারী খাতে একটি মহাসমস্যা ছিল accountability-র প্রশ্নে। আমাদের সরকারের একটি অন্যতম নীতি হল, de-regulation and withdrawal of control over economic activities of state এবং বেসরকারীকরণের নীতি অব্যাহত রাখা। আর অনেক কলকারখানার ৪৯ শতাংশ শেয়ার আমরা stock exchange-এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিলি করব। কিন্তু সরকারী খাতে এখনও অনেকগুলি বড় বড় শিল্প কলকারখানা রয়ে গেছে এবং নানা কারণে এগুলিকে রাখতে হচ্ছে।

তবে পাবলিক সেক্টরকে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য আমরা তাদেরকে freedom দিয়েছি, আর সেই সাথে targetও দিয়েছি। Evaluation করবার ব্যবস্থাসহ accountability স্থাপন করার ব্যবস্থা করেছি। এর ফলে আমরা কিছু কিছু সুফলও পাচ্ছি। আমরা নতুন monitoring system-এর ব্যবস্থা করেছি একটা নতুন আইনের অধীনে। এই public sector unitগুলিকে more accountable করার জন্য, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং ক্রমান্বয়ে তাদেরকে profit অর্থাৎ মুনাফার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাদেরকে একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে আনা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আজকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলীর মূল্যায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করার জন্য একটা নতুন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার, data-base-এ আর্থিক ও সামাজিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয় করা হবে। Human beings আর করবে না। Bangladesh Chemical Industries Corportation (B C I C) সরকারী খাতের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই B C I C ১৯৮৭-৮৮ সালে লাভ করেছে ২৩ কোটি টাকা এবং এবছর লাভ করেছে ৩০ কোটি টাকা। উৎপাদন করেছে ১৯৮৭-৮৮ সালে ১ হাজার ৬১ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য এবং এই বছর করেছে ১,১৯১ কোটি টাকার উৎপাদন। সার উৎপাদন করেছে ১৯৮৭-৮৮ সালে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৬০০ টন, এ বছর করেছে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭০০ টন। সার কারখানাগুলি এই ১৯৮৮-৮৯ সালে ৭০% of the installed capacity-তে চলেছে। আমরা সার রপ্তানী করেছি ১৯৮৭-৮৮ সালে ৭২ কোটি টাকার, আর এবছর রপ্তানী করেছি ১৫২ কোটি টাকার। মাননীয় স্পীকার, আমাদের অনেক সম্মানিত সংসদ-সদস্য সরকারী খাতের সমালোচনা করে বলেছেন যে এখানে লোকসান ছাড়া আর কিছু নেই। আমি তাঁদেরকে জানাতে চাই যে, এটা ঠিক কথা নয়, তবে সরকারী খাতকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে টিকে থাকতে হবে এবং এইজন্য তাদেরকে সময় দিতে হবে।

অনেকে এই ব্যাপারে আমলাদের দোষারোপ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই আমলাতন্ত্র একটা ইনস্টিটিউশন। দুনিয়ায় কোন দেশ নেই যে দেশে আমলাতন্ত্র নেই। সুতরাং আমাদের দেশেও আমলাতন্ত্র থাকবে। আমাদের bureaucracy is one of the best in the region—একথা মনে রাখতে হবে। তবে একথা সত্য যে সরকারী খাতের কর্পোরেশন ও কল-কারখানায় তাদের একটি কায়েমী স্বার্থ (vested interest) রয়েছে যা অবশ্যই সরকারের নীতি বাস্তবায়নের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে দূর হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

আজকে একথা কেন বলছি ক্ষমতায় আসলে সেটা বুঝবেন। একটা প্রশাসনিক যন্ত্রকে overnight change করা যায় না, it is not a regimented society, ব্যুরোক্রেসিকে even in a regimented society-তে নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজ নয়। একাকী কাজ করতে পারবেন না। আপনারা যাঁরা নিজেদের নীতি-নির্ধারক বলে দাবি করেন, কাকে নিয়ে নীতিগুলি বাস্তবায়ন করবেন, নিজেরা বাস্তবায়ন করবেন? সম্ভবপর নয়। রাজনৈতিক ক্যাডার? ঐ ক্যাডার আমাদের জানা আছে, লুটপাট করে খাবে, ঐ ক্যাডার আমরা চাই না।

মাননীয় স্পীকার, বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই হবে উন্নতির প্রথম স্তর এবং এই বিনিয়োগের জন্য স্থিতিশীলতা আনতে হবে। শুধু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নয়, একই সরকারকে ক্ষমতায় থাকতে হবে, এমন কোন কথা নয়, কিন্তু নীতির স্থিতিশীলতা থাকতে হবে। অর্থাৎ সরকারের পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু সরকারের নীতিগুলি যাতে পরবর্তী সরকার অনুসরণ করেন, বাস্তবায়ন করেন সেই স্থিতিশীলতার প্রয়োজন। এর সাথে সাথে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উন্নতি করতে হবে, অর্থায়নের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে এবং বন্দরে মাল খালাস ও শুল্ক পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করতে হবে। উন্নয়নের পথ একটি কঠিন পথ; গতানুগতিক পদ্ধতিতে রাজনীতিকে পরিচালনা করলে এই উন্নয়নের পথে আমরা বেশি দূর এগুতে পারব না।

অনেক বিষয়ে এই সরকার জাতীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে দেশের ভাবমূর্তি বাড়িয়েছে এবং অনেক সুনাম অর্জন করেছে। দুটি বিষয় ইদানীংকালে বিশ্বের জনমনে আমাদের সম্পর্কে একটি সুন্দর ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছে, যা আমি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। প্রথমটি হল, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান এনে দেওয়া। শত বছরের পুরনো একটি সমস্যার সমাধান এই সরকার করেছে, military solution-এর বদলে political solution-এর option exercise করেছে এই সরকার। আজকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে। ষাট শতাংশের উপরে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আজকে বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করা হচ্ছে। যাঁরা আমাদের নিন্দা করেছেন তাঁরাও প্রশংসা করেছেন। আজকে তাই এই সাফল্যের জন্য সামরিক বাহিনীর সকল সদস্যকে এই সংসদের তরফ থেকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, আমরা যাঁরা এখানে বসে আছি, আমরা জানি না পার্বত্য চট্টগ্রামে কি দুরূহ অবস্থার মধ্যে সামরিক বাহিনীকে কাজ করতে হয়। খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, দীঘিনালা, মাটিরাংগার দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই গহীন জঙ্গলে প্রতিকূল পরিবেশে দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার জন্য যারা আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদেরকে এই জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। আজকে এই পার্বত্যবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা, তাদেরকে আমাদের কাছে নিয়ে আসা, তাদের মাধ্যমে এই নির্বাচন করা এবং এই নির্বাচনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি ফিরিয়ে আনার পুরো কৃতিত্ব আমাদের সামরিক বাহিনীকে দিতে হবে। তার সাথে সাথে বিডিআর, পুলিশ এবং আরও প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কাজ করেছেন তাদের সবাইকে এই কৃতিত্ব দিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, দেশপ্রেমের এই উজ্জ্বল উদাহরণ যাঁরা স্থাপন করেছেন, তাঁদের বাজেট সম্পর্কে যাঁরা প্রশ্ন তোলেন, তাঁদেরকে শুধু বলতে চাই যে, আমাদের দেশের আশপাশে খতিয়ে দেখুন যে বাজেটে সামরিক বাহিনীর জন্য এ্যালোকেশন কোন্ দেশে কত? আশপাশের দেশগুলির তুলনায় আমাদের defence budget কম। আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েও সামরিক বাহিনীর যা প্রয়োজন সেটা মেটানোর চেষ্টা করছি। এই সামরিক বাহিনী যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে না থাকত, তাহলে কী হতো, চিন্তা করে দেখেন আপনারা? দুই দিন মশার কামড় খেয়ে ফিরে আসতেন, দুই ঘণ্টাও ওখানে থাকতে পারতেন না।

[বাধা প্রধান]

যান নি তো কোন দিন। কোন দিন যান নি। কোলকাতায় বসে দেশ স্বাধীন করেছেন। শাজাহান সিরাজ সাহেব কোথায় বসে দেশ স্বাধীন করেছেন আমি জানি। তবে আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কোন attack করতে চাই না। ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়। সুতরাং, উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

www.pathagar.com

[কণ্ঠস্বর: সাবাস্! সাবাস্!]

মাননীয় স্পীকার, আমরা যে দুটি কারণে সারা দুনিয়ার প্রশংসা অর্জন করেছি তার একটা হল পার্বত্য চট্টগ্রাম আর অন্যটি হল disaster management-এ। আমরা সব সময় বলে আসছি, a good government is good politics। আমরা যদি প্রশাসন দক্ষতার সাথে চালাতে পারি, আমরা যদি দুর্যোগের সময় জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি, আমরা যদি অর্থনীতিকে সবল করতে পারি, আমরা যদি দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটাতে পারি, that will be the correct and good political government। আ স ম রব সাহেব বলেছেন যে, এই সরকারের কোন রাজনীতি নেই। এই সরকারের যদি রাজনীতি না থাকে, তাহলে আপনারা কী করে এখানে বসে আছেন? How are you sitting here? You are the product of politics of this government। ঐ দিন চলে গেছে। শ্লোগান, বিবৃতি, মিটিং, মিছিলের প্রয়োজন আছে। দলকে চাঙ্গা রাখার জন্য প্রয়োজন আছে। কিন্তু যদি দেশের উন্নতি করতে চান তাহলে প্রথমে জানতে হবে দেশের অর্থনীতির কথা। How to manage the economy of the country। How to manage a disaster।

মাননীয় স্পীকার, এই মুহূর্তে আমাদের খাদ্যশস্যের মজুত আছে ১০ লক্ষ টন, আগস্ট মাসে হবে ১৪ লক্ষ টন। আর অক্টোবর মাসে lean period-এর পরে গিয়ে দাঁড়াবে আবার ১০ লক্ষ টনে। দেশের জন্য আমাদের ১০০০ মিলিয়ন ডলারের উপর বৈদেশিক মুদ্রা আছে। অর্থাৎ, প্রায় ৩,৭০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের reserve আছে। আমাদের বাংলাদেশী যাঁরা বিদেশে থাকেন—প্রবাসী, এবছর তাঁরা ৮০০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ২৬০০ কোটি টাকা দেশে পাঠিয়েছেন। এই সরকারের উপর বিশ্বাস আছে বলেইতো আজকে এই অঙ্ক গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। কৃষিঋণ মওকুফ করেছেন এই সরকার ৪০০ কোটি টাকা। গত ছয় বছরে বিদ্যুৎ ৬৫০ মেগাওয়াট থেকে ১৪৫০ মেগাওয়াট করা হয়েছে। ১৮০টি উপজেলা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে আরও ১৫০টি উপজেলা বিদ্যুতায়ন করা হবে। ৫৫০০ কিলোমিটার সড়ক থেকে গত ছয় বছরে ১১,০০০ কিলোমিটার সড়ক তৈরি করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশ একটি অতি সম্ভাবনাময় দেশ। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন আছে, আমাদের জনসম্পদও তেমন আছে। We are poor because we are unable to manage our affairs.

আমরা ইলেকট্রনিক্স খাতকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছি। দুই বছর আগে অনেকে সন্দেহ করেছিলেন যে বাংলাদেশে আবার ইলেকট্রনিক্স কীভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে? তারা ইলেকট্রনিক্সকে একটা বিলাসসামগ্রী বলে মনে করেন। এই সংসদে অনেকে বলেছেন যে, VCR, VCP-র উপর কেন আরও ট্যাক্স বাড়ানো হয় নি? আমি তাঁদের জানাতে চাই যে, এই সব সামগ্রী প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের দেশে আসবে, আমরা এগুলিকে সংযোজন করে এই সব টেকনোলজি adopt করব এবং বিদেশে রপ্তানী করব। এটাই হল আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

আমি আপনাকে জানাতে চাই যে, গত এক বছরে in one year's time এই দেশে ছয়শত ছোট ছোট ইলেকট্রনিক্স কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এই ইলেকট্রনিক্স শিল্পের মধে VCR, VCP-র কথা আমি উল্লেখ করতে চাই না, কিন্তু নতুন একটি item-এর কথা আমি উল্লেখ করতে চাই, সেটা হল কম্পিউটার। অনেকেই শুনলে অবাক হবেন যে, বাংলাদেশের তরুণ ইঞ্জিনিয়ার বা যুবকরা কম্পিউটার এসেম্বল করা জানতেন না। মাননীয় স্পীকার এই বছর আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নে ৭৫০ টি কম্পিউটার রপ্তানী করেছি। ১৯৮৯-৯০ সালে কম্পিউটার রপ্তানী করেছি ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭ শত ডলারের অর্থাৎ half a million ডলারের মত।

আমরা ১২ হাজার কম্পিউটার সোভিয়েট ইউনিয়নে রপ্তানীকরার অর্ডার পেয়েছি এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটা এই বছরের মধ্যে রপ্তানী হওয়ার কথা। আমাদের economic performance অন্যান্য অনেক অনুন্নত দেশের তুলনায় ভাল। কেন ভাল? আমাদের inflation rate-এ বছর ছিল ৮%। এর আগের বছর ছিল ১১%, তার আগের বছর ছিল ১০%। আমাদের মত যারা অনুন্নত দেশ, poor economy তাদের তুলনায় আমাদের inflation rate একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আছে। এটা একটা ভাল লক্ষণ।

www.pathagar.com

আমাদের বৈদেশিক ঋণ মাত্র ৯ বিলিয়ন ডলার, এটা তেমন কিছুই না। আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের আরও বেশি বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন। আরও বৈদেশিক সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু নিতে পারি না। কারণ আমাদের নিজস্ব টাকার অভাব। আপনারা যদি আরও কিছু করের ব্যবস্থা করে দিতেন, তাহলে আমরা আরও বেশি বিদেশী সাহায্য ব্যবহার করতে পারতাম। আমাদের কাছে এখন ডলারের চেয়ে টাকার বেশি প্রয়োজন। কারণ, আমরা যদি ১ টাকার ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহলে আমরা ৪ টাকা মূল্যমানের সমপরিমাণ বৈদেশিক টাকা আমাদের দেশের উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করতে পারতাম। কিন্তু এটা আজকে আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না স্থানীয় মুদ্রার অভাবে।

মাননীয় স্পীকার, আপনি যদি দেখেন, debt service-এর ratio আমাদের ২৩%-এর মত, যেটা reasonable control-এর মধ্যে আছে। Exchange market rate এবং official market rate-এ difference খুব কম। তারপর GDP growth rate ৩.৫% থেকে ৪% হবে, যদিও আমাদের দুর্যোগ, বন্যা এবং নানারকমের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছে, তবুও এটা অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভাল। তারপরে energy sector-এ growth rate হচ্ছে ১৭%। Construction-এ হয়েছে ১০%। ব্রাজিলের growth হচ্ছে ২.৬%। তাদের বিদেশে ঋণ আছে ১৩০ বিলিয়ন ডলার। আমাদের হল মাত্র ৯ বিলিয়ন। ইন্দোনেশিয়ার বিদেশী ঋণ হল ৫০ বিলিয়ন ডলার।

মাননীয় স্পীকার, আমার হাতে সময় কম।

[বাধা প্রদান]

আমি ওনাদের কথাগুলির জবাব দিতে চেয়েছিলাম। আমার জবাব শোনার জন্য ওনারা নিশ্চয়ই interested।

[বাধা প্রদান]

আমি নামাজের পরে আবার শুরু করব।

(মাগরিবের নামাজের বিরতির পর সংসদের বৈঠক পুনরায় আরম্ভ হয়)

মাননীয় স্পীকার, যেহেতু একটু সময় পেলাম, আমি আরও দুয়েকটি বিষয়ে একটু বলতে চাই। সেটা হল, বাংলাদেশকে একবিংশ শতাব্দীর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর এই চ্যালেঞ্জ হবে প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ। আমরা যদি আমাদের দেশকে এখন যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় রেখে যেতে চাই, তা হয়ত পারি। কিন্তু আমরা যদি আমাদের মানুষের সমৃদ্ধি আনতে চাই, তাদের জীবন-মান উন্নত করতে চাই, তাহলে অবিলম্বে আমাদেরকে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে এবং সেই প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি এবং শিল্পে আমাদের প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে।

প্রযুক্তি সম্পর্কে একটি খুব সুন্দর কথা আছে, সেটা হল, technology is a gain for the rich, a dream for the poor and a master key for development। এই জিনিসটা যদি আমরা মনে রাখি, তাহলে আমরা কী কৃষি, কী শিল্প সব ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব। আর যদি আমরা অগ্রগতি চাই, তাহলে এই technology-র নতুন যে পথ সারা দুনিয়া আজকে অবলম্বন করেছে সেই পথ আমাদেরকেও অবলম্বন করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, এখানে একটা বই আছে, W. H. Auden-এর লেখা। এখানে একটি চমৎকার কথা আছে। তিনি বলেছেন:

> Private faces in public places are wiser and richer than public faces in private places.

প্রাইভেট সেক্টরকে আমরা জোরদার করতে চাই। যারা প্রাইভেট সেক্টরের বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁরাও এখন বুঝতে পারছেন যে, তাদের জনগণের প্রতিভাকে তাঁরা ব্যবহার করতে পারে নি। রেজিমেন্টেড 'ফিলসফির' অধীনে একটি দেশের সত্যিকারের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো সম্ভবপর নয়।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, Mikhail Gorvachev তাঁর "PERESTROIKA" বইতে লিখেছেন যে:

"People, human beings with all their creative diversity, are the makers of history. So the initial task of restructuring an indispensable condition, necessary if it is to be successful is to "wake up" those people who have "fallen asleep" and make them truly active and concerned, to ensure that everyone feels as if he is the master of the country, of his enterprise, office or institute. This is the main thing".

The Soviet people want a clear perspective... full blooded and unconditional democracy. Glasnost in all things, big and small. Perspective for hard work and faithful service for the use and the good of society. We need no social utopia.

এসব কথা এখন বেরুচ্ছে। সারা দুনিয়ায় স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি উদ্যোগের উপর প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নও এখন theory of collectivism থেকে সরে Individulaism-এর দিকে যাচ্ছে। রাষ্ট্রতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের পথে চলে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর একটি শর্ত হল সুবিন্যস্ত সড়ক যোগাযোগ। আজকে অজস্র সেতু তৈরি হয়েছে দেশে। এর কিছু কিছু উল্লেখ গতকাল করা হয়েছে। এখন আমি সবগুলি উল্লেখ করতে চাই না। তবে নির্মাণাধীন যেসব প্রধান প্রধান সেতু বা যেগুলি ভবিষ্যতে আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি, তার নামগুলি এখন বলতে চাই। যা নির্মাণাধীন আছে, তা হল মেঘনা সেতু, গড়াই সেতু, শম্ভুগঞ্জ সেতু, মহাসিং সেতু, শেরপুর সেতু এবং ত্রিভুবনী সেতু। আর পরিকল্পনাধীন যেসব সেতু আছে সেগুলি হল, দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা, রূপসা, মেঘনা, গোমতী, ধরলা, শিকারপুর, ধলেশ্বরী এবং চিত্রা। কিন্তু সবচেয়ে বড় যে সেতু, আমাদের স্বপ্নের সেতু সেটা হল যমুনা সেতু। ১৮শত কোটি টাকা ব্যয়ে এই সেতুর নির্মাণকাজ ইনশাল্লাহ এই বছরের শেষের দিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে গ্রহণ করা হবে।

এই সেতু হবার পরে, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক যে উন্নতি আসবে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ এই যমুনা সেতু, আপনারা জানতে চেয়েছেন, এটা five hundred and forty million dollar-এর project এটার টাকা তো একবারেই আসবে না। এটার জন্য অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন। এটার একটা technical aspect আছে, serious technical aspect এবং এ বছরের শেষের দিকেই এই সেতু নির্মাণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মাঠ পর্যায়ে যাবে অর্থাৎ সমস্ত কাজ শেষ, এখন শুধু টেন্ডার float করে work order দেওয়া। এটা আশা করি, এ বছরের শেষের দিকে হবে। এর মধ্যেই অনেক কাজ শুরু হয়ে গেছে।

[বাধা প্রধান]

Feasibility study এবং অন্যান্য সব কিছু complete হয়ে গেছে।

মাননীয় স্পীকার critics will always criticise অর্থাৎ সমালোচকরা সব সময়ই সমালোচনা করে যাবেন। But builders will always go on building the society. You are critics but we are the builders. That's the difference. Mr. Speaker, in politics, if you want any speech or big slogan or rhetorics or even call for a hartal to collapse the economy for the time being, you ask the Opposition both here and outside, but if you want any thing done, any bridge built, any road constructed, any power station installed, ask our leader, he will do it for you.

মাননীয় স্পীকার, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ২/১টি কথা বলা দরকার, কারণ এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের জন্য সহায়ক হতে যাচ্ছে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দুটি ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের জন্য সহায়ক হবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং আমেরিকার মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি হয়েছে, ইরান-ইরাকের মধ্যকার ৮ বছরের যুদ্ধ শেষ হয়েছে; প্যালেস্টাইনের স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা যেটা ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৮ সালে হয়েছে এবং বাংলাদেশ স্বীকৃতি দিয়েছে, চীন-সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ ১২ বছর পরে মিলিত হয়েছে; চীন-ভারত ২৬ বছর পর শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়েছে; ভারত-পাকিস্তান ১৬

www.pathagar.com

বছর পর মিলিত হয়েছে, আফগানিস্তানে ১০ বছর যুদ্ধের অবসান ঘটেছে এবং সোভিয়েট সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে 'গ্লাস্‌নস্‌ট' এবং 'পেরেস্ত্রয়কা'-র মূলনীতি এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে, চীন দেশে modernisation programme এখন কার্যকর হচ্ছে। এইসব কিছু মিলিয়ে আন্তর্জাতিক পরিবেশ অনেক স্থিতিশীল হয়েছে, উত্তেজনামুক্ত হয়েছে এবং সেটা গরিব, অনুন্নত দেশের জন্য একটি সহায়ক অবস্থার সৃষ্টি করবে বলে আমরা মনে করি।

গত বছর 'Seven-nation Industrialised Nations's Summit' টরেন্টোতে যেটা হয়েছে, সেখানে তাঁরা গরিব, অনুন্নত দেশের ব্যাপারে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেটা হল, অনুন্নত দেশে resource flow বাড়াতে হবে, ঋণ মওকুফ করতে হবে, সমস্ত বিদেশী ঋণ যেটা আমরা নিয়েছি এগুলি মওকুফ করার চিন্তা তাঁরা নিজেরাই এখন করছেন। সেইজন্য আমি একটু আগে বলেছি যে, আমাদের উচিত হবে বিদেশী সাহায্য যতটা পারা যায় ব্যবহার করা এবং বিদেশী ঋণ নিলেই ঋণে জর্জরিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ এই ঋণকে অনুদানে পরিণত করতে তাঁরা একদিন না একদিন বাধ্য হবেন।

মাননীয় স্পীকার, এবার আসি disaster management-এর পরবর্তী পর্যায়ে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য কী করা হচ্ছে, এটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তবু আমি একটু বলতে চাই। আমাদের রাষ্ট্রপতি সরকারের উদ্যোগে 'সার্ক' দেশগুলিতে গিয়েছিলেন, জাতিসংঘে গিয়েছিলেন, ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের সঙ্গে দেখা করেছেন, ফ্রান্সে এবং যুক্তরাজ্যে গিয়েছেন।

আজকে তার ফলশ্রুতিতে কী দেখতে পাই? এই প্রথমবারের মতো seven most industrialised nations, the richest countries of the world-এর সাতজন নেতা বাংলাদেশের বন্যা সমস্যার উপরে আলোচনা করবেন এই জুলাই মাসের ১৮ তারিখে। আজকে এই বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বের সমর্থন এসেছে। এটার জন্য এদেশের সকল স্তরের জনগণ কৃতিত্বের দাবিদার।

রাষ্ট্রপতি ১২, ১৩ ও ১৪ তারিখে ফ্রান্সে অবস্থান করবেন এবং ঐ সাতটি উন্নত দেশের নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে এবং বাংলাদেশের flood policy-র উপরে আলোচনা হবে। চারটি সমীক্ষা হয়েছে; ইউএনডিপি, জাপান এবং আমেরিকা studyগুলি করেছে। ইউএনডিপির সঙ্গে বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞরা জড়িত ছিলেন। আমেরিকায় disaster management-এর উপর কাজ চলছে আমেরিকান কংগ্রেসে। বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য European Parliament-এ resolution পাস হয়েছে। European Community এই summit-এ আমাদেরকে সমর্থন জানানোর জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আজকে এটা আমাদের দেশের সকল মানুষের জন্য নতুন করে গৌরব বয়ে আনবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

মাননীয় স্পীকার, as a nation we should be in a hurry, আমাদের হাতে সময় খুব কম। একটি উন্নত দেশের জন্য ২০ বছর, ২৫ বছর, ৩০ বছর, ৫০ বছর, ১০০ বছর হয়তো কিছুই না। কিন্তু আমাদের মত একটি দেশের জন্য ১০ বছর অন্যান্য দেশের ১০০ বছরের মত। কারণ, এই ১০ বছরে যদি আমরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে চলি, আর যদি সরকার পরিচালনায় ব্যর্থ হই এবং আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে না পারি, তাহলে এই দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা বাড়বে, ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়বে, বেকারত্বের সংখ্যা বাড়বে। তাছাড়া আমাদের প্রজন্মরা বা পরবর্তী বংশধররাও এই সরকার পরিচালনা করতে আর সক্ষম হবেন না। ফলে দেশে নৈরাজ্য বাড়বে।

প্রতি মিনিটে ৫টি শিশুর জন্ম হচ্ছে। প্রতি ঘণ্টায় তাহলে ৩০০ শিশুর জন্ম হচ্ছে। প্রতি দিনে ৭,২০০ শিশুর জন্ম হচ্ছে এবং প্রতি মাসে ২ লক্ষ ১৬ হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করছে। এক বছরে হবে ২৫ লক্ষ। আমরা এই দেশকে এখন যদি ম্যানেজ করতে না পারি, ১০ বছর পর কী করে ম্যানেজ করব? সেই জন্য আমাদের নীতি বাস্তবায়ন এবং লক্ষ্য অর্জন যত তাড়াতাড়ি করতে পারি, ততই আমাদের জন্য ভাল।

মাননীয় স্পীকার, আমাদেরকে রাষ্ট্র-সম্পদ বাড়াতে হবে। রাষ্ট্র-সম্পদ বাড়ানোর অনেকগুলি উপায় আছে। রপ্তানী বৃদ্ধিসহ কতকগুলি উপায়ের কথা আমি উল্লেখ করেছি। এটা মূলত নির্ভর করে

www.pathagar.com

কীভাবে আমাদের দেশের মানুষকে আমরা ব্যবহার করতে চাই, সম্পৃক্ত করতে চাই। আমি আপনাদের সঙ্গে একটি বিষয়ে একমত যে, দেশের জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে না পারলে সেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল নির্ধারিত সময়ে অর্জন করা সম্ভবপর নয়, সম্ভব হবে না। সেই জন্য আমাদেরকে উদ্ভাবনী পন্থা অবলম্বন করতে হবে। বিদ্যমান এবং অস্তিত্বশীল সম্পদ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। অপচয়, অনিয়ম, দুর্নীতি ও সম্পদের অপব্যবহার রোধ করতে হবে। কৃচ্ছ্রসাধন এবং আত্মত্যাগ করতে হবে। কোন জাতি ত্যাগ স্বীকার না করে নিজের উন্নয়ন সাধন করতে পারে নি। There is no short cut to develop a country, একটি জাতিকে কিছু সময়ের জন্য সম্মিলিতভাবে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আপনি ত্যাগ স্বীকার করেন, আমি ত্যাগ স্বীকার করলাম না তা হবে না। বা আমি ত্যাগ স্বীকার করলাম, বাকি কেউ করল না—তাতেও হবে না। সমগ্র জাতিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

আজকে মাননীয় স্পীকার, এটা করার জন্য প্রয়োজন leadership commitment to growth। A total commitment to growth, সকল পর্যায়ের সকল নেতৃত্বের একটি commitment থাকতে হবে to growth। এটাই হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। Leadership বলতে রাষ্ট্রপতি এরশাদকে বোঝায় না। তিনি একা নন, আমরা, আপনারা—সকল পর্যায়ের নেতৃত্বে যারা আছে তাদের commitment to growth যদি আমরা সৃষ্টি করতে পারি, তাহলে আমরা যে growth economy-র কথা বলছি সেটা অর্জন করা সম্ভবপর হবে।

এটার জন্য কী দরকার? এটার জন্য প্রয়োজন a brain trust. At every level, প্রত্যেকটি পর্যায়ে, a group of dedicated people-এর প্রয়োজন। নিবেদিতপ্রাণের প্রয়োজন। আর একটি হল utilisation of your own assets and experts। নিজেদের দেশের সম্পদ এবং বিশেজ্ঞদের ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এই তিনটি উপাদান যদি আমরা অর্জন করতে পারি, তাহলে আমাদের মধ্যে আর কোন মতানৈক্য থাকবে না।

মাননীয় স্পীকার, এবার আমি আসছি বিরোধীদলের কিছু বক্তব্যের জবাব দিতে। সবাই বলেছেন যে, এটা একটা গতানুগতিক বাজেট। তার জবাবে আমিও বলতে চাই যে, বিরোধী দলের সমালোচনাও অত্যন্ত গতানুগতিক হয়েছে, out of date। Out of date সমালোচনা যেভাবে ১৯৭৩ সালে আপনারা বাজেটের সমালোচনা করেছেন আজকে আপনারা ১৯৮৯ সালেও ঐ একইভাবে সমালোচনা করেছেন। I will show you।

[বাধা প্রদান]

Wait, একটু অপেক্ষা করুন।

মাননীয় স্পীকার, ১৯৭৪ সালে জাসদের সংসদ সদস্য জনাব আবদুস সাত্তার, তখনকার বাজেটের সমালোচনা করে বলেছেন, "বাজেট আসছে মরণ আঘাত নিয়ে।" তারপর আর একজন বলেছেন, "সরকারের এই বাজেট ব্যর্থ হতে বাধ্য।"

এখানে একজন সংসদ সদস্য ঐ একই কথা বলেছেন।

[বাধা প্রদান]

আস্তে আস্তে, have patience। আপনাদের বক্তৃতা অনেক মনোযোগ সহকারে আমি গত ২০ দিন শুনেছি। এটা হল তাঁদের সমালোচনা, ১৯৭৪ সালে বলেছেন। "নয়া বাজেট পণ্যের বাজারে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির শামিল।" "বন্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠু না হলে অর্থমন্ত্রীর যুক্তি কার্যকর হবে না।" "মানুষ আরও গভীর সঙ্কটের কবলে পড়িবে—জাসদ" এটা ১৯৭৪ সালের কথা। "সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে," "এই বাজেটে কোন আশার আলো নেই।" তাঁদের নেত্রী কী বলেছেন? সেটাও এখানে আছে।

[বাধা প্রদান]

আমার এই উদ্ধৃতিগুলি কার বিরুদ্ধে যাচ্ছে সেটা আমি জানি। আপনারা তারপর থেকে কোন লেখাপড়া আর করেন নি। সেটাই আমি প্রমাণ করতে চাচ্ছি। এরপরে নতুন কিছু পড়েন নি। আর কী পড়েছেন, সেটা আমি নিয়ে এসেছি। সেটা একটু পরে দেখাব।

এই ধরনের পুরো ফাইল আছে, তাদের গতানুগতিক বক্তব্য, catch-word আছে, বিরোধী দল সংসদেই বলেন আর সংসদের বাইরেই বলেন, একই কথা বাইরে এবং ভেতরে। কোন তফাত

www.pathagar.com

নেই। তাঁরা দাবি করেন যে, তাঁরা হচ্ছেন ভিন্ন ধরনের বিরোধীদল। কিন্তু বাজেটের সমালোচনায় তাঁরা সেই ভিন্নতা রাখতে পারেন নি। একেবারে এক এবং অভিন্ন বলে নিজেদেরকে প্রমাণিত করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, তাঁরা বলেছেন যে, foreign aid অর্থাৎ পরনির্ভরশীলতা আমাদের বেড়েছে। এটা একটা serious subject, আমার সময় কম। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, আমার কাছে অনেক নাম করা ecnonomist-এর বই আছে including books of many eminent scholars। Foreign aid-এর ব্যাপারে এই সমস্ত বইতে বলা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে aid usersদের উপরে। অর্থাৎ যে দেশ বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করতে চায়, তারা কীভাবে করতে চায় তার উপর। সুতরাং, এ ব্যাপারে কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। যদি এখানে কোন দুর্বলতা থাকে, তাহলে সে দুর্বলতা আমাদের নিজেদের।

আমরা যদি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোন প্রকল্প চিহ্নিত করতে না পেরে থাকি, তাহলে সেটাও আমাদের অক্ষমতার জন্য হচ্ছে, আর যদি আমরা কোন প্রকল্পে সফলতা অর্জন করে থাকি, সেটাও আমাদের দক্ষতার জন্যই হচ্ছে। এটাই হল মূল কথা।

এখানে যেহেতু বুরোক্র্যাসির কথা বার বার এসেছে সেই জন্য উল্লেখ করতে হয়, কেনেথ গলব্রেইথ বলেছেন, Bureaucracy is bureaucracy whether it is inside or out of the country, অর্থাৎ তাদেরকে যদি আপনি পুনর্বিন্যাস করতে পারেন, আপনি তাদেরকে নতুন incentive দিতে পারেন, নতুন দিক-দর্শন দিতে পারেন, motivation দিতে পারেন, leadership দিতে পারেন, তাহলে তাদের থেকে ভাল কাজ পাবেন। আর এটার দায়িত্ব হবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে, তাদের ছাড়া আপনি রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন, আপনি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন, সেটা আপনি পারবেন না।

মাননীয় স্পীকার, আমরা অনেক পরিবর্তন এনেছি। যেমন একটি সাধারণ উদাহরণ দিচ্ছি। অনেক প্রকল্পে আমরা দেখেছি যে, প্রকল্পের পরিচালকরা প্রকল্পের স্থানে থাকেন না, ঢাকায় থাকেন। এটা আমরা খুঁজে বের করেছি। এখন সকল প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের জায়গায় থাকতে বাধ্য করা হয়েছে, তাতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন আরও ত্বরান্বিত হবে এবং তার সুফল আমরা পাব।

মাননীয় স্পীকার, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং চিনি, এই তিনটির বিষয়ে তাঁরা খুব সোচ্চার ছিলেন। সারা বাংলাদেশে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা হল ১৫ লক্ষ, গ্যাসের গ্রাহক ৩ লক্ষ ৬১ হাজার। আর চিনি খায় সারা বাংলাদেশের ৮.১৫ শতাংশ মানুষ। আমি যে কর ধার্য করব, এই করটা কার উপরে চাপাব? যারা বাংলাদেশ সরকারের বা আমাদের অবকাঠামোগত কোন সুবিধা পায় না তাদের উপরেই কি আমরা কর বসাব, নাকি যাঁরা কিছু কিছু সুবিধা পাচ্ছেন তাঁদের উপরে কর বসাব? যারা বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না, তাঁদের তুলনায় যারা বিদ্যুৎ পাচ্ছেন তারাই অনেক ভাগ্যবান। সুতরাং আমি তাদের উপরেই কর বসাব।

মাননীয় স্পীকার, এই ১১ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ১৫ লক্ষ গ্রাহক। বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যে খরচটা হয়, সে খরচটা আমি কার কাছ থেকে তুলব? গরিব কৃষকের কাছ থেকে তুলব? তাই যাঁরা এই সুবিধা ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন তাঁদের কাছ থেকেই খরচটা তুলতে হবে।

কলকারখানা, domestic use-সহ সারা দেশে ৩ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ গ্যাস ব্যবহার করে। অথচ ১১ কোটি মানুষ যারা গ্যাস ব্যবহার করছেন না, সেই ১১ কোটি মানুষের উপরে কি আমি ট্যাক্স বসাব? সুতরাং গ্যাসের সুবিধা যাঁরা ভোগ করছেন, তাঁদের উপরেই বসাতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আমি মনে করি, আমাদের অর্থ-মন্ত্রী is fully justified in imposing tax on gas and electricity—আপনি গ্যাস ব্যবহার করবেন, আর তার জন্য গ্রামের মানুষ পয়সা দেবে কেন? আপনি বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন, বিজলী বাতি জ্বালাবেন, অথচ বিল দেবেন না, আর গ্রামের মানুষ তা pay করবে? এই সরকার এই নীতিতে বিশ্বাস করে না।

আর মাননীয় স্পীকার, চিনির কথা বলা হয়েছে। গতকাল আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির দাম ছিল ৪৮০ ডলার per ton। চিনির ব্যাপারে খুব উত্তেজিত হয়ে আমাদের জনাব শাজাহান বললেন, তাহলে কি জনগণ চিনি খাবে না? কিন্তু তিনি ৮.৫% লোকের কথা বলছেন যারা চিনি খায়। Less

www.pathagar.com

than a crore, চিনি খেতে হলে পয়সা দিয়ে খেতে হবে। আপনারা চান টিসিবি প্রতি টন ৪৮০ ডলার দিয়ে এনে অর্থাৎ প্রতি কেজি ২৭ টাকা ক্রয়মূল্যে এনে আপনাদের ২২ টাকায় দেবে? This government will not do that। দেশে চিনির ঘাটতি আছে। যাঁরাই চিনি আনবেন, তাঁরাই ৪৮০ ডলার দিয়ে আনবেন। Duty দিয়ে সেটা প্রায় ২৭/২৮ টাকায় পড়ে প্রতি কেজি। আমরা আনব ২৭/২৮ টাকায় আর মোঃ শাহজাহান[১] এবং শাজাহান সিরাজকে ২২ টাকায় দেব, এটা হবে না, এটা দেব না, এটা হাজার দাবি করলেও দেব না। সুতরাং চিনি খাওয়ানোর জন্য এই সরকার কোন subsidy দেবে না, এটা আজকে ঘোষণা দিতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, জনাব জোয়ার্দার[২] বলেছেন, মুদ্রাস্ফীতি বেড়েই চলেছে। আমি বলেছি যে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে নি, মুদ্রাস্ফীতি কমেছে। জনাব নুরুল ইসলাম মনি বলেছেন, অর্থমন্ত্রীরা একই কথা বলেন, এটা একটা চরিত্রহীন বাজেট। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' পড়েছিলাম, কিন্তু বাজেট চরিত্রহীন হয় এটা জানতাম না।

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, বিশ্বব্যাংক ও বিদেশী স্বার্থে এই বাজেট তৈরি হয়েছে। অর্থনীতির উপরে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। অর্থনীতির উপর যদি সরকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে মাসিক ভাতা কী করে পাচ্ছেন? সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে বলেই পাচ্ছেন।

জনাব আবদুস সাত্তার[৩] সিগারেট-বিড়ির পক্ষে খুব বলেছেন। জনাব সাত্তারকে একটা পরামর্শ দেই, আপনি সিগারেট খাওয়া বন্ধ করুন। জনাব গোফরান[৪] কালো টাকার কথা বলেছেন। কালো টাকা? আপনারা যে চাঁদা তুলতে যান, সেটা কি কালো না সাদা? পলিটিক্যাল পার্টির চাঁদা তুলতে হয়, অস্বীকার করার উপায় নেই। যে টাকাটা চাঁদা তোলেন সেটা একেবারেই কালো। কালো টাকা দুনিয়ার সব সমাজে আছে। এমন কোন দেশ নেই যে দেশে কালো টাকা নেই। আমরা কী করার চেষ্টা করেছি? আমরা চেয়েছি, এই টাকাটা উৎপাদন খাতে ব্যয় করা হোক। আমি বলব, কেউ যদি কালো টাকা করেও থাকে এবং সে যদি সেই টাকা দেশে উৎপাদন খাতে, কলকারখানা স্থাপন করতে ব্যয় করে, আমি তাকে দেশপ্রেমিক হিসাবে আখ্যায়িত করব।

মাননীয় স্পীকার, জনাব নূরে আলম জিকু এক বিশাল লিখিত বক্তৃতা দিয়েছেন। এত তাড়াতাড়ি বক্তৃতা পড়েছেন যে তিনি কী বলেছেন আমরা বুঝতেই পারিনি। পরে শুনলাম উনি একটা বিকল্প বাজেট দিয়েছেন এবং তার উপর স্পীকার সাহেব রুলিং দিয়েছেন যে, বাজেট এখানে একটাই আলোচনা হবে। আপনারা ঐ বাজেটটা ভাল করে রক্ষা করে রাখুন, নষ্ট যাতে না হয়, উই পোকা যাতে না ধরে। আপনারা যখন ক্ষমতায় আসবেন, তখন এটা উত্থাপন করবেন, যদি আপনি Finance Minister নিযুক্ত হন। জনাব মফিজুর রহমান রোকন সাহেব নেই, ওনার কথার জবাব দিয়ে লাভ নেই।

জনাব আবদুল হাই বলেছেন, চালের দাম বেড়েছে। আমরা তো ক্রাইসিসে আছি। চালেম দাম আবার অনেক জায়গায় বেশ কমে গেছে। গত বছর চালের দাম গড়ে ৪.৬% বেড়েছে, যেটা তার আগের বছর ১০% বেড়েছিল। আর এই বছরের এই সময়ে চালের দাম ৬ টাকার নিচে নেমে গেছে। এ জন্য আমরা খুব চিন্তিত আছি।

মাননীয় স্পীকার, জনাব শাজাহান সিরাজ বলেছেন, 'বাজেট কী?' তিনি সব সময় এরকম প্রশ্ন করেন। তিনি অনেক ভাল কথা বলেছেন। কিন্তু একটা কথা বলেছেন যে, 'সব বিনা পয়সায় দিতে হবে।' বক্তৃতা বিবৃতি বিনা পয়সায় দেওয়া যায় অনেক, কিন্তু চিনি, দুধ, সার বিনা পয়সায় দেওয়া যাবে না। আর বলেছেন, 'রাজবন্দীদের মুক্তি' দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশে কোন কারাগারে কোন রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী, কোন রাজনৈতিক কারণে বন্দী নেই।

জনাব মোহাম্মদ শাহজাহানও চিনি খাওয়ার অধিকার চেয়েছেন। আমি তার জবাব দিয়ে দিয়েছি। আর তিনি বারবার বলেন যে, 'শাসক শ্রেণী'। মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার মাধ্যমে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, তিনি কোন্ শ্রেণীতে belong করেন? তিনি নিজেই তো 'শাসক শ্রেণীর' একজন।

---

১. মোঃ শাহজাহান, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নির্বাচিত সদস্য।
২. মোহাম্মদ দবিরউদ্দিন জোয়ার্দার, ঝিনাইদহ-১ আসনে নির্বাচিত সদস্য।
৩. আবদুস সাত্তার, লক্ষ্মীপুর-৩ আসনে নির্বাচিত সদস্য।
৪. এম এ গোফরান, লক্ষ্মীপুর-১ আসনে নির্বাচিত সদস্য।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, মেজর বজলুল হুদা সাহেব বলেছেন, "গত বছরের বাজেট আর এ বছরের বাজেট একই রকম। আগামী দশক ও শতাব্দীতেও একই অবস্থা বিরাজ করবে। তারপর বলেছেন যে, আগামী দুই হাজার বছরেও কিছু হবে না। তিনি কতটা হতাশাগ্রস্ত ভেবে দেখুন। নিরাশার বাণী আমাদের শোনাবেন না, জনাব বজলুল হুদা। আমরা নিরাশার বাণীতে বিশ্বাস করি না। আপনাকে শুধু এটুকু বলি, আপনার নির্বাচনী মার্কা কুড়ালটা একটু দূরে রাখবেন। দেখবেন যে আপনার এই নিরাশা চলে গেছে। যতদিন কুড়াল সাথে থাকবে ততদিন আপনি একটা guilty conscious নিয়ে ডিফেনসিভ থাকবেন, অফেনসিভ হতে পারবেন না।

মাননীয় স্পীকার, জনাব আ স ম রব দু'বার বক্তৃতা করেছেন। আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনেছি। তাঁর message is same। তিনি ৫০০ সদস্যবিশিষ্ট সংসদ আর ৯০০ সদস্যবিশিষ্ট এনইসি দাবি করেছেন। মাননীয় স্পীকার, ৩০০ সংসদ সদস্য দিয়ে আমরা এই পার্লামেন্ট চালাতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছি, আপনার কত অসুবিধা সৃষ্টি করছি। আর যদি ৫০০ সদস্য এখানে বসে, তাহলে আপনার কী অবস্থা হবে চিন্তা করে দেখুন।

তিনি আরও বলেছেন যে, ৫০০ সদস্যবিশিষ্ট সংসদ যদি করা হয় তাহলে প্রবৃদ্ধির হার লাফ দিয়ে ১০ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশে চলে যাবে। 'মারফতি' কথা। এটা মারফতি কথা ছাড়া অন্য কোন কিছু নয়। কারণ এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

[বাধা প্রদান]

মাননীয় স্পীকার, তারপরে জনাব আবদুর রব বলেছেন যে, তিনি ৯০০ সদস্যের National Economic Council চান। আমি এর আগেও বলেছি যে, ২০০ সদস্য নিয়ে NEC-র মিটিং পরিচালনা করতে আমাদের কত কষ্ট পেতে হয়। আর ৯০০ মানুষ বসে আপনারা National Economic Council-এর মিটিং করে দেশের পরিকল্পনা করবেন—এটা কল্পনার বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনাদের framework আপনারা বুকের মধ্যে বেঁধে রাখেন—কোন আপত্তি নেই। আমাদের আর শোনাবেন না।

আজকে সকালে আ স ম রব সাহেব আরও দু-একটি কথা বলেছেন তার জবাব একটু দেওয়া দরকার। তিনি বলেছেন, দিনে এরশাদ, রাতে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি। এটা হল তাঁর নতুন একটা আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। তবে তিনি দিনের বেলায় তো জানি জাসদ। রাতের বেলায় তিনি কী করেন আমাদের এখন জানতে ইচ্ছা করছে।

মাননীয় স্পীকার, উন্নয়ন এবং গণতন্ত্র পাশাপাশি চলতে হবে। গণতন্ত্র ছাড়া উন্নয়ন হুমকির সম্মুখীন। আর উন্নয়ন গণতন্ত্র ছাড়া অর্জন করা সম্ভবপর নয়। সেই জন্য এই লক্ষ্য অর্জন করার উদ্দেশ্য এই গণতন্ত্রকে স্থিতিশীল করতে হবে। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে সমান্তরালভাবে সুদৃঢ় ও জোরদার করতে হবে। They have to go hand in hand—democracy and development। আর এটা কার্যকর করা আমাদের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ।

প্রথমে এইজন্য চাই সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা। গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত রাখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন একটি সর্বদলীয় সমঝোতা। রাজনৈতিক দলের যাঁরা এখানে আছেন বা যাঁরা বাইরে আছেন তাঁদের সকলকেই একটি জাতীয় সমঝোতায় আসতে হবে যে, আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে ও কাঠামোকে আমরা সুদৃঢ় করব, অব্যাহত রাখব। এই ধারাবাহিকতাকে আমরা আরও জোরদার করব। দেশের মূল সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে আমরা একটি ঐকমত্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করব। আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধিশালী করি, একটা বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করি এবং দলমত নির্বিশেষে এ দেশের কোটি কোটি মানুষের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা যাতে আমরা মিটাতে পারি, অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য যাতে আমরা অর্জন করতে পারি, সেইজন্য সমবেতভাবে কাজ করি।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্যই এই সংশোধনী

সংবিধান (নবম সংশোধন) আইন, ১৯৮৯

৯ জুলাই ১৯৮৯

দেশের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে আরও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাষ্ট্রপতি এরশাদ সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেন। এই সংশোধনীতে প্রস্তাব করা হয় যে কোন রাষ্ট্রপতি দুই মেয়াদের বেশি সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকতে পারবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার আদলে রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি একই সাথে running-mate হিসাবে নির্বাচিত হবেন। কেবল পার্লামেন্টে Impeachment proceedings-এর মাধ্যমে তাঁদের দুজনকে অপসারণ করা যাবে। এই সংশোধনী প্রবর্তন করার আগে অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটে যার বর্ণনা আমার আত্মজীবনীতে থাকবে। তবে এখানে শুধু এটুকু বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতি এরশাদ ধারণা দিয়েছিলেন যে তিনি ১৯৯১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে আর দাঁড়াবেন না, কারণ ততদিনে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর দশ বছর পার হয়ে যাবে। আমাকে নতুন সংশোধনী অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি করা হবে এবং নির্বাচনের ছয় মাস আগে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করবেন এবং উপ-রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে সরকার এবং দল পরিচালনা করে নির্বাচনের মাধ্যমে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হবেন। এই সংশোধনী পাস হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীকে ১৯৮৯ সালের ১২ আগস্ট উপ-রাষ্ট্রপতি করা হয় ঠিকই, কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের প্রায় ১৬ মাস বাকি থাকতে ২২ মে ১৯৯৫ সালে এরশাদ বরগুনার এক জনসভায় আবার রাষ্ট্রপতির জন্য নির্বাচনে দাঁড়াবেন বলে ঘোষণা দেন এবং পরে একটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করেন।

আমি এই প্রস্তাবে সম্মত ছিলাম না, কারণ এই পরিকল্পনায় আমার বিশ্বাস ছিল না। কোন সামরিক কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার কোন নজির পৃথিবীতে নেই। তাই এই প্রস্তাবও বাস্তবসম্মত ছিল না। পরে সেটাই প্রমাণিত হয়েছিল। আমি প্রায় দুমাস যাবত এই প্রস্তাবে রাজি হই নি। আমি প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হিসাবে থেকে যাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেছিলাম।

মাননীয় স্পীকার

আমার বক্তব্য শুরু করার আগে এই সংশোধনী বিলের উপরে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের বিরোধীদলের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিরোধীদলের নেতা এবং আমাদের সরকারী দলের সদস্যবৃন্দ সকলকে এই সংসদের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই একটি বিশেষ কারণে যে, নবম সংশোধনী বিলে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছতে পেরেছি। এই প্রথমবারের মত একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংবিধানের একটি সংশোধনীর বিষয়ে সরকার এবং বিরোধীদলের মধ্যে একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ঐক্যের ভিত্তি হল যে, আমরা দেশে গণতন্ত্র চাই। গণতন্ত্রের বিকাশ চাই। গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা দেখতে চাই এবং গণতন্ত্রকে সুদৃঢ়, জোরদার এবং শক্তিশালী করতে চাই। মনের এই আবেগ ও ইচ্ছা থেকেই আজকে আমাদের মধ্যে এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের অতীতের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখব যে, সাংবিধানিক রাজনীতি এবং সাংবিধানিক সংকটের জন্য আমাদের সমাজের প্রকৃতি এবং প্রগতি বারবার ব্যাহত হয়েছে। প্রথম স্বাধীনতার নয় বছর পর ১৯৫৬ সালে আমরা তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান পাই। সেই সংবিধানে যদিও Parliamentary system এবং Presidential system-এর একটা সংমিশ্রণ আমরা দেখতে পাই, কিন্তু মূলত সেই সংবিধানে একটি সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। সেই সংবিধান দুই বছরের বেশি টেকে নি। ১৯৫৮ সালেই সামরিক শাসন আসে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানকে cripple করা হয়, অর্থাৎ সেই সংবিধানকে সম্পূর্ণরূপে abrogate করে Martial Law-এর অধীনে দেশকে পরিচালনা করা হয়। তারপরে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান একটি নতুন সংবিধান দেন—যেটা ১৯৬২ সালের সংবিধান বলে পরিচিত।

www.pathagar.com

এই সংবিধানে, মাননীয় স্পীকার, ১৯৫৬ সালে জাতি যা অর্জন করেছিল তা থেকে সরে এসে পশ্চাদগামী একটি কেন্দ্রীভূত সরকার অর্থাৎ centralised administration বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা কায়েম করা হয়। সেটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'মৌলিক গণতন্ত্র' বলে একটা নতুন ধরনের গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয় যেখানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন পরোক্ষভাবে, এক শ্রেণীর মৌলিক গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে।

তারপরে, মাননীয় স্পীকার, ১৯৬৮-৬৯ সালের সেই গণ-আন্দোলনে এখানকার অনেকেই আমরা শরিক হয়েছিলাম। অনেকে আছেন, যাঁরা প্রথম সারিতে ছিলেন। সেই আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৬৯ সালে আবার সামরিক আইন জারি করা হয় এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানকে আবার বাতিল ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে, প্রথম ৯ বছর কোন সংবিধান ছিল না। তারপরে সংবিধান দুবার বাতিল হয়েছে ১৯৫৮ এবং ১৯৬৯ সালে। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে তখনকার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জাতিকে একটি সংবিধান উপহার দেন। এই সংবিধানে সকল গণতান্ত্রিক অধিকারের নিশ্চয়তা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিধান করা হয়। জাতির মৌলিক নীতিগুলি সন্নিবেশিত করা হয় এবং দেশে একটি সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধি ব্যবস্থা রচনা করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রে, আমাদের দেশের মানুষের নতুন জীবনে, নতুন স্বপ্নে এই সংবিধান কার্যকর হয়।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল এই যে, ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই ২ বছর ২ মাসের মধ্যে ৪টি সংশোধনী এই সংবিধানে আনা হয়। প্রথম সংশোধনী আনা হয় ১৫ জুলাই, ১৯৭৩ সালে যেখানে সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়। তারপরে, সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে একটি সংশোধনী এনে article-33-কে amend করা হয়, অর্থাৎ তার বলে কোন নাগরিককে বিনা বিচারে ২৪ ঘন্টার বেশি কোন পুলিশের হেফাজতে রাখা যাবে না বলে যে বিধান ছিল তার পরিবর্তন করা হয় এবং দেশে নাগরিকদের বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য একটি নিবর্তনমূলক আইন, Special Powers Act প্রণয়ন করা হয়। একই সংশোধনীর সাথে আর একটি সংশোধনী আনা হয় রাষ্ট্রপতিকে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতা দান করে।

তৃতীয় সংশোধনী আনা হয় ২৮ নভেম্বর, ১৯৭৪ সালে, জমির সীমানা নিয়ে ১৬ মে ১৯৭৪ সালে ভারতের সংগে আমাদের যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তিটাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। সেই চুক্তি অনুযায়ী আমরা আমাদের জমি ভারতে হস্তান্তর করেছি এবং সংবিধানে তা সন্নিবেশিত করেছি, কিন্তু তার বদলে আমাদের যে জমি পাওয়ার কথা ছিল সেটা আমরা এখনও পাইনি।

তারপর এসেছিল চতুর্থ সংশোধনী, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে। এই সংশোধনীতে সমস্ত মৌলিক অধিকারকে রহিত করা হয় এবং একটি একনায়কতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয় এবং দেশে একটি একদলীয় রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপরে এপ্রিল, ১৯৭৯ সালে আসে পঞ্চম সংশোধনী। ১৯৭৫ সালে যখন সামরিক শাসন আসে তখন সংবিধানকে বাতিল না করে স্থগিত করা হয়, এবং পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক আইনকে তুলে নিয়ে দেশে একটি পূর্ণ সাংবিধানিক সরকার কায়েম করা হয়। 6th Amendment যেটা আসে, সেটা করা হয় তখনকার উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার যাতে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হতে পারেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেই জন্য। একজন ব্যক্তির সুবিধার জন্য তখন ষষ্ঠ সংশোধনী বিল আনা হয়েছিল।

মাননীয় স্পীকার, সপ্তম সংশোধনী বিল আমাদের এই সরকারের আমলে আসে, সামরিক আইন তুলে নিয়ে একটি সাংবিধানিক সরকার পুনর্বহাল করার জন্য। অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে আমরা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করি। আর আজকে নবম সংশোধনী বিল এনেছি, যার উপরে এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি এই নবম সংশোধনী সম্পর্কে দুয়েকটি কথা অবশ্যই বলব।

মাননীয় স্পীকার, বর্তমানে আমাদের এই সাংবিধানিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি কী? বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা আমাদের দেশে এখন বিদ্যমান। সংবিধানের সব মৌলিক অধিকার এবং বিচার

www.pathagar.com

বিভাগের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা এখন বিদ্যমান। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য দূর করে একটি পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য রাষ্ট্রপতি এরশাদ উদ্যোগ নেন।

এই সংসদে এই বিলটি হঠাৎ দেখে হয়তো আপনাদের মনে হয়েছে যে, এই বিল তাৎক্ষণিকভাবে আনা হয়েছে। কিন্তু আসলে এই বিল হঠাৎ করে আনা হয় নি। এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বেশ কয়েক মাস যাবত চিন্তাভাবনা করেছেন, কথাবার্তা বলেছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং তিনি নিজে ঠিক করেছেন যে, তাঁর নিজের ক্ষমতা তিনি নিজেই সীমিত করতে চান। এই সংবিধানকে আরও গণতন্ত্রায়ন করতে চান। এই সংবিধানের ধারাবাহিকতা যাতে অব্যাহত থাকে, দেশে যাতে গণতন্ত্র সুদৃঢ় হয়, শক্তিশালী হয় এবং এই দেশে প্রচলিত গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক রাজনীতি যাতে আরও সুসংহত করা যায় তার জন্য তিনি এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

মাননীয় স্পীকার, বর্তমানে ৪৮ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত এবং অপসারিত হন। এখানে আমাদের একটা সংসদ আছে যেখানে জনগণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যরা আছেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি এবং সংসদের মাঝখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ এই উপ-রাষ্ট্রপতির পদ। যদি কোন কারণে রাষ্ট্রপতি অনুপস্থিত থাকেন বা রাষ্ট্রপতি তাঁর কাজ যদি চালাতে না পারেন তাহলে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কাজ করবেন। ১৮০ দিনের মধ্যে তিনি নির্বাচন দেবেন।

মাননীয় স্পীকার, দুটি কারণে এই উপ-রাষ্ট্রপতির পদের মর্যাদা সঠিক ছিল না। প্রথমটি হল যে, এটা কোন গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার অধীনে ছিল না। যেখানে সংসদ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত, রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, সেখানে এই উপ-রাষ্ট্রপতির নিয়োগের ব্যাপারে কোন গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা ছিল না। আর একটি হল, রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতির কারণে, পদত্যাগ করার কারণে বা যে কোন কারণে যদি কাজ করতে না পারেন, তাহলে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন, কিন্তু তিনি ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচন দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

এই বিধানের ফলে সমাজে অনিশ্চয়তা নেমে আসার সম্ভাবনা থাকে। দেশের রাজনীতিতে, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় অনিশ্চয়তার একটা ছায়া নেমে আসবে, যার ফলে দেশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, দেশের অর্থনীতি এবং উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে। এই দুটি কারণেই বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করার প্রয়োজনবোধ করেছে সরকার।

মাননীয় স্পীকার, এই দুটি সমস্যার সমাধান করার জন্য সংবিধানের বর্তমান সংশোধনী আমরা এনেছি। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, রাষ্ট্রপতি সরাসরিভাবে ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচিত হবেন এবং একই সঙ্গে, একইভাবে দেশের সকল মানুষের ভোটে একজন উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। তাঁদের দুটি অফিস একই দিনে vacant হবে। এই ব্যবস্থাই এই আইনের মধ্যে রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি একই দিনে নির্বাচিত হওয়ার পর যদি কোন কারণে উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ নিতে দেরিও হয়, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ যেদিন শেষ হবে সেই দিনই উপ-রাষ্ট্রপতির মেয়াদও শেষ হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল system-এর আদলে প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট running mate হিসাবে নির্বাচিত হবেন। এই বিধান কার্যকর করার জন্য একটি উপযুক্ত আইন আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এই সংসদে আনব। এটা হল আগামী নির্বাচনের কথা। এই ব্যবস্থা চালু হলে সরকার এবং শাসন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হলে বা তিনি কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং বাকি মেয়াদের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসাবে দেশ পরিচালনা করবেন।

আমাদের রাষ্ট্রপতি ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং এই সংবিধানের অধীনে নির্বাচিত হয়েছেন। শাজাহান সিরাজ সাহেব বলেছেন যে, এখানে আমরা ফাঁক রেখেছি। বজলুল হুদা সাহেবও বোধহয় একই point raise করেছেন। এই আইন commence হওয়ার পরে দুই টার্ম শুরু হবে, না এখন থেকেই শুরু হবে? মাননীয় স্পীকার, আমি অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানাতে চাই, আইন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আইন বলছে যে, কোন রাষ্ট্রপতি দুটি consecutive terms-এর বেশি office hold করতে পারবেন না। তার মানে

www.pathagar.com

হল যে, পরপর দুবার যিনি Article 48-এর অধীনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন বা হবেন তিনি আর রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। যদি বুঝতে না পারেন তাহলে ভাল উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করুন, কোন অসুবিধা নেই।

১ মার্চ, ১৯৯১ সাল থেকে এটা enforced হবে। মাননীয় স্পীকার, এটার দুটি দিক আছে। এই আইনটা in a way একটা futuristic amendment, গেজেটে নোটিফিকেশন করা হোক বা না হোক ১৯৯১ সালের ১ মার্চে এটা কার্যকর হয়ে যাবে। নিজে থেকেই এটা কার্যকর হবে। আর একটি হল, সরকার যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে ১ মার্চের আগেও এই আইনটাকে কার্যকর করতে পারেন। দুটি option open আছে। এবং এই মার্চের পরে আর কোন option নেই। এই আইনে বলে দিচ্ছে:

> তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপে কোন তারিখ নির্ধারিত না হয়, তাহা হইলে এই আইন ১ মার্চ, ১৯৯১ইং তারিখে বলবৎ হইবে।

মাননীয় স্পীকার, এই দুটো confusion আমি দূর করার চেষ্টা করেছি। আর একটি হল, আমাদের সংবিধান বলে, যেদিন থেকে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর, ১৯৯১ সালে, তার আগে ছয় মাসের মধ্যে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। Six months prior to the expiry of the term। ১ মার্চ কেন রেখেছি? ৬ মাস হয় এপ্রিল মাসে। ১ মার্চ এইজন্য রেখেছি যে, নির্বাচনের প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। তারিখ ঘোষণা করতে হবে, কীভাবে নির্বাচন হবে তার ব্যবস্থা করতে হবে—এইজন্য আমরা দেড় মাস সময় হাতে রেখেছি। যাতে ঐদিন থেকে বলবত হয়ে গেলে sitting President যিনি আছেন, তিনি যাতে সবকিছু ঠিকঠাক করে ঐ অক্টোবর মাসের আগে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারেন এই জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আর একটি হল যে, এখন থেকে ১ মার্চ, ৯১ সাল পর্যন্ত কী হতে পারে, রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে এই আইনকে তিনি এখনই enforce করবেন, আজকে এই আইন পাস হয়ে গেল, তিনি সম্মতি দিলেন। এখন তিনি এটা enforce করতে চান। তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, উপ-রাষ্ট্রপতি যিনি এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য হবেন আর এই আইন বলবত হওয়ার পর যদি তাঁকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ করেন, তাহলে সেই উপ-রাষ্ট্রপতির নিয়োগ এই হাউসে absolute majorityর সমর্থনে ratified হতে হবে, not by simple majority, অর্থাৎ কমপক্ষে ১৫১ জন সদস্য উপ-রাষ্ট্রপতির পক্ষে ভোট দিয়ে তাঁর appointment-টাকে ratify করতে হবে।

আর একটি কথা যে, প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পরও উপ-রাষ্ট্রপতির পদ যদি কোন কারণে খালি হয়, তাহলে কী হবে? সেখানেও নতুন করে উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন করার প্রয়োজন হবে না। সেখানেও উপ-রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেবেন কিন্তু পার্লামেন্ট দ্বারা 'রেটিফাইড' হতে হবে। তাহলে তার 'রেজাল্ট' কী? রেজাল্ট হল, উপ-রাষ্ট্রপতি এই আইন কার্যকর হওয়ার পর বা ১৯৯১ সালে নির্বাচিত হওয়ার পর যে কোন অবস্থায়, যদি রাষ্ট্রপতি কোন কারণে দেশ পরিচালনা করতে না চান বা তিনি পদত্যাগ করেন বা তিনি যদি কোন কারণে কাজ করতে অক্ষম হন তাহলে উপ-রাষ্ট্রপতিকে বর্তমানে যে বিধি আছে, ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচন দিতে হবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি যতদিনের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এই উপ-রাষ্ট্রপতি, তিনি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন বা পার্লামেন্টের দ্বারা রেটিফাইড হন, দুটো ক্ষেত্রেই তিনি রাষ্ট্রপতির টার্ম অব অফিস যখন শেষ হবে সেই পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। তবে ঐ টার্ম শেষ হওয়ার ১৮০ দিনের মধ্যে তাঁকে নির্বাচন দিতে হবে। এটাই হল, মাননীয় স্পীকার, এই সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু।

দুই একটি পয়েন্ট এখানে তোলা হয়েছে যেটা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। সেটা হল যে, একটি অতিরিক্ত ক্ষমতা এই সংসদকে প্রথমবারের মতো দেওয়া হয়েছে। যদি রাষ্ট্রপতি না থাকেন, উপ-রাষ্ট্রপতি না থাকেন, মাননীয় স্পীকার, আপনিও যদি না থাকেন বা unable যদি হন, তাহলে দেশ কে চালাবে? আমাদের বর্তমান সংবিধানে এটার কোন provision নেই। Like in a war, war declared হলে Parliament sits at once and takes decision. এই সংবিধানে war-এর ব্যাপারে provision already আছে। কিন্তু প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে ছিল না। যেটা আমরা এখন সংশোধন করার চেষ্টা করেছি।

www.pathagar.com

যেদিন এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হবে ঠিক তার পরের দিন, এখানে বলা আছে, কীভাবে সেটা নির্ধারিত হবে। সংসদ এটা decide করবেন যে কীভাবে এবং কে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার পালন করবেন? একটা প্যানেল থাকবে ৫ জনের। তখন সকলেরই একটু আশা থাকবে। শাজাহান সিরাজ সাহেব আপনার নাম ১ নম্বরে রাখব।

মাননীয় স্পীকার, আমি চেষ্টা করলাম যতটুকু সম্ভব ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য। আমি আশা করি আমার এই বক্তব্যের পরে যাদের মনে কিছু সংশয় ছিল, কিছু দুশ্চিন্তা ছিল, সেটা অনেকটা দূর হবে।

মাননীয় স্পীকার, এখানে কয়েকজন সংসদ সদস্য power and function of the Prime Minister and the Vice-President সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এটা একটি বহু দলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা। আজকে আমরা office of the Vice President-কে effective করেছি। পার্লামেন্টে impeachment proceedings ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে যেমন অপসারণ করা যাবে না, ঠিক তেমনি উপ-রাষ্ট্রপতিকেও করা যাবে না। এটা আমাদের জন্য একটি মস্ত বড় বিজয়। এই রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন এই সংবিধানে যদি আমরা আনি, তাহলে এই সংবিধানের যে কাঠামো আছে সেই কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন হয়ে যাবে। যা আমরা জাতীয় পার্টির তরফ থেকে কোনদিনই চাই না। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার যে কাঠামো আছে সেই কাঠামোকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য এই সংশোধনী আনা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। মোহাম্মদ শাহজাহান সাহেব বলেছেন, শাহজাহান সিরাজও বলেছেন যে, তাড়াহুড়া করে বিল আনা হয়েছে। আমি এর উত্তর আগেও দিয়েছি যে, তাড়াহুড়া করে এ বিল আনা হয় নি। এই বিল সম্পর্কে অনেক চিন্তাভাবনা করা হয়েছে এবং আমি মনে করি এর আগে যত সংশোধনী এসেছে—আটটি সংশোধনী এসেছে, আপনারা যদি proceedings গুলি দেখেন তাহলে দেখবেন যে, অন্য যে কোন সংশোধনীর চেয়ে এই সংশোধনীর উপর আলোচনার জন্য অনেক বেশি সময় রাখা হয়েছে। আমরা আলোচনার জন্য আগামী কালও প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আপনাদের তরফ থেকে এবং আমাদের তরফ থেকে বলা হয়েছে ঈদ আসছে সেজন্য যে যার এলাকায় চলে যাবেন। এই কারণে আমরা এটা আগামী কাল পর্যন্ত চালাতে পারছি না। কিন্তু আপনাদের কোন বক্তার বক্তব্য বাদ থাকে নি। মূল বিষয়টি, মূল প্রশ্নগুলি, মূল বক্তব্য, আপনাদের বক্তব্যে বেরিয়ে এসেছে বলে আমি মনে করি।

মাননীয় স্পীকার, জনাব শাজাহান সিরাজ ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে বলেছেন। এতে করে তিনি কী বোঝাতে চান, আমি তা ঠিক জানি না। তবে আমি তাঁকে এটুকু বলতে চাই যে, ইতিহাস থেকে শিক্ষা শুধু আমাদেরকে নিলেই চলবে না, তিনিও যদি একটু নেন, তাহলে আমরা খুব খুশি হব। ঐসব পুরনো দিনের কথার দিকে আমি আর যেতে চাই না। সময় কম।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের মাননীয় সদস্য সর্বজনাব মোক্তার হোসেন জোয়ারদার, আবদুল হাই প্রমুখ মোটামুটি একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন। সংশয় ও অনিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করেছেন; আমার জন্য খুব আফসোস করেছেন। আমি জনাব আবদুল হাই সাহেবকে নিশ্চয়তা দিতে চাই, এখন অবশ্য তিনি নেই, কখনও সময়মত থাকেন না, বক্তৃতা দিয়েই চলে যান। তিনি আমার সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, তাঁর আমার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। আমরা ইনশাআল্লাহ যাঁরা floor-এর এই পাশে আছি তাঁরা সবাই খুব ভাল আছি। আপনারা আমাদের জন্য কোনরূপ চিন্তা করবেন না। বরং যদি পারেন, তাহলে দোয়া করবেন।

জনাব বজলুল হুদা সাহেব বলেছেন, বিচার মানে হল 'তালগাছটা আমার'। মাননীয় স্পীকার, বজলুল হুদা সাহেবের নির্বাচনী প্রতীক ছিল কুড়াল। যাঁরা কুড়াল দিয়ে কাজ করে তাদের জন্য তাল গাছ কাটা খুব সহজ। কিন্তু আমাদের জন্য এতো সহজ নয়। We cannot say readily যে, তালগাছটা আমার, খুঁড়ে নিয়ে গেলাম। আমরা তা পারব না। আর, তিনি এখানে একটা পোস্টার দেখিয়েছেন। পোস্টারে 'ধানের শীষ' দেখলাম। কুড়াল তো দেখলাম না, কুড়ালের কী হল? এখন ধানের শীষে কুড়াল দেখছেন, না কুড়ালে ধানের শীষ দেখছেন? এটা বজলুল হুদা সাহেব next time-এ আমাদেরকে জানাবেন।

তারপরে আমাদের মাননীয় এহসান আলী খান সাহেব খুব ভাল বলেছেন, তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড আর আমি দিতে চাই না। তিনি বলেছেন যে, আমার হাত পা বাঁধা। আমার হাত পা যদি বাঁধা হয়ে থাকে

www.pathagar.com

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে, তাহলে এহসান আলী সাহেবেরও হাত পা বাঁধা আছে এই সংসদে, একই কারণে।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের সম্মানিত বিরোধী দলের নেতা একটি অত্যন্ত সারগর্ভ বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর স্টাইল এখন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আগে আমরা দেখতাম যে, তিনি নোট দেখে বক্তব্য রাখতেন, আজকাল দেখছি he has changed his strategy completely। তিনি এখন লিখিত বক্তব্য পড়েন এবং তা-ও আবার আপনার অনুমতি না নিয়েই। তবুও তাঁর বক্তব্যে এমন কিছু নেই আমি যেটার প্রতিবাদ করতে পারি। তবে, শুধু বলতে চাই যে, তাঁর নিজের যে ফিলসফি, তাঁর দলীয় যে দর্শন, তার প্রতি তিনি stick করেছেন এবং সবসময় তিনি করেন। তিনি এখনও মনে করেন যে, ৫০০ আসনের একটি সংসদ হলে দেশের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এটার সঙ্গে আমরা একমত নই। তবে constitution is not unchangeable, এটা পরিবর্তনশীল। যুগের ও সময়ের সাথে সাথে মানুষ যেমন বদলায়, সংবিধানও তেমন বদলাতে পারে। আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকব যেদিন তাঁরা two-third majority নিয়ে এই পার্লামেন্টে আসবেন, সংবিধানের বিধি মোতাবেক তাঁদের aim and object যেটা আছে সেটা তাঁরা বাস্তবায়ন করতে পারবেন। Good luck to them।

মাননীয় স্পীকার, আমি আমার বক্তব্য প্রায় শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছি। আমি শুধু বলতে চাই যে, যাঁর অনুপ্রেরণা এবং যাঁর উদ্যোগে এই বিলটি আমরা আজকে এখানে এনেছি, তিনি হলেন রাষ্ট্রপতি এরশাদ। মাননীয় স্পীকার, সংবিধান একটি জাতির দলিল। আমরা একদিকে খুব ভাগ্যবান, পাকিস্তানে অল্প সময়ের মধ্যে দুবার সংবিধান বাতিল হয়েছে, আমাদের দেশে গত আঠার বছরে কখনো বাতিল হয়নি। যদিও দুটি সামরিক আইন ও শাসন এসেছে, আমাদের সংবিধান বাতিল হয় নি এবং বিশেষ করে গত সাত বছরে এই সংবিধানকে সম্পূর্ণভাবে সমুন্নত রাখা হয়েছে। আজকে মাননীয় স্পীকার, এই সংশোধনী আনা হয়েছে to democratise the constitution further এবং এই সংবিধানকে আরও improve করার জন্য আনা হয়েছে।

এই কথাটা কেউ বলতে পারবে না যে, এই সংশোধনী আনার ফলে সংবিধানে দেওয়া দেশের জনগণের কোন অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। আজকে তাই অন্তত একটি বিষয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি যে আমরা ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা অনুন্নত দেশ হতে পারি, কিন্তু আমরা এই সংবিধানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ও অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছি, যদিও আমাদের উপর দিয়ে ঝড়তুফান কম যায়নি।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতি এরশাদ এসেছেন ক্যান্টনমেন্ট থেকে। তিনি একজন সামরিক অফিসার ছিলেন, আমরা রাজনীতিবিদরা যা করতে পারি নি, আজকে রাষ্ট্রপতি এরশাদ সেই জিনিসটা করেছেন। নিজে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় নিজের অবসরের ব্যবস্থা করেছেন। এই সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমে জাতির ভবিষ্যতের জন্য একটি সুদূরপ্রসারী সংস্কার এনেছেন।

এই সংশোধনী দেশে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতাকে নিশ্চয়তা দান করেছে। আশা করি, এই সংশোধনী দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্বের সংকট নিরসন করবে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি আরও জোরদার করবে, আমাদের সংবিধানকে সমুন্নত রাখবে, এবং গণতন্ত্রকে সুসংহত করবে।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।*

---

* বিলটি একই দিনে সংসদে পাশ হয়।

www.pathagar.com

আমরা যাঁরা সরকারে ছিলাম আমাদের কারোরই ট্র্যাক রেকর্ড ভাল নয়

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণের উপর বক্তব্য

১৫ মে ১৯৯১

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিরোধীদলসমূহের সম্মিলিত ফর্মুলা অনুযায়ী আমি উপ-রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার পর দেশের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি এরশাদ উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন এবং তার পরপরই তিনি নিজে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দীন দেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করেন এবং দেশে গণতন্ত্রের নতুন যাত্রা সূচনা করেন। জেল-জুলুমসহ সদ্য ক্ষমতাচ্যুত জাতীয় পার্টির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সত্ত্বেও ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে দেশে একটি সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতের সমর্থন নিয়ে বিএনপি সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সরকার গঠন করে। কিন্তু সাংবিধানিক সংকট থেকে যায়। সরকার গঠিত হয় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির অধীনে অর্থাৎ বিচারপতি সাহাবুদ্দীন তখনও রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথচ জনগণ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে বিএনপির উপর। অন্যদিকে প্রধান বিচারপতির পদ না ছেড়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ ছিল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(ঘ ঘ)-এর পরিপন্থী। এই অন্তর্বর্তীকালীন সাংবিধানিক সংকটের মাঝখানে নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে সংবিধান অনুযায়ী সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ভাষণ দিতে হয়। নির্বাচনে আমি কারাগারের অন্তরাল থেকে নির্বাচিত হই এবং জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা হিসাবে এই বক্তব্য রাখি।

মাননীয় স্পীকার

মাননীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণটা ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী ভাষণ। Normally Head of the State যখন কোন পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন, সেই বক্তব্যে সরকার তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মসূচী তুলে ধরেন। কিন্তু এই ভাষণে সেই ধরনের দিক-নির্দেশনা নেই এবং এটা কোন নীতিনির্ধারণী ভাষণ ছিল না। তার কারণ হল এই যে, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিজেও বলেছেন, তিনি নিরপেক্ষ এবং নির্দলীয় অথচ সংবিধান অনুযায়ী তিনি হলেন সরকারপ্রধান, অথচ তাঁর মন্ত্রিসভা এখন দলীয় মন্ত্রিসভা। কারণ দেশে একটি নির্বাচন হয়েছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বিশেষ দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। They have got mandate of the people to govern the country।

এই দুটি কারণেই এই ভাষণটি দেশের সামনে একটি সাংবিধানিক সংকটের কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এবং এই সাংবিধানিক সংকট আজকে জাতির সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা আমরা আমাদের এই অধিবেশনের প্রায় সকল আলোচনার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি। আজকে শাসনই বলি, আর সংবিধান সংকটই বলি, আমি মনে করি, জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে এই অনিশ্চয়তার অবসান অতি শীঘ্র হওয়া প্রয়োজন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর কথা না বলে তিনি এই সাংবিধানিক সংকট নিরসনের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর ভাষণের ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদে তিনি এই মূল বক্তব্যটা তুলে ধরেছেন।

এখন মাননীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিজের অবস্থানটাও অত্যন্ত নাজুক। ৯ম সংশোধনী কার্যকর হবার পর এই দেশে কোন উপ-রাষ্ট্রপতি সংসদের অনুমোদন ছাড়া কোন কার্যভার এবং কার্যকাল পরিচালনা করতে পারেন না। আর দ্বিতীয় হল তিনি প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং এখনও প্রধান

www.pathagar.com

বিচারপতি আছেন। প্রধান বিচারপতি হিসাবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬ (ঘঘ) অনুসারে তিনি উপ-রাষ্ট্রপতি হতে পারেন না।

কিন্তু তারপরও একটি অসাধারণ এবং অস্বাভাবিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে, তিনজোটের ঐক্যবদ্ধ একটি ঘোষণার প্রেক্ষাপটে আমি এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করি। কিন্তু তার মানে এই নয়, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কার্যভার এবং কার্যকাল বিধিসম্মত বা সংবিধানসম্মত হয়েছে। সেইজন্য আমি আশা করেছিলাম, এই অধিবেশনে সর্বপ্রথম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাঁদের উদ্যোগে তাঁর এই কার্যভার এবং কার্যকালকে ratify করবেন, সংবিধানকে সংশোধন করবেন এবং এটা করা উচিত ছিল। যতদিন এটা করা হবে না, ততদিন পর্যন্ত constitutionally একটি vacuum থেকে যাবে। যখন আমরা পদত্যাগ করি, তখন এই প্রশ্নের জবাবে আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে, জনগণের নির্বাচিত সংসদ তাঁর কার্যকাল এবং কার্যভারকে ratify করে দেবে।

দ্বিতীয় কথা হল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে, সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে, এখানে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। আজকে আমার ডানদিকে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা একটি বিশেষ জোট, বাঁদিকে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা আর একটি জোট এবং তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করেছেন এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য। It was unity of convenience, not an unity of conviction। সমগ্র জাতি এটা খুব ভালভাবে জানে যে, এই দুটি জোটের মধ্যে আদর্শগত কোন মিল নেই। সব ব্যাপারেই তাঁদের মধ্যে প্রচুর বিভেদ রয়েছে। আজকে এই সংসদে তাঁদের এই আদর্শগত পার্থক্যটাই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এই ঘোষণাপত্র নিয়ে যে বিতর্ক, এটা উনাদের নিজস্ব ব্যাপার।

যে প্রত্যাশা, যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জাতি এই সংসদ নির্বাচিত করেছিল, আজকে সংসদের এই অধিবেশন শেষ হতে চলেছে কিন্তু সেই আশা-প্রত্যাশার কোন প্রতিফলন এই সংসদের কোন কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা পায় নি। আজকে এইজন্য এই প্রশ্নটি থেকে যাবে যে, ভবিষ্যতে যখন আবার অধিবেশন বসবে তখনও এই সমস্যার কোন সমাধান আদৌ তাঁরা করতে পারবেন কিনা?

মাননীয় স্পীকার, নির্বাচনের আগের এই ঘোষণার দুইটি দিক ছিল। একটি হল ক্ষমতা হস্তান্তরের দিক, আর একটি হল এই সংসদে আসার পর কী করে তাঁরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন করবেন? হস্তান্তরের ব্যাপারে তাঁরা যেভাবে বলেছিলেন, সেভাবেই আমরা তাঁদেরকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছি। হস্তান্তরের পর তৃতীয় একটি শর্ত অলিখিতভাবে যোগ করা হয়, সেটি হল, নির্বাচন হবে ঠিকই, কিন্তু একটি রাজনৈতিক দলের সমস্ত নেতৃবৃন্দকে জেলখানায় আটক রেখে তাঁদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে তাঁদেরকে নির্বাচনে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফেলে দিতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত আজকে তাই হয়েছে। যদি নির্বাচনে অন্যান্য দলের মতো আমাদেরকেও সমান অধিকার দেওয়া হত, তাহলে আমরা এই সারিতে বসতাম না, হয়তবা ঐ সারিতে বসতাম।

কিন্তু আমরা এটা গ্রহণ করে নিয়েছি এজন্য যে, এর ফলে যদি দেশে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করতে পারি এবং গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে পারি তাহলে আমাদের এই পদত্যাগ সার্থক হবে বলে আমরা মনে করেছিলাম। যেভাবে আমরা ক্ষমতা হস্তান্তর করেছি তাতে একটা নজিরবিহীন কাজ আমরা করেছি বলেই আমরা মনে করি। আমরা সংবিধানকে অব্যাহত রাখার, রক্ষা করার চেষ্টা করেছি এবং সেই লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করেছি। এই নির্বাচন নিরপেক্ষ হয় নি as far as Jatyio Party is concerned। নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে, অবাধ হয়েছে কিন্তু নিরপেক্ষ হয় নি। কারণ আমরা দেখেছি যে, an act of discrimination was exercised against one particular political party। যদি এটা করা না হত, তাহলে হয়ত গণতন্ত্রকে এদেশে আরও সহজভাবে সুসংহত করার সৌভাগ্য আমরা অর্জন করতে পারতাম।

মাননীয় স্পীকার, অর্থনৈতিক অবস্থা আজকে একটি অত্যন্ত কঠিন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। এটা আমাদের সকলের জন্য উদ্বেগের কারণ। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ এবং এই প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আমাদের দেশের অর্থনীতিতে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। এইজন্য আমি আজকে বলতে চাই যে,

www.pathagar.com

প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ থেকে বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পদে ফিরে যাওয়াটা অনৈতিক এবং সংবিধান পরিপন্থী

সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১

৩১ জুলাই ১৯৯১

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দেশে একটি নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু অবাধ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী দেশে তখনও রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা বহাল ছিল অর্থাৎ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনই ছিলেন সরকারের নির্বাহী প্রধান। ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর ঢাকার পান্থপথের জনসভায় আন্দোলনরত বিরোধী জোটসমূহের এক ঘোষণা অনুযায়ী সংসদের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে একটি সার্বভৌম সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য নতুন সংসদে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপন করা হয়। সংবিধান (একাদশ সংশোধন) বিল ১৯৯১ আর সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল ১৯৯১। প্রথমটি ছিল, প্রধান বিচারপতির পদে বহাল থেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন এবং তাঁর সরকারের সমস্ত কার্যক্রমকে বৈধকরণ করা আর দ্বিতীয়টি ছিল দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রবর্তন করা। বিরোধী জোটসমূহের অঙ্গীকার অনুযায়ী একাদশ সংশোধনীতে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর মেয়াদকাল শেষে দেশের প্রধান বিচারপতি পদে দায়িত্ব পালন করার জন্য ফিরে যাওয়ার বিধান রাখা হয়। উপরোক্ত দুইটি সংবিধান সংশোধনী বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চূড়ান্ত করার জন্য সংসদ একটি সর্বদলীয় বাছাই কমিটি গঠন করে। লেখক এই বাছাই কমিটির সদস্য হিসাবে আমি আমার অবদান রাখি, কিন্তু আমার মতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে একটি রাজনৈতিক অফিসের দায়িত্ব পালন করার পর দেশের স্বাধীন বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ অফিস অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করা বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের জন্য শুধু অসাংবিধানিক নয় বরং অনৈতিক ছিল। এই অভিমত ব্যক্ত করে আমি বাছাই কমিটিতে আমার অসম্মতিসূচক বক্তব্য Note of dissent প্রদান করি যা সংসদে বাছাই কমিটির রিপোর্টে সন্নিবেশিত করা হয়। যদিও সিদ্ধান্ত ছিল যে বাছাই কমিটির কোন সদস্য সংসদে এই দুটি বিলের উপর কোন বিতর্কে অংশগ্রহণ করবেন না, কিন্তু Note of dissent-এর উপর আমার বক্তব্য রাখার সুযোগ গ্রহণ করি।

মাননীয় স্পীকার

আমি সিলেক্ট কমিটির মেম্বার ছিলাম এটা সত্য। কিন্তু I have a Note of dissent and I have a right to defend my Note of dissent on the floor of the House। সেই জন্য আমি আমার Note of dissent এর উপর কিছু বলার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

[অনুমতির পর]

মাননীয় স্পীকার, আজকের এই সংশোধনী কেন আনা হচ্ছে? এটা এজন্যই আনা হচ্ছে যে, there has been a constitutional vacuum in the country। একটা সাংবিধানিক শূন্যতাকে পূরণ করার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে। এখানে অতীতের কথা অনেক বলা হয়েছে, আমি অতীতে যেতে চাই না। তিন জোট বা জনগণের প্রতি সম্মান দেখিয়ে যখন আমরা পদত্যাগ করি এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের কাছে যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়, তখন এই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে, তাঁর এই কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং তাঁর কার্যকাল সংবিধান অনুযায়ী বৈধ হবে না। সেই কারণেই তো আজকে এই বিল আনা হয়েছে। যদি সেটা বৈধ হত তাহলে এই বৈধকরণের বিল তো এই হাউসে আনার প্রয়োজন ছিল না। সেজন্যই এখানে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের বিরুদ্ধে এই হাউসে কোন বক্তব্য উত্থাপন করাটা ঠিক হবে না। কারণ এটা বললে তাঁকে অনেক বেশি বিতর্কিত করে তোলা হবে।

www.pathagar.com

এখানে যে নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া হয়েছে, সেটা অত্যন্ত একটি মৌলিক ও নীতিগত কারণে দেওয়া হয়েছে। এটা ব্যক্তি সাহাবুদ্দীনের ব্যাপারে নয় বা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন সম্পর্কে নয়, এটা একটি office কে uphold করার জন্য, অফিস অব দি চীফ জাস্টিস অব বাংলাদেশ-এর জন্য। সেই অফিসের ব্যাপারে এখানে বক্তব্য রাখা যেতে পারে। সুতরাং আমরা যদি এই হাউসে তাঁর ব্যক্তিত্বকে নিয়ে বিতর্ক করি তাহলে প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সেজন্য মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে, তাঁর কার্যকাল এবং তার কার্যভারকে বৈধ করার জন্যই এই amendment bill-এ তিনটি অংশ রয়েছে। একটি হল প্রস্তাবনা, দ্বিতীয় হল চতুর্থ তফশীলের অনুচ্ছেদ ২১(১) আর তৃতীয় হল একই তফশীলের ২১(২) অনুচ্ছেদ।

এই সংশোধনীর প্রস্তাবনার ব্যাপারে আমি আপত্তি তুলেছি যে, এখানে 'অবৈধ' শব্দটি বোধহয় ব্যবহার করা উচিত হবে না। এখানে কোন আবেগের প্রশ্ন নেই বা কাউকে ডিফেন্ড করার জন্য একথা বলা হচ্ছে না। Constitution-making is a very arduous task, it is a very difficult task। এখানে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই সংশোধনীটা আনছি। 'অবৈধ' কথাটা বায়তুল মোকাররমে দাঁড়িয়ে বলা যায়, এটা কোন political মিটিং-এ বলা যায় যে আমরা 'অবৈধ' সরকার ছিলাম, খুব ভাল কথা, এটা বলার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু যখন আমি সংবিধানে 'অবৈধ' শব্দটি দিচ্ছি তখন মাননীয় স্পীকার, আপনার মাধ্যমে সংসদের প্রতি সদস্যকে I want to request to search his soil to find out the answer। ঐ সরকারকে যদি অবৈধ বলেন, তাহলে আমরা যে পদত্যাগ করে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলাম সেটা কি 'অবৈধ' থেকে যাবে, না সেটা বৈধ হবে? এই যে নির্বাচন হয়েছে, আমরা সবাই সংসদে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, এটা কি 'অবৈধ' হয়েছে? তাই আমি বলেছিলাম যে, এই 'অবৈধ' শব্দটি ব্যবহার করা উচিত হবে না। আর বলেছিলাম যে, আপনারা 'বাধ্য' শব্দ ব্যবহার করেন আর নাই করেন, এটা ঠিক যে গণআন্দোলনের মুখে একটি সরকার পদত্যাগ করে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। এটা ঐতিহাসিক সত্য কথা। এটা লিখলেও যা, না লিখলেও তা।

দ্বিতীয় অংশে, অনুচ্ছেদ ২১(১)-এ আছে, তাঁর কার্যকাল এবং কার্যভারকে ন্যায়সঙ্গত বা বৈধকরণ করার কথা। আমি মনে করি যে এটা করা উচিত। তার কারণ আমরা যদি সেটা বৈধকরণ না করি, তাহলে constitution-এ একটা vacuum থেকে যাবে। এমনকি আমাদের এই existence will be questioned। সে কারণেই আমাদের উচিত হবে এই অংশের জন্য সমর্থন জানানো।

কিন্তু তৃতীয় অংশে অর্থাৎ ২১(২) অনুচ্ছেদের ব্যাপারে আমি আমার Note of dissent দিয়েছি। আমি মনে করি যে, আমাদের দেশে আমরা সকলেই democratic, গণতন্ত্রের কথা বলছি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলছি। Separation of Judiciary-র জন্য জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ সাহেব বিল এনেছেন, আমি তাঁকে মোবারকবাদ জানাই, স্বাগত জানাই। আসলে গণতন্ত্রের মূল ingredient হল কতকগুলি basic institutions, basic pre-conditions। যেমন পার্লামেন্ট, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদেরকে enforce করার অধিকার যদি আদালতের থাকে সেটাও একটি ingredient of democracy। আজকে একটি ingredient বা institution-কে গ্রহণ করব আর একটিকে গ্রহণ করব-এই দ্বন্দ্ব, contradiction থেকে আমাদেরকে ঊর্ধে উঠে আসতে হবে। Democracy is not a particular object, কোন একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য নয়। এটা একটি culture, কতগুলি institution-এর উপর ভিত্তি করে democracy গড়ে ওঠে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে জনাব তোফায়েল আহমেদের কিছু reference-এর কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি জন মার্শালের কথা বলেছেন, এ্যাডামের কথা বলেছেন, জনাব নাসিম সাহেব[১]ও বলেছেন। এগুলি মধ্যযুগীয় দৃষ্টান্ত, তখনকার সময়ে এই ধরনের রীতি-নীতি ছিল না। কিন্তু আধুনিক যুগে এটা দেখাতে পারবেন না। পাকিস্তানে ছিল। মঞ্জুর কাদের Foreign Minister ছিলেন আইয়ুব খানের সময়। তিনি Chief Justice হয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। কিন্তু আমি....

[বাধা প্রদান]

---

১. মোহাম্মদ নাসিম, সিরাজগঞ্জ-১ আসনে নির্বাচিত সদস্য।

www.pathagar.com

আমাদের মানুষের যে ক্রয়ক্ষমতা, এই ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই হল আমাদের জন্য সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারের পক্ষে যাঁরা আছেন, তাঁদের মূল দায়িত্ব হবে কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করা যায়।

সেইজন্য এই অর্থনীতিকে সবল করতে হলে প্রাইভেট সেক্টরকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। আমরা যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলাম বিগত সরকারের সময়, সে নীতিমালা যদি অনুসরণ করা হয় অর্থাৎ ব্যক্তি উদ্যোগ ও ব্যক্তি প্রতিভাকে যদি স্বীকৃতি দেওয়া যায় এবং সকল নাগরিককে যদি আমরা সমান সুযোগ দিতে পারি, তাহলে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন আমরা দেখি, সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে।

এখানে আমি একটি কথা উল্লেখ করতে চাই, সেটা হল মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রায় ৭০ হাজার বাংলাদেশীকে জরুরীভিত্তিতে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল দেড় মাসের মধ্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ৭০ হাজার বাংলাদেশীর মধ্যে একজনও এখন পর্যন্ত কুয়েত ফিরে যেতে পারে নি। সরকারের উচিত হবে এদের দ্রুত সেখানে পাঠানো এবং সেই সাথে বেকার আরও বাংলাদেশীদের সেখানে পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

আমরা সৌদি আরবে সৈন্য পাঠিয়েছিলাম। তখন অনেক বিরোধীদল আমাদের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু আজকে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রত্যাগত সৈন্যদেরকে 'রিসিভ' করতে বিমান বন্দরে গিয়েছিলেন এবং বলেছেন তারা বাংলাদেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছে। আমাদের সেই কূটনৈতিক সফলতার কারণেই আজকে এই সরকার এবং এই দেশের জনগণ সুফল ভোগ করবে।

আমাদের বলা হয়, "স্বৈরাচার সরকার। স্বৈরাচারের আমলে কিছুই হয় নি। সমস্ত অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে। কোন ভাল কাজ হয় নি।" মাননীয় স্পীকার, আমাদের অবশ্যই ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। আমাদের ব্যর্থতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমাদের সফলতাকে ঢেকে রাখা যাবে না।

আমরা গত ৮ বছরে ১১ হাজার কিলোমিটার রাস্তা পাকা করেছি। ৪৬০টি গ্রামে অন্ধকার বাজার ছিল, সেগুলিকে আমরা ছোট ছোট শহরে পরিণত করেছি। আমরা ৫১৮টি বড় ও মাঝারি আকারের সেতু তৈরি করেছি। আমরা ৬৫০ মেগাওয়াটসম্পন্ন বিদ্যুৎ নিয়ে সরকার শুরু করেছিলাম, সেটাকে ২২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে উন্নীত করেছি।

এই সংসদে, এই সরকারের তরফ থেকে একজন মন্ত্রী প্রশ্নোত্তরে ছাপানো অক্ষরে বলেছেন যে, ১৯৮১-৮২ সালে এদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা ছিল ৭৮%। আর ১৯৯০ সালে সেটা নেমে হয়েছে ৫৫%। দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা যদি ৮/৯ বছরে ৭৮% থেকে ৫৫% হয়ে থাকে, তাহলে আমি মনে করি, বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র দেশ, এত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সাফল্য অর্জন করেছে।

It is on record যে, দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা কমেছে।

মাননীয় স্পীকার, আর একটি কথা হল, স্বৈরাচারী ব্যবস্থা। আমি অতীতকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না। স্বাধীন বাংলাদেশে স্বৈরাচারের ভিত্তি কারা স্থাপন করেছিলেন, তার পুনরুক্তি আমি করতে চাই না।

সত্য ঘটনাটি হল, ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমেই এইদেশে স্বৈরাচারের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। সুতরাং আমরা যাঁরা অতীতে সরকারে ছিলাম, আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি আজকে যাঁরা এখানে বসে আছি, তাঁদের কারোরই ট্র্যাক রেকর্ড ভাল নয়। আমাদের সকলেরই অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা রয়েছে। আজকে আমাদের এটা স্বীকার করে অতীতের তিক্ততায় না গিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করতে হবে। সেইজন্য আমি মনে করি, একটি অনুন্নত গরিব দেশে গণতন্ত্রের এই প্রক্রিয়া কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এটা অনেক কঠিন কাজ, এর জন্যে প্রয়োজন অনেক সহিষ্ণুতা। যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই সংসদের জন্ম হয়েছে, এখন পর্যন্ত এই সংসদ তেমন কিছুই produce করে নেই। কিন্তু আমি আশা করব যে, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা

www.pathagar.com

থাকতে হবে যাতে যে পদ্ধতির সরকারই হোক না কেন, প্রশাসনের উপর এই সংসদের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়; যাতে দেশে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আমরা কায়েম করতে পারি, গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে পারি। যে স্বপ্ন লালন করে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম, সেই স্বপ্নকে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি। Let the flower of democracy blossom from this Parliament.

জাতীয় পার্টি এই বিষয়ে অর্থাৎ গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য, এই সংসদকে শক্তিশালী করার জন্য যে কোন উদ্যোগকে সমর্থন জানাবে এই আশ্বাস আমি দিচ্ছি।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, আপনার মত জ্ঞান আমার নেই। আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র মানুষ। মধ্যযুগীয় শব্দটি যদি literal way-তে নেন, তাহলে যেটা বলেছেন সেটা ঠিক। কিন্তু আমি তো literally কথাটি বলিনি। আমি বলেছি in the form of a speech। যাই হোক, আমি কথাটি withdraw করে নিচ্ছি, তারপরও বলব এটা অনেক পুরনো example দিয়েছেন। আধুনিক কালের example নয়। মঞ্জুর কাদেরের কথা বলতে পারতেন যে, তিনি Foreign Minister হওয়ার পর কি করে Chief Justice হলেন। কিন্তু তিনিও টিকতে পারেন নি। তাঁকে resign করতে হয়েছিল। সুতরাং, আজকে আমি এই প্রশ্ন তুলতে চাই না যে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন কোর্টে ফিরে গেলে বিচার দিতে পারবেন কিনা, বা embarrassed feel করবেন কিনা, বা আরও যে ৪ জন জজ আছেন আপীল বিভাগে তাঁরা embarrassed feel করবেন কিনা। এই ধরনের argument-এ আমি যেতে চাই না। I want to keep my argument on a broader horizon। সেটা হল, যদি আমরা সত্যিকার অর্থে আইনের শাসনে বিশ্বাস করি, যদি বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, যদি সংবিধানের Article 22-এ বিশ্বাস করি অর্থাৎ Separation of Judiciary-তে বিশ্বাস করি তাহলে আমাদেরকে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। আমার ডানদিকে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরাই Article 22 প্রণয়ন করেছিলেন। এখানে অনেকেই আছেন যাঁরা সেদিন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। দেশের বিচার বিভাগকে আমরা সত্যিকার অর্থে যদি স্বাধীন রাখতে চাই, Judicial Magistracy-কে Executive থেকে বের করে Judiciary-র under-এ, Chief Justice-এর under-এ আনতে চাই; যেখানে Magistrate-কে আমরা judicial power exercise করতে দিতে চাই না, who is an extention of the executive, আজকে সেখানে আমরা একজন executive head-কে Chief Justice হিসাবে বসাতে চাচ্ছি, এটা কি contradiction নয় মাননীয় স্পীকার? এটা অবশ্যই contradiction। সেই জন্য এটা broad sense-এ দেখতে হবে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে আমি অত্যন্ত সম্মান করি। আমি তাকে ২২ বছর যাবত চিনি। আমার চেয়ে বেশি সম্মান খুব কম সংসদ-সদস্য দেখাতে পারেন। কিন্তু আমার চাইতে ওনারা সবাই সম্মান বেশি দেখাচ্ছেন। সেটা আমি মেনে নিলাম। আমি তাতে আরও খুশি যে সুপ্রীম কোর্টের একজন জজকে সব সংসদ-সদস্য আমার চাইতে বেশি সম্মান করেন। আমি স্বীকার করি তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এটা একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত, তিনি একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি মহান। কিন্তু মাননীয় স্পীকার...

[বাধা প্রদান]

সেই কারণেই আমি নীতিগত প্রশ্নে বলতে চাই, আমি আশা করব বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এখন একজন আরও উচ্চমানের মহান ব্যক্তি হিসাবে পরিচয় দেবেন। আমি জানি আপনাদের একটি অঙ্গীকার আছে। You are bound to abide by a promise। আমি বলছি না যে আপনারা আপনাদের অংগীকার ভঙ্গ করুন, যদিও আপনাদের উচিত হয় নি সেই ধরনের অঙ্গীকার করা। বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেছেন, "যে কথা দিয়েছি সে কথার তো বরখেলাপ করতে পারি না"। আমি বলছি না আপনাদেরকে বরখেলাপ করতে। কিন্তু it should be on record in the proceedings of this Parliament যে আমরা এই বিষয়টি আলোচনা করেছি এবং আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা তাঁকে তাঁর স্বপদে ফিরে যাওয়ার জন্য এই বিল পাস করেছি। কিন্তু আমি মনে করি, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আরও অনেক মহত্ত্বের পরিচয় দেবেন এই বিল পাস হওয়ার পরেও তিনি যদি স্বেচ্ছায় স্বপদে ফিরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

[বাধা প্রধান]

মাননীয় স্পীকার, এখানে উত্তেজনার কিছু নেই। আমি বলেছি যে, তিন জোট যেই অঙ্গীকার করেছে, তাদের সেই অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। But we have a right to dissent. It must be recognised in this Parliament that there is a Note of dissent on this issue। যার যাই মত থাকুক না কেন, যদি এই কথা বলার স্বাধীনতা এই সংসদে না থাকে, তাহলে এটা ব্যর্থ, বিফল হয়ে যাবে। এই বিষয়ে এখানে বিতর্ক যত কম হয়, বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে নিয়ে বিতর্ক যত কম হবে, ততই তাঁর জন্য মঙ্গল হবে। আর বিতর্ক যত বাড়বে তাঁর নিজের জন্য ততই বিব্রতকর হবে।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।*

---

*বিলটি ১৯৯১ সালের ৮ই আগস্ট সংসদে পাস হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিপাক্ষিক কূটনীতি যেখানে সফল হয় নি সেখানে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে

বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতি

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে বার্মা অর্থাৎ মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বরাবরই ভাল। কিন্তু মায়ানমারের আভ্যন্তরীণ কারণে মাঝে মাঝে এই সম্পর্কে পিছুটান পড়ে। এবারও আবার হঠাৎ করে মায়ানমার থেকে লক্ষাধিক মানুষ আশ্রয়ের জন্য বাংলাদেশের সীমান্ত পেরিয়ে কক্সবাজারের টেকনাফ এলাকার অভ্যন্তরে চলে আসে এবং তাদের জন্য শরণার্থী শিবির স্থাপন করতে হয়। এর আগে ১৯৭৮ সালে মায়ানমারের প্রায় তিন লক্ষ শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল যা আমাদের দেশে একটা প্রকট আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। মায়ানমারে কোন গণতন্ত্র নেই এবং সামরিকরা দেশ চালায়। মায়নমারের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়াত নেতা উঅাংসুন-এর কন্যা সুকী (Suu Kyi) যখন তাঁর মাকে মৃত্যুশয্যায় দেখতে যান, তখন তাঁকে গৃহবন্দী করা হয় এবং তারপর থেকে তিনি আর দেশের বাইরে যেতে পারেন নি। আন্তর্জাতিক চাপে নির্বাচন দিলে সুকীর দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, কিন্তু সামরিকরা ক্ষমতা হস্তান্তর করে নি। কখনও সীমিতভাবে মুক্ত অবস্থায় আর কখনও গৃহবন্দী অবস্থায়, সুকী মায়ানমারেই এখন তাঁর দিন যাপন করেন। মায়ানমার থেকে আগত শরণার্থীদের বিভিন্ন দিক এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু সুপারিশ এই বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

মাননীয় স্পীকার

বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্তে যে সঙ্কট, এটা আমাদের জাতির জন্য একটি বিরাট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর চারটি প্রধান কারণ। প্রথমটি হচ্ছে, আমরা সকলেই এখানে অনুভব করি যে এটা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় হল, এটা একটি রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তৃতীয় হল, এটা একটি মানবিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। যে সব শরণার্থী এখানে এসেছে, যদিও পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই, এখন পর্যন্ত খবরের কাগজের মাধ্যমে যা জানা গেছে, প্রায় দেড় লক্ষ শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। সরকারীভাবে লক্ষাধিক বলা হয়, কিন্তু সঠিক সংখ্যা আমাদের কারও জানা নেই। আর চতুর্থ কারণ হল, বার্মায় অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট অত্যন্ত গভীর আকার ধারণ করেছে এবং সেই কারণেও তাদের নিজেদের সঙ্কটকে divert করার জন্য আন্তর্জাতিক একটি সমস্যা সৃষ্টির প্রয়াস তাদের মধ্যে আসতে পারে।

মাননীয় স্পীকার, এই কারণগুলির মধ্যে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য, সেটা হল শরণার্থী যারা আসছে, তারা আমাদের দেশের নাগরিক নয়, আমাদের মতে তারা বার্মার নাগরিক। ১৯৭৮ সালে যে তিন লক্ষ শরণার্থীকে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল বার্মা তাদেরকে defranchise করেছে, এটা বার্মার internal matter। এটার সঙ্গে আমরা জড়িত নই, বাংলাদেশ সম্পর্কিত নয়। কিন্তু আজকে শুধু বাংলাদেশের দেশরক্ষা নয়, আজকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, এরা আসার ফলে।

সুতরাং, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর লৌকিক diplomacy আমাদেরকে আজকে অত্যন্ত হতাশ করেছে, আমাদেরকে বিচলিত করে তুলেছে। কারণ এই শরণার্থীরা কেবল ২১ ডিসেম্বরের পর থেকে আসছে না, এই শরণার্থীরা বেশ কয়েকমাস যাবৎ আসছে এবং সরকারের এটা অবশ্যই জানা ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে সরকার তেমন কোন তৎপরতা দেখাতে পারে নি। এবং সেই কারণেই আজকে এই সমস্যাটা ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে।

আমি বলব যে এই লৌকিক diplomacy is no diplomacy। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হতে হবে সুস্পষ্ট, দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ। আমাদের দেশে ১২ কোটি মানুষ, বার্মার হল সাড়ে চার কোটি মানুষ। যদিও

www.pathagar.com

আয়তনে তারা আমাদের চেয়ে তিনগুণ বড়, কিন্তু আমাদের দেশে আসার কারণে এই শরণার্থীরা আমাদের দেশের উপর যে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে, এর প্রতিরোধের ব্যবস্থা যদি আমরা উপযুক্ত সময়ে গ্রহণ করতে না পারি, তাহলে এই জাতির জন্য আরও বিরাট দুর্যোগ নেমে আসতে পারে।

আমার বন্ধু জনাব রাশেদ খান মেনন একটি বিশেষ আঙ্গিক থেকে একটি বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর পুরো বক্তব্যের সাথে আমি একমত নই। আমার বন্ধু জনাব শাজাহান সিরাজও আরও একটি আঙ্গিক থেকে বলেছেন যে বর্তমানে পৃথিবীর মানচিত্রে যে পরিবর্তন ঘটছে এর সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক গুটির ট্রাপে জড়িয়ে না পড়ি সেদিকে আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা যদি অভ্যন্তরীণ কারণ বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে, আমাদের বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া–এঁদের পারিবারিক জীবনে অনেক ট্রাজেডি ঘটেছে। বার্মার সুকীর জীবনেও একই ট্রাজেডি ঘটেছিল। স্বাধীনতা অর্জন করার ৬ মাস আগে তাঁর পিতা উআংসুন, যিনি national hero ছিলেন, যাঁর স্বাধীন বার্মার নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল, যখন সমস্ত জিনিস চূড়ান্ত হয়ে গেল, মাত্র ৬ মাস আগে, জুলাই ১৯৪৭ সালে, তাঁকে এবং তাঁর সাথে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যাঁরা ছিলেন সকলকে হত্যা করা হয়। এবং তারপরে 'সুকী' আর দেশে থাকে নি। লেখাপড়া করেছে বিদেশে, দিল্লীতে এবং অক্সফোর্ডে। তিনি ১৯৮৮ সালে মায়ের মৃত্যুশয্যায় তাঁকে দেখতে এসেছিলেন এবং তখন সেখানে আটকে পড়েন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে সেখানে আন্দোলন শুরু হয় এবং গণবিপ্লব আসে। ২৬ বছরের পুরনো সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে জন বিস্ফোরণ ঘটে এবং ১৯৮৯ সালে জুলাই মাসে 'সুকী'কে অন্তরীণ করা হয়। ১৯৯০ সালের ৭ মে সেই দেশে নির্বাচন হয় এবং ঐ নির্বাচনে ৪৮৫ আসনের মধ্যে 'সুকী'র দল National League for Democracy ৩৯২টি আসন জয়লাভ করে। কিন্তু সেই দেশের সামরিক জান্তা তাদের কথা রাখেন নি এবং তাঁরা তাঁকে ক্ষমতায় আসতে দেয় নি।

আজকে যদিও বার্মার এই অভ্যন্তরীণ সংকটে আমাদের বলার কিছু নেই তথাপি একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে তাদের পররাষ্ট্রনীতির কারণে বা তাদের অভ্যন্তরীণ নীতির কারণে যদি আমাদের security insecured হয় তাহলে বাংলাদেশ অবশ্যই তার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি। আজকে আমার একজন favourite লেখক Vaclav Havel বলেছিলেন Noble Peace পুরস্কারের জন্য যখন সুকীকে recommend করা হয় তখন, "for her courageous leadership for a non-violent struggle for the restoration of human rights in Burma"– এটা আমিও সমর্থন করেছিলাম।

আজকে আমার সুনির্দিষ্ট কতকগুলি সুপারিশ আছে। প্রথম সুপারিশটি হল, সরকারী ও বিরোধীদলের মধ্যে কোন দ্বিমত এই ইস্যুতে থাকাটা ঠিক নয়। আমরা অতীতে যেমন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এবং তারপর ১৯৮৮ সালের বন্যার সময় এবং যেকোন সংকটের সময় জাতি হিসাবে একতার পরিচয় দিয়েছি তেমনি এই সংকটের সময়ও আমরা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চাই। এজন্য আমার সুনির্দিষ্ট সুপারিশ হবে যে এই সংসদে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠন করা হোক। সরকার যে লৌকিক diplomacy follow করছেন সেটাতে কাজ হবে না। জাতিকে আস্থায় নিতে হবে, বিরোধীদলকে আস্থায় নিতে হবে। এ রকম একটি সংকটে traditional diplomacyতে কাজ হবে না। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। সাথে সাথে সরকারের তরফ থেকে যেসব তথ্য এখানে Foreign Minister disclose করতে পারেন না তাঁর লৌকিক diplomacy'র কারণে, সেগুলি এই সংসদীয় কমিটিকে জানানো হোক এবং এর মাধ্যমে এই সংসদ অবহিত হবে।

দ্বিতীয়, দ্বিপাক্ষিক কূটনীতি সফল হয়নি এটা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। It has been reduced to a flag meeting diplomacy। এ diplomacy কোনদিন আমাদের জন্য সফলতা আনতে পারে না। এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে চেষ্টা করেছেন সেটা ব্যর্থ হয়েছে। জাতি আজকে সেটা অবলোকন করছে। সেজন্য আমি মনে করি যে দ্বিপাক্ষিক কূটনীতি যেখানে সফল হয় নি সেখানে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

তথ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, তাঁরা চেষ্টা করছেন। কিন্তু এটা দ্রুত করা উচিত। জাতির জানা উচিত। কোনদিন আমরা খবরের কাগজে এটা দেখিনি, আজকেই প্রথম শুনেছি। সেজন্য এই বিষয়ে

www.pathagar.com

বৈদেশিক সাহায্য ও সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন। আজকে, সেখানে মানবেতর অবস্থা। ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া রোগ বিস্তার লাভ করছে। শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলারা রয়েছে শরণার্থী হিসাবে, এ ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতা ও নীরবতা আজকে জাতিকে হতবাক করেছে, নিরাশ করেছে। এ ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে যে ধরনের সক্রিয় ভূমিকা আমরা আশা করেছিলাম, সরকার সেই ধরনের ভূমিকা পালন করে নি। ৯ জানুয়ারিতে ১০টি মেডিক্যাল টীম পাঠানোর জন্য স্থানীয় প্রশাসন অনুরোধ করেছিল। আমরা এখন পর্যন্ত শুনি নি, কোন কাগজে দেখি নি যে, একটি মেডিক্যাল টীম পাঠিয়ে এই শরণার্থীদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আমাদেরকে শরণার্থীদের কাছে যেতে হবে, কারণ এটা একটা মানবিক ইস্যু। আর এ ব্যাপারে যে ডিপ্লোমেটিক এফর্টস্ লাগে তার জন্য সময় বয়ে যাচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে সঙ্গে যে ষড়যন্ত্র চলছে তাতে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হবে। সেটা মোকাবিলা করার সামর্থ্য আমাদের হবে না।

আমি শেষ করার আগে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, এই অবস্থায় আমাদের আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতার যদি প্রয়োজন হয়, সেটা আমাদের বিনাদ্বিধায় এখনই নেওয়া উচিত। কারণ এটা আমাদের মতো রাষ্ট্রের জন্য শুধু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটই সৃষ্টি করছে না, এর সাথে সাথে একটা অর্থনৈতিক চাপ আমাদের দরিদ্র দেশের উপরে সৃষ্টি করা হচ্ছে। এজন্য আমি মনে করি, একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরাম করা প্রয়োজন। United Nations Commission for Refugees আছে, তাদেরকে approach করা যেতে পারে এবং আরও diplomatic level-এ সারা বিশ্বে জনমত সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সরকার আসে সরকার যায় কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না

১৯৯২-৯৩ সালের বাজেট

২১ জুলাই ১৯৯২

কোন আন্দোলন বা গণজাগরণের মধ্য দিয়ে যখন একটি নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে স্বাভাবিকভাবেই সেই সরকারের কাছ থেকে দেশের মানুষ অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। তারা একটা নতুন কিছু পাওয়ার স্বপ্ন দেখে আর বাজেটে তারই কিছু প্রতিফলন দেখতে চায়। যদিও একটি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করার পর বিএনপি সরকার অতি অল্প সময়ের মধ্যে সামষ্টিক অর্থনীতিতে একটি স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হয়, কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষের কাছে এর সুফল পৌঁছানো অত সহজ ছিল না।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আর একটি দুঃখজনক বৈশিষ্ট্য হল, যখন কোন নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে তখন তারা পূর্বের সরকারের কোন সাফল্যকেই স্বীকার করে না। বরং বলে সেই সরকার দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে গেছে এবং সকল ক্ষেত্রের সকল ব্যর্থতার জন্য পূর্ববর্তী সরকারকে দায়ী করে। সংসদে জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত নেতা হিসাবে জাতীয় পার্টি সরকারের কিছু সাফল্যের কথা এই বক্তৃতায় তুলে ধরা হয়। সাথে সাথে এই বাজেটের আলোকে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক দিকসমূহ আলোচনা করা হয় এবং কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়।

মাননীয় স্পীকার

আমি ভেবেছিলাম এবার এই বাজেটের উপর কোন বক্তব্য রাখব না, তার কারণ, বাজেটের মূল বিষয়টি হল করারোপ এবং সেটা অর্থবিলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যেখানে অর্থ বিল পাস হয়ে গেছে, এর পরে এটাকে একটা academic আলোচনা বলা যেতে পারে। কিন্তু তারপরও যেহেতু দেশের বিভিন্ন সমস্যা এই আলোচনায় চলে এসেছে, সেই জন্য আমি এখানে দু'চারটি কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছি। অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই, কারণ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জাতীয় পার্টি সরকারের রচিত এবং তারই একটি অংশ হল আজকের এই ১৯৯২-৯৩ সালের উন্নয়ন কর্মসূচী। আর এই কর্মসূচীর Macro-economic policy framework জাতীয় পার্টি সরকার রচনা করে গেছে। অর্থমন্ত্রী তার বাইরে যেতে পারেন নি, তিনি সেই Macro-economic policy-কে follow করে বাজেট উত্থাপন করেছেন। Three-year rolling programmeটা আমরাই introduce করেছিলাম। কারণ পাঁচ বছরের একটি কর্মসূচী খুব বড় এবং আমার জানামতে এটা কেউ সম্পন্ন করে না। এত বড় একটি বই, যেটা আমরা লৌকিকতার খাতিরে তৈরি করি, কিন্তু এটার তেমন কোন weight নেই, এই জন্য যে, আমাদের দেশ পরনির্ভরশীল। দাতারা কত টাকা দেবে তার উপর নির্ভর করে জাতীয় বাজেট, উন্নয়ন কর্মসূচী। সেই জন্য ৫ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার যৌক্তিকতা চলে গেছে। যার জন্য এখন বেশি emphasis দেওয়া হচ্ছে three-year rolling programme-এ, কারণ তাতে প্রত্যেক বছরে যে উন্নয়ন কর্মসূচী হবে সেটা দ্রুত বাস্তবায়ন করা এবং তার return অর্জন করে দেশের প্রবৃদ্ধি সহজে বাড়ানো সম্ভব হবে।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের দেশ একটি দরিদ্র-জনিত সমস্যা-বহুল দেশ। এই দেশে বাজেট প্রণয়ন করা যে কোন অর্থমন্ত্রীর জন্য একটি কঠিন কাজ। সেই জন্য তাঁর প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। I extend my sympathy to him। খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু আমরা একটি গণতান্ত্রিক সরকার পেয়েছি। একটি অভ্যুত্থানের পর যখন একটি নতুন সরকার আসে তখন দেশের জনগণের মধ্যে অনেক আশা বেড়ে যায়, এবং তারা অনেক স্বপ্ন দেখে। আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, এই বাজেট সেই আশা এবং স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি, বরং হতাশ করেছে। আমরা ভেবেছিলাম যে, এই সরকারের মাধ্যমে জাতির কাছে long-term prospective-এর একটা vision দেওয়া হবে যে আমরা কোন্ পথে গিয়ে আমাদের দেশের সত্যিকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য, অর্থাৎ যে কারণে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম, তার সেই সুফল এই বাজেটের মাধ্যমে আমরা অর্জন করতে পারব। এই

www.pathagar.com

বাজেটে সেই vision-এর অভাব দেখছি। এই বাজেটে সেই ধরনের সুদূরপ্রসারী কোন vision বা sense of direction বা কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার যে target oriented budget হয় তার অনুপস্থিতি এই বাজেটে প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, সরকার আসে সরকার যায়, কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না। ঘটলেও, সেটাকে quantify করা খুব difficult আমাদের মত একটি অনুন্নত দেশে এবং সেটাই স্বাভাবিক। এই বাজেট সংসদে আসার এক ঘণ্টা আগে মন্ত্রিসভায় পেশ করা হয়েছে। মন্ত্রীদের কতজন এই বাজেট আগে দেখেছেন আমার জানা নেই। আমরা ভেবেছিলাম যে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের বাজেট তৈরি করার জন্য একটি নতুন ধরনের প্রক্রিয়া হবে। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, ঠিক অতীতে যত বাজেট যেইভাবে প্রণীত হয়েছে আজকের এই গণতান্ত্রিক সরকারের বাজেটও সেইভাবেই প্রণীত হয়েছে। ঠিক এই সংসদে আসার আগে, এক/দেড় ঘণ্টা আগে মন্ত্রিসভার কাছে এই বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। তাঁদের অনুমতি না দিয়ে কোন উপায় নেই। সেজন্য তাঁরা অনুমোদন দিয়েছেন। তারপরে অর্থমন্ত্রী এখানে এসে বাজেট উত্থাপন করেছেন। সুতরাং, এই গতানুগতিকভাবে বাজেট তৈরি করার একটি সেকেলে পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য আমি মনে করি যে, আমরা এই সরকারকে দায়ী করতে পারি।

এই বাজেট একটি নতুন আঙ্গিকে প্রণয়ন করা যেত এই কারণে যে আজকে দেখা যাচ্ছে Macro-economic policy framework-এ শুধু বিশ্বব্যাংক নয় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি consensus গড়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগের মত একটি ঐতিহ্যবাহী দল তাদের অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তন করেছে। আমি ভেবেছিলাম, এই সরকার এই সুযোগ গ্রহণ করবেন। কারণ আজকে আমাদের Macro-economic policy এই সরকার যেটা অনুসরণ করেছেন, আর আওয়ামী লীগ যেটা এখন অনুসরণ করতে চায় সেটা প্রায় একই। জাতির জন্য এটা একটা সৌভাগ্য বলতে হবে। তাই মূল সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় সবাই মিলে consensus-এর ভিত্তিতে আজকে নতুন একটা অর্থনৈতিক নীতিমালা শুধু প্রণয়ন নয়, বাস্তবায়নও করতে পারতাম। তা না হওয়ায় আমরা একটা বিরাট সুযোগ হারিয়েছি বলে আমি মনে করি।

মাননীয় স্পীকার, একটা long-term development strategy-এর জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি টাস্কফোর্স নিয়োগ করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রায় সকল অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ, সমাজবিদ এই টাস্কফোর্সের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সকলেই জানে এই টাস্কফোর্সের চারটি ভলিউম আছে, এর একটি ভলিউম আমি এনেছি। আমি ভেবেছিলাম, এই টাস্কফোর্সের কিছু কিছু recommendation এই বাজেটে প্রতিফলিত হবে। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে দেখছি যে, এত বড় একটা exercise বাংলাদেশের ইতিহাসে যা কোনদিন হয় নি, কিন্তু তাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে এবং সেটা সঠিক হয় নি।

মাননীয় স্পীকার, নিজেদের ব্যর্থতা ও দুর্বলতাকে ঢেকে রাখার প্রয়াসে এই সরকারের প্রায় সকল সদস্যই ৯ বছরের ইতিহাসকে টেনে নিয়ে এসেছেন। দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে কেন? বলা হয়েছে, ৯ বছরের স্বৈরশাসনের জন্য দেশে দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি হয়েছে, এমনকি অনেককে বলতে শুনেছি, ২৯ এপ্রিল যে ঝড় হয়েছে সেটাও ৯ বছরের স্বৈরশাসনের জন্য হয়েছে, রাস্তাঘাটের নিয়ন্ত্রণ ট্রাফিক পুলিশ করতে পারে না ৯ বছরের স্বৈরশাসনের জন্য। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ, স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীবলেন যে, ৯ বছরের স্বৈরশাসনের জন্য এরূপ হয়েছে। দু'শ কলেজ বন্ধ করেছেন, বলেন ৯ বছরের স্বৈরশাসনের জন্য হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক-যুদ্ধ হয়, বলেন ৯ বছরের স্বৈরশাসনের জন্য হচ্ছে। এই সব কথা দেশের মানুষ আর বিশ্বাস করতে রাজি নয়। নিজেরা perform করে প্রমাণ করুন that you can do better than what we did in the management of the economy।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের অর্থনৈতিক performance-এর উপর অনেক বলা হয়েছে। আমি একটি সমীক্ষা উত্থাপন করতে চাই। এটা অর্থ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কাগজপত্র এবং অর্থনৈতিক জরিপ থেকে তুলে নেয়া। আমাদেরকে বলা হয় আমরা নাকি অর্থনীতিকে একেবারে পঙ্গু

www.pathagar.com

করে দিয়েছি। আমি তার একটি সমীক্ষা তুলে ধরতে চাই। ১৯৮১-৮২ সালের শেষ পর্যায়ে বিএনপি সরকারের জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার ০.৯%-এ নেমে এসেছিল, ১৯৮৯-৯০ সালে আমাদের ৫.৮% প্রবৃদ্ধির হার ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার reserve ছিল ১৯৮০-৮১ সালে ২২১ মিলিয়ন ডলার, আমাদের শেষ বছরে ছিল ৮২৫ মিলিয়ন ডলার। দেশজ GNP ছিল ২৩,৭৩১ কোটি টাকা, যা ১৯৮৯-৯০ সালে ৭৫,০৪১ কোটি টাকা ছিল। বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র ৬৫০ মেগাওয়াট, কিন্তু ১৯৮৯-৯০-এ এই বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ২২০০ মেগাওয়াট। মাননীয় স্পীকার আমরা যত দিন সরকারে ছিলাম অন্তত শেষের দিকে ৫ বছর লোড শেডিং বাংলাদেশের কেউ দেখে নি। এই সরকার আসার পর থেকেই বাংলাদেশে লোড শেডিং শুরু হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, ১৯৮১-৮২ সালে খাদ্য উৎপাদন ছিল ১ কোটি ৪২ লক্ষ টন। আমরা যে বছর সরকার ছাড়ি সে বছর ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে। যেদিন আমরা সরকার থেকে পদত্যাগ করি সেদিন ১৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুদ ছিল।

মাননীয় স্পীকার, শিল্প ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ১৯৮১-৮২ সালে ৬.৫ শতাংশ ছিল। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স সেদিন সমীক্ষা বের করেছে, এই প্রবৃদ্ধির হার ১৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। ১৯৮১-৮২ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৯ শতাংশ ছিল। এটাকে নামিয়ে আমরা ২.১ শতাংশে এনেছিলাম। রপ্তানী আয় ১ হাজার ২ শত ৫৫ কোটি টাকা ছিল। সেটাকে বাড়িয়ে আমরা ৪ হাজার ৯ শত ৫০ কোটি টাকা করেছি। ১৯৮১-৮২ সালে বিদেশে চাকুরিতে বাংলাদেশীদের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের পরিমাণ ছিল ৬১৯ কোটি টাকা। সেটাকে আমরা ২,৪৭৭ কোটি টাকায় উন্নীত করেছি। আর দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর কথা সম্পর্কে বলতে হয় ১৯৮২-৮৩ সালে পল্লী অঞ্চলে ৭৩.৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। আর শহর অঞ্চলে তা ছিল ৬৬ শতাংশ। ১৯৮৮-৮৯ সালে এটা কমে পল্লী অঞ্চলে হয়েছে ৫৫ শতাংশ, আর শহর অঞ্চলে হয়েছে ৪২ শতাংশ।

মাননীয় স্পীকার, নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য আমাদেরকে দোষারোপ করে যেতে পারেন। আপনারা সরকারে আছেন, মিডিয়া যতদিন আপনাদের control-এ আছে রেডিও, টেলিভিশনে আপনাদের কণ্ঠ অনেক বেশি শোনা যাবে। আপনারা সংখ্যায়ও অনেক বেশি, সুতরাং আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের চাইতে অনেক জোর গলায় আপনাদের বক্তব্য রাখতে পারবেন এবং বলেই যাবেন যে, যত দোষ ঐ ৯ বছরের স্বৈরশাসনের দোষ। আপনারা বলতে পারেন, কিন্তু এ দেশের জনগণকে বোকা মনে করবেন না। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য অন্যদের অতীতের কথা বলা আর বেশি দিন মানুষ গ্রহণ করবে না। হয়তো প্রথম ছয় মাস public memory fresh ছিল, বলেছেন। কিন্তু এটা দিন দিন ক্ষীণ হতে চলেছে, এটা আপনাদের অনুধাবন করা উচিত।

মাননীয় স্পীকার, জাতীয় পার্টি ৯ বছরে ১১ হাজার কিলোমিটার রাস্তা করেছে। মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী নেই। তিনি সেদিন সংসদে অন্তত এতটুকু স্বীকার করেছেন যে ৮ হাজার কিলোমিটার রাস্তা জাতীয় পার্টির সরকারের আমলে পাকা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, বড় এবং মাঝারি সেতু করেছি আমরা ৫১৮টি। খোয়াই নদীর উপর তিস্তা বাঁধ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন, আমরা খুব আনন্দিত। কিন্তু এটার পরিকল্পনা, এটার অর্থ সংগ্রহ, এটার বালি, এটার মাটি, ইট সমস্ত কিছুই জাতীয় পার্টির সরকারের আমলের প্রস্তুত করা।

মাননীয় স্পীকার, উপজেলা কাঠামো সম্পর্কে বলি। উপজেলা কেন্দ্রগুলি একটি ছোট গ্রাম্যবাজার ছিল। সেটা অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ৪৬০টি ছোট ছোট বাজারকে ছোট ছোট শহরে পরিণত করা হয়েছে। আপনারা এই উপজেলা বিলুপ্ত করেছেন তাতে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু, আপনারা নিজেরা এলাকায় গিয়ে নিশ্চয়ই দেখতে পারবেন যে, এই উপজেলার মাধ্যমে যে ঐতিহাসিক সংস্কার আনা হয়েছিল, সেটা কোন দলীয়ভাবে করা হয় নি। এটা কোন রাজনৈতিক দলের সুবিধার জন্য করা হয় নি। এটা এই জন্য করা হয়েছিল যে, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মধ্যে ছিল যে, আমরা এদেশে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটিয়ে একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার কায়েম করব। তারপরে ৬ দফা, ১১ দফাসহ প্রতিটি আন্দোলনে একই কথা বার বার বলা হয়েছে যে, এ

www.pathagar.com

দেশে আমরা সনাতনী ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা আর চাই না। আমরা এমন একটা ব্যবস্থা চাই, যেখানে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি তাঁদের স্থানীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবেন ও development-এর জন্য কাজ করবেন। প্রশাসন এবং উন্নয়ন এদুটোর সমন্বয় উপজেলাতে করা হয়েছিল। আপনারা সেটাকে বিলুপ্ত করেছেন। কেন করেছেন, আমরা জানি না। অর্থমন্ত্রীর টাকার খুব দরকার, এটা আমরা বুঝি। কিন্তু টাকা বাঁচানোর জন্য এধরনের একটি গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানকে আমলাতন্ত্রের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। এজন্য অবশ্যই একদিন আপনাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। আজকে তো আপনারা দলে ভারি, কিন্তু ভবিষ্যতে এজন্য আপনাদেরকে জবাব দিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা নতুন জেলা দপ্তর করেছি ৬৪টি। আজকে লক্ষ্মীপুরে জেলা দপ্তর হয়েছে। আরও যেসব জেলায় জেলা দপ্তর ছিল না, সেখানে বিশাল আকারে জেলা দপ্তর হচ্ছে। এই অবকাঠামো ৫০ বছরেও করা সম্ভবপর হতনা যদি এই সংস্কারের উদ্যোগ জাতীয় পার্টির সরকার গ্রহণ না করত। আমরা মেঘনা সেতু করেছি, কর্ণফুলী সেতু করেছি। আপনারা বলবেন যে এতে আপনাদের contribution আছে, আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু মুজিব নগরের স্মৃতিসৌধ আমরা সম্পন্ন করেছি। শহীদ মিনারের কাজ আমরা সম্পন্ন করেছি। বায়তুল মোকাররমকে আমরা চতুর্দিক থেকে মহিমান্বিত করেছি। ঢাকা মহানগীর যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে আপনারা গাড়ি চালান সেই সব রাস্তার কথা একবার জিজ্ঞাসা করবেন যে কারা এই রাস্তা করেছে। জাতীয় পার্টির সরকার করে দিয়ে গিয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, যমুনা সেতুর কথা বলছেন, মেঘনা-দাউদকান্দি সেতুর কথা বলছেন, Flood Action Programme-এর কথা বলছেন, এগুলিকে আমাদের সরকারের আমলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনারা এখন এসে এগুলোকে সম্পন্ন করবেন এটা আমরা চাই এবং এটাকেই বলে continuity of the government policy। মাননীয় স্পীকার এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই, continuity of development process দেশে থাকতেই হবে। এই সরকার যখন চলে যাবে, তখন তাদের অসমাপ্ত কাজ পরবর্তী সরকার সম্পন্ন করবে। এই সরকার চিরদিন ক্ষমতায় থাকবে না। কোন সরকার শেষ সরকার নয়। সকল সরকারের পতন আসবে, যদি দেশ টিকে থাকে এবং দেশে গণতন্ত্র থাকে।

মাননীয় স্পীকার, এখন আমি Flood Action Programme সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

[বাধা প্রদান]

আপনারা একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। আমিতো কোন গালাগালি করছি না।

এতটুকু ধৈর্য যদি আপনাদের না থাকে তাহলে কী করে চলবে? কী করে গণতন্ত্র করবেন? গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ কীভাবে দেবেন? আমরা তো না হয় অনেক ভুল করেছি, অনেক অন্যায় করেছি, আপনারা দয়া করে ঐ ভুল আর ঐ অন্যায় করবেন না। এটাই আপনাদের কাছে আমার আরজ। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আপনারা কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক ভুল করে যাচ্ছেন।

মাননীয় স্পীকার, আমি Flood Action Programme সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ Programme বাংলাদেশের জন্য। জাতীয় পার্টির সরকার ১৯৮৯ সালে এই Flood Action Programme গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এখানে আমি একটা সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে চাই। এই Flood Action Programme এখন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত সমালোচিত হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে আমাদের এই ধরনের ফ্লাড এ্যাকশন কর্মসূচী নেয়া উচিত নয়। কারণ হল এই ফ্লাড এ্যাকশন প্রোগ্রাম নিলে পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশের অনেক ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং আমার অনুরোধ মাননীয় সেচমন্ত্রীর কাছে যে, আপনি দয়া করে লক্ষ্য রাখবেন ফ্লাড এ্যাকশন প্রোগ্রামের একটা integral part যাতে পরিবেশ সেক্টরের উপর থাকে। পরিবেশের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে যেন এই ফ্লাড এ্যাকশন প্রোগ্রাম recast করা হয়। এই অনুরোধ আমি মাননীয় পরিবেশ-মন্ত্রীকেও জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, বাজেটের একদিকে রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত ২,০০৪ কোটি টাকা দেখিয়েছেন অন্য দিকে আবার ৪০০/৫০০ কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নেবেন, ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং করবেন। এটা

www.pathagar.com

ম্যাজিক অব ম্যাথমেটিক্স। ব্যাংক থেকে ঋণ নেবেন বলেছেন। ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া মানেই তো হল ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং।

মাননীয় স্পীকার, ডিউটি কমিয়েছেন ১২৫ কোটি টাকা, ট্যারিফ ভ্যালু বাড়িয়েছেন ৩৮৩ কোটি টাকা। ৫ হাজার টাকা কৃষিঋণ মওকুফ করায় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এতে আপনাদের খরচ হবে ২,০৪৩.৯৩ কোটি টাকা। এই টাকা কোথা থেকে আসবে? এই বাজেটে তার কোন প্রতিফলন নেই। কৃষিতে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণের সুদ মওকুফ করবেন বলে নির্বাচনের আগে ওয়াদা দিয়েছিলেন। কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই ফ্লোরে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে, ওটা দিতে পারবেন না।

মাননীয় স্পীকার। অর্থমন্ত্রীর constrain আমি বুঝি। অর্থমন্ত্রী দাতাদের ফাঁদে পড়েছেন, Aid trap-এ পড়েছেন। এটা আমরা সবাই বুঝি। Because it applies to all of us, এই জাতির জন্য, আমাদের সকলের জন্য it is a matter of concern এবং এই ব্যাপারে আপনি যদি কোন বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন, আমরা সবাই আপনাকে সমর্থন জানাব, এই trap থেকে বেরিয়ে আসার জন্য।

মাননীয় স্পীকার, আমি শিল্পায়নের কথা কিছু বলতে চাই। এই বাজেটে সমস্ত কিছু বলা হয়েছে, অথচ বাংলাদেশের জন্য কোন্‌টা real target সে কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয় নি। অনেকগুলো টার্গেটের কথা বলেছেন। আমরা ১০১টা টার্গেট চাই না। আমরা একটা টার্গেট চাই। সেই টার্গেট হবে, how to increase the growth rate in our economy। এই growth rate এর কোন প্রতিশ্রুতি যদি অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় আসত, reflected হত, তাহলে কতগুলো জিনিস এখানে আসত যেটা আমরা আলোচনা করতে পারতাম।

শিল্পায়নের কথা বলতে গিয়ে আমাদের শিল্পমন্ত্রী বা বস্ত্রমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলব যে, তাঁরা এখন খাঁচার পাখি। হয়ত তাঁরা কিছু বলতে পারেন নি। তাঁদের পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমি বলতে চাই, শিল্পায়নের মৌলিক ভিত্তি হল তিনটি। একটি হল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। দ্বিতীয়টি হল হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর। এই ধোলাই খাল কনসেপ্ট। এটা কোন ব্যক্তির কনসেপ্ট ছিল না। এটা ছিল যুগের চাহিদা। এই দেশে শিল্পায়নের ভিত্তি রচনা করতে হলে হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরকে গুরুত্ব দিতে হবে। তৃতীয়টি হল বস্ত্র। দুনিয়াতে যত দেশ শিল্পায়িত হয়েছে, একটি শিল্পের উপর ভিত্তি করে শিল্পায়ন করেছে, সেটা হল বস্ত্র। আমাদের দেশীয় বস্ত্রশিল্পের একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমাদের ক্র্যাফটসম্যান রয়েছে। আমাদের ম্যানেজারিয়েল ট্যালেন্ট রয়েছে। কিন্তু এই বস্ত্র খাতকে বর্তমান সরকারের আমলে এবং এই বাজেটে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয় নি। বরং যেটা হয়েছে, সেটা হল, এই বাজেটে দেশীয় শিল্প কারখানা বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই বাজেটকে আমি দেশীয় শিল্প-কারখানা বন্ধ করে দেয়ার বাজেট বলে আখ্যায়িত করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, this is the standard principle and the guideline of industrialisation। আজকে বস্ত্র শিল্পে ট্যারিফ ভ্যালু যেটা বসানো হয়েছে সেই ব্যাপারে আমি দুটো suggestion দিতে চাই। আপনারা pre-shipment arrangement-এ যান, ট্যারিফ ভ্যালু বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না। আর anti-dumping law করুন যাঁরা বিদেশ থেকে রফতানী করেন আমাদের বাজার নেওয়ার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। যে pump BMTF-এ তৈরি হয় সাড়ে তিন হাজার টাকায় তা চীন দেশ পাঠায় ১৫০০ টাকায়। ১৫০০ টাকায় তো raw materials-ই কেনা যায় না? কী করে এই price-এ আনা যায়? It is called dumping price, আপনারা এমন law করুন যাতে এটা বন্ধ করা যায়। Instead of going for tariff value indiscriminately, আপনারা pre-shipment arrangement-এ যান। এবং আপনারা একটি anti-dumping law করুন। তাহলেই ট্যারিফ ভ্যালু আপনার প্রয়োজন হবে না। এর ফলে দেশীয় শিল্পও protection পাবে।

মাননীয় স্পীকার, এখন আমি বাজেটে বস্ত্রশিল্পে তুলা এবং সুতার উপর ট্যাক্স প্রয়োগের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরতে চাই। তুলার উপর ট্যাক্স না হলে সুতার উৎপাদন খরচ ৩০ টাকায় নেমে আসবে, যা বর্তমান দামের অর্ধেক। আমাদের দেশে সুতা বিদেশ থেকেই বেশি আমদানী করা হয়

www.pathagar.com

এবং import value-টাই local market value determine করে। যখন import করে আনছেন, ট্যাক্স বসিয়েছেন, VAT বসিয়েছেন–সব কিছু বসানোতে ১ কেজির দাম পড়ে ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, আর যারা locally manufacture করে তাদের পড়ে ৩০ টাকা। কিন্তু তারা বিক্রি করে ৬০ টাকায়। suffer করছে কারা? দেশের সাধারণ handloomওয়ালারা, যারা গরিব তারা suffer করছে। সুতাওয়ালারা অনেক টাকা মুনাফা করছে। যাঁরা yarn নিয়ে আসছেন, তাঁরা সেটা high price-এ বিক্রি করছেন। এখন এই যে ৩০ টাকার গ্যাপ, এটা করা ঠিক হয়নি। কোন ব্যক্তি বা কোন গোষ্ঠীর স্বার্থে এধরনের কোন নীতি প্রণয়ন করা জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। এধরনের পলিসি যখন determine করা হয় তখন সারা জাতির সার্বিক কল্যাণ সামনে রেখেই তা adopt করা আবশ্যক। আজকে যদি সুতা এবং তুলার উপর ট্যাক্স তুলে নেওয়া হয় তাহলে দেশে বর্তমানে বন্ধ দুই হাজার specialised textile মিল পুনরায় চালু হতে পারবে, তেমনি চালু হবে পাঁচ লক্ষ বন্ধ তাঁত, অন্যান্য মিল এবং ১০৮টি ডায়িং এবং ফিনিশিং বন্ধ মিলসমূহ। ফলে দেশের জনগণ স্বল্পমূল্যে কাপড় কিনতে পারবে। পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে অবৈধভাবে smuggled যে yarn আসছে সেটাও বন্ধ হবে। ফলে দেশে নতুন বস্ত্র মিলসমূহে নতুন করে চাঙ্গাভাব আসবে। বস্ত্র শিল্পকে বাঁচান। এই বস্ত্র শিল্পই হচ্ছে দেশের শিল্পায়নের মূল ভিত্তি। মেহেরবানি করে এর প্রতি নজর রাখুন। তাহলে এদেশে শিল্পায়ন অবশ্যই করা সম্ভবপর হবে।

রপ্তানীর কথা বলেছেন, গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু রপ্তানীকে highest political level-এ যে গুরুত্ব দেওয়ার কথা সেটা দেওয়া হয় নি। European Common Market-এ এখনও আমাদের উপর কোন restriction নেই। 332 million population, largest market in the world with people having purchasing capacity there, যা বিক্রি করতে চাইবেন সেটাই সেখানে বিক্রি হবে। সব কিছুই রপ্তানী করতে পারবেন। কিন্তু এক সময় restriction আসবে। স্পেন, পর্তুগাল, আবার এখন যদি গ্রীস মেম্বার হয়, তুলনামূলকভাবে ইউরোপের অনুন্নত দেশগুলো চাপ সৃষ্টি করবে European Community-র উপর যাতে এই restriction দেওয়া হয় আমাদের মত দেশ থেকে রপ্তানী করার ব্যাপারে। তাই যতদিন পর্যন্ত এই restriction নেই, let us not miss the bus। এটা আমাদের জন্য বিরাট একটি সুযোগ। এখনই উচিত হবে ইউরোপে আমাদের বাজার বৃদ্ধি করা। যখন restriction আসবে তখন মানবতার খাতিরে তারা আমাদের রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়ে দেবে না, যদি এখন আমরা export বাড়িয়ে two billion dollar-এ নিতে পারি আগামী ২ বছরের মধ্যে তাহলে two billion dollar পর্যন্ত guaranteed export market আমাদের থাকবে। সেজন্য রপ্তানীর কথা বলেছেন ঠিকই কিন্তু রপ্তানীকে encourage করার জন্য আমি ভেবেছিলাম যে একটা সুনির্দিষ্ট strategy থাকবে এই বাজেট বক্তৃতায় কিন্তু তা নেই।

আমার কাছে সাইফুর রহমান সাহেবের ১৯৮১-৮২ সালের বাজেট বক্তৃতা আছে। কথা হচ্ছে without technology কী করে আমাদের দেশে যে সম্ভাবনার কথা আমরা বলি তা অর্জন সম্ভব? তাঁর কোন বাজেটেই একটা শব্দ নেই যে technology-এর উপর আমরা কোন গুরুত্ব আরোপ করছি কিনা? রপ্তানী করবেন, কিন্তু finished product যদি competetive না হয়, তাহলে আমরা কোথা থেকে মার্কেট পাব? আজকে এই বাজেটে বলা হয়েছে ঠিকই যে রপ্তানী গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেটা মুখে শুধু বললেই চলবে না। আমরা ভেবেছিলাম একটা Action Programme এই বাজেটে আসবে, এই গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে, যাতে এ দেশের মানুষ একটি আশার আলো দেখতে পায়। আজকে আমাদের অবস্থা খারাপ হতে পারে, কিন্তু পাঁচ বছর বা দশ বছর পর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের চাইতে আরও ভালভাবে থাকার সুযোগ পাবে। এই জন্যই তো আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম। মাননীয় স্পীকার, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে অত্যন্ত হালকাভাবে উচ্চারণ করা হয়েছে। অথচ এটা ছাড়া দেশে শিল্পায়ন করা সম্ভব হবে না। এবিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি জানি, Labour Ministry থেকে এব্যাপারে একটা কমিশন করা হয়েছে লেবার আইন পরিবর্তন করার জন্য এবং এটা একটা ভাল পদক্ষেপ। কিন্তু এখানে আপনাদের ট্রেড ইউনিয়নদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে আমরা একটা যুগোপযোগী শ্রমনীতি আমাদের দেশে চালু করতে পারি।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, কৃষি হল আমাদের দেশের একেবারে মূল খাত। এটা থেকে আমাদের প্রায় ৪৮ থেকে ৫০% জিডিপি আসে এবং কৃষির রিটার্ন হল highest return। একজন কৃষকের জন্য যদি সার এবং অন্যান্য উপকরণ easily available করা যায় তাহলে যে রিটার্নটা আমরা পাব তা অন্য কোন খাতে বিনিয়োগ করে আমরা পাব না। কিন্তু এখানেও গাছাড়া ভাব, একটা half-hearted attempt, কৃষিকে সত্যিকার অর্থে গুরুত্ব দিয়ে highest return পাওয়ার যে একটা সুযোগ আছে সেখানে enough attention দেয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি না। মাননীয় স্পীকার, সার বিতরণ ব্যক্তি মালিকানাধীনে বিতরণের ব্যবস্থা আমরাই করেছিলাম। আমরা আশা করব, এই সরকার এটাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করতে পারবেন। এখনও বাংলাদেশের ৪০ শতাংশ জায়গায় সার পৌঁছায় না। যদি এই কৃষকদেরকে সার ও উন্নতমানের বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করতে পারতাম তাহলে আমাদের প্রডাকশন অনেক বেশি বাড়ত। শুধু উৎপাদনেই আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতাম না, আমরা খাদ্য রফতানী করতেও পারতাম। আমার বন্ধু খাদ্যমন্ত্রী সেদিনও একটা বক্তৃতায় একথা বলেছেন।

মাননীয় স্পীকার, শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষাখাতে আমরা সবচাইতে বেশি বিনিয়োগ করি। অথচ return is the poorest from education। I am very sorry to say this। আপনারা সেক্রেটারীয়েটে বসে যদি বলেন যে, আপনারা সার্বজনীন শিক্ষায় সাফল্য লাভ করবেন, পারবেন না। আমাদের গালি-গালাজ করেন 'স্বৈরাচার' বলে, কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার যেখানে রয়েছে সেখানে দেশের মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পারেন না কেন? শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিত নেই, তিনি বলেছেন শিক্ষানীতি না কি আছে। আমার জানা মতে কোন শিক্ষানীতি নেই। সময়ের অভাবে বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না। আমাদের শিক্ষামন্ত্রীকে বলি Korean education system দেখুন, আমাদের চাইতে অনেক পিছনে ছিল। ১৯৫১-৫২ সালে তাদের per capita income ছিল আমাদের তুলনায় ১০ ডলার কম। আজকে তাদের per capita income হয়ে গেছে ৫ হাজার ডলার, আর আমরা পড়ে আছি ১৭৫ ডলারে। তারা শিক্ষাকে সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। কাজেই শুধু বাজেটের peripheral speech-এর মধ্যে নয়, মুখরোচক lip service-এর মধ্যে নয়, একটা half hearted attempt নয়, এটার জন্য জাতীয়ভাবে একটা অত্যন্ত serious attempt যদি না নিই, আগামী ১০ বছর পরে এই পার্লামেন্টে যারা আসবে তারা আমাদের চাইতে ভাল হোক সেটা আমরা চাই, কিন্তু আমার ভয় হয়, গুণগতভাবে আমাদের চাইতে ভাল শিক্ষিত মানুষ এই পার্লামেন্টে আসতে পারবে কি না। আজকে সেজন্য মনে হয় Education Sector-এর জন্য আমাদের কোন বিশেষ প্রোগ্রাম এই বাজেটে নেই। সব কিছু করা হয়তো possible নয়, but go for education and population control, যদি প্রবৃদ্ধি বাড়াতে চান। আপনারা টার্গেট করেছেন প্রবৃদ্ধি বাড়বে ৫ শতাংশ, একটু কম হতে পারে বা একটু বেশি হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এক বছরের মধ্যে বেড়ে যাবে আরও ২.৫ মিলিয়ন people, আপনি কোত্থেকে আসল প্রবৃদ্ধি বাড়াবেন? আপনি জনসংখ্যা কমানোর জন্য কি action programme এই বাজেটে reflect করেছেন? এই জাতিকে কি নির্দেশনা দিয়েছেন? এটা আমরা expect করেছিলাম। আপনাদের মতে আমরা তো ব্যর্থ হয়েছি। আপনারা দাঁড়িয়ে আমাদেরকে বলবেন, "আপনারা কিছুই করেন নি", আমি মেনে নেব। কিন্তু আমি একটা সমীক্ষা দিয়েছি কী কী করেছি। আপনারা এবিষয়ে একটা sub-sector করে কিছু টাকা বাড়িয়েছেন। গতবার যা ছিল তার থেকে একশ কোটি টাকা বাড়িয়েছেন, পরিবার পরিকল্পনায়, পঞ্চাশ কোটি টাকা বাড়িয়েছেন। This is not the way। এই ভাবেই চলবে আমাদের, আগামী বাজেটে আপনি দেবেন, তার পরের বাজেটেও আপনি দেবেন, আর এই কথাই আপনারা বলবেন। আমরাও একই কথা বলব। But nation will not achieve much। আজকে সেই জন্য এই কথাগুলো আমাদের মনে রাখা দরকার।

মাননীয় স্পীকার, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতির কথা সকলের জানা। আমি নতুন করে বলতে চাই না। দেশের মানুষ ভেবেছিল একটা নতুন সরকার আসবে, জিনিসপত্রের দাম না কমুক অন্তত বাড়বে না। শিক্ষাঙ্গনে অন্তত শান্তি ফিরে আসবে। আর আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক কিনতে হবে না। এরশাদ সাহেব তো ক্ষমতায় নেই। শিক্ষাঙ্গনে বন্দুকযুদ্ধ বোধহয় এবার শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বন্দুকযুদ্ধ শেষ হয়

www.pathagar.com

নি। আপনারা স্কুল-কলেজ বন্ধ রেখেছেন কয়েকবার, কেন? কারণ বন্দুকযুদ্ধ, সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারেন নি, এরা কারা?

মাননীয় স্পীকার, সন্ত্রাস দমনের জন্য শুধু সরকারকে দায়ী করি না আমি। তবে আমাদের experience বলে যে, দেশে যারা চাঁদাবাজ, মাস্তান, সন্ত্রাসী আছে তাদের বেশির ভাগ সরকারের বিভিন্ন ব্যক্তির protection-এ থাকে। তার কারণ আছে। It is a social problem, they need protection for their survival। এই reality যদি আপনারা অবজ্ঞা করেন, তাহলে আপনারা সন্ত্রাসের সমস্যা কোন দিনই সমাধান করতে পারবেন না।

মাননীয় স্পীকার, ছোট কালে শুনেছিলাম 'দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন'-এর কথা। আজকাল দেখছি যে, দুষ্টের পালন আর শিষ্টের দমন। যারা ভাল থাকতে চায়, যারা শান্তিপ্রিয় তারা আজকে victim। যারা মাস্তান, সন্ত্রাসী, তারা আজকে winner। তাদেরকে যারা লালন পালন করে তাদেরকে যদি আপনারা স্তব্ধ করতে না পারেন, যদি নিস্তব্ধ করতে না পারেন, তাহলে সন্ত্রাস দমন করা সম্ভবপর হবে না।

মাননীয় স্পীকার, we are in a state of under-development। আমাদের জাতির জন্য সব চাইতে বড় চ্যালেঞ্জটা কী? Challange হল under-development থেকে state of progress-এ যাওয়া এবং এই transition period কোন কোন দেশে একশ দু'শ বছর লেগেছে। কোন কোন দেশ আবার দেখতে পাচ্ছি by applying modern technology, ৩০-৪০ বছরের মধ্যে তারা এই ট্রানজিশন পিরিয়ড অতিক্রম করতে পারছে। For example, আমরা সবাই জানি দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানের কথা, but এই সব দেশের কথা না বলে latest দুটো দেশের কথা বলি। ইন্দোনেশিয়ায় ১৬ কোটি মানুষ, মুসলমান তারা আমাদের মত, থাইল্যান্ড আমাদের মত দেশ। আমাদের চাইতে অনেক কম per capita income ছিল। আজকে থাইল্যান্ডের growth rate হল nine and half per cent, ইন্দোনেশিয়ার growth rate হল seven and half per cent। এই দেশগুলো খুব দ্রুত তাদের transition পিরিয়ডটা সম্পন্ন করছে। transition period-টাকে shorten করাটাই হলো আমাদের সব চাইতে বড় চ্যালেঞ্জ।

আসুন আমরা এই transition period-টাকে shorten করি। তা না হলে আমরা বেশি দিন টিকে থাকতে পারব না। আমরা যদি মনে করি আমাদের জাতির জন্য ৫০ বছর কিছুই না, সেইটা ভুল হবে। বাংলাদেশের জন্য ৫০ বছর অনেক কিছু। We as a nation must be in a hurry। We cannot wait এবং if we wait, we will be only cursed by our future children। এই জন্য সময় আমাদের হাতে খুব বেশি নেই। যদি মনে করেন, ৫ বছরের জন্য আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন তাহলে, পাঁচ বছরের টার্গেট দেন what target you like to achieve in population planning, যেটা কোরিয়ানরা করেছে। আমি এখানে উদ্ধৃতি দিতে পারছি না কেননা আমার সময় কমে আসছে। Korean economic policy-তে তারা magical progress অর্জন করেছে।

মাননীয় স্পীকার, অসম্ভব সম্ভাবনার দেশ, এই বাংলাদেশ। এদেশের মানুষের মধ্যে যে প্রতিভা, যে মেধা, যে শক্তি, যে উদ্দীপনা আছে, ১২ কোটি মানুষের সেই শক্তিকে নিয়োজিত করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তাঁরা তাদের নিজেদের প্রতিভা, মেধা, শক্তিকে দেশের উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারে। সেই পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব হল সরকারের। সরকার তো regulate করবে না, কত মানুষকে আপনারা চাকুরি দেবেন? কত মানুষকে চাকুরি দিতে পারবে একটা সরকার? চাকুরি দিতে পারবে না। কিন্তু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, through policy, through incentives, through support। সেই policy যদি implement করতে পারেন, তাহলে যে সম্ভাবনা এদেশের মানুষের মধ্যে রয়েছে তা কাজে লাগাতে পারবেন। আমি অত্যন্ত আশাবাদী এদেশের মানুষ সম্পর্কে। আমি এখনও মনে করি যে, ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে এই দেশের ১৭৫ ডলার per-capita income থেকে আমরা current valueতে ৬০০-৭০০ ডলার per-capita income-এ আমাদের দেশকে নিতে পারব। কারণ ১২ থেকে ১৫ কোটি মানুষের

www.pathagar.com

per-capita income যদি ৬০০-৭০০ ডলার হয়, your economy will grow। আপনাকে অর্থাৎ সরকারকে তখন খুব বেশি কিছু করতে হবে না। অর্থনীতির চাকা নিজের গতিতেই চলবে এবং সেই অর্থনীতির সুফল আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা পাবে।

মাননীয় স্পীকার, বেকারত্ব আমাদের দেশের বিরাট একটি সমস্যা। কিন্তু এই বেকারত্বের সঙ্গে দেশের সামগ্রিক উন্নতি অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিল্পখাত জড়িত, কৃষিখাত জড়িত। কিন্তু আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের এই দেশে ৮০ লক্ষ শিক্ষিত বেকার যুবক আছে। অশিক্ষিত বেকার যুবকদের কথা না হয় বাদই দিলাম। এই যে potential, এই যে brain, এই যে শক্তি এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা, এই শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য এই বাজেটে কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নি। মাননীয় স্পীকার, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, এখন সারা দুনিয়াতে এমনকি আমেরিকার মত দেশে সম্পূর্ণভাবে নতুন একটা চিন্তাধারা এনেছেন। সেটা হল, "Ethical management of political economy"। *On Ethics and Economics*, অমর্ত্য সেনের এই বই quote করতে অনেক সময় লাগবে। আমাদের মত গরিব দারিদ্র পীড়িত দেশে, আমাদের options অত্যন্ত লিমিটেড। এই লিমিটেড optionsগুলির মধ্যে টার্গেট করে, কোন্ কোন্ সেক্টরের জন্য অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জন করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেগুলিকে নির্দিষ্ট করে সেই জন্য জাতীয়ভাবে, এই সামাজিক খাতগুলিকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করার কথাকেই বলা হয়েছে ehtical management of political economy।

মাননীয় স্পীকার, oath এবং রাষ্ট্র পরিচালনা এক কথা নয়। An elected government may not be a democratic government। একটি democratic governmentকে কতগুলি eternal values অনুসরণ করতে হয়। সংযম, সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা হল values of democracy।

জানি না, আজকে কেন জানি, বিশেষ করে জাতীয় পার্টির ব্যাপারে একটা সহিংসতার ভাব, একটি সংযমহীনতার ভাব। বায়তুল মোকাররমে আমাদের মিটিং ডেকেছি, আমাদেরকে জনসভা করতে দেয়া হয় নি। আমরা সায়েদাবাদে মিটিং ডেকেছি, আমাদেরকে সভা করতে দেয়া হয় নি। আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই যে, সভা করতে আপনারা দিতে নাও পারেন, যেহেতু আপনারা সরকারে আছেন, কিন্তু গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মূল দায়িত্ব আপনাদের উপর। আপনাদের কথা হল যে, "আপনারা করতে দেন নি সেজন্য আমরাও আপনাদের করতে দেব না।" এটা কোন যুক্তি হতে পারে না। এই যুক্তি আপনারা বর্জন করবেন বলে আমি আশা করি। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে প্রতিহিংসা বর্জন করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, বাইবেল থেকে আমি একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই। "He who takes up the sword shall perish with the sword". আপনারা ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সৃষ্টি করেছেন, এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনই আপনাদের পতনের মূল কারণ হতে পারে বলে আমি আশঙ্কা করছি।

মাননীয় স্পীকার, যে জাতি অতীতকে নিয়ে ঝগড়া করে সেই জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না, এটা আমি এর আগেও বলেছি। Let us look forward, let us go forward। অতীতে আমরা যারা ক্ষমতায় ছিলাম, আমাদের কারোরই track record ভাল নয়।

আমাদের প্রত্যেকের track record-এ অনেক দোষ-ত্রুটি রয়ে গেছে। But let us forget them, এখনতো আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হলো এই state of under-development থেকে state of progress-এ যাওয়ার যে transition period সেটাকে shorten করা। এটাই হল মূল চ্যালেঞ্জ। Let us do that। রাজনীতির মানেই হল জনগণের কল্যাণে সরকার পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দেওয়া।

[বাধা প্রদান]

মাননীয় স্পীকার, আমরা অতীতেও দেখেছি, আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে, ক্ষমতায় গেলে দাপট দেখানো। ক্ষমতার দাপট যত কম দেখাবেন ততই আপনাদের জনপ্রিয়তা বাড়বে। আর যত

www.pathagar.com

বেশি দেখাবেন জনপ্রিয়তা ততই কমতে থাকবে। প্রশাসনে দলীয়করণ প্রক্রিয়া বন্ধ করুন, তাহলে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারবেন। যদি রাজনৈতিকভাবে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চান, বিচার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। বিরোধীদলের উপর অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, এই সংসদের সদস্য হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আজ অনুপস্থিত।

[বাধা প্রদান]

মাননীয় স্পীকার শুধু এই কথা বলতে চাই, The same fate may come to you one day, do not forget it, just remember that।

[বাধা প্রদান]

আমরা চাই যে, জাতীয় পার্টির নেতা এরশাদ এই সংসদে আসুক। তাতে এই সংসদের সম্মান বাড়বে, সম্মান কমবে না, সরকারীদলের সম্মান বাড়বে। রাজনীতি করছেন large-hearted হোন, তাহলে দেখবেন ইতিহাসে আপনারা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, আর তা না হলে ভাগ্য একই রকম হবে।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।

www.pathagar.com

মনে হয় ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে আর কিছুই নেই

'ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংস' সম্পর্কিত প্রস্তাব

২০ জানুয়ারি ১৯৯৩

ষোড়শ শতাব্দীতে, ৪৬৪ বছর আগে, সম্রাট বাবরের শাসনামলে ভারতের অযোধ্যা রাজ্যে মীর বাকী বলে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই বাবরী মসজিদ স্থাপন করেন। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে ১৯৯২ সালের শেষার্ধে ভারতে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। শিবসেনা ও বিজেপির নেতৃত্বে হিন্দু জঙ্গীবাদীরা এই মসজিদ ভেঙে সেখানে একটি মন্দির স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়। এই বক্তব্যের মাধ্যমে এই মসজিদের ইতিহাস, ভারতে তখনকার কংগ্রেস সরকারের ভূমিকা, বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া এবং অবস্থানের উপর আলোকপাত করা হয়।

মাননীয় স্পীকার

আজকেসহ ৪ দিন আমরা এই বিষয়ের উপর আলোচনা করছি। এইদিকে যাঁরা বক্তব্য রেখেছেন, তাঁদের বক্তব্য শুনে মনে হয়েছে, যেন বাবু নরসীমা রাও এখানে বসে আছেন বা তাঁর প্রতিনিধিরা বসে আছেন। আর এই পক্ষের কথা শুনে মনে হয়েছে যে, এখানে একটা সাম্প্রদায়িক দল বসে আছে যাদের উদ্দেশে তাঁরা বক্তব্য রাখছেন। কিন্তু এই বিষয়টি এমন একটি বিষয় যেখানে আমার মনে হয়, the entire approach was not correct।

কারণ এটা একটা গণতান্ত্রিক এবং নির্বাচিত সরকার। আর আছে এদেশের সংসদের প্রধান বিরোধীদল। এটাই হল বাস্তব সত্য। আলাপ-আলোচনায় খুব বেশি একটা তফাৎ আমি পাই নি। It was a very thin difference of opinion। এই বিষয়ে আমি আমার বক্তব্যের শেষে সুপারিশ রাখব, how to eleminate this thin difference between the two sides on this very important issue for our nation....

মাননীয় স্পীকার, দুটো পরাশক্তির স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, এটার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিশ্বে ধর্মযুদ্ধ, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও বেশি ছড়িয়ে যাবে, কিন্তু এর সঙ্গে আমরা যে ইস্যুটা আলোচনা করছি তার একটু ব্যবধান আছে। আমি মনে করি না যে ভারতে যে ঘটনা ঘটেছে এটা স্নায়ুযুদ্ধের fall-out। তার কারণ হল এই দ্বন্দ্ব, এই কলহ এই এলাকায়, এই উপমহাদেশে, বহু বছর যাবৎ চলে আসছে। এই জন্য আমি ঐ আন্তর্জাতিক যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, তাঁদের মতামতের সাথে একমত হলেও, ভারতে যে ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনার সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না।

মাননীয় স্পীকার, মীর বাকী বলে সম্রাট বাবরের সভা পরিষদের একজন সদস্য ষোড়শ শতাব্দীতে এই মসজিদটি তৈরি করেছিলেন। এর আগে কখনও এখানে রাম মন্দির বা রামের জন্ম, marked as a birth place of Ram ছিল না। এটা একাদশ শতাব্দীতে কোন এক সময়ে কোন একজন বলে গেছে, কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই। ১৫২৯ সালে প্রথম, একাদশ শতাব্দীর পাঁচশত বছর পরে, এই মসজিদ হয়েছে। এই মসজিদ হওয়ার আরও প্রায় তিনশত বছর পরে ১৮৫৫ সালে প্রথম একটি দ্বন্দ্ব হয়, একটি যুদ্ধ হয়, একটি রায়টের মত হয় হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে। তার প্রায় চার বছর পর ব্রিটিশ সরকার একটি দেওয়াল দিয়ে মসজিদকে আলাদা করে ভাগ করে দেয়। এর পরে হিন্দু সম্প্রদায় একটি মামলা করে। মামলা করার পরে সেখানকার লোকাল কোর্ট সেটাকে ডিসমিস করে দেয়। তারপরে অনেক বছর আর কিছু হয়নি। প্রায় ৬০-৭০ বছর পর ১৯৩৪ সালে হিন্দুরা আবার এই মসজিদ আক্রমণ করে। এরপরে প্রায় ষোল বছর পর ১৯৫০ সালে আর একটি মামলা হয়। মামলার ফলে কোর্ট এই মসজিদের কাস্টোডি নেয়। এর পরে প্রায় তেত্রিশ বছর পর

www.pathagar.com

১৯৮৩ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ একটা campaign শুরু করে যে এই মসজিদের জায়গায় রামের জন্মস্থান ছিল। সুতরাং এখানে একটা মন্দির করতে হবে। ১৯৮৮ সালে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধী ওখানে একটি ground-breaking ceremony করেন, ৫৮ মিটার দূরে মন্দির বানানোর অনুমতি দেন এবং তার ফলে বিরাট একটি রায়ট হয়।

১৯৯০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি রথযাত্রা করে ভি পি সিং সরকারের পতন ঘটায় এবং সেখান থেকেই আসলে বিষয়টি চরম আকার ধারণ করে। ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে এই রাম মন্দির তৈরি করার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

মাননীয় স্পীকার, আমি এই কথাগুলি বলার পেছনের কারণটা হল এই যে, এটার একটা পরিকল্পনা অনেক বছর যাবৎ হিন্দু মৌলবাদীদের মধ্যে ছিল, যার ফাঁদে ভারতের সকল প্রধান রাজনৈতিক দল পড়েছে। ভারতের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল–ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে সাম্প্রদায়িকতার ফাঁদে পড়েছে। শুধু বিজেপি যে communal card play করছে তা নয়, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইন্ডিয়ান কংগ্রেস পার্টি secularism-এ বিশ্বাস করা সত্ত্বেও আজকে তাঁরা communal card play করার কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন এবং যার জন্য আজকে ভারতে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এবং এটা তাঁদের internal রাজনৈতিক কারণেই হচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে যেমন state capitalism collapse করেছে, আজকে ভারতেও secularism মনে হয় collapse করে গেছে। এই ৬ ডিসেম্বরের আগে, জুলাই মাসে হিন্দু মৌলবাদীরা ঘোষণা করেছে যে, "আমরা এখানে মন্দির তৈরি করব, definitely তৈরি করব, মন্দির তৈরি না করে বাড়িতে ফিরব না।"

ভারতের খুব নাম করা রাজনীতিবিদরা এসব কথা বলেছেন। শিবসেনা-বিজেপি জঙ্গী বাহিনী বাবরী মসজিদের কাছেই মোটা দড়ি, লাঠি, হকিস্টিক, শাবল, কোদাল, টুকরী নিয়ে গেছে এবং ১ ডিসেম্বর থেকে সমাবেশ শুরু করেছে। ৫ ডিসেম্বর সেখানে ৩ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়। তার আগে ট্রেনিং নিয়েছে কী করে তাড়াতাড়ি করে এই মসজিদ ভাঙা যায়। সেখানে একটি মন্দির স্থাপন করার জন্য, ওখানে মূর্তি স্থাপন করার জন্য সমস্ত জিনিসপত্র সাথে করে নিয়ে গেছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা মসজিদ ভাঙা শুরু করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সুপ্রীম কোর্টের অর্ডার ছিল তাই সেখানে কিছুই হবে না এবং মসজিদকে প্রটেকশন দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষায় বলেছেন:

> আমি মনে করেছি বিজেপি কথা দিয়েছে যে, তারা সুপ্রীম কোর্টের কথা মেনে চলবে আর উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং আমাকে বলেছেন যে, তিনি এই আদেশ মেনে চলবেন।

দুঃখের সাথে বলতে হয়, এর উপর ভিত্তি করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার নির্জীব এবং নীরব ছিল। তাদের inaction-এর কারণে, আজকে এই ৪৬৪ বছরের একটি ঐতিহ্যবাহী মসজিদ–এটা শুধু মসজিদ নয়, it is a symbol of faith for a very very large community of this world. not only of this subcontinent ভাঙা হয়েছে যা সমস্ত ইসলামী উম্মার অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। এরজন্য কোন সত্যিকারের মুসলমান ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের এই গাফিলতিকে ক্ষমার চোখে দেখতে পারে না এবং না দেখতে পারাটাই স্বাভাবিক।

মাননীয় স্পীকার, বাবরী মসজিদ ভাঙার প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। আজকে এই সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে। এখানে কিছু ঘটনা ঘটেছে, এই ঘটনার জন্য যারাই দায়ী তাদেরকে শনাক্ত করা হোক, আর যে সব মন্দির ভেঙেছে সেগুলি পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা করা হোক। এটাই হল দাবি। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে কিছুই হয় নি। এটা ঠিক নয়। ঘটনা ঘটেছে এবং লংমার্চে যখন হাজার হাজার মুসলমান আবেগে আপ্লুত হয়ে তারা একটি প্রতীকী মিছিল করতে চেয়েছে, তাদেরকে বিনা পয়সায় ফেরি পার করে দেওয়া হয়েছে। নদী পার হওয়ার পর তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সরকারের এই দ্বৈতনীতির ব্যাপারে আজকে দেশ-বিদেশের মানুষ প্রশ্ন করে।

মানুষের মনে সন্দেহ হয়েছে যে, সরকারের সত্যিকারের ভূমিকাটা কী ছিল? কারণ any Government of worth will defend and protect any citizen's right and properties।

www.pathagar.com

এটাই হল নিয়ম। যে কোন সরকার হোক, আজকে যদি জামায়াতে ইসলামীর সরকারও হত, it would have been their sacred responsibility, প্রতিটি নাগরিকের জানমালের হেফাজত করা। সুতরাং আজকে প্রশ্নটা এই নয় যে কত মন্দির ভেঙেছে বা কত হিন্দুদের বাড়ি পুড়ে গেছে বা লুটপাট হয়েছে। প্রশ্ন হল যে সরকারের ভূমিকাটা কী ছিল? এই ব্যাপারে আমাদের অনেকেরই সন্দেহ রয়ে গেছে। যদিও তাঁরা বলেছেন, প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন লিখিত নির্দেশ কি দেওয়া হয়েছিল? জেলা পর্যায়ে লিখিত নির্দেশ সরকারের কাছ থেকে গেছে কিনা আমরা জানতে চাই। কারণ ৯০ সালে যখন রায়ট হয়, তখন আমরা সরকারে ছিলাম। আমাদের সময়েও মন্দির ভেঙেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু within twenty four hours আমরা আর্মি নামিয়েছিলাম। আমরা প্রত্যেকটি জেলায় B.D.R দিয়েছিলাম। যার জন্য situation control-এ এসেছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে তখনকার যে ব্যবস্থা জাতীয় পার্টি সরকার নিয়েছিল সেটা কার্যকর করা হয়েছিল কিনা?

আজকে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমরা যখন যাই এস. পি. সাহেব বলেছেন, "আমার গ্রেপ্তার করার কোন অর্ডার উপর থেকে নেই।" মানে উপরের কোন অর্ডার নেই। যদি গ্রেপ্তার করার অর্ডার না থাকে তাহলে যে কোন মানুষই নিরীহ হিন্দু বাড়িতে গিয়ে লুট করে ২/৪টি জিনিস নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং, government-এর policyটা কী ছিল? এ নিয়ে আজকে শুধু আমাদের দেশে নয়, শুধু ভারতে নয়, বিদেশেও এই বিষয়ে প্রশ্ন জেগেছে।

মাননীয় স্পীকার, আজকে এই প্রশ্নের উত্তর আশা করি সরকারের তরফ থেকে পরিচ্ছন্নভাবে আমাদের কাছে আপনারা উপস্থাপন করবেন। সার্ক সম্মেলন হতে পারে নি। সেই জন্য সরকারের অপরিপক্বতাকে আমরা দোষারোপ করেছি।

এর সাথে সাথে আমি আর একটি কথা বলতে চাই। এখানে আমার কাছে আছে Indian spoksman-এর বক্তব্য যে কেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে আসেন নি। আমি একটু পড়ে শোনাতে চাই। তাঁরা বলেছেন:

> It was expected that the situation in and around India would have stabilised and the political tensions created by the action in some of the other countries in the sub-continent would have subsided by then. Unfortunately public demonstrations and acts amounting to interference in the internal affairs of India have continued to vitiate the atmosphere. This naturally impacts negatively on prospects of the SAARC Summit.

আমি এটার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। কারণ আজকে লংমার্চ করাটাকে যদি internal interference বলা হয় এবং সেই অজুহাত দেখিয়ে ঢাকায় না আসেন তাহলে I think this will be a very weak and feable logic। বাংলাদেশে এমন কিছু ঘটে নি যেটাকে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। যদিও এই ব্যাপারে আমাদের পররাষ্ট্র সচিব এই ধরনের একটি বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু এখানে আমি বলব সরকারের উচিত হয় নি পররাষ্ট্র সচিবকে দিয়ে প্রতিবাদ জানানো। সরকারের উচিত ছিল বি.এন.পি.'র সাধারণ সম্পাদককে দিয়ে এর প্রতিবাদ জানানো; because there is something which is called political।

মাননীয় স্পীকার, আমি মনি করি যে, এটাকে একটা pretext হিসাবে ব্যবহার করা ঠিক হয় নি। তাদের নিজেদের দেশে যে ঘটনা ঘটেছে তা সকলে জানে কিন্তু ধর্ম কোন সীমানা মানে না। ধর্মের যে অনুভূতি এটাকে যদি বলা হয় যে, ভারতের একটা internal affairs, তাহলে বলব বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার ফলে তাঁদের নিজেদের অবস্থার দিকে একটু তাকালে ভাল হয়।

মাননীয় স্পীকার, আমি আর দুটি point বলে শেষ করব। প্রতিক্রিয়াটা হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের দেশে প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে ভারতে যা হয়েছে, তার তুলনায় অনেক কম হয়েছে। আমাদের দেশে প্রাণহানি ঘটে নি। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক জায়গায়

www.pathagar.com

সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হয়েছে, মন্দির ভেঙেছে, একথা সত্য। এই সত্য কথা যদি মেনে নেওয়া হয়, এতে লজ্জার কিছু নেই। কারণ এর দায়িত্ব হল সরকারের। আমার অনেক এলাকায় আমি দেখেছি কিছু কিছু ত্রাণও গেছে, যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের জন্য। ত্রাণ যদি পাঠিয়ে থাকেন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারবেন না কেন? লজ্জার কোন কিছু নেই। বরং দেশের ভাবমূর্তি বাড়বে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার যে ঐতিহ্য রয়েছে সেই ক্ষেত্রে সরকারেরও একটা ভূমিকা আছে, এটাই প্রমাণিত হবে। তাছাড়া কোরান শরীফে বারবার বলা হয়েছে যারা সংখ্যালঘু, যারা নিরুপায়, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমরা যারা সংখ্যাগুরু তাদের উপর অর্পিত।

মাননীয় স্পীকার, hard reality হল ভারত আমাদের প্রতিবেশী দেশ এবং একটি বিশাল দেশ। We cannot choose our neighbours। ১২ কোটি মুসলমান ভারতে বসবাস করে। এটাও একটা বাস্তব সত্য। আমার বক্তব্য হল stability of this region is vitally important for our own country। সুতরাং কূটনীতিতে আবেগের কোন স্থান নেই। আমি অনেক responsible minister দের বক্তব্য শুনেছি। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই ধরনের বক্তব্য কোন সরকারের মন্ত্রীর কাছ থেকে আশা করিনি। যত আবেগই থাকুক। কারণ these are such facts of life যেগুলিকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এই এলাকায় stability নষ্ট হলে শুধু ভারত নয় তার প্রতিক্রিয়া আমাদের মত ক্ষুদ্র বাংলাদেশে এসে পড়বে। এ কথাটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।

www.pathagar.com

বিরোধীদলের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করুন এবং প্রতিহিংসার রাজনীতি বর্জন করুন

রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের ভাষণের উপর বক্তব্য

১১ মার্চ ১৯৯৩

১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে সংবিধানের একাদশ এবং দ্বাদশ সংশোধনী আইন পাস হয় এবং দ্বাদশ সংশোধনীর পক্ষে গণভোটের পর সেপ্টেম্বর মাসে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন এবং জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে যান।

১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে বছরের প্রথম অধিবেশনে জনাব বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর ভাষণ দেন। জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা হিসাবে দলীয়করণ এবং প্রতিহিংসার রাজনীতি বর্জন করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়।

মাননীয় স্পীকার

বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতির ভাষণের আর কোন মূল্য বা তাৎপর্য নেই। দু'মাস আগে তিনি এই ভাষণ দিয়েছেন। এই দু'মাসের মধ্যে দেশের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি। বরং সর্বক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে। সুতরাং এতদিন পর যখন আমরা এই ভাষণ আলোচনা করছি আমাদের জন্য বিষয়টি খাপছাড়া হয়ে গেছে। এটার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়েছে এবং এটার যে একটা flow of discussion থাকে, সেটাও ব্যাহত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, এই ভাষণে আমার মনে হয় যে রাষ্ট্রপতি একজন দলীয় ব্যক্তি হিসাবে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে ভাষণ দেন নি। কারণ রাষ্ট্রপতির যে মর্যাদা, সেই মর্যাদা তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে বহন করতে সক্ষম হয়েছেন বলে আমি মনে করি না। এই ভাষণে আমরা যেটা expect করেছিলাম সেটা হল, এখানে একটা দার্শনিক কাঠামো থাকবে। কিন্তু আমরা কোন দার্শনিক কাঠামো এই ভাষণে পাই না। এই ভাষণে কোন vision নেই। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কীভাবে রূপায়ণ করা হবে তার কোন ইঙ্গিত নেই। বর্তমান সরকারের কিছু সাফল্যের কথা এই ভাষণে বলা হয়েছে। কিন্তু ২০০০ সালে বাংলাদেশে মানুষ কী ধরনের জীবন প্রত্যাশা করবে তার কোন নির্দেশনা নেই। একটি narrow সঙ্কীর্ণ গতানুগতিক পরিমণ্ডল থেকে লেখা একটি বাৎসরিক আনুষ্ঠানিকতা পালন করা ছাড়া রাষ্ট্রপতি আর কিছুই করেন নি। এই ভাষণের সাথে দেশের বর্তমান বাস্তব অবস্থার কোন সঙ্গতি বা সম্পর্ক আমরা খুঁজে পাই না।

তিনি গণতন্ত্রকে রূপ দেওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু সেটা কীভাবে অর্জন করবেন সে কথা বলেন নি। আমরা যদি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাই তাহলে তার কতগুলি পূর্বশর্ত আছে। একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হল যে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কী কী? প্রথম হল সংসদ, পার্লামেন্ট। আজকে পার্লামেন্ট অবহেলিত, এই পার্লামেন্টকে কার্যকর করার মূল দায়িত্ব হল সরকারী দলের। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রথম সারির চেয়ারগুলি খালি থাকে। এটা সংসদকে কার্যকর করার উপায় নয়। তারপরে আমরা দেখেছি যে, এই সংসদের জন্য একটা সচিবালয় করার কথা ছিল। এখন পর্যন্ত সেই সচিবালয় হয় নি। তাহলে সংসদ কী করে শক্তিশালী হবে?

এটাই হল এই Government-এর পরিচয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছে? আজকে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা এই সরকার দিতে পারছে না। আমি শুধু একটা উদাহরণ দিতে চাই।

www.pathagar.com

নৌ-বাহিনীর যে ঘটনাটি ঘটেছে, এই ঘটনা বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর জন্য কলঙ্ক বয়ে এনেছে। কারণ এই ঘটনাটি যখন ঘটলো তখন কী করা উচিত ছিল? The first thing you do, you demobilise. But you did not do that. You should have Court Martial them on the spot. You did not do that. You disarm them. You did not do that. You allowed it to continue for three, four days। তদন্ত কমিটি করেছেন, Civilianদের দিয়ে মিলিটারী এফেয়ার্সে তদন্ত কমিটি করেছেন। It is self-contradictory and we know what will be the fate of তদন্ত কমিটি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, এইসব জিনিস যখন করার প্রয়োজন on the spot করতে হয়। তাহলে অথরিটি অব দি গভর্নমেন্ট থাকে, আর নাহলে অথরিটি অব দি গভর্নমেন্ট erode করে যায়।

মাননীয় স্পীকার, সন্ত্রাস শিক্ষার পরিবেশকে গ্রাস করতে চলেছে। শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে সরকারের নির্লিপ্ততার কারণে। জাতি আজকে দ্বিধাবিভক্ত। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে কোন ইঙ্গিত পাই নি এবং সরকারের কাছ থেকেও পাই নি। সবাইকে অসন্তুষ্ট করে আপনারা দেশ চালাতে চান? বাইরে তো অসন্তুষ্ট করেছেনই। এইখানেও আপনারা আওয়ামী লীগকে অসন্তুষ্ট করবেন, জামায়াতে ইসলামীকে অসন্তুষ্ট করবেন। এত কষ্ট করে জামায়াত ভোট দিয়ে আপনাদের majority করিয়ে আপনাদেরকে ১৫১ করিয়েছেন। তারপর আপনারা তাদের আমীরকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে আপনারাই তাদেরকে encourage করেছেন, এখন একই ইস্যুতে তাঁকে আবার জেলে রেখেছেন।

লোকে বলে আজকে ৫ দলকে অসন্তুষ্ট করেছেন। মেনন[১] সাহেব অসন্তুষ্ট। সবাইকে অসন্তুষ্ট রেখে দেশ চালাতে পারবেন? গণতন্ত্রের মূল উপাদান হল সমঝোতা। Accomodation, compromise, give and take। এইভাবে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া চালু রাখতে হয়। গণতন্ত্র সুসংহত হতে পারে। কিন্তু আপনারা সবাইকে অসন্তুষ্ট করে এককভাবে দলীয়করণ করে দেশ চালাবেন এটা সম্ভবপর হবে না।

রবীন্দ্রনাথের 'পরশ পাথর'। সেই পরশ পাথরের জন্য আপনারা আন্দোলন করেছেন। পরশ পাথর পেয়েছেন কিন্তু পরশ পাথর হারিয়ে ফেলছেন। দেশের মানুষ তাই mean করে, এখনও সময় আছে। যদি গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে চান তাহলে আপনারা বিরোধীদলের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করুন এবং প্রতিহিংসার রাজনীতি বর্জন করুন। সংসদকে কার্যকর করার জন্য যে বিষয়গুলি আমি উত্থাপন করেছিলাম, আসুন সবাই মিলে আলোচনা করি এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সকলে সক্রিয় ভূমিকা পালন করি।

ধন্যবাদ। মাননীয় স্পীকার।

---

১. রাশেদ খান মেনন, বরিশাল-১ আসনের নির্বাচিত সদস্য।

www.pathagar.com

জাতিকে বৈদেশিক সাহায্যের ফাঁদ (Aid-trap) থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেট

২৪ জুন ১৯৯৩

সামষ্টিক অর্থনীতি (macro-economy)-কে স্থিতিশীল করার জন্য বিএনপি সরকারের সফলতা অব্যাহত থাকে। আর্থিক এবং উন্নয়ন খাতে অধিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার সুফলসমূহ দেশে-বিদেশে প্রশংসা অর্জন করে। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ সেসব বোঝে না। সামষ্টিক অর্থনীতি (macro-economy)-র আভাস-ইঙ্গিত বা সুফল তাদের কাছে বোধগম্য নয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কত, রপ্তানী কত বাড়লো, দেশজ সম্পদ কত হলো, সঞ্চয় বা বিনিয়োগ কত বৃদ্ধি পেল—এসব তাদের কাছে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। দেশের মানুষ শান্তি চায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ চায়, স্বল্প মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেতে চায়, রাস্তা, বিদ্যুৎ, খাল-খনন, পানি নিষ্কাশন চায়। স্কুল-কলেজ, মক্তব-মাদ্রাসার উন্নয়ন চায়। মোট কথা একটা সহজ সরল জীবন-জীবিকার পরিবেশ দেখতে চায়। অন্যদিকে গরিব দেশের জন্য বৈদেশিক সাহায্য একদিকে যেমন প্রয়োজন আবার এটা একটি বিরাট ফাঁদও। এই ফাঁদে একবার পড়লে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সেই ফাঁদ আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। এরই আলোকে এই বক্তৃতায় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সমস্যার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় এবং শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং রপ্তানীর কৌশল নির্ধারণের উপর আলোকপাত করা হয়। গণতন্ত্রকে লালন করার জন্য প্রতিহিংসার রাজনীতি বর্জন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

মাননীয় স্পীকার

আমার সুহৃদ ফজলুর রহমান পটল একজন খুব ভাল বক্তা। সব সময়ই ভাল বক্তৃতা দেন। কিন্তু আজকে বাজেট আলোচনায় তাঁর বক্তৃতার বিষয়টি সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারেন নি। তাঁর বক্তৃতা একটি ভুল বিষয়ের উপর হয়েছে। তিনি আমার পূর্ববর্তী রেকর্ডের উপর বক্তৃতা করেছেন, অনেকটা ব্যক্তিগত আক্রমণ, ভাল বলেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের পূর্ববর্তী রেকর্ড আমার মনে হয়, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বললে ভাল হয়। আমি কিছু বলতে চাই না। এখানেই আমি এই বিষয়টির ইতি টানতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, বাজেট উত্থাপিত হয়েছে ১০ জুন। এখন আমরা যে আলোচনা করছি মূলত এটা একটা একাডেমিক এক্সারসাইজ। এর ফলে বাজেটের খুব বেশি পরিবর্তন হবে না। সরকারের চিন্তা-চেতনা ধ্যান-ধারণারও খুব বেশি পরিবর্তন হবে বলে আমি মনে করি না। তারপরেও এটার একটা মূল্য আছে। তাই ভবিষ্যতের জন্য বলছি।

Finance Minister-এর attitude আমি জানি। Pre-budget discussion-এ তিনি বিরোধিতা করেন নি। তিনি এটার সঙ্গে একমত ছিলেন। তিনি অনেক ফোরামে এই বাজেট তৈরি করার আগে আলোচনা করেছেন। সুতরাং, পার্লামেন্টেও আলোচনা হলে ভাল হত এবং সে ব্যাপারে তিনি মতও দিয়েছিলেন। কিন্তু government within government operate করেছে, wheel within wheel operate করেছে, যার জন্য তাঁর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গত অধিবেশনেও পার্লামেন্টে আলোচনা করা সম্ভব হয় নি। ভবিষ্যতে যদি সুযোগ থাকে তাহলে আশা করি বাজেট পেশ করার পরে নয়, বাজেট উত্থাপন করার আগেই পার্লামেন্টে বাজেটের দিক-নির্দেশনা নিয়ে আমাদের সংসদ সদস্যদেরকে আলোচনার একটা সুযোগ দেবেন। তাতে জাতি উপকৃত হবে এবং অর্থমন্ত্রীও উপকৃত হবেন।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, macro economic level-এ সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা ঠিক কথা যে, রাজস্ব আয় বেড়েছে। ব্যয় কিছুটা কমেছে। সঞ্চয়ের হারও কিছুটা বেড়েছে। আমাদের এখানে সরকার দাবি করেছেন সঞ্চয়ের হার ১৩%। আগে ছিল ১১ কিংবা ১২, এক সময়ে ১০-এ নেমে গিয়েছিল, এখন ১৩-তে এসেছে। Foreign exchange reserve 2.2 billion dollar। মুদ্রাস্ফীতি দাবি করা হয় ৩% কিন্তু Consumers Association দাবি করেছে ৬.৫%। সুতরাং, সরকারী পরিসংখ্যান সম্পর্কে সন্দেহ আছে। Current account deficit কিছুটা কমেছে। আমি এর জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। An excellent job done by a very good technocrat। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে, micro level-এ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ এই macro level-এর সাফল্য ground level-এ কী পর্যায়ে আছে সেটা যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে আমাদের বলতেই হবে যে, there has been a total failure on the part of the government to refleet those achievements at the grassroots level। Reform programme বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি World Bank, IMF-কে খুশি করতে পেরেছেন। তারা খুব খুশি। তবে অনেক সময় তিনি অতি উৎসাহী হয়ে খুশি করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এর ফলে ground level-এ অর্থনীতিকে স্থবির ও stagnant করে দিয়েছেন। Country has been plunged into a deep recession। এই রিসেশন থেকে আমাদেরকে এখন বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে নিম্ন আয়, নিম্ন সঞ্চয়, নিম্ন বিনিয়োগের চক্র থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। That is our challenge। উনি rightly identify করেছেন। কিন্তু unfortunately আমাকে বলতে হচ্ছে যে, অর্থমন্ত্রী একা এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন। তাঁর আমলাতন্ত্র, ব্যুরোক্র্যাসি, তাঁর কেবিনেট কলিগগণ, যাঁদেরকে নিয়ে তিনি সংসার করছেন, যাঁদেরকে নিয়ে তিনি এগুলো বাস্তবায়ন করার কথা চিন্তা করছেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত কিনা, তাঁরা তাঁর সঙ্গে co-operate করছে কিনা আমার তাতে সন্দেহ আছে।

সরকারের peformance যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব ADP performance has been very poor। ১৩৭টি প্রকল্পে কোন খরচই হয়নি। সরকারী খাতে বিনিয়োগ কমেছে। এমনকি সংশোধিত বাজেট যদি দেখেন, ৮,৬৫০ কোটি টাকা রেখেছিলেন, utilise করতে পেরেছেন ৮,১২১ কোটি টাকা। এটা আপনাদের কথা, it is one of the complaints of the donors who are giving money to us।

Investment in private sector। Public Sector-এ investment-এর একটা খতিয়ান তিনি দিয়েছেন। আমাদের দেশের পরিকল্পনা পদ্ধতি আমি তুলে দিতে বলেছিলাম। কারণ এই জাতীয় প্ল্যানটা করতে হয় যেহেতু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে যেতে হয়, আই এম এফ-এ যেতে হয়, এইড ক্লাবে যেতে হয়, এসবের জন্য একটা bankable document-এর দরকার হয় বলে। বাজেটও অনেকটা তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে এটা হল public expenditure programme। It has nothing to do with the people as such। ট্রাজেডি হল, এত সাফল্যের কথা বলেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের কী হল? বিনিয়োগ বাড়ে নি কেন? তার কারণ হল you are tightening the belt too much। আমাদের সময়ে আমরা খরচ করেছি। অনেক সময় বেশি খরচ করেছি। You wanted to tighten the belt। But you have tightened it so hard that economy-র রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন। বেল্ট টাইট করতে গিয়ে macro level-এ কিছু achieve করেছেন। যখন দাতারা ব্যালেন্স শীট দেখে তখন তারা খুশি হয়। একটা ব্যালেন্স শীট তৈরি করেছেন, excellent balance sheet। Any donor will be impressed। কিন্তু দাতাগোষ্ঠীরা তো জানে না আমাদের দেশের গ্রামের মানুষের কী অবস্থা। কাগজের হিসাব দেখে তারা আপনাকে খুব appreciate করেছে। আসলে আমাদের অর্থনীতিটাই আজকে অসাড় হয়ে গেছে। এই ট্র্যাপ থেকে বের হওয়ার উপায় নেই। একটি উপায় শুধু আছে নিজেদের আরও বেশি উৎপাদন করা, সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং বিনিয়োগ বাড়ানো। আপনাদের পক্ষে তো জনগণের ম্যান্ডেট ছিল। কিন্তু আজকে you have surrendered this mandate to the

www.pathagar.com

wishes and conditions of the donor agencies, disregarding our national interest. This is what you have done. But I do not blame you for that. I have all the respect for you.

Interest rate আপনি বোধ করি পাঁচ বা ছয় বার কমিয়েছেন। আরও কমাবেন। আপনাকে কমাতে হবে। কারণ আপনি দেখছেন যে বিনিয়োগ হচ্ছে না। কিছু টাকা withdrawal হয়েছে, কিন্তু সেই টাকা শিল্পে বিনিয়োগ হয় নি। এই টাকা দিয়ে ওরা বাংলাদেশ ব্যাংকে বন্ড কিনছে। কিন্তু তারপরও, interest rate আর কমালেও, rate 2% করলেও আপনার টাকা ব্যাংক থেকে কেউ নেবে না। Because, crisis of confidence। You are not able to restore the confidence of the people। যারা entrepreneurs তারা এখনও বুঝতে পারছে না যে তারা invest করে রিটার্নটা পাবে কিনা। And there is a crisis of management, ব্যবস্থাপনার সঙ্কট রয়েছে এই সরকারে। I have all the respect for your good intentions এবং আমি এটাও মনে করি যে, আপনি একজন দেশপ্রেমিক। কিন্তু এই crisis of management-এর জন্য and non-co-ordination within the government-এর জন্য আজকে এর সুফল জনগণ পায় নি। আপনার business investors, আপনার Cabinet colleagues মিস্ট্রাস্টে ভুগছে। যার কারণে এত বড় একটা জনগণের ম্যান্ডেট পাওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য যে অবস্থা দেশের মানুষ আশা করেছিল সেটা পায় নি।

এই বাজেটের কারণে দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব আরও বাড়বে। দারিদ্র্য আরও গভীর হবে, গরিব আরও গরিব হবে। সাধারণ মানুষ, যারা প্রান্তিক কৃষক এবং গরিব, তারা আরও নিঃস্ব হবে। মানুষ আরও ভূমিহীন হবে, আরও গৃহহীন হবে। উৎপাদন ক্ষমতা তারা হারাবে। এই বাজেটে তাদের জন্য কোন দিক নির্দেশনা নেই। আমরা এক বছরের জন্য আসি নি, এখানে বাংলাদেশকে আগামী ২০১০ সাল বা ২০২০ সালে কী রকম দেখতে চাই, এই ভিশন এই বাজেটে দেখতে চেয়েছিলাম। জাতি গঠনের কোন long-term নির্দেশনা নেই। একটা বাৎসরিক অংকের হিসাব আছে, খুব সুন্দর হিসাব। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের জন্য, ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনার কোন পথ নির্দেশনা নেই। সদিচ্ছা আছে অনেক, কিছু আশা, কিছু শ্লোগান আছে, কিন্তু বাস্তবায়নের কোন action programme নেই।

মাননীয় স্পীকার, কত বছর আমরা আর এই ধরনের বাজেট আনব? আমি অতীতের সকল বাজেটের কথাই বলছি এবং বর্তমান বাজেটের কথা বলছি। আমরা জানতে চাই যে, গত বছরের বাজেট দেওয়ার সময় আপনারা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলো কতটা বাস্তবায়ন করেছেন? যে সব বাস্তবায়ন করতে পারেন নি সেগুলো কেন পারেন নি, সেটা জাতি জানতে চায়। টার্গেট ওরিয়েন্টেড একশন প্রোগ্রাম আজকের বাজেটের মধ্যে অনুপস্থিত। গতানুগতিক ছকে বাঁধা কিছু বরাদ্দের হিসাব আছে। জনগণ এটাতে আগ্রহী নন। সাধারণ কৃষক দেখতে চায় যে, তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য সে পাচ্ছে কিনা।

মাননীয় স্পীকার, শিক্ষার ব্যাপারে আমি বলতে চাই, বদরুদ্দোজা চৌধুরী সাহেব যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে ৮০ লক্ষ বেকার যুবক আছে আমাদের দেশে। তারা কী চায়? তারা একটা চাকুরি চায়, তারা কেউ ভিক্ষা করতে চায় না। Every man wants an honourable and dignified life। আজকে একজন যুবক যা চায় সেই আশা আপনি মিটাতে পেরেছেন কিনা এটাই লোকে দেখবে। গৃহবধূরা দেখবে যে, তাদের জিনিসপত্রের দাম কমলো কিনা বা অন্তত যেন না বাড়ে এটুকুই তাদের প্রত্যাশা। মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মানুষের কাছে সন্দেহ জেগেছে যে, আপনি এই দেশে শিল্প চান কিনা। যদি না চান, আপনি বলে দিন যে, আমাদের দেশে শিল্পের কোন প্রয়োজন নেই। export করে অর্থ উপার্জন করে আমরা আমাদের যা প্রয়োজনীয় জিনিস সেগুলো import করতে চাই। আমাদের দেশের consumer items পর্যন্ত আমরা বিদেশ থেকে আমদানী করে আমাদের দেশের মানুষকে দিতে চাই। ভাল কথা, কিন্তু কাঁচামাল export করে তো সেই অর্থ উপার্জন করা যাবে না, রপ্তানী বাড়াতে হলে শিল্প ও কলকারখানা লাগবে।

www.pathagar.com

অনেক দেশ আছে যে দেশে industrial base established হয়নি, যেমন হংকং। তাদের সেটা দরকারও নেই। Honkong is not a manufacturing country। Honkong নিজেকে service industry-তে পরিণত করেছে। আজকে বিরাট একটা অর্থনীতি গড়ে তুলেছে। কিন্তু আপনি শিল্পের কথা বলবেন, অথচ শিল্পের ভিত্তি রচনা করার জন্য যে মৌলিক উপাদানগুলো প্রয়োজন তা আপনি provide করবেন না, এভাবে শিল্প হবে না। এই বাজেটকে সেজন্য আমি শিল্প-বিমুখ এবং বিনিয়োগ-বিমুখ একটি বাজেট বলে আখ্যায়িত করতে চাই।

আজকে যাঁরা শিল্পে নিয়োজিত আছেন, যাঁরা বিনিয়োগকারী, যাঁরা উদ্যোক্তা, তাঁদের কয়েকজনকে আপনাদের সারিতে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি। Search your soil and say whether I am right or not। যদি সত্য কথা বলতে পারেন তাহলে আপনাদের উত্তর হবে, yes, what you are saying is right। শুধু বাজেট বা কেতাবের মাধ্যমে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা সম্ভবপর নয়। পরিবেশ, সুযোগ আর আস্থা সৃষ্টি করাটাই হল সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে এ সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। দেশের দরিদ্র অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে, কোটি কোটি বেকার যুবককে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উৎপাদন খাতে নিয়োজিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করাটাই হল সাফল্যের মাপকাঠি। সে ব্যাপারে এ বাজেটে কোন প্রকারের প্রয়াস পর্যন্ত নেই। আমাদের দেশের অগণিত মানুষের যে মেধা, প্রতিভা, শক্তি, উৎসাহ, উদ্দীপনা আছে তা আজকে আমরা কাজে লাগাবার কোন পরিবেশ, কোন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারিনি। and that is the challenge before us। I am not only addressing the Finance Minister। I am addressing ourselves। আমাদের সবাইকে address করছি। এটাই হল আমাদের সকলের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। আজকে দেশে economic ভিত্তি করবেন? কিসের মাধ্যমে করবেন? বড় বড় কিতাবের মাধ্যমে! দুনিয়ার কোন দেশ আনতে পেরেছে কি? সাউথ কোরিয়া কি কেতাবের মাধ্যমে এনেছে? Four Asian tigers, হংকং, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর–তারা তাদের উন্নয়ন কি এই ধরনের কিতাবের মাধ্যম এনেছে? এখনও যারা NIC, Newly Industrialised Countries, অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন–তারা কীভাবে পারে? ইন্দোনেশিয়ায় ১৮ কোটি মানুষ। আমাদের মত মুসলিম। তারা অত্যন্ত অনুন্নত ছিল। আজকে ৭.৫% growth rate তাদের। How did they do it? Why can't we do it? আজকে ইন্দোনেশিয়ার growth rate হল ৭.৫%, ফিলিপাইনের ৬%, চায়নার ১১.৫% growth rate, highest growth rate in this world today, তারা socialist economy-র মধ্যে market economy চালু করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে।

আমার কথা হল, মাননীয় স্পীকার, এই break-through আনতে হলে আলাপ আলোচনায় হবে না। এই যে investment-এর ratio, ইন্ডিয়াতে সেভিংস rate হল almost ৩০%, পাকিস্তানে ২৪%, ইন্ডিয়াতে ২২% হল GDP-র investment ratio, পাকিস্তানে ২০%, নেপালের মত দেশের ১৯%। It is a small country, ভুটান তো আরও ছোট, কিন্তু সেখানে ৩৬%। আমাদের দেশে মাত্র ১৬%।

মাননীয় স্পীকার industrial base ছাড়া technology ছাড়া, দেশের মানুষের অর্থনৈতিক যে স্বনির্ভরতার কথা বলছেন, এটা অর্জন করা কখনই সম্ভব হবে না। সুতরাং, industrial base তৈরি করতে হবে। আজকে কৃষিতে আমরা যতই self-sufficient হই না কেন, this is not going to change the quality of our life. Agriculture as such does never change the quality of life. It may give us food. Basic necessity meet করতে পারে। কিন্তু আজকে agriculture-এ কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। There is no scope। ১%ও হবে কিনা সন্দেহ আছে। There is no scope for employment in agriculture।

সুতরাং, দেশের শিল্পের কোন প্রয়োজন নেই এটা ভুল নীতি হবে। চার হাজার কারখানা বন্ধ হয়েছে এই সরকারের আমলে। স্কপ দাবি করে পাঁচ হাজার কারখানা বন্ধ হয়েছে, ১৫০০ কারখানা রুগ্ন হয়েছে। ১০০ কোটি টাকা রেখেছিলেন বাজেটে, কিন্তু এক পয়সাও দেন নি। পয়সা বাঁচিয়েছেন

www.pathagar.com

এবং বলেছেন রাজস্ব উদ্বৃত্ত হয়েছে। পয়সা খরচ না করে সেই টাকা আপনারা ব্যাংকে রেখে দিয়েছেন। সুতরাং ম্যাক্রো লেভেলের এই সাফল্যগুলোকে সাফল্য বলা যাবে না। তার কারণ এগুলোর সঠিক প্রতিফলন সার্বিক অর্থনীতিতে ঘটে নি। সেই জন্যই শিল্পের প্রতি চরম অবহেলা আজকে আপনারা দেখাচ্ছেন। আমদানী ও সাহায্য-নির্ভর একটি ভিখারী জাতি হিসাবে নিজেদেরকে বন্ধক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকে সারা দুনিয়াতে আমেরিকা, জাপান থেকে কোরিয়া, থাইল্যান্ড পর্যন্ত সর্বত্রই টেক্সটাইল হচ্ছে শিল্প সেক্টরের ভিত্তি। আমাদের দেশেও এর বিরাট সম্ভাবনা ছিল। শত শত বছর ধরে আমাদের এদেশে হ্যান্ডলুম ডেভেলপ করেছে। আমাদের দক্ষ শ্রমিক আছে। আমাদের ম্যানেজারিয়াল ওয়ার্কফোর্স আছে টেক্সটাইলে। কিন্তু আমরা আজকে একটা ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছি। আমি শুধু একটি ছোট সমীক্ষা দিতে চাই। আমি মনে করি যে, টেক্সটাইল সেক্টর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর দেশের উন্নয়নের জন্য। আজকে ৫,১৪,০০০ হ্যান্ডলুমে চাকুরিজীবী আছে ১২ লক্ষ গ্রামীণ মানুষ, কিন্তু ২ লক্ষ ৬০ হাজার হ্যান্ডলুম বন্ধ হয়ে গেছে। ৮ লক্ষ হ্যান্ডলুম উইভারস চাকুরিচ্যুত হয়েছে। ৩০ হাজার স্পেশিয়ালাইজড এবং পাওয়ার লুম আছে আমাদের দেশে। ৬০% of these are idle, দুই লক্ষ উইভারস আজকে বেকার আছে। ২১০টি ডাইং ইউনিট আছে আমাদের দেশে। তার ৫০% বন্ধ হয়ে গেছে। আরও দেড় লক্ষ মানুষ বেকার হয়েছে এই কারণে।

মাননীয় স্পীকার, বিদেশী ফেব্রিকস্-এ বাংলাদেশের বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। কী করে দেশে ফেব্রিকস তৈরি হবে? গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করা হচ্ছে ২০-২২% মূল্য সংযোজন দিয়ে। বলা হয়েছে যে, সাত হাজার কোটি টাকার গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করা হয়েছে। আসলে তা করা হয় নি। আপনি যদি backward linkage করতে না পারেন তাহলে how will you gain your strength in the export? Seven thousand looms belonging to large textile mills under public and private sectors আজকে বন্ধ আছে। আমি যে পরিসংখ্যানগুলো দিচ্ছি এটা আমি আপনাকে দিয়ে দেব ভেরিফাই করার জন্য whether I am correct or wrong। এত হাই ডিউটি, ভ্যাট, ট্যারিফ ভ্যালু ইত্যাদি বসিয়ে আজকে স্মাগলারদের স্বর্গ তৈরি করে দিয়েছেন বাংলাদেশে। যার ফলে আজকে ইন্টারন্যাশনাল price-এর তুলনায় আমাদের দেশে উৎপাদিত ফেব্রিক ৭০-৮০% দাম বেশি দিয়ে আমাদের কৃষকরা, সাধারণ মানুষরা কিনছে। যে লুঙ্গী ৬০ টাকায় কেনা যেত সেই লুঙ্গী আমাদের বস্ত্র-মন্ত্রী কালকে বলেছেন ২৩৫ টাকায় তাঁর স্ত্রী তাঁকে কিনে দিয়েছেন। এটা হলো ট্রাজেডি। এইখানেই আমাদের পলিসি থ্রাস্ট-এর প্রশ্ন। ১০০১টি কাজ কোন সরকার করতে পারবে না, তাই সিলেক্ট করতে হবে। সিলেকটিভ ওয়েতে যেতে হবে–কোন্ সেক্টরকে থ্রাস্ট সেক্টর করবেন। You will have to be whole-hearted, not half-hearted। হাফ হার্টেডে গেলে কিছু করা সম্ভব হবে না। সেই জন্যে ১৫ হাজার কোটি টাকা নিয়োজিত আছে বস্ত্র সেক্টরে। আমি এ্যাডভাইস করব, এটা আমার অনুরোধ থাকবে যে, এটা পুনর্বিবেচনা করবেন। কটন এবং ইয়ার্ন-এর উপর থেকে সমস্ত ডিউটি তুলে দিন। Because your manufacturing units, your manufacturing items will have to be cheaper. Otherwise আপনি কখনো স্মাগলিং থেকে এবং বিদেশী liberal import থেকে আপনার দেশের পণ্য সামগ্রীকে বাঁচাতে পারবেন না। এই কথাগুলো এজন্য বললাম যে, আজকে এগুলো remove করুন এবং backward linking establish করুন। Garments industry is a very potential industry for us। আমরা চেষ্টা করেছি, আমরাও পারিনি, আপনারা করুন। এব্যাপারে আপনাদেরকে আমরা সহযোগিতা করব, সমর্থন দেব। আমরা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে তখন ৩০০ কোটি টাকা পেতাম, যখন জাতীয় পার্টি সরকারে আসে। যখন বিদায় নিয়েছে, তখন ছয় হাজার কোটি টাকার রপ্তানী করেছে। এই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে যদি কারো একক কোন contribution থাকে, সেটা হলো জাতীয় পার্টি সরকারের।

মাননীয় স্পীকার, আজকে industrial base তৈরি করতে হবে light engineering industry-র উপর ভিত্তি করে। শিল্পমন্ত্রীর কাছ থেকে আজকে ধোলাইখাল concept-এর কথা

www.pathagar.com

শুনি না। এটা তো কারো পৈত্রিক কিছু নয়, light engineering-এ basic skilled labour তৈরি হয়। বিদেশীরা যখন আসে, export করতে চায়, ইন্ডাস্ট্রি করতে চায়, skilled labour পায় না। কী করে আসবে? এটা small industry থেকে আসবে, cottage industry থেকে আসবে এবং consumer-based item-এর যে সব ইন্ডাস্ট্রি দেশে আছে সেগুলো থেকে আসবে। এই ইন্ডাস্ট্রি যদি না হয়, আপনি কী করে বিদেশী বিনিয়োগ expect করেন, যেখানে skilled labour পাওয়া একেবারেই মুস্কিল হবে অথবা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। আজকে এসব কারণে সুজন-এর কথা কেউ বলে না, মিশুক-এর কথা কেউ বলে না। কারণ এগুলো তো আমাদের দেশে তৈরি করা সম্ভবপর। কেন করবেন না? You have the infrustructure, কেন মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি রয়েছে না? এসব idle big factory যেগুলো আছে, ডিজেল প্লান্ট-যাদের আমরা white elephants বলি, কেন তারা এগুলো করতে পারবে না? কিন্তু আজকে এই emphasis টা নেই। একটা industrial base তৈরি করার জন্য commitment-এর অভাব আজকে পরিলক্ষিত হয়েছে। এটা শুধু আমার কথা নয়, এটা সর্বস্তরের মানুষের কথা। আজকে জুট সেক্টর। Jute has a tremendous potential, a bright future। তার দুটি কারণ, একটা হলো whole world is abandoning synthetics, আর একটা হলো আমাদের যারা মূল প্রতিদ্বন্দ্বী-ভারত-তারাই তাদের Jute-এর consumer। তাদের দেশে আভ্যন্তরীণ demand এত বেড়েছে যে, আস্তে আস্তে তাদেরকে রপ্তানী কমিয়ে দিতে হবে। কমাতেই হবে এবং এ দুটি কারণে আমরা আমাদের জুটকে আরো বেশি গতিশীল করতে পারি। অবশ্য জুট সেক্টরে আমাদের অনেক সমস্যা আছে। তারপরও পাটের উৎপাদন, পাটের রপ্তানী এবং পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানীর অনেক future আমাদের দেশের আছে।

এর সাথে তিন কোটি মানুষ জড়িত আছে। Jute is available here। আমরা সব সময় বলি যে, নিজেদের দেশে যে raw materials আছে তার উপর ভিত্তি করে শিল্প করতে হবে। আজকে সেখানেও আমরা পিছিয়ে পড়ছি বলে মনে করি। আজকে এক্সপোর্টের কথা আপনারা বলেছেন। কিন্তু কোন thurst নেই, যে thurst থাকা দরকার। Already we have missed one bus। আমেরিকা যখন GSP তুলে দিল তখন we missed a bus। অনেক foreign investors wanted to relocate their industries in Bangladesh to produce and export to maintain their market in America। কিন্তু আমরা সেই সুযোগ নিতে পারি নি। Now another bus is still there ই.ই.সি-তে এখনো restriction impose করে নি, এখনো কোটা দেয় নি। কিন্তু খুব শীঘ্রই দেবে। স্পেন, পর্তুগাল, গ্রীস এসব দেশ ই.ই.সি-র উপরে already প্রেসার দিচ্ছে যে, তারা থাকতে বাংলাদেশ বা অন্যান্য দেশ থেকে কেন অবাধে পোশাক আসবে? সুতরাং, আজকে এই যে, four hundred and one million people-এর মার্কেট, the largest market in the world today is European market। এই মার্কেটে এখনো আমাদের পণ্য রপ্তানী করার freedom আছে without any restriction। প্রত্যেক বছরে ১৫% রপ্তানী বাড়া যথেষ্ট নয়।

আজকে export-এর জন্য যে একটা national thurst-এর দরকার, it is missing। ফাইন্যান্স মিনিস্টার, আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, export-এর জন্য আপনি কতবার নিজে বসেছেন, সেটা আমি জানতে চাই। প্রধানমন্ত্রী কতবার বসেছেন, সেটা আমি জানতে চাই। আমি এই জন্য বলছি যে, আজকে আমাদের দেশের উপর অনেক রকমের restriction, সাবসিডি তুলে নাও, এই করতে পারবে না, সেই করতে পারবে না-এই ধরনের comments ইতিমধ্যেই অনেকে করেছে। আজকে দেখুন, এই যে GAT, যারা উন্নত দেশ, তারা কী অন্যায় অবিচার আমাদের উপর করছে তার একটা নমুনা আমি আপনাকে দিচ্ছি। আজকে নন ট্যারিফ barrier দিয়ে যাকে এন টি বি বলে, তারা সমস্ত export, অনুন্নত দেশের export restrict দিচ্ছে।

আজকে তারা কোটা সিস্টেম করে দিয়েছে, কোন্ দেশ কতটুকু export করবে। অমুক দেশ অত দিতে পারবে। Free market economy-র কথা তারা বলে গার্মেন্টস্ এবং টেক্সটাইলের

www.pathagar.com

উপর নতুন নতুন কন্ডিশন তারা আরোপ করছে। Standardisation, মানে তারা ঠিক করবে standard ঠিক হয়েছে কি না। তারা যে ইমপোর্ট করছে সেটা তাদের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হয়েছে কি না–এটা তারা বিবেচনা করবে। তারপর তো other administrative ব্যাপার আছে। এর ফলে আমরা বৈষম্যের শিকার হয়েছি। আজকে গার্মেন্টসে সম্ভবত আমরা ১.৬ বিলিয়ন ডলার তাদের কাছ থেকে আয় করতে পারছি। অথচ গার্মেন্টস-এ আমরা ৫ বিলিয়ন ডলার অর্জন করতে পারতাম যদি কোটা না থাকত। আমাদের ফরেন এইডের দরকার নেই। আমরা গিয়ে বলতে পারি, তোমাদের এইডের আমার দরকার নেই। তুমি আমার কোটা সিস্টেমটা তুলে নাও। Let us compete in your market. Let Bangladesh compete the market in America। তুমি আমাকে দেড়শ, দুইশ ডলার যাই দাও, সেটা আমি চাই না, তুমি আমার উপর থেকে কোটা তুলে নাও।

মাননীয় স্পীকার, এন টি বি reduce করতে বলেন ইইসিকে। Only 20 percent যদি reduce করে তাহলে ইইসি দেশ থেকে কোন এইড নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। আজকে সেইজন্য আমাদেরকে দোষারোপ করে বলেন, আমরা কেন করতে পারি নি। ঠিক আছে, আমরা করতে পারি নি, আপনারা করেন। আমরা চাই যে, আপনারা করেন। You claim to have been elected by people। আপনি যেভাবে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, আমিও সেইভাবে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। বরং আপনার সুযোগ অনেক বেশি ছিল। আপনারা মাঠে ময়দানে যেতে পেরেছেন। আমি জেলখানায় ছিলাম। আপনারা টেলিভিশনে, খবরের কাগজে কাভারেজ পেয়েছেন, ভোটারদের কাছে যেতে পেরেছেন। আমিতো পারিনি, কিন্তু তারপরও দেশের মানুষ ভোট দিয়েছে। সুতরাং আমাদের হেয় প্রতিপন্ন করাটা ঠিক হবে না। আমি যেমন আপনাদের respect করি, আপনাদেরকেও আমাকে সেইভাবে respect করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, সেই জন্য আজকে মনে হয় leadership commitment to growth is lacking. Growth-এর জন্য যে একটা ন্যাশনাল কমিটমেন্ট থাকা দরকার, হয়ত সাইফুর রহমান সাহেবের আছে, বা হয়ত প্রধানমন্ত্রীরও আছে, কিন্তু দেখা গেল যে, বাকি কারও নেই। তাহলে growth achieve করা possible হবে না। অন্যান্য দেশে তারা নিজেদের এক করে ফেলেছে। Government, business community, politicians, opposition–সব এক হয়ে গেছে। আর আমাদের এখানে একটা দরখাস্ত করলে, এক মিনিস্ট্রি থেকে আর এক মিনিস্ট্রিতে যায় একটা নখতা লাগিয়ে, একটা অবজেকশন দিয়ে, অগ্রগতি বন্ধ করে দেয়। এইভাবে তো উন্নতি হবে না। So, this is what was expected of a government elected by people, যেটা achieve করতে আপনারা সক্ষম হন নি। ফরেন ইনভেস্টমেন্ট চান। যেখানে দেশের মানুষ ইনভেস্ট করে না, সেখানে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আসবে? এটা তো আশা করা ঠিক নয়। আগে দেশের মানুষের আস্থা অর্জন করুন। দেশের বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করলে foreign investment এমনিতেই আসবে।

আজকে কেউ যদি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তারা হলো বাংলাদেশের কৃষক সমাজ। যখন ফসল নষ্ট হয় তখন সরকারের খুব চিন্তা। অর্থমন্ত্রীকে তখন ADP কর্তন করে নগদ টাকা দিয়ে বিদেশ থেকে চাল আমদানী করতে হয়। কিন্তু যখন bumper crop হয় তখন সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন যে চালের দাম তো কমেছে। সুতরাং, দেশের মানুষ তো খুব খুশি। তখন আর কৃষকদের পণ্যের নায্য মূল্যের কথা তারা ভুলে যান। কিন্তু আজকে stagnation-এর অন্যতম কারণ হলো যে, মানুষের purchasing capacity কমে গেছে। কৃষকদের হাতে টাকা নেই। এই জিনিসটা আমাদেরকে accept করতে হবে। There is no demand in the market। Demandটা আসতো যদি ৮০ শতাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সামান্য একটুও বাড়ত। Every time there has been a bumper crop, our farmers are the sufferers। এই ব্যাপারে আমি recommend করব, একটা Price Commission করুন, যাতে করে কৃষককে নায্য মূল্য দেওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। শুধু ফসল উৎপাদন করার পরে নয়, ফসল উৎপাদন করার আগেই যাতে কৃষক জানতে পারে what will be the price of their product।

www.pathagar.com

আজকে তাই আপনি এই Price Commission করুন। আপনি গরিব মানুষের ভর্তুকি কেটে নিয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করেছেন। আমি মনে করি, this is a wrong approach। এই wrong approach টা revise করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, budget is a political document and particularly in a poor country like ours. It is not a mere budget। আজকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য যে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, তার প্রতিফলন আপনার বাজেটে ঘটেনি। So, it has to be looked into politically also। আজকে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, employment generate করা, এগুলো সবই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত। একজন রাজনীতিক হিসাবে আমাকে যদি আজ জিজ্ঞাসা করেন what is the first priority of your country today? আমি বলব কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। যদি second priority-র কথা বলেন সেখানেও বলব কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা আর একই কথা বলব third priority-র কথা বললে। কিন্তু তার কোন প্রতিফলন নেই। কত লক্ষ মানুষ শুধু বস্ত্র sector-এ চাকুরি হারিয়েছে তার একটি খতিয়ান মাত্র দিয়েছি। অন্যান্য সেক্টরের কথা নাইবা বললাম। তাই কর্মসংস্থানের জন্য নয়, কর্মচ্যুতি ঘটানোর জন্যই এ সরকার এসেছে। আপনি চাকুরি নিয়ে নিন, কিন্তু অন্য চাকুরির ব্যবস্থা না করে আপনি কর্মচ্যুতি ঘটিয়ে যাবেন, this is a wrong policy। বলা হয় বাংলাদেশের শ্রমিকদের আজকে productivity ৪৪% কমে গেছে। কিন্তু কেন? আপনার education sector-এর অবস্থা কী? আমি জানি শিক্ষা মন্ত্রী বলবেন খুব ভাল অবস্থা। আমরা সকলেই জানি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কী অবস্থা, বদরুদ্দোজা সাহেব তো চলেই গেলেন ঐ মন্ত্রণালয় থেকে এই দুরবস্থার কারণে।

মাননীয় স্পীকার, আজকে বার্মার মত দেশে ৮৫% literacy, থাইল্যান্ড ৯৮% achieve করেছে। কোরিয়া ১০০% achieve করেছে। আজকে ইন্দোনেশিয়ার মত দেশে, আমাদের মত মুসলমান দেশ, তাদের ৮৮% literacy rate। আমাদের rate 44%-এর নিচে। Productivity-র সঙ্গে আরও জড়িত labour management relationship এবং মজুরির প্রশ্ন। এই wages-এর প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। It is a moral issue। I will say আমরা নিজেরা নিজেদের বেতন বাড়িয়েছি, সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়েছি, রাষ্ট্রপতির বেতন বাড়িয়েছি, মন্ত্রীদের বেতন বাড়িয়েছি, প্রধানমন্ত্রীর বেতন বাড়িয়েছি। কী কারণে বাড়িয়েছি? আমরা কি কেউ উৎপাদন খাতে কাজ করি? কাজ করি না। তারপরেও বাড়িয়েছি। কেন বাড়িয়েছি, কারণ জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। এই একটা moral plane-এ I will argue যে, আপনারা Wage Commission-এর সুপারিশ accept করুন। Negotiate করে minimum wage accept করে নিন এবং শ্রমিকদেরকে বাঁচান। শ্রমিকদের কারণে বিনিয়োগ হচ্ছে না বলে বলা হয়। এটা depend করে management এবং labour-এর উপরে। যেখানে ভাল management সেখানে কোন labour problem দেখি না। এটা আমার experience এর কথা বলছি। Management যদি ভাল না হয়, labour-এর problem সেখানে বেশি হয়। এই যে labour unrest বা labour problem, সেটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের দেশে এখনো ভাল আইন আছে এই উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের তুলনায়। আমাদের কিছু improvement এখানে সেখানে দরকার। এই বিষয়টিকে যদি আপনারা দলীয়ভাবে না নিয়ে জাতীয়ভাবে নিয়ে এটাকে institutionalise করতে পারেন, তাহলে শ্রমিক-মালিক সকলেই খুশি হবে।

মাননীয় স্পীকার, তাঁরা যখনই বক্তৃতা দিতে যান তখনই বলেন, জাতীয় পার্টির সরকারের আমলে কোন উন্নয়ন হয় নি, এই কথাটি সব সময় বলা হয়। আমি একটি ছোট্ট সমীক্ষা তুলে ধরতে চাই। ১৯৮১-৮২ সালের অর্থবছরে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার ০.০৯% নেমে গিয়েছিল। আমরা যে বছর সরকার ছাড়ি ১৯৯০ সালে সেখানে ৫.৮৮% প্রবৃদ্ধির হার ছিল। এই বার তাঁরা ৫% expect করছেন। এখনো ৫.৮৮% reach করতে পারেন নি। তারপরও ৫% expect করছেন চাল বেশি উৎপাদন হয়েছে সেই জন্যে, কৃষকরা খেটেছে সেই জন্যে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬৫০ মেগাওয়াট ছিল ৮০-৮১তে, ১৯৯০ সালে ২২শ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন ছিল ১ কোটি ৪২

www.pathagar.com

লক্ষ টন, আমরা করেছি ৯০ সালে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.০৯% ছিল সেটাকে কমিয়ে ২.০১%-এ আনা হয়েছিল এবং রপ্তানী আয় ১,২৫৫ কোটি টাকা ছিল, সেটাকে বাড়িয়ে ৪,৯৫০ কোটি টাকা করেছিলাম। দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর হার ৭৩.০৮% ছিল পল্লী অঞ্চলে আর ৬৬% ছিল শহরাঞ্চলে। আমরা সেটাকে কমিয়ে পল্লী অঞ্চলে ৫৫% এবং শহরাঞ্চলে ৪২%-এ নামিয়ে এনেছিলাম। এগুলো আপনাদের কেতাব থেকে নেওয়া হয়েছে, সময় থাকলে আমি সবই দেখাতে পারতাম।

মাননীয় স্পীকার, কুমারখালী সেতু, শম্ভুগঞ্জ সেতু, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, district collectorates all over the country, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়–এগুলো জাতীয় পার্টির সরকারের আমলের। এই ক্রেডিট যদি শিক্ষামন্ত্রী নিতে চান, নিতে পারেন। নতুন সার্কিট হাউসসমূহ উদ্বোধন করে বেরিয়ে এসে বক্তৃতায় বলেছেন জাতীয় পার্টির সরকারের আমলে কোন উন্নতি হয় নি। শম্ভুগঞ্জের সেতু উদ্বোধন করে সেতুটি পেরিয়ে গিয়ে অপর পারে জনসভা করে বলেছেন যে, জাতীয় পার্টির আমলে কোন উন্নয়ন হয় নি। এগুলো তো ঠিক নয়, this is not correct। ঢাকার যে বিজয় সরনি সড়ক দিয়ে রোজ রোজ পতাকা উড়িয়ে আসছেন, এই বিজয় সরনি কারা করেছে? এই রোকেয়া সরনি কারা করেছে? সায়দাবাদের বিশ্বরোড কারা করেছে? আজকে আমি যদি হিসাব দেই তা শেষ করা যাবে না। এই সব প্রশ্ন আপনাদের নিজেদের জিজ্ঞাসা করা উচিত। তাহলে আপনারাই উত্তর পাবেন। সুতরাং এই কথাটা বলা উচিত নয় যে, বিগত সরকারের আমলে কোন উন্নতি হয় নি। সব সরকারের আমলে উন্নতি হয়েছে। নির্বাচিত হলেই সরকার বা প্রশাসন সবসময় গণতান্ত্রিক হয় না। গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের নমুনা বাংলাদেশে আমরা দেখেছি, ভারতে দেখেছি, পাকিস্তানে দেখেছি এবং সেটা যেন আর না হয় এই অনুরোধ জানাই। জাপার উপরে অত্যাচার করছেন, নির্যাতন করছেন, মাননীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীবলেছেন, "মৃদু লাঠিচার্জ নয়, এবার খুব শক্ত লাঠিচার্জ করা হবে।" মাননীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীকে বলতে চাই, অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে আপনাকে বলতে চাই, আপনি হলেন দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তা। কিন্তু আপনার মুখ থেকে যখন এই কথা বের হয়, আপনার সরকারের ভাবমূর্তি তাতে বাড়ে না। এটুকু জেনে রাখুন। আর আজকে মন্ত্রী আছেন কালকে যে মন্ত্রী থাকবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তখন বিষয়টি নিয়ে regret করবেন যে, কেন হাউসে এই ধরনের কথা বলেছিলাম।

[বাধা প্রধান]

Why not? যদি আমি এই কথা বলে থাকি, এই ধরনের কোন কথা বলে থাকি তাহলে অবশ্যই I may regret one day।

মাননীয় স্পীকার, মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে আজকে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী৩ জন মহিলাকে জেলখানায় রেখেছেন। তাদেরকে কোর্ট থেকে জামিন দিয়েছে, আপনি ডিটেনশন অর্ডার দিয়েছেন। তিন মাসের কোলের বাচ্চা জেলখানায় আছে মায়ের সঙ্গে। ঐ শিশুটি তো কোন দোষ করে নি। আপনি যদিও একজন bachelor, কিন্তু আমি জানি, মানবিক কারণে অন্তত আপনার হয়ত বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হবে না...

[বাধা প্রধান]

মাননীয় স্পীকার, আজকে বেগম রওশন এরশাদের জামিনের আবেদন করছিলাম হাইকোর্টে, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল কোর্টে দাঁড়িয়ে আপত্তি তুলে বললেন যে, "না না তিনি বৃদ্ধা নন, she is a young lady"। কিন্তু এটর্নী জেনারেল একজন bachelor, সেইজন্য কোর্টকে বললাম, তাঁর কোন experience নেই, how could he determine whether that woman is young or old। আজকে নির্যাতনে জাতীয় পার্টির নেতা জনাব লতিফ মুন্সীর হাত ভেঙে গেছে–জেল authority recommend করে পাঠিয়েছে, ডাক্তাররা recommend করেছেন, কোর্টের অর্ডার আছে তাকে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সারা রাত যন্ত্রণায় কেঁদেছে, হাতে পুঁজ জমে গেছে। দয়া-মায়া বলে কি কিছুই নেই? তাকে জামিনে মুক্তি দিলে I can asure you বিএনপি সরকারের পতন ঘটবে না, তাকে পঙ্গু হাসপাতালে যেতে দিন অন্তত। আবার বলছি প্রতিহিংসার রাজনীতি বর্জন করুন।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আমাদের ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৫, ১৯৮২ এবং ১৯৯০ সালের কথা ভুলে যেতে হবে। আমাদের আশেপাশের দেশগুলো, যেগুলোর কথা উল্লেখ করেছি—থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনাম। তাদের দিকে দেখুন। ভিয়েতনামে যে পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে তার দশ ভাগের এক ভাগও বাংলাদেশে হচ্ছে না। আজকে আমাদের goal একটিই যে, আমরা দেশের মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবো, দেশের মানুষের আয় বাড়াব, economic growth আনব, এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ২০১০ সালকে টার্গেট করুন। ১৯৭১ সালকে টার্গেট করে কোন লাভ হবে না। আজকে ২০১০ সালের জন্য আমরা সকলে মিলে কাজ করি তাহলেই দেখব যে, আমাদের বাংলাদেশের জন্ম সার্থক হয়েছে। Stability বলতে যেটা বুঝায় not only to have continuation of a government but more a continuation of the policy frame-work, continuation of the institutions. No government is a permanent government. But economic policy framework-এর stability হলো বড় কথা। তাই আজকে শ্লোগান হওয়া উচিত, আসুন গণতন্ত্রকে সুসংহত করি, আর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করি এবং এটাই হোক এই জাতীয় সংসদের আজকের দিনের অঙ্গীকার।

অনেক ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তহীনতা এবং দলীয় কোন্দল আজকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে গ্রাস করেছে

লালবাগ হত্যাকাণ্ড

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সরকারী দল বিএনপিকে হারিয়ে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের প্রার্থী মহম্মদ হানিফ জয়লাভ করেন। এই নির্বাচনের পরপরই ১৯৯৪ সালের ৩১ জানুয়ারি লালবাগ থানার নবাবগঞ্জ বড় বাজারে বিজয়ীদের উপর ব্রাশ ফায়ারে এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং ৬ জন প্রাণ হারায়—যা জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু সরকারকে তেমন উদ্বিগ্ন মনে হয় নি। দলীয় কারণে এই হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা না করাতে দেশে হতাশার সৃষ্টি হয়। হাইকোর্ট ডিভিশনে নতুন বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে প্রধান বিচারপতির সাথে অর্থপূর্ণ পরামর্শের বিষয়টিও এই বক্তব্যে আলোচনা করা হয়।

মাননীয় স্পীকার

লালবাগে যে মর্মান্তিক ঘটনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পর ঘটেছে, এটাকে আমি একটি 'cold blooded revenge' বলে আখ্যায়িত করতে চাই। It was an act of arrogance on the part of the ruling party, having lost in the election in the City Corporation। আজকে কিন্তু এ ব্যাপারে ঢাকার অধিবাসীদেরকে, নাগরিকদেরকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। কারণ, এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়াবহ। সমাজে একটি উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে। সেই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি যে, সকল বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, পাঁচদলীয় ঐক্যজোট, জাসদ একটি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে। এই ঘটনা অনেকদূর গড়িয়ে যেতে পারত।

আজকে তাই ঢাকা, বিশেষ করে লালবাগ এলাকার মানুষদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে হয় যে, তারা restrain করেছে এবং বিরোধী দলের এই দায়িত্বশীল ভূমিকার জন্য এই হত্যাকাণ্ডের পরেও ঢাকায় শান্তি বিরাজ করছে। কিন্তু জনগণ আজকে হতাশ এই কারণে যে, একটি প্রেসনোট দিয়ে Home Minister একটি controversy raise করেছেন। তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, দুটি দলের বিবাদের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। কথাটা সত্য নয়। এবং এটা সকলেই জানে যে কীভাবে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় পত্রিকাগুলির সমস্ত কাগজই আমার কাছে আছে। কোন একটি কাগজে এই কথা বলেনি যে, সেদিন কোন দুই দলীয় সংঘর্ষের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং, এ ধরনের একটি কথা আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। প্রেস নোটে যেটা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা সত্য নয়।

মাননীয় স্পীকার, আজকে মানুষ হতাশ এজন্য যে, এই ধরনের মামলা, যেখানে বিরাট একটি উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এবং পাবলিক importance রয়েছে, সেখানে আপনি স্বাভাবিকভাবে ভাববেন swift এবং speedy trial-এর কথা। একটা নিরপেক্ষ investigation হবে। গ্রেফতার এখন পর্যন্তও হল না। যে সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি, যার কথা এমনকি সরকারী দলের অনেকে পর্যন্ত বলেছেন, তাকে ধরা যায় নি। এই ধরা না যাওয়ার পেছনে সরকারের ভূমিকা আজকে জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার। সন্ত্রাসীরা সবসময় যাঁরা ক্ষমতাসীন, যাঁরা প্রভাবশালী, তাঁদের ছত্রছায়ায় থাকে এবং এই সন্ত্রাসীরা সরকারের ছত্রছায়ায় ছিল এবং এখনও আছে। যার জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। আজকে এই যে swift and speedy trial-এর কথা আমি বলেছি, সরকারী দলের পক্ষ থেকে যাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরাও আজকে চান যে, একটা বিচার হোক। প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে বলেছেন এটার একটা বিচার হোক। কিন্তু এ বিচার তো

www.pathagar.com

frustrated হয়ে যাবে যদি এ বিচারে swift and speedy trial-এর ব্যবস্থা করতে না পারেন। সেটার দায়িত্ব সরকারের।

এখানে সরকারের ব্যর্থতা আজকে সকলের সামনে পরিষ্কার হয়েছে। এটা বিএনপি– সরকারী দলের এবং সরকারের ব্যর্থতা বলে আমি উল্লেখ করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, এই সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অযোগ্যতার কথা আমরা বারবার বলেছি। এই এটর্নী জেনারেলকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে[১], সেটা সারা জাতি জানে। আজকে নয়জন জজকে বিচারক নিয়োগ করে আপনারা শপথ করিয়েছেন ঠিকই, শপথ হয়েছে, সমাধান আপাতত হয়েছে কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান হয়নি। Consultation-এর বিষয়টি Constitution-এর মধ্যে আনতে হবে। It has to be an effective consultation। ঐ যে বলেন যে, আমরা consult করেছি। তার মানে প্রধান বিচারপতি মানুন আর না মানুন তাতে কিছু আসে যায় না। কনসাল্ট করেছি, এখন আমরা আমাদের মত অনুযায়ী কাজ করব। সেটা হয় না। সেইজন্য আমরা বলেছিলাম যে, আপনারা বিল আনুন যদি আপনারা সত্যিকার অর্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা চান। আমার শ্রদ্ধেয় সালাহউদ্দিন ইউসুফ সাহেব আড়াই বছর সংগ্রাম করেছেন তাঁর বিলটা পার্লামেন্টে আনার জন্য। আজকে সেটা আনেন, নাহলে আপনারা নিজেরা বিল আনেন এবং আমরা সবাই মিলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করি। তাহলে মনে করব যে, আপনারা সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং গণতন্ত্রকে সাংবিধানিক রূপ আপনারা দিতে চান।

মাননীয় স্পীকার, এটর্নী জেনারেল জাতিকে হতবাক করেছেন। কে দায়ী জানি না। সমস্ত সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকরা আজকে নিজেদেরকে অত্যন্ত অসহায় মনে করছেন। সংবাদপত্রে যা বেরিয়েছে, এটা এই সরকারের সমন্বয়হীনতা প্রমাণ করে। প্রধানমন্ত্রী এবং আইন-মন্ত্রী পাশাপাশি বসেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন সমন্বয় আছে বলে আমাদের মনে হয় না। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। সিদ্ধান্তহীনতা এবং দলীয় কোন্দল আজকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে গ্রাস করেছে। আজকে তার জন্য সারা জাতিকে মাশুল দিতে হচ্ছে। আশা করেছিলাম সরকারী দল শিক্ষা গ্রহণ করবে। কিন্তু দেখা যায় যে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। বিরোধী দলের প্রতি আর একটু সহনশীল হওয়ার চেষ্টা করেন। এই নির্বাচনে হারার পরে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীএখানে বলেছিলেন যে আর কোনদিন ১৪৪ ধারা জারি করা হবে না কোন বিরোধী দলের সভা ভঙ্গ করার জন্য। চট্টগ্রামে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পরে ১৪৪ ধারা জারি করে আমাদের সভা আপনারা বন্ধ করে দিয়েছেন। এটা ঠিক না এবং খুলনাতে নির্বাচনের পর একজন মসজিদের ইমামকে প্রহার করেছেন, Arrogance is power। সেটাই আপনারা দেখাচ্ছেন। এর পরিণতি হবে আরও ভয়াবহ। এখন বুঝতে পারছেন না, পারবেন আস্তে আস্তে। সন্ত্রাস দমন আইন করেছেন, বলেছিলেন যে, সন্ত্রাস দমন হবে। লালবাগের হত্যাকাণ্ড কী প্রমাণ করেছে? প্রমাণ করেছে যে, this law was made not to punish those who are the supporters of the Government but those who are in the Opposition। আজকে এই সন্ত্রাস দমন আইন বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি আপনাদের কাছে। কারণ এই আইন আপনারা বিরোধী দলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছেন, নিজেদের সন্ত্রাসীদেরকে প্রটেকশন দেওয়ার জন্য আপনারা এই আইন তৈরি করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, আজকে এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং লালবাগের এই হত্যাকাণ্ডের পরেও সরকার যদি মনে করেন nothing has happened তাহলে এর পরিণতির জন্য আপনাদেরকে আরও অনেক করুণ পরাজয় বরণ করতে হবে। এখানে একজন সম্মানিত সংসদ-সদস্য জনপ্রিয়তার কথা বলেছেন। জনপ্রিয়তা বাড়ে বা কমে–এটা কেউ বক্তৃতা দিয়ে ঠিক করতে পারবেন না। জনপ্রিয়তা নির্ভর করে নির্বাচনের উপরে। এরপরেও যদি আপনাদের এই উপলব্ধি না আসে যে, আপনাদের জনপ্রিয়তা কতটুকু কমেছে তাহলে নির্বাচন দিন, জাতীয় নির্বাচন দিন। একটি

১.প্রধান বিচারপতির পরামর্শ উপেক্ষা করে হাইকোর্টে নয়জন বিচারক নিয়োগ করা হয়েছিল। পরে আইনজীবীদের দাবির মুখে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

www.pathagar.com

নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হবে। কারণ দলীয় সরকার থাকলে নির্বাচন কমিশন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না—এটাই প্রমাণিত হয়েছে আজকে জাতির সামনে। আজকে সেজন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন দিন।

আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি বলব লালবাগ হত্যাকাণ্ডের বিচার যদি অবিলম্বে করা না হয়, speedy trial-এর ব্যবস্থা যদি না করা হয় তাহলে সরকারকে সারা দেশের মানুষ দায়ী করবে।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

২০০১ সালে নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ নেত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন দাবি করেন

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণের উপর বক্তব্য

২৬ নভেম্বর ২০০১

১৯৯৬ সালের জুন মাসে সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করার পর আওয়ামী লীগ দলীয় কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতির পদ না দিয়ে দেশবরেণ্য এবং সামাজিকভাবে প্রচণ্ড ভাবমূর্তিসম্পন্ন সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে। ১৯৯৬ সালের ৯ অক্টোবর তারিখে ৫ বছর মেয়াদের জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। সংবিধানের ৫০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও নতুন কোন রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতি থাকবেন। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর সাধারণ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় ঐক্যজোট জয়লাভ করার পর ২৮ অক্টোবর সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। প্রক্রিয়াগত কারণে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তখনও সম্পন্ন না হওয়ায় সংবিধানের ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিনে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ নতুন সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসাবে ভাষণ দান করেন। আওয়ামী লীগ সরকারে থাকাকালীন রুলস অব বিজনেস সংশোধন করে সংসদে রাষ্ট্রপতির যে কোন প্রস্তাবিত ভাষণ মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের বিধান করে। স্বাভাবিকভাবেই তখন রাষ্ট্রপতির ভাষণের মাধ্যমে নতুন সরকারের নীতিমালা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দিক-নির্দেশনা প্রতিফলিত হয়। ঐতিহ্যগতভাবেও সেটাই সবসময় সব সংসদীয় ব্যবস্থায় হয়ে থাকে। ব্রিটেনের রানীও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে হাউস অব কমন্সের ভাষণে তা-ই করে থাকেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদও সেটাই করেছেন। কিন্তু নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের উক্ত ভাষণের জন্য তাদেরই মনোনীত এবং নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে আওয়ামী লীগ তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা শুরু করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে নানা রকম বিরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করতে থাকে। রাষ্ট্রপতির ভাষণের দিন আওয়ামী লীগ সংসদ বর্জন করে। সংসদে এই ভাষণের উপর আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার আগেই ১৪ নভেম্বর ২০০১ সালে প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বিদায় গ্রহণ করেন।

মাননীয় স্পীকার

আজকে প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ সংসদে নেই, থাকলে ভাল হত। রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময়ও এবার তারা উপস্থিত ছিলেন না। এই কাজটা তারা ভাল করেননি, দুটি কারণে। একটি হল তারা বলেন যে, তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তারা সেটা প্রমাণ করতে পারেননি। আর দ্বিতীয় কারণ হল রাষ্ট্রপতি শুধু জাতির একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতীকই নন, রাষ্ট্রপতিকে এই সংসদই নির্বাচিত করেছে। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করার পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন দেয় এবং তাঁকে দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে। তাঁদের উচিত ছিল অন্তত রাষ্ট্রপতির ভাষণে উপস্থিত হওয়া। কিন্তু ভাষণের উপর তাঁরা সংসদের বাইরে অনেক বক্তব্য রেখেছেন। অত্যন্ত unfortunate, *যুগান্তর* পত্রিকা ৩০/১০/২০০১ তারিখে ছাপিয়েছে "রাষ্ট্রপতি সেই কলের গানই বাজালেন, বিবেকে বাধলো না"। বিরোধীদলের নেত্রী জাতীয় সংসদে দেওয়া রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণের সমালোচনা করে বলেছেন:

> এই ভাষণের পর রাষ্ট্রপতি নিজেই নিজের গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন। জোট নেত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণে আমাদের সাবেক সরকারের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য দেন, রাষ্ট্রপতি সেই একই কলের গান বাজালেন। তিনি একজন প্রধান বিচারপতি ছিলেন। অথচ মিথ্যা বয়ান দিতে তার বিবেকে একটুও বাধল না।

www.pathagar.com

It's deplorable. It's not only a wrong statement. It's deplorable on the part of the leader of the opposition to say that রাষ্ট্রপতি মিথ্যা বয়ান দিয়ে গেছেন। আরও বলেছেন যে, আমাদের নেত্রী জাতির উদ্দেশে যেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটার নাকি হুবহু একটি অবিকল বক্তৃতা ছিল এইটি। রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপরে *জনকণ্ঠ* ছাপিয়েছে "নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে হারানোর ষড়যন্ত্রে রাষ্ট্রপতিও জড়িত ছিলেন", I have no language to condemn this statement of the leader of the opposition– "এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে হারানোর ষড়যন্ত্রে তিনিও জড়িত ছিলেন"।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতির জন্য নিজেকে defend করার কোন সুযোগ এখানে নেই। একতরফাভাবে একজন রাষ্ট্রপতিকে এভাবে দোষারোপ করা এবং publicly condemn করার নজির অন্তত আমার জানা নেই। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭৩ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক বছর সংসদের প্রথম অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন। আর যদি নতুন সংসদ হয়, সেই সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনেই তিনি ভাষণ দেবেন। এটা তাঁর একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব ছিল। ১৯৯৬ সালের আগে রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজস্ব তৈরি করা ভাষণ দিতে পারতেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর Rules of Business change করেছে। এটা পরিবর্তন করে তাঁরা নিজেরাই বলেছেন যে রাষ্ট্রপতি independently কোন ভাষণ দিতে পারবেন না। এটা ক্যাবিনেট দ্বারা approved হতে হবে। রুলস্ অব বিজনেসের ১৬(৪)-এ আপনি দেখবেন। এই Rules of Business তাঁরা amend করে বলেছেন যে, রাষ্ট্রপতি আলাদাভাবে ভাষণ দিতে পারবেন না। It has to go through the cabinet. এটা তাঁদেরই করা। এটা আমরা করিনি। আমার কাছে গত ছয় বছরের inaugural addresses of President আছে। গত পাঁচ বছর সাহাবুদ্দীন সাহেব রাষ্ট্রপতি হিসেবে এখানে ভাষণ দিয়েছেন। প্রত্যেকটি ভাষণে তিনি উল্লেখ করেছেন, আওয়ামী লীগের সফলতার কথা, আর বিরোধীদলের ব্যর্থতার কথা। সুতরাং আজকে এ ২০০১ সালে যখন তিনি বক্তৃতা রেখেছেন, তাঁর ভাষণে মাত্র এগারটি পাতা এবং ১৯টি প্যারাগ্রাফ রয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের আছে আটত্রিশ পাতা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণ। আর এ ভাষণে রাষ্ট্রপতি কী বলেছেন? এটা যদি আমাদের স্টেটমেন্ট হতো বিএনপি'র স্টেটমেন্ট হতো, তাহলে বিগত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগের দুঃশাসন, সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের উপরে আমরা দু'শত পাতার ভাষণ এখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতাম। কিন্তু আমরা সেটা করিনি। তাঁদের দুর্নীতির ইতিহাস বর্ণনা করা যেত রাষ্ট্রপতির ভাষণের মাধ্যমে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি কিছুই বলেননি।

মাননীয় স্পীকার, আপনি দেখবেন প্যারাগ্রাফ-৪-এ তিনি শুধু বিগত সরকারের সময়ের দুটো লাইন উল্লেখ করেছেন, "সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দলীয়করণের কারণে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে"। এটুকুতেই আজকে অস্থির হয়ে পড়েছে বিরোধীদলের নেত্রী। আজকে রাষ্ট্রপতিকে বলছেন যে, তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, কলেরগান বাজিয়েছেন, তিনি ষড়যন্ত্র করেছেন। এর চেয়ে deplorable আর কিছু হতে পারে না। প্যারাগ্রাফ-৫-এ রাষ্ট্রপতি অর্থনীতির কথা বলেছেন। এ অর্থনীতির কথা কী বলেছেন? তিনি বলেছেন যে, ১৯৯১-৯২ সালে যখন বিএনপি সরকারে আসে তখন ডলারপ্রতি মুদ্রার মান ছিল ৩৫.৭০ টাকা। যখন বিএনপি ক্ষমতা থেকে চলে যায় নির্বাচনের আগে, তখন এটা ৪১ টাকায় উঠেছিল। অর্থাৎ পাঁচ বছরে ৬ টাকা মাত্র বেড়েছে, মুদ্রার অবমূল্যায়ন হয়েছে। ২০০১ সালে পাঁচ বছরে ডলারপ্রতি ১৬ টাকা মূল্য কমে গিয়ে ৫৭.২০ টাকায় উঠে যায়। বৈদেশিক মুদ্রা ৮৮৮ কোটি ডলার বাংলাদেশ ব্যাংকে পাওয়া গেছে বিএনপি যখন প্রথম ১৯৯১ সালে নির্বাচিত হয়। কিন্তু ১৯৯৬-৯৭ বিএনপি সরকার ক্ষমতা ছাড়ার সময় ২০৪ কোটি ডলার রিজার্ভ রেখে এসেছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার সময় ১.১৫ অর্থাৎ মাত্র ১১৫ কোটি ডলার রিজার্ভ রেখে গেছে। Domestic borrowing যদি আপনি দেখেন বিএনপি সরকারের সময় সবচেয়ে stable economic performance ছিল। ৯১-৯৬ এই পাঁচ বছরে ১৪ হাজার কোটি টাকা accumulated borrowing ছিল সেটা বেড়ে ৩৮ হাজার কোটি টাকা করে গেছেন আওয়ামী লীগ সরকার। তারা ১৯৯৬-২০০১ এই পাঁচ বছরে আভ্যন্তরীণভাবে ২৪ হাজার কোটি টাকা borrow করেছেন। সুদ বাবদ ১৯৯৬-৯৭ সালে ব্যয় হয়েছিল ১ হাজার ৮০ কোটি টাকা। সেটা বেড়ে

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পাঁচ বছরে ৩ হাজার ৬ শত কোটি টাকা হয়েছে। ১৯৯১-৯৬ সালে পাবলিক সেক্টরে ২ হাজার ৯ শত কোটি টাকা লোকসান হয়েছিল। আর আওয়ামী লীগের সময় এই লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮ হাজার ৫৬ কোটি টাকা। রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে যদি এসব উল্লেখ করে থাকেন, এটা কি তিনি মিথ্যা বলেছেন? তিনি সত্য কথা এখানে তুলে ধরেছেন। এই সত্য কথা তুলে ধরাটাই তাঁর দায়িত্ব।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতি মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেছেন। বর্তমান সরকার তাঁদের নির্বাচনী ইস্তেহার অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন করেছে। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে দেশ বিভক্ত করার চেষ্টা করেছিল। তারা মানুষের কাছে ভোট চেয়েছে এই বলে যে, যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি তারা নৌকাতে ভোট দিন। তাহলে আজকে কি আমরা ধরে নেব যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে। না, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ নয়। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ রায় দিয়েছে। এ কথাই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, I am quoting from a great leader of Great Britain "if you want to hear speeches ask the opposition, if you want anything to be done আমরা বলব, ask Begum Zia. She will do it for you।" আজকে যারা মুক্তিযুদ্ধের কথা সবচেয়ে বেশি বলেছে, তারা পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিল। তারা সত্যিকার অর্থে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে যায়নি। আজকে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে একজন মন্ত্রী পর্যন্ত নিয়োগ করেছে। সুতরাং এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন সাহেবের ভাষণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করা।

মাননীয় স্পীকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের নেত্রী তথা বিরোধী দলের নেত্রী দাবি করেন—তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিনি এনেছেন। এটা তাঁর "brain child।" ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করার পর তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার গুণগান গেয়েছেন। কিন্তু নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর তিনি বলেছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আর কোন প্রয়োজন আছে কিনা সেটা চিন্তা করে দেখবেন। আমাকে একটু পিছনের দিকে যেতে হচ্ছে। ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর পান্থপথের জনসভায়, আমাদের নেত্রীও সেই আন্দোলনে ছিলেন, তাঁরা প্রথমেই বললেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে। সেই অনুযায়ী নির্বাচন হবার পর বিএনপি সরকার গঠিত হয়। দাবিটা ছিল সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে। বিএনপি সরকার আসার পরই দাবি তোলা হল যে, ভবিষ্যতে সকল নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে হবে। সেই অনুযায়ী ১৬ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হল এবং ২৭ মার্চ ৯৬ সালে 13th Amendment Bill পাস করা হল। বিএনপি সরকারই দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে গেছে। তারপরে ১২ জুন ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হল। সে নির্বাচনে যখন আওয়ামী লীগ জিতলো তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার খুব ভাল ছিল। তারা দেশ পাঁচ বছর শাসন করল। ১৩ জুলাইতে পাঁচ বছর শেষ হয়ে যাবার পর Parliament যখন expire করলো তখন তারা নির্বাচনে অবতীর্ণ হল।

মাননীয় স্পীকার, বিদায়ের আগে আওয়ামী লীগ ঘর সাজিয়েছিল। তাঁদের সরকার সকল ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, সামরিক বাহিনীকে পছন্দমত সুবিন্যস্ত করেছিলেন, সমস্ত আটঘাট বেঁধেছিলেন। লাইসেন্সবিহীন অস্ত্র ছাড়াও ৪ হাজারের বেশি অস্ত্রের লাইসেন্স দিয়েছেন। একই ব্যক্তিকে ৩/৪টি করে অস্ত্র দিয়েছেন, নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য অর্থের সম্ভার তৈরি করেছিলেন।

এখানে আমি শুধু দুয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই। *প্রথম আলো* ২৬ এপ্রিল ছাপিয়েছে, "২ সপ্তাহে ৯ জন সচিব রদবদল, প্রশাসনে অসন্তোষ"। তারা নির্বাচনে জেতার জন্য আর কী করেছিলেন? "প্রশাসন ক্যাডারের ২৮৩ জন সহকারী কমিশনার নিয়োগ", *ইত্তেফাক*, ১ মে, ২০০১। *ইনকিলাব* ২৫ মে, "নির্বাচন প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে সহস্রাধিক কর্মকর্তার বদলী প্রক্রিয়া শুরু"।

আজকের কাগজ ১৩ জুন, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই পুলিশে বড় ধরনের রদবদল। "মন্ত্রী এমপি ও দলীয় নেতাদের দাবি মেটাতে সরকার প্রস্তুত", *আজকের কাগজ*। তারপরে *দৈনিক ইনকিলাব*

www.pathagar.com

জুলাই মাসের ৩ তারিখ "১৩ যুগ্ম-সচিব, ২৭ ইউএনও বদলী"। এভাবে নির্বাচনের সব প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাঁরা।

মাননীয় স্পীকার, কেন আমি এ কথাগুলি বলছি? তার কারণ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর তাদের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলেছিল আওয়ামী লীগ। সে জন্যই আমাকে আজকে এ কথাগুলি বলতে হচ্ছে। ৮/৭/২০০১ তারিখ তাদের রিজাইন করার মাত্র ৫ দিন আগে ইনকিলাব ছাপিয়েছে, "প্রশাসন অনুকূল রাখতে সরকার বেপরোয়া"। এখানে পুরো নিউজটি যদি পড়ি তাহলে সাবস্ট্যান্টস হবে এই যে, তখন যেখানে খুশি সেখানে নিজস্ব পছন্দ করা কর্মকর্তাদেরকে এই প্রশাসনে রেখে তারা প্রশাসনের যে ডিসিপ্লিন সেটা নষ্ট করে গিয়েছিলেন। *ইনকিলাব* ৯ জুলাই ১৯৯৬— "৮৫৯ জন সামরিক ও বেসামরিক আমলার নিয়োগ, বদলী ও পদোন্নতি। প্রশাসনে তুলকালাম কাণ্ড"। তারপরে "৭৩ উপজেলায় ইউএনও রদবদল", ১০ জুলাই তারিখ, সরকার ক্ষমতা ছেড়ে যাবার মাত্র তিন দিন আগে ১০ জুলাই আর একটি news item, "প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস প্রথম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভীত ও দিশেহারা আওয়ামী লীগ"। নির্বাচনের আগে একটা প্রশাসনিক ক্যু করতে চেয়েছিলেন তাঁরা।

The Daily Star লিখেছে, "Fourteen Awami League Men appointed in BTV News Section violating rule"। ক্ষমতা ছাড়ার ১ দিন আগে এ কাজটি করেছিলেন, যাতে বাংলাদেশ টেলিভিশনকে প্রভাবিত করে নিজেরা জয়লাভ করতে পারেন। সেই স্বার্থকে সামনে রেখে তারা এ সকল কাজ করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, এটা হল *প্রথম আলো* ১৪ জুলাই ২০০১ সাল। "সচিব থেকে ইউএনও সাড়ে তিন মাসে ৫ শতাধিক রদবদল"। তারপরে দেখেন যেদিন তাঁরা চলে যাচ্ছেন সেদিনও তারা বদল করে গেছেন। শুধু কি তাই করেছেন? পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে তড়িঘড়ি করে ৪ শত কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করে গেছেন। টাকা-পয়সা ছাড়া তখন আর অন্য কিছুই তাঁদের মেজাজের মধ্যে ছিল না। রাজধানীর খাল সংস্কারের নামে বরাদ্দ ১৫ হাজার টন গম পর্যন্ত তাঁরা নিয়েছেন এই আমাদের খোকাকে[১] হারানোর জন্যে। "৯ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন নিয়ে দাতারা ক্ষুব্ধ", ২৭ জুন, ১৫ দিন আগের ঘটনা। তাঁদের চলে যাওয়ার আগে ৯ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প Suppliers Credit-এ, অর্থ হল বেশি সুদ দিতে হয় এবং এতে choiceও খুব কম থাকে। Suppliers Credit অর্থ আমি যে জিনিস দেব সেটা কিনতে হবে। আর চড়া দামে কিনতে হবে। আর সুদ বেশি দিতে হবে। সেটা করেছেন কারণ নগদ টাকা পাওয়ার জন্য। সরকার ছেড়ে চলে যাচ্ছেন 'যা পার সরিয়ে নাও'। এই ছিল তখনকার তাদের মানসিক অবস্থা। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে ৪৯৭ কোটি টাকা কম দিয়েছেন। ১৩ জুলাই তাদের শেষ দিন ছিল। তার মাত্র ১৫ দিন আগে ৪৭৩ কোটি টাকার গ দিয়েছেন। মেয়াদ শেষে সরকার বিপুল অংকের প্রকল্প অনুমোদনে মেতে উঠেছিলেন।

এগুলি আমি এ জন্য বলছি যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যই সংবিধানের ম্যান্ডেট দেওয়া হয়। বিএনপি এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায়নি। তারা সব সময় বলেছিল যে, "একটি নির্বাচিত সরকার আমরা, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। আমরা অনির্বাচিত একটি পরিষদের কাছে ক্ষমতা দিয়ে যেতে চাই না"। এটাই ছিল বিএনপির stand। কিন্তু আওয়ামী লীগ তখন বলেছিল, না, নির্বাচনের সময় সরকার হতে হবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ এবং সেই জন্যই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রবর্তন করা হল। তারপরে ক্ষমতায় আসার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়েছে। তাঁরা কোন অফিসারকে চাকরিচ্যুত করেননি। বিদায়ী সরকার যেভাবে ঘরটি সাজিয়ে গিয়েছিলেন তাতে তাঁরা দেখলেন যে তা দিয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভবপর নয়। আওয়ামী লীগ যে প্রকল্পগুলি অনুমোদন করেছে, তাও বেআইনীভাবে, irregularly করেছে। আর তাঁরা পদোন্নতি, রদবদল, পোস্টিং করেছেন নির্বাচনকে সামনে রেখে। যদি সেই অবস্থার মধ্যে নির্বাচন হতো তাহলে সেই নির্বাচন কখনও নিরপেক্ষ হতো না। সুতরাং নির্বাচন কমিশনও Article-118, 119, 120, 126 and Article-78 of the

১. সাদেক হোসেন খোকা, ঢাকা-৭ আসনে নির্বাচিত সদস্য।

www.pathagar.com

Constitution-এর অধীনে নির্বাচন আর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারত না। আজকে নির্বাচনের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জনগণের ম্যান্ডেট ছিল যে তারা একটি নিরপেক্ষ পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। কিন্তু সেটা করতে যাওয়ার কারণে বিরোধী দলের নেত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেটা তাঁর তোলা উচিত হয়নি। *প্রথম আলোর* ৬ আগস্টের সম্পাদকীয় কলামে আছে, "নির্বাচনের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা শেখ হাসিনার উচিত হয় নি"। কিন্তু তাঁরা তুলেছিলেন এই জন্য যে, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যেই কৌশলে তাঁরা নির্বাচনে জয়লাভ করতে চেয়েছিলেন সেই কৌশল তাঁদের কাজে লাগবে না। তাঁরা জানতেন যে, জনগণ যদি ভোট দিতে পারে তাহলে আওয়ামী লীগ জিততে পারবে না। এই জন্যই তারা তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

নির্বাচন যখন হয়ে গেল, ভোটারদের মধ্যে ৭৮ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে এবার। মহিলারা সহ আমাদের দেশের নিরন্ন, নিরস্ত্র, অবহেলিত, লাঞ্ছিত জনগণ তাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ভোটের মাধ্যমে এবং সেখানে চারদলীয় ঐক্যজোটকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়যুক্ত করেছে দেশের সাধারণ মানুষ। শহীদ জিয়া বলে গিয়েছিলেন, "জনগণই হল ক্ষমতার উৎস"। তাই তাঁদের অস্ত্র, অর্থ, প্রশাসনিক কাঠামো, তাদের সমস্ত ঘর সাজানোর যত উপাদান ছিল সবই ভেঙে গেছে। কোনো কিছুই কাজে লাগে নি জনগণের ইচ্ছার সামনে, স্রোতের সামনে।

আজকে অভিযোগ এনেছেন স্থূল কারচুপির। ২ অক্টোবর ২০০১ *দৈনিক জনকণ্ঠ* থেকে পড়ছি মাননীয় স্পীকার—"স্থূল কারচুপির নীল নকশার নির্বাচন, আওয়ামী লীগ ভোটের ফল প্রত্যাখ্যান করেছে" এবং এইভাবে বক্তব্য দিয়ে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের integrity-র প্রশ্ন তুলেছেন। শুধু তাই নয়, অত্যন্ত আশ্চর্য লাগে যে এই integrity-র প্রশ্ন—আজকে তাঁরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সকলের ব্যাপারেই তুলেছেন। তাঁরা যখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করলেন আমরা তখন তার প্রতিবাদ করছিলাম এই জন্য যে আমাদের সাথে আলোচনা না করে কেন নিয়োগ করা হল। ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলার ছিল না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও পরে সফিউর রহমান নামে আরেক সদস্যকে নিয়োগ করলেন, বিরোধী দলের সাথে কোনো আলোচনা না করে। সেটা তাঁদের করা উচিত হয় নি। আজকে সেই নির্বাচন কমিশন সাহসের সঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে জাতির সামনে প্রমাণ করে দিয়েছে যে নির্বাচন নিরপেক্ষ, নির্দলীয়ভাবে হলে সাধারণ মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়, এটা তাঁরা নিশ্চিত করেছে। আজকে তাঁদের সম্পর্কে তাঁরা integrity-র প্রশ্ন তুলেছেন। আর্মড ফোর্সেস, আমাদের দেশের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী, যারা তাদের প্রদত্ত কর্তব্য পালন করেছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন নির্বাচনের সময়, আজকে তাদেরও integrity-র প্রশ্ন তুলেছে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার কারণে। আজকে পুলিশ, বিডিআর, প্রশাসন, এমনকি বিদেশী সংস্থা, পর্যবেক্ষক, সকলের বিরুদ্ধেই তারা একই অভিযোগ তুলেছেন। নির্বাচনের পর অনেক কিছু বলেছেন। ২৯টি এনজিও, এই যে এখানে লিস্ট আছে, দেশী-বিদেশী, একটি এনজিও'ও তাদের সাথে একমত পোষণ করেন নি। প্রত্যেকে একবাক্যে বলেছে যে বাংলাদেশে যত নির্বাচন হয়েছে এ নির্বাচন ছিল সবচাইতে সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষ। আজকে তাঁরা তাঁদের integrity-র প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা যে কোন পর্যায়ে যেতে পারেন। বলছেন, রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসাররাও নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আওয়ামী লীগের সাথে। তার মানে যাঁরা তাঁদের নিয়োজিত মানুষ ছিলেন, তাঁরা এখন সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেষ বিবৃতি দিয়েছেন, রাষ্ট্রপতিও নাকি ষড়যন্ত্র করেছেন, বেঈমানী করেছেন, বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাহলে প্রেসিডেন্ট বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বললে বলতে হবে যে, প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই তাঁদের খুব আস্থাভাজন ছিলেন। অথচ সকলেই জানে this man is a man honour and dignity। তাঁরতো নিজেকে ডিফেন্ড করার সুযোগ ছিল না, রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনিতো সাংবাদিক সম্মেলন করে, আমরা যেরকম করি, প্রতিবাদ করতে পারেন নি। একইভাবে প্রধান উপদেষ্টারও সেই সুযোগ ছিল না, আর্মির সে সুযোগ নেই, প্রশাসনে যারা আছেন, সচিবরা যাঁরা কাজ করেন, ডেপুটি কমিশনার যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সেই সুযোগ নেই। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে

www.pathagar.com

নিরুপায়, তাঁদের সম্পর্কে এই অকথ্য ভাষায় মিথ্যা গালমন্দ করাটাকে bad taste এবং দায়িত্বহীনতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

আওয়ামী লীগ দাবি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা তাঁদেরই আন্দোলনের ফসল। কিন্তু আজ তাঁরাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সাংবিধানিক ব্যবস্থার উপর প্রশ্ন তুলছেন। আমার বক্তব্য হল বিএনপি এটা আগে চায় নি। কিন্তু সেই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিএনপি ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আজকে যদি আওয়ামী লীগ সংসদে এসে বলে যে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর চায় না, মাননীয় স্পীকার, it will suit BNP very much। আগামী নির্বাচন তাহলে বিএনপির অধীনে হবে। আমাদের আপত্তি করার কোন কারণ থাকবে না। তাঁরা আসুন এখানে প্রস্তাব করুন, আমরা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখব।

আমার বক্তব্য শেষ করার আগে শুধু এটুকু বলতে চাই, আওয়ামী সরকারের পরাজয়ের কারণ আমরা সবাই জানি। বিএনপি সেই ভুল করবে না যে ভুল তারা করেছে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, দলীয়করণ, বিরোধী দলের প্রতি অসহিষ্ণুতা, অত্যাচার, অনাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন, মিথ্যা মামলা এবং সংসদকে অকার্যকর করা–এসবই ছিল তাঁদের শাসনামলের বৈশিষ্ট্য। মানুষ সেগুলি পছন্দ করে নি। বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ। তাঁরা পলিটিক্সকে ডিভাইড করেছেন। আমরা পলিটিক্সকে ইউনাইট করার চেষ্টা করেছি। দেশের মানুষ ঐক্যের রাজনীতিকে গ্রহণ করেছে এবং দেশের মানুষ তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাঁদের দুঃশাসনের কারণে। আজকে সেই জন্য আসুন আমরা অতীতকে ভুলে গিয়ে সামনের দিকে চলি, সংস্কার আনি। আমাদের দেশে চৌদ্দ কোটি মানুষ, দুই কোটি বিশ লক্ষ বেকার যুবক আছে, তারা প্রত্যেকে একটি চাকরির অপেক্ষায় আছে। আমরা তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করি। আমরা আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করি। আসুন, সংসদে আসুন। আমাদের নেত্রী বলেছেন, যে কোন ব্যাপারে সহযোগিতা করা হবে সংসদকে কার্যকর করার জন্য। বিরোধীদলের ভূমিকা আরও সক্রিয় হোক এটা আমরা চাই। কিন্তু তাঁরা যদি না আসেন তাহলে তার দায় দায়িত্ব তাঁদেরকে নিতে হবে। দেশ বসে থাকবে না মাননীয় স্পীকার। এই সংসদও বসে থাকবে না। জনগণের ম্যান্ডেট আমাদেরকে রক্ষা করতেই হবে। দেশ এগিয়ে চলবে, নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে। গণতন্ত্রকে ইনশাল্লাহ সুসংহত করা হবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে এবং দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করা হবে।

বিরোধী দলের নেত্রী ১৫ নভেম্বর '৯৮ সালে বলেছিলেন, "আওয়ামী লীগ আর কখনও হরতাল করবে না"। এটা হল *ভোরের কাগজের* নিউজ। কিন্তু পরাজয়ের এক মাস যেতে না যেতেই গত ১৫ নভেম্বর ১১ দলের ইস্যুবিহীন একটি হরতাল ছিল। সেখানে তিনি তাঁর ওয়াদা বরখেলাপ করে সমর্থন দিয়েছিলেন হরতালের প্রতি। জনগণ সাড়া দেয় নি। আমি বলব যে, আসুন আমরা সংসদকে কার্যকর করি, আমরা সমঝোতার মাধ্যমে জাতীয় ইস্যুগুলিকে নিষ্পত্তি করি। আমাদের দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটি আছে। কিন্তু আমরা সেই মেজরিটি দেখাতে চাই না। আমরা ব্রুট মেজরিটি দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাই না। আমরা চাইব যে তাঁরা আসুন। কারণ আমাদের অনেকগুলি ইস্যু আছে এই সংবিধান সংশোধনের জন্য। আমরা সহযোগিতা করব। তাঁরা এইখানে যদি আসেন, সংসদকে যদি শক্তিশালী করেন গণতন্ত্র সুসংহত হবে, বাংলাদেশের মানুষ শান্তি পাবে এবং দেশকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আমাদের মূল লক্ষ্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সেই লক্ষ্য অর্জন করতে ইনশাল্লাহ আমরা সক্ষম হব।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

অপরাধ দমন করা তো দূরের কথা, এসিড নিয়ন্ত্রণেরই কোন আইন ছিল না

এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২
এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২

১২ এবং ১৩ মার্চ ২০০২

অনেক ধরনের শিল্প প্রক্রিয়ায় এসিডের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ব্যক্তিগত আক্রোশে আজকাল এসিড ব্যবহার করে নৃশংস অপরাধ সংগঠিত করা হয় যার ফলে বেশির ভাগ victim হয় নিরীহ নারী সমাজ। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় হল এসিড নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন আইন বিদ্যমান নেই। এসিড যে কোন স্থান থেকে সংগ্রহ করা যায়। তাই এসিডের আমদানী, উৎপাদন, ব্যবহার, মওজুদ, পরিবহন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা গেলে এসিড সংক্রান্ত অপরাধ দমন করা সহজ হবে।

মাননীয় স্পীকার

সর্বপ্রথম যারা আজকে এই বিলের উপরে বক্তব্য রেখেছেন আমি তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

একটা জিনিস স্পষ্ট যে, তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে এবং এই উদ্বেগ একটি জাতীয় উদ্বেগ। কারণ, আমি ছোট একটি সমীক্ষা আপনার সামনে উপস্থিত করছি। এই এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ১৯৯৭ থেকে ২০০১ বিগত আওয়ামী সরকারের সময়ে ৬৪৯টি ঘটেছে এবং তার ফলে ১২৯৩ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। এদের বেশির ভাগই মহিলা। এদের অনেকে করুণ জীবন যাপন করছে। এদের মর্মান্তিক অবস্থার ব্যাপারে বিগত আওয়ামী সরকার নিশ্চুপ ছিল। নিরীহ মহিলা ও শিশুরা যে নির্যাতনের শিকার হয়েছিল সে প্রেক্ষাপটে তাদেরই উচিত ছিল এসিড নিক্ষেপের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা। কিন্তু সেখানে তারা ব্যর্থ হয়েছে। সবচাইতে বড় কথা হল, এসিড সংক্রান্ত, এমনকি এসিড ব্যবহারের জন্য আমদানী, উৎপাদন, ব্যবহার, মওজুদ, পরিবহন, এসবের উপরে বাংলাদেশে কোনো আইন নেই।

এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে যদিও এসিড শিল্পায়নের কাজে লাগে, কিন্তু এসিড ব্যবহারের উপরে নিয়ন্ত্রণমূলক কোন আইন, বাংলাদেশের ৩১ বছরে করা হয়নি। বিষয়টি যখন তলিয়ে দেখতে গেলাম তখন দেখলাম যে, অপরাধ দমন করা তো দূরের কথা এটার নিয়ন্ত্রণেরই কোন আইন নেই। সেই জন্য আমরা দুটি আইন প্রণয়ন করতে এসেছি এখানে। আজকের যেটা, সেটা হল এসিড নিয়ন্ত্রণ বিল। আর আগামীকাল যেটা আসবে সেটা হবে এসিড অপরাধ দমন বিল। এই এসিড নিয়ন্ত্রণ বিলের মূল দিকগুলি হল:

এই বিলের মধ্যে একটি জাতীয় নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এটার চেয়ারম্যান হবেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীএবং কো-চেয়ারম্যান হবেন মাননীয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী। এখানে সরকারের অত্যন্ত দায়িত্বশীল উর্ধতন কর্মকর্তা ছাড়াও সংসদ সদস্য এবং বেসরকারী সংস্থার, যাঁরা এই বিষয়ে মহিলাদের উপরে আক্রমণ ও নির্যাতন প্রতিরোধের ব্যাপারে সজাগ এবং সচেতন ভূমিকা পালন করছেন তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই কাউন্সিলে। এই জাতীয় কাউন্সিলের দায়িত্ব এবং কর্তব্য এই বিলের মধ্যে দেওয়া আছে। এদের প্রধান দায়িত্ব হবে— এসিডের ব্যবহার, উৎপাদন, আমদানী, মওজুদ ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণের উপরে একটি বিধিমালা রচনা করা। এর পরেই থাকবে জেলা কমিটি। এই কমিটিতে প্রতিটি জেলার জেলা প্রশাসককে নিয়ে একটি কমিটি করা হচ্ছে, যেখানে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ যাতে করে এই রকমের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন একটি

www.pathagar.com

লাইসেন্সিং প্রথার মাধ্যমে। এই জন্য একটি লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ করা হয়েছে। লাইসেন্সের নবায়নের ব্যবস্থা আছে। এসিড বহনকারী যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যদি সেখানে লাইসেন্সের কোন বিধান বা শর্ত ভঙ্গ করা হয়।

মাননীয় স্পীকার, এই আইনের আর একটি বিশেষ দিক হল যে এখানে আলাদা একটি তহবিল থাকবে। এই তহবিলের মূল উদ্দেশ্য হবে, এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা। এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা এবং আইনগত সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা। এটা হল human side of this law. এটা অত্যন্ত significant যে, আজকে যারা এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের সেবা করা দরকার। তাদের সেবা বা দেখাশুনা করার ব্যাপারে কোন আইন ছিল না এবং অন্য কোন আইন দ্বারা এটা করার কোন বিধান ছিল না। আজকে সেই জন্য এই দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছি। এই আইনের আর একটি দিক হল, লাইসেন্স ব্যতীত এসিডের পরিবহন, আমদানী, উৎপাদন, মওজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার কেউ যদি করেন তাহলে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। দণ্ডের মেয়াদ হবে অনূর্ধ ১০ বছর এবং ন্যূনতম ৩ বছর পর্যন্ত। লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করার জন্য অনূর্ধ ৫ বছর এবং ১ বছর সর্বনিম্ন। আমাদের একটা অভিজ্ঞতা আছে যে, এই সব আইনের অপব্যবহার হতে পারে এবং সমাজে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত কারণে এই আইন কেউ ব্যবহার করতে পারে, সেই জন্য কেউ যদি মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মোকদ্দমা দায়ের করে তাহলে তার জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেই ধরনের অপরাধীকে ৫ বছর পর্যন্ত সাজা দেওয়া যাবে।

মাননীয় স্পীকার, আজকের এই ক্ষণে দেখা যাচ্ছে যে এসিডের অপব্যবহারের কারণে অনেক নিরীহ মহিলা এবং বিশেষ করে দেখা যায় যে ব্যক্তিগত বিভিন্ন ঈর্ষামূলক কারণে, বিদ্বেষমূলক কারণে, প্রেমঘটিত কারণে এই এসিডের ব্যবহার হয়। যত্রতত্র, যেখানে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। তার ফলে দেশে একটি বিরাট অংশ বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুরা এই যে ভয়াবহ, মর্মান্তিক, দুর্বিষহ অবস্থায় পড়ে, তাতে জাতির সকল পর্যায়ে এবং সকল শ্রেণীর মানুষ আজকে উৎকণ্ঠিত। এই উৎকণ্ঠার নিরসনের জন্য এই বিল আনা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আজকে এই বিল পাস হলে এই এসিডের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হবে, যার ফলে এসিড সংক্রান্ত অপরাধও কমে আসবে এবং যে দণ্ডের ব্যবস্থা আমরা করেছি, যেটা আমি আগামী কালকে ব্যাখ্যা করব যখন আমরা অপরাধ দমন আইন উপস্থাপন করব, তার ফলে আমরা বিশ্বাস করি অপরাধ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং দেশের মানুষ, আপামর জনসাধারণ, এটাকে স্বাগত জানাবে এবং এই আইনের দ্বারা উপকৃত হবে।

মাননীয় স্পীকার, এই আইনটি একটি অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ আইন। আমি আমার মাননীয় সংসদ সদস্য যারা জনমত যাচাই-এর প্রস্তাব করেছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বলতে চাই যে, এই আইন পাস করতে বিলম্ব করাটা আমাদের উচিত হবে না। যত শীঘ্র সম্ভব এই আইন কার্যকর করা প্রয়োজন এবং এই অপরাধগুলি থেকে দেশের মানুষকে, বিশেষ করে মহিলাদেরকে যাতে আমরা রক্ষা করতে পারি, সেই জন্য আমার অনুরোধ হবে ঐ প্রস্তাবগুলি হয় তাঁরা প্রত্যাহার করুন, আর না হলে সেগুলি প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং এই আইনটা, অবিলম্বে এই হাউজে পাস করার অনুমতি প্রদান করার জন্য মাননীয় স্পীকারকে অনুরোধ জানাব।

মাননীয় স্পীকার, আমি সম্মানিত সংসদ-সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে তাঁরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কতগুলি বিধানের উপর। আমি তাঁদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, যে সংশোধনীগুলি তাঁরা এনেছেন সে বিষয়গুলির উপরে আমরা খুব গভীরভাবে চিন্তা করে বর্তমানের এই আইনটি এনেছি। কোন law perfect নয়। সকল আইনই trial and error এর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। সুতরাং আমরা এখন আইনটি যেভাবে এনেছি সেভাবেই আইনটিকে এই সংসদের মাধ্যমে পাস করতে চাই। মাননীয় সদস্যবৃন্দ যে সব সংশোধনীর কথা বলেছেন সেগুলি আমরা বিচার-বিবেচনা করেছি। তার মানে এই নয় যে, দরজা বন্ধ, ভবিষ্যতে যখন আমরা আইনটি প্রয়োগ করতে যাব তখন যদি দেখি কোন সংশোধন করা প্রয়োজন, তখন আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

ধন্যবাদ মাননীয় স্পীকার।*

---

* বিলের উপর আনীত সংশোধনীগুলি কণ্ঠভোটে নাকচ হয় এবং বিলটি সেদিনই সংসদে পাস হয়।

www.pathagar.com

এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২
১৩ মার্চ ২০০২

আমাদের মত অনুন্নত কিছু কিছু দেশে ব্যক্তিগত লোভ, লালসা, ক্রোধ, হিংসা চরিতার্থ বা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এসিড ব্যবহার করা হয়। এটা একটি অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং জঘন্য অপরাধ যা অবিলম্বে দমন করার জন্য এই আইনটি তৈরি করা হয়।

মাননীয় স্পীকার

আমি ধন্যবাদ জানাই সম্মানিত সংসদ সদস্যদেরকে। তাঁরা এই আইনটিকে জনমত যাচাই করার জন্য প্রস্তাব এনেছেন এবং তাঁদের উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই বিষয়ে ২/১টি কথা আমি আপনার মাধ্যমে এই সংসদে উপস্থাপন করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, এটা ঠিক কথা যে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যদিও এসিড শব্দ লেখা নেই, কিন্তু এই ধরনেরই একটি পদার্থ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিষয়টি স্পষ্ট নয় এবং সেই আইনটিতে আরও অনেক অপরাধ সম্বলিত বিষয় রয়েছে, যার কারণে আমাদেরকে নতুন একটি আইন করতে হচ্ছে। প্রথম হল যে, দেশে এসিডের কারণে যে ঘৃণ্য, জঘন্য এবং নৃশংস অপরাধ অব্যাহতভাবে চলছে এটা অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়োজন। এই কারণে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে এই এসিড নিক্ষেপের কারণে একজন ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাকে দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, এসিডের কারণে যারা victim হবে তাদের সুবিচার প্রাপ্তির লক্ষ্যে এই অপরাধগুলি দমন করার জন্য কঠোর আইন করা প্রয়োজন। আর, একটি আলাদা ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে এই অপরাধগুলির বিচার করতে হবে। কারণ এখন এই বিচারগুলি হয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে। সেই ট্রাইব্যুনালগুলি over crowded, সেখানে অনেকগুলি মামলা এক সঙ্গে থাকে, যার জন্য এসিডের দ্বারা আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিচার এই আদালতগুলিতে করা সম্ভব হচ্ছে না। এমনও মামলা আছে যে, এসিডে একেবারে বিদগ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু তার বিচার ১, ২, ৩ বছর পরও হচ্ছে না। সে কারণেই এই আইনটিকে আরও পরিপূর্ণ আকারে আনা হয়েছে। এটা একটি self-contained law এবং এটাতে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐ আইনে তদন্ত করার সময় সীমার যে procedure রাখা হয়েছিল, সেটা এখানে আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আরেকটি কথা বলা দরকার যে, এটি একটি মানবাধিকার সম্পর্কিত আইন। It also relates to the rights of women, children and men who are victims of this offence। এজন্য আজকে এই আইনটি আমরা এখানে এনেছি। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ যাঁরা আজকে এর ওপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব করেছেন সেগুলি আমি গ্রহণ করতে পারছি না। তাই জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমি মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব গোলাম হাবিব দুলালকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি বিলটির উপর কতগুলি সংশোধনী এনেছেন। তাঁর সংশোধনীর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হল, আমরা গতকাল যে আইনটি পাস করেছি, সেটা মনে হয় তিনি ভাল করে পড়ে দেখেননি। কারণ সেই আইনে চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা করেছি। সুতরাং আপনি আশ্বস্ত হতে পারেন যে, আপনার যে প্রধান উৎকণ্ঠা অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, সেটা সরকার করবে। এমনকি তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করা হবে। এছাড়া তাদেরকে আইনী সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আমরা গতকাল যে বিলটি পাস করেছি তার মধ্যে এসব আছে। সেটার পুনরাবৃত্তি আমরা এই আইনে করিনি। সুতরাং মাননীয় সদস্যের চিন্তার কোন কারণ নেই। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তুলেছিলেন। আমি স্পষ্ট ভাষায় জানাতে চাই যে, এই আইনের কারণে কোন ব্যবসায়ীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এখানে শুধু নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁকে লাইসেন্স নিতে হবে যাতে করে এটার অপব্যবহার আমরা বন্ধ করতে পারি। এটাই হচ্ছে সেই আইনটা করার প্রধান উদ্দেশ্য।

মাননীয় স্পীকার, গত বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৫৩টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা সম্পর্কিত মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং ৩৫১ জন গুরুতর আহত হয়েছে, এর মধ্যে ৯০%

www.pathagar.com

মহিলা। এই কারণেই এই আইনটি এখানে এনেছি। এই আইনের বিশেষ দিকগুলি সংসদের জ্ঞাতার্থে একটু বলা দরকার। এসিড দ্বারা যদি মৃত্যু ঘটে তার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। এসিড দ্বারা গুরুতর আহত হলে সেখানেও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং গুরুতর আহত না হয়ে যদি শারীরিকভাবে আহত হয়ে থাকে, তবে অনধিক ১৪ বছর এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৭ বছর শাস্তির বিধান করা হয়েছে। এসিড নিক্ষেপ করা বা নিক্ষেপের চেষ্টা করার কারণে ন্যূনতম ৩ বছর ও সর্বোচ্চ ৭ বছর শাস্তির বিধান করা হয়েছে। এছাড়া এই ধরনের অপরাধমূলক কাজে সহায়তার জন্য full offence-এর যে শাস্তি সেই শাস্তি তাকে ও ভোগ করতে হবে।

আমাদের দেশে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে মিথ্যা মামলা রুজু করে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে জড়িয়ে হয়রানি করা হয়। এই সব ক্ষেত্রেও অর্থাৎ মিথ্যা মামলা দায়ের করার জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে। এই আইনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি অপরাধটি করেছে তার কাছ থেকে এই ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করা হবে। সে যদি নিজে অর্থ দিতে না পারে, তাহলে সে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পত্তি লাভ করবে সেখান থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করা হবে। এই বিধানও আইনে করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে ৯০ দিন পর্যন্ত তদন্তের সময়সীমা ধার্য ছিল। এটাকে এখন কমিয়ে ৬০ দিন করা হয়েছে। সুতরাং এই আইন কার্যকর হলে বিচার পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত হবে এবং খুব দ্রুতগতিতে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া সম্ভবপর হবে। এছাড়া যে ট্রাইব্যুনাল হবে সেই ট্রাইব্যুনাল শুধু এসিডের মাধ্যমে অপরাধ সংঘটিত মামলাগুলির বিচার করবেন।

মাননীয় স্পীকার, আমি শেষ করার আগে শুধু বলতে চাই যে, এই সরকার একটি রেসপনসিভ সরকার। যখনই সমাজে এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয় তার প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের এই সরকার রেসপন্ড করে এবং এই অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য যে ডায়নামিজমের প্রয়োজন, এই ডায়নামিজম, এই আইন প্রণয়নের দ্বারা এই সরকার প্রমাণ করেছে।

আমি মনে করি এই সরকারের এটা একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই ধরনের একটি সমস্যাকে মোকাবেলা করার জন্য যে গতিশীলতা প্রয়োজন ছিল সেটা বিগত পাঁচ বছরের সরকার কোন দিন দেখাতে পারে নেই। আমি সে জন্য আজকে আপনার মাধ্যমে এই আইনটি পাস করার জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যদেরকে অনুরোধ করব।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।*

* বিলটি সেদিনই কণ্ঠভোটে পাস হয়।

www.pathagar.com

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

১৬ সেপ্টেম্বর ২০০২

বিশ্বময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একটি সার্বজনীন চলমান সমস্যা। তবে আমাদের দেশে নানা কারণে বিষয়টি একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করে। বিরোধী দল ছাড়াও সংবাদপত্র, সুশীল সমাজ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং পেশাজীবী সংগঠনসমূহ এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তাই সংসদে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়।

মাননীয় স্পীকার

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা পৃথিবীর সকল দেশের সকল সরকারের জন্য একটি সমস্যা। আমাদের জন্যও এটা একটি সমস্যা। আমেরিকার নিউইয়র্ক স্টেটে প্রতি ৩ মিনিটে একটি করে খুন হয়। কিন্তু খবরের কাগজে হেড লাইন হয় না। ভারতে a woman is raped every 54 minutes. কিন্তু ভারতের জাতীয় পর্যায়ের কোন খবরের কাগজে প্রথম পাতায় এগুলি ছাপানো হয় না। পার্লামেন্টের মেম্বাররাও এসব নিয়ে আলোচনা করেন না। তার কারণ এটা একটি সার্বজনীন নিয়মিত সমস্যা। এই সমস্যা সমাধান করার দায়িত্ব মূলত সরকারের উপর। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় মনে রাখতে হবে যে আওয়ামী লীগের শাসনের সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তমান সরকারকে এ বোঝা বহন বা এই সমস্যা সমাধান করতে হচ্ছে।

সাঈদী[১] সাহেব কিছু পরিসংখ্যান দিয়েছেন। আমি repeat করব না। তবে শুধু বলতে চাই যে, ৫ বছরে আওয়ামী লীগের সময়ে ১৬,৯৯০টি খুন হয়েছিল, তার মানে প্রতি মাসে ২৮৩টি এবং দিনে ১০টি করে খুন হয়েছিল। এটা সরকারি তথ্য। আর ১২,৭৩৭টি ধর্ষণ হয়েছিল। তাতে মাসে ২১২টি বা দিনে ৭টি ধর্ষণ হয়েছিল আওয়ামী লীগের সময়।

তারা জননিরাপত্তা আইন করেছিলেন বিরোধী দলের উপর নির্যাতন চালানোর জন্য। ৩২ হাজার মানুষকে আটক করেছিলেন জননিরাপত্তা আইনে। আমরা সেই জননিরাপত্তা আইনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টের মাধ্যমে অসাংবিধানিক ঘোষণা করিয়েছিলাম। ঐ ৩২ হাজারের মধ্যে ২৬ হাজার ছিল আমাদের দলীয় নেতা-কর্মী।

১৭ হাজার মামলা দিয়েছিল আমাদের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগ এই দেশে একদলীয়, একনায়কত্ব, স্বৈরাচারী বাকশালী শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিল। গণতন্ত্র আপনাদের মুখে শোভা পায় না। আমাদের মোট ৪ লক্ষ ২৫ হাজার নেতা-কর্মীকে আপনারা আটক করেছিলেন, হয়রানি করেছিলেন। এই যে সাদেক হোসেন খোকা, নিজের কথা নিজে বলে নি। ১৫৪টি মামলায় তাঁকে আসামী করেছিলেন। নাজিম উদ্দিন আলম ৯৬টি, সূত্রাপুরে আমাদের মোহন আছে, তাঁর বিরুদ্ধে ১৩৬টি মামলা দায়ের করেছিলেন। কারণ তাঁরা মিছিল করতেন, মিটিং আয়োজন করতেন। শুধু জননিরাপত্তা আইনে ৩৩০৯টি মামলা দিয়েছিলেন, সে কথাটি আজকে আপনাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। পাঁচ বছরে লক্ষ লক্ষ বেআইনী অস্ত্র আপনাদের হাতে ছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে যাওয়ার আগে জানুয়ারি থেকে জুলাই ১৩ তারিখ পর্যন্ত, ঠিক যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত, ৩৬৩৬টি লাইসেন্স দিয়ে গিয়েছিলেন এবং আপনাদের অনেক নেতা-কর্মীকে ৩টি করে লাইসেন্স দিয়েছিলেন। আজকে সেই অস্ত্রগুলি উদ্ধার করতে আমরা ততটা সমর্থ হই নি এবং সেই অস্ত্রগুলি এখনো সমাজে বিরাজ করছে। সেই অস্ত্রগুলি এখনো ব্যবহার হচ্ছে দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার কাজে।

---

১. দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, পিরোজপুর-১ আসনে নির্বাচিত সদস্য।

www.pathagar.com

আমাদের বিরোধী দলের নেত্রী সেদিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ২০ জুলাই *দৈনিক সংগ্রামে* ছাপা হয়েছে, "আর যদি একটি লাশ পড়ে তাহলে দশটি লাশ পড়বে।" চট্টগ্রামের পুলিশের প্রতি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "অপরাধীদের ধরতে দু'চারটি লাশ পড়লেও কোন অপরাধ হবে না। আপনারা ব্যর্থ হলে আমার দল অস্ত্র হাতে নেবে।"

এডভোকেট হাবিব মণ্ডলকে হত্যা করা হয়েছিল, বুশরাকে হত্যা করা হয়েছে, রুবেলকে হত্যা করা হয়েছে, সুমনকে হত্যা করা হয়েছে। তানিয়া ধর্ষণ ও হত্যা মামলা হয়েছে। ডিবি অফিসে জালাল হত্যা, এস এম রব হত্যা খুলনায়, আপনাদের নেতা আপনাদের কর্মীরাই তাঁকে হত্যা করেছিল। এডভোকেট নুরুল ইসলাম হত্যা, কাজী আরেফ হত্যা, শিপু হত্যা, মুকুল হত্যা, সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যা, সজল হত্যা, মুরগী মিলন হত্যা আর কত বলব, ১১৪৯টির উপর মামলা হয়েছে। কিন্তু বিচার আপনারা করেন নি। আইনের শাসনের কথা বলেছেন কিন্তু বিচারের ব্যবস্থা করেন নি। কারণ এইসব হত্যার সাথে আপনাদের নেতা, এমপি, মন্ত্রীরা জড়িত ছিল। সেই জন্য এদের বিচার আপনারা করেন নি।

যুগান্তর ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১। "এমপি ইকবালের মিছিল থেকে গুলি, নিহত ৩।" ইকবাল সাহেবের ছবি এখানে আছে, হাতে পিস্তল। কোন এ্যাকশন নেন নি। আমি যুগান্তরের ছবি দেখাচ্ছি। এই দেখুন।

এসব কথা বলে কোন লাভ নেই। এই যে দেখুন আর একটি ছবি। এখানে আছে কিভাবে অস্ত্র নিয়ে ছাত্রলীগের ছেলেরা আঘাত করছে, আক্রমণ করছে। আপনাদের সময়কার গড ফাদারদের ইতিহাস নাই বা বললাম। এই যে, আমাদের বিখ্যাত জয়নাল হাজারী। এটা হল *দৈনিক মানবজমিন* ২৫ অক্টোবর ২০০০। "হাজারী তার অস্ত্র গোডাউনটি কাকে দেবেন," ২৮ অক্টোবর ২০০০ সন। এরপরেও আমার কাছে অনেক ছবি আছে কিন্তু সময় কম। আপনাদের এই কাগজগুলি এখনই পাঠিয়ে দেব। ইকবালের[২] ছবিসহ।

আজকে আমাদের সামনে যে সমস্যা সেটা আমাদেরকে অবশ্যই দূর করতে হবে। সুরঞ্জিত বাবু পুলিশের কথা বলেছেন। পুলিশকে দলীয়করণ যেভাবে আওয়ামী লীগ করে গেছে, সেটা থেকে মুক্ত হতে আমাদের সময় লেগেছে। যার জন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লেগেছে। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে সুসংহত করেছি। পুলিশের উপর আস্থার কথা বলেন, আস্থা হারিয়ে আপনারা রক্ষী বাহিনী করেছিলেন। একটি অস্ত্রেরও লাইসেন্স বর্তমান সরকার গত এগারো মাসে কাউকে দেয়নি, অথচ আপনারা বেআইনীভাবে বহু অস্ত্রের লাইসেন্স দিয়েছেন। বলেন, দিয়েছেন কিনা? সন্ত্রাস লালন করার ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, আপনারা। কারণ বিএনপি সরকারের সাথে আওয়ামী লীগের গুণগত পার্থক্য হল, তখনকার সময় আপনারা state terrorism এবং state patronisation introduce করেছিলেন। যারা দিনের আলোতে সন্ত্রাস করেছে, তাদেরকে প্রশ্রয় দিয়েছেন আশ্রয় দিয়েছেন, ফেনীর জয়নাল হাজারী, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান, লক্ষ্মীপুরের তাহের, গফরগাঁও-এর গোলন্দাজ, এরা সব ছিল সুপরিচিত গডফাদার। এরকম আরও অনেক ছিল, ঢাকার মকবুল[৩], ইকবাল এবং হাজী সেলিম আরও অনেকে।

বোমার কথা ভুলে গেছেন। এখন বোমাগুলি ফোটে না কেন? এই বোমাগুলি গেল কোথায়? এই এগার মাসে একটিও ফুটল না কেন? এ বোমাগুলি কারা ফুটিয়েছিল তা সকলেরই জানা আছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সেদিন আপনারাই ঘটিয়েছিলেন। বিএনপি সরকারের সময় একটি নামও বলতে পারবেন না যে এপর্যন্ত একজন গডফাদার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা বিএনপি মন্ত্রী বা এমপির ভাই, আমাদের ছাত্রদলের নেতা, কাউকে আমরা স্পেয়ার করি নি। কারণ আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাস করি। আপনাদের সময় সবাইকে স্পেয়ার করেছেন। কাউকে আপনারা হাজতে নিয়ে, জেলখানায় নিয়ে, মামলা দেন নি কারণ তারা ছিল আপনাদের সোনার ছেলে, সেইজন্য।

আওয়ামী লীগ জননিরাপত্তা আইন করেছিল। আমরা সেটা বাতিল করেছি। This is the first time a government has repealed a black law in the history of Bangladesh। কারণ সাধারণত সকল সরকারই black lawগুলি রেখে দেয় বিরোধী দলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য,

---

২. ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-১০ আসনে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য এইচ বি এম ইকবাল।
৩. ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-৯ আসনে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য মকবুল হোসেন।

www.pathagar.com

কিন্তু আমরা এটা করেছি। এরপরে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা বলেছিলেন যে, এ আইনটি করা হচ্ছে বিরোধীদলকে নিপীড়ন করার জন্য। একটি উদাহরণ দেন এখানে। দ্রুত বিচার আদালতের অধীনে কোন political victimisation হয় নি। একটিও দেখাতে পারবেন না। Not a single one। ঐ যে, নীলফামারীর উকিলের কথা বলছেন, ঐ মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছি। Not a single one example। আপনাদের কোন বক্তৃতায় এখন আর এটা আসে না আজকাল। এই আইনের অধীনে ৪৩৮টি মামলার রায় এরই মধ্যে হয়েছে। যার জন্য ছিনতাই এবং রাহাজানি অনেকটা কমে এসেছে। এই আইনের কারণে। আর চাঞ্চল্যকর বহুল আলোচিত মামলা শিহাব হত্যা মামলা পাঁচ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। যা বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন দিন ঘটেনি, তা এই সরকার করেছে। আজকে তৃষা হত্যার মামলা চার্জশীট হয়ে গেছে। আপনাদের সময় হলে পাঁচ বছরে হতো না। অথচ আমরা করেছি। নওশীন ও সিমি হত্যা মামলা চার্জশীট দেওয়া হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির জন্য দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করেছি, যেটা আপনাদের সময় করা সম্ভবপর হয়নি। শিপু হত্যা মামলা আমরা ভুলে যাই নি। কার সন্তান তার সঙ্গে জড়িত ছিল ভুলে যাইনি। আমাদের রিপোর্ট আছে। ওসি নিজের হাতে সেই কামাল আহমেদ মজুমদারের ছেলেকে কোলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য এয়ারপোর্টে নিয়ে গিয়েছিল। সেই দিনগুলির কথা আমরা ভুলি নি। কেন এই বিচারগুলি আপনাদের সময় করেননি? পাঁচ বছর তো সময় পেয়েছিলেন। আর প্লট দখলের কথা তো বাদই দিলাম। নাসিম সাহেবের কথা তো বলতে চাই না। উনি তো কালো চশমা পরে এখন পেছনের সীটে বসেছেন। ওনার কাহিনী বলতে গেলে তো মহা মুশকিল হবে।

এসিড। ওনাদের সময় একশত আটষট্টি জন মহিলা এসিডদগ্ধ হয়ে প্রায় বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। এসিডের জন্য ওনারা, না আইন করেছেন, না কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন। এই সরকার, আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে, তাঁর direct order-এ এসিড নিয়ন্ত্রণের ওপর দুটি আইন হয়েছে। এসিড আদালত করা হয়েছে বিচার করার জন্যে। আজকে এটা কমে এসেছে। এই আইন দুটি করার পর মাত্র একুশটি এসিড সংক্রান্ত ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে।

বিগত পাঁচ বছরে দেশে অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, কিন্তু তদন্ত করার জন্য তারা কোন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন করে নি। তদন্ত যদি হয়ে থাকে, কোন রিপোর্ট দাখিল করে নি This is the first time in our history যে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে, শামসুন্নাহার হলের ব্যাপারে জুডিশিয়াল কমিশনই শুধু করি নি, সেই জুডিশিয়াল কমিশন যাতে তাড়াতাড়ি করে রিপোর্ট দেয় তার ব্যবস্থা করেছি এবং তার ওপর ভিত্তি করে government has already taken action।

মালিবাগের হত্যা মামলা—আওয়ামী সরকার যদি থাকত, কোনদিন তার জন্য তদন্ত কমিশন হতো না। আজকে সেই মালিবাগ হত্যা মামলায় জাস্টিস জয়নুল আবেদীন তাঁর রিপোর্ট দিয়েছেন। এটা একটা স্বচ্ছ সরকার। একটা transparent government। A responsive government। সেটাই আমরা প্রমাণ করেছি এবং এ বিচারগুলি আমরা করে দিয়েছি। তাই রিপোর্টগুলি দাখিল হয়েছে এবং এর উপর কাজ চলছে।

আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল, এই সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করবে না, সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করবে না। Compromise করবে না। আরেকটি হল, এই সরকার চেষ্টা করবে যত দ্রুত সম্ভব, যে সব অপরাধ হচ্ছে, এসব অপরাধের বিচার করা। This is the intention of the government.

আওয়ামী লীগের নিয়ত ঠিক নেই। নিয়ত যদি ঠিক থাকতো তাহলে তারা ওই একদলীয় সরকার গঠন করতেন না। কিন্তু এখন তারা গণতন্ত্রের কথা বলেন। নিজেদের পুরনো দিনের কথা ভুলে যেতে চান। আমি শুধু বলব যে, ঈমান ঠিক রাখুন। সিরাতুল মুসতাকীমে বিশ্বাস করুন। তাহলেই দেখবেন, ইনশাআল্লাহ you will prosper। As far as the performance of the two governments are concerned, তুলনায় কোন ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে পারবেন না। আজকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, where Awami League has failed, BNP Insha-Allah, will succeed.

Thank you, Mr. Speaker.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল অধ্যাদেশ এবং আইন, ২০০২

২৪ নভেম্বর ২০০২

সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদ অধিবেশন যখন থাকে না তখন রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ সরকার প্রয়োজন বোধ করলে অধ্যাদেশ জারি করে আইন প্রণয়ন করতে পারেন, তবে সেই আইন সংসদের পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম দিনে উত্থাপিত হতে হবে এবং সেই দিন থেকে সেই অধ্যাদেশ কেবল ৩০ দিনের জন্য বলবৎ থাকবে যদি না উক্ত সময়কালের মধ্যে সেই অধ্যাদেশটি রহিত করা না হয় অথবা সংসদ একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে তা অননুমোদন করেন। সরকার যদি এই অধ্যাদেশটি আইন আকারে অব্যাহত রাখতে চান তাহলে অধ্যাদেশটি তামাদি হওয়ার আগেই পৃথক একটি বিল সংসদে পাস করাতে হবে। নতুন বিলের অধীনে তখন অধ্যাদেশটি রহিত করে দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষিতে সরকার এই আইন বহাল রাখার জন্য দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল করার প্রস্তাব সম্বলিত একটি বিল উপস্থাপন করে।

মাননীয় স্পীকার

সবচেয়ে আগে বিরোধী দলের মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই যে, তাঁরা এই বিতর্কে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু অনেকেই এই অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে খুব উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা যেসব বক্তব্য মনে করেছেন ভাল, সঠিক, সেগুলিই তাঁরা বলেছেন। আমার দায়িত্ব হল, তাদের এই বক্তব্যগুলি সত্যিকার অর্থে কতটুকু সঠিক সেটা এই সংসদকে অবহিত করা।

দ্রুত বিচার হল সময়ের দাবি। গণ মানুষের দাবি। বিরোধী দলের অনেক মাননীয় সদস্য এর আগে বলতেন, "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।" সেটা মানুষ চায় না। মানুষ চায় সুবিচার, সহজে, কম খরচে, দ্রুত বিচার। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত আছে বল আমি মনে করি না। দ্বিমত থাকতে পারে না। যারা অভিযুক্ত হবেন তাদের জন্যই মৌলিক অধিকার রয়েছে সংবিধানের আর্টিক্যাল ৩৫-এ। সেই অভিযুক্ত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার হল, একটি দ্রুত বিচারের মাধ্যমে তার মামলার নিষ্পত্তি হওয়া। যাতে তিনি যদি নির্দোষ হন তাহলে তাড়াতাড়ি তিনি যেন নির্দোষ হিসাবে বেরিয়ে আসতে পারেন, আর যিনি দোষী তিনি যাতে শাস্তি পান। তারজন্য এ দ্রুত বিচার। প্রচলিত আইনের অধীনেই এ বিচার মানুষ প্রত্যাশা করে। মামলার নিষ্পত্তি বিলম্বের কারণে আজ সমগ্র জনগোষ্ঠী বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এব্যাপারেও কোন দ্বিমত হতে পারে না।

তাই, বিচার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন। এ ব্যবস্থাকে আধুনিক, গতিশীল এবং যুগোপযোগী করার জন্য সর্বাঙ্গীণ একটি প্যাকেজ সংস্কার আনার বিভিন্ন পদক্ষেপ এ সরকার গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে একটি হল এই দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, যেটা আমরা এখানে বিবেচনার জন্য এনেছি, অর্ডিন্যান্স করার একই উদ্দেশ্য ছিল।

অন্যদিকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আওতায় আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ দমনের জন্য দ্রুত বিচার আদালত আইন আমরা বেশ কিছুদিন হলো করেছি এবং এই আইনের বাস্তবায়ন খুব চমৎকারভাবে এগিয়ে চলেছে। তখন বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দরা খুব জোর করে বলেছিলেন যে, এই আইন বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। আপনাদের সে বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

আমরা বাংলাদেশে নতুন trend সৃষ্টি করেছি। এ সংস্কার আনার মধ্যে আন্তরিকতা থাকতে হবে। আইন করলে চলবে না। আইনের প্রয়োগ সঠিকভাবে করেছি কিনা সেটা দেখতে হবে।

www.pathagar.com

আপনারা করেননি। আপনারা জননিরাপত্তা আইন করেছিলেন। আমরা বলেছিলাম, এটা রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে এবং ঠিক তাই করেছেন। এই জননিরাপত্তা আইনে ৩২ হাজার মানুষকে গ্রেফতার করেছিলেন তার মধ্যে ২৬ হাজার ছিল আমাদের দলীয় নেতা-কর্মী। সেই জননিরাপত্তা আইন আমরা চ্যালেঞ্জ করেছি সুপ্রীম কোর্টে। ২ জন জজ রায় দিয়েছেন, জামিনের অংশটাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে। এটা রেকর্ডের কথা। কিন্তু আমরা যে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী দ্রুত বিচার আদালত আইন করেছি, তার অধীনে, গত ৭ মাসে, ৫ হাজার ৫৫১টি আসামীর বিরুদ্ধে ২ হাজার ৭৮টি মামলা দায়ের করা হয়। তারমধ্যে ১ হাজার ১১৩টি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। ৭৭৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এ দ্রুত বিচার আদালতে। এই আইনের মাধ্যমে আপনাদের কাউকে জেলখানায় নেওয়া হয়নি। লালমনিরহাটে একজন এডভোকেটকে এই দ্রুত বিচার আইনের অধীনে অভিযুক্ত দেখিয়ে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু We are a responsible Government। আমরা প্রধামন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে সে মামলা থেকে সে ল'ইয়ারকে বাদ দিয়ে দিয়েছি। কেন? তিনি একজন আইন সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই আইন তাঁর উপর প্রয়োগ করা ঠিক হয় নি। যদিও তিনি আওয়ামী লীগ করতেন। কারণ আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম জাতির কাছে যে, এ আইন আমরা রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করব না এবং সে প্রতিশ্রুতি আমরা রক্ষা করেছি। আমরা অনেক মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে পেরেছি।

এখন আমরা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করেছি, এই জন্য প্রথমে অর্ডিন্যান্স করেছিলাম এখন সেটাকে আইনে পরিণত করতে যাচ্ছি। এই ট্রাইব্যুনালে পাঁচটি গুরুতর অপরাধের বিচার হবে—খুন, ধর্ষণ, বেআইনী অস্ত্র, মাদকদ্রব্য এবং বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত, অন্য কোন মামলা এই সব ট্রাইব্যুনাল এখতিয়ারে নেবে না। চাঞ্চল্যকর এবং বহুল আলোচিত মামলাগুলি পরিচালনায় সমন্বয় সাধন করার জন্য একটি মনিটরিং সেল করা হয়েছে, যার ফলে আমরা অনেক মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে পেরেছি।

মনিটরিং সেলের সমালোচনা করে আপনারা বলেছেন যে, যদি তৃষা হত্যা মামলা দুই মাস ১৪ দিনে শেষ করতে পারি তাহলে বাকি মামলাগুলি কেন করতে পারছি না? এটার উত্তর হল—মাননীয় স্পীকার, আমরা এই দ্রুত বিচারের প্রক্রিয়াটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাই। আজকে ব্যক্তি উদ্যোগে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উদ্যোগে কিছু মামলা তাড়াতাড়ি করে নিষ্পত্তি হচ্ছে। সেই জন্য তাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে, সমন্বয় সাধন করতে হচ্ছে। কারণ একজন মন্ত্রীর পক্ষে এত সময় দেওয়া কি সম্ভবপর? সেই জন্য এটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

আমরা কথা দিয়েছিলাম জাতির কাছে যে, আমরা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করব, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করব, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করব। সেই কারণে বর্তমান সরকারের তের মাস হয়েছে, এই তের মাসে অনেক মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এরমধ্যে বেশির ভাগ হচ্ছে বিগত সরকারের আমলের মামলা।

২৬,০০০ মানুষ খুন হয়েছিল ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। সেই মামলাগুলির মধ্যে ১৩৬টি মামলা ছিল নৃশংস এবং বহুল আলোচিত। প্রতিমাসে খুন হয়েছিল ৮৩টি, দিনে ১০ জন করে খুন হয়েছিল এবং প্রতিদিন সাতটা ধর্ষণ হয়েছিল আওয়ামী লীগের সময়ে। এগুলি সব পরিসংখ্যানের ব্যাপার। আমার নিজের মনগড়া কথা না।

আওয়ামী চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এসব অপরাধ ঘটানো হয়েছিল। আমি বলি, কেন এই মামলাগুলির বিচার হয় নি তখন? কারণ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা, তাঁদের সন্তানরা এই হত্যা এবং ধর্ষণের সাথে জড়িত ছিল, সেই জন্য সেদিন তাঁরা বিচার করেন নি। এডভোকেট হাবিব মণ্ডল হত্যার বিচার হয়নি, বুশরা হত্যার বিচার হয়নি, শাজনীন হত্যা মামলার বিচার হয়নি, তানিয়া ধর্ষণ মামলার বিচার তাঁরা করেন নি, মহসিন হত্যার বিচার করেন নি, রুবেল হত্যা মামলার বিচার করেন নি, ভারতীয় নাগরিক জিবরান তায়েবী হত্যা, মহিমা হত্যা, জাহানারা গণধর্ষণ, শিপু হত্যা, সুমন হত্যা, রুমা ধর্ষণ–এধরনের অজস্র মামলার বিচার করেন নি। কেন করেন নি সকলে জানে। কারা জড়িত ছিল তাও আমরা জানি, সারা জাতি জানে।

এডভোকেট নুরুল ইসলাম, সাংবাদিক শামছুর রহমান, কাজী আরিফ হত্যা মামলার বিচার কেন করেন নি? উদীচী বোমা হত্যা মামলার কথা বলেন, কেন বিচারগুলি করেন নি? আজকে এই লম্বা

www.pathagar.com

লিস্ট যদি দেই তাহলে অনেক সময় লেগে যাবে। শুধু এই কথাই বলতে চাই this government means business, we mean business আমরা যা মুখে বলি কাজে তা করার চেষ্টা করি। এখন দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে।

বিরোধী দল বলেছেন যে, আমরা আইনের শাসনের নামে তাঁদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এই বিল এনেছি। অনেকে এখানে দাঁড়িয়ে আমাদের নেত্রীকে দোষারোপ করার চেষ্টা করেছেন। দেশের আইন-শৃঙ্খলার উপরে বলেছেন। আপনারা ভুলে গেছেন যে, "যদি একটি লাশ পড়ে তাহলে দশটি লাশ পড়বে।" এই কথাটা আমাদের কেউ বলেন নি। আপনাদের নেত্রী এখানে নেই, তিনি বলেছিলেন। তার কী জবাব? সে জবাব তো এই পার্লামেন্টে দিতে হবে তাঁকে। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে এই ধরনের একটি কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন। "অপরাধীদের ধরতে দু'চারটা লাশ পড়লেও কোন অপরাধ হবে না।" এ কথা তিনি বলেছিলেন এবং *দৈনিক সংগ্রাম* পত্রিকায় ২০ জুলাই, ২০০০ তারিখে একথা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। "আপনারা ব্যর্থ হলে আমার দল অস্ত্র হাতে নেবে"—প্রধানমন্ত্রী একথাও বলেছিলেন। আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী।

এখানে অনেকে বলেছেন যে, দ্রুত বিচার করেছেন, কিন্তু জাতির জনক হত্যার বিচার করেন না কেন? জাতির জনক হত্যার বিচার হয়ে গেছে নিম্ন আদালতে। এখন তো আপীল মামলা সুপ্রীম কোর্টের আপীলেট ডিভিশনে আছে। এখানে সরকারের করণীয় কিছু নেই। কারণ, যিনি আপনাদের আইনজীবী, জনাব সিরাজুল হক মারা গেছেন। আমি তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। তিনি আপনাদের আইনজীবী ছিলেন। আপনাদের নিয়োজিত আওয়ামী লীগের উকিলকে আমরা বদলাই নি, এটা বিএনপি সরকার বলে সম্ভবপর হয়েছে। আপনারা ক্ষমতায় গেলে over-night change করে দিতেন তাঁদেরকে। সরকারের পয়সা দিয়ে জাতির জনকের হত্যার বিচারকার্যের জন্য যে আইনজীবী রেখেছিলেন সেই আইনজীবীকে আমরা সরিয়ে দিইনি। তাঁরাই মামলা পরিচালনা করেছেন। যদি মামলা বিলম্বিত হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের কারণেই হয়েছে। সরকারের কোন কারণে হয় নি। আজ মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ নাসিম সাহেব একটা মামলার কথা বলেছেন, ওনাদের সময়ে তা আটমাসে নিষ্পত্তি করেছেন। শুনে খুশি হলাম। তাহলে আপনাদের জাতির জনক, আপনাদের বঙ্গবন্ধু যার কথা বলতে আপনারা অজ্ঞান হয়ে যান, তাঁর হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যবস্থা পাঁচ বছরে করেননি কেন, সেই উত্তর জনগণকে আপনাদেরকেই দিতে হবে।

আমরা যদি তৃষা হত্যা মামলা ২ মাস ১৪ দিনে সম্পন্ন করতে পারি—আপনারা যে পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিলেন সেই পাঁচ বছরে তাঁর বিচার সম্পন্ন করতে পারলেন না কেন? তার মামলা হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টে নিষ্পত্তি করতে পারলেন না কেন? এর জবাব আপনারা আপনাদের নিজেদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করুন। আমাদেরকে দেওয়ার দরকার নেই। কারণ আমরা এর জবাব জানি। Because, Awamil League was an incompetent government। একটা অদক্ষ, অযোগ্য সরকার ছিল। সেজন্য পারেন নি এবং সেজন্য নির্বাচনে হেরেছেন। আর এ কথা যদি সত্য না হয় তাহলে বলতে হবে যে আপনারা ইচ্ছা করেই এই মামলা নিষ্পন্ন করেন নি। রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার জন্য এই মামলাটাকে জিইয়ে রেখেছেন। সেইজন্য এখনও এই মামলার শুনানির কোন উদ্যোগ আপনারা গ্রহণ করছেন না। শুধু বক্তৃতা বিবৃতির মধ্যে এই বিষয়টাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

আমি এখন আইনটা একটু explain করতে চাই। প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। আপনারা মৌলিকভাবে দু'তিনটা প্রশ্ন করেছেন। বলেছেন, এই অর্ডিন্যান্স অনুমোদন করা উচিত হবে না। পার্লামেন্ট বসবে—এটা জেনে অর্ডিন্যান্স না করে, we should have waited। আমি agree করি। কারণ, যেখানে একটা গণতান্ত্রিক সরকার, একটা পার্লামেন্ট বসে, সেখানে সাধারণত অর্ডিন্যান্স করে আইন করাটা ঠিক নয়। তবে এ ধরনের অবস্থার যদি সৃষ্টি হয় যখন সংসদ অধিবেশনে নেই, তখন article 93তে এই ক্ষমতাটা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া আছে। এই সংবিধান আপনারাই রচনা করেছিলেন। মাননীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত has to hear। এত বড় বড় কথা বলেছেন, সংবিধানের প্রশ্ন তুলেছেন।

www.pathagar.com

এই সুরঞ্জিত বাবু ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদে যা আছে সেটা তিনি endorse করতে পারেন না। কারণ, তিনি সেই সংবিধানে সই করেন নি। He was one of the four persons who did not sign the constitution of 1972. He took the floor many times. I have read the entire proceedings. Yes you argued very well. But you did not sign the constitution। সেই কারণে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে তিনি হেরে গেলেন। জিতেছিলেন কিন্তু আওয়ামী লীগ জিততে দেয়নি। শাজাহান সিরাজ ৭০ হাজার ভোটে জিতেছিল। তাকে ঘোষণা করে পরের দিন বলেছে, না জিতেনি। That was the record of the 1973 election of Awami League and you are a victim of that। এর একটা কথাও অসত্য নয়।

এখানে আমাদের একজন মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছেন যে, এখনও তো ট্রাইব্যুনাল কাজ শুরু করতে পারে নি। সুতরাং অর্ডিন্যান্স কেন?

আমরা অর্ডিন্যান্স করে তিন সপ্তাহ অগ্রসর হয়েছি। আজকে যদি এই বিলটি পাস করে এই কোর্টগুলি করতাম, তাহলে আমাকে আরও তিন সপ্তাহ পরে এই প্রক্রিয়া শুরু করতে হতো, আমার চার সপ্তাহ loss হতো। আমরা তো বিচারের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তিনি বলেছেন, এই অর্ডিন্যান্স সংবিধানবিরোধী। কোন্ পয়েন্টে বিরোধী সেটা তিনি বলেননি। কিসের জন্য বিরোধী সেটা বলেননি। This Ordinance is made under Article 93 of the Constitution। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, argument করতে পারনে, বলার খাতিরে বলতে পারেন, পল্টনের মত বক্তৃতা দিতে পারেন। কিন্তু You will not be able to say that it is an unconstitutional Ordinance. Only the Supreme Court can say that।

উনারা আর একটি পয়েন্ট তুলেছেন। সেটা হল, একই অপরাধে অপরাধী দুইজন ব্যক্তির দুই রকমের আদালতে কেন বিচার হবে। That is a very substantive point. This is a very good point, strong point। আমি এটার উত্তর দিচ্ছি।

আমাদের বর্তমান বিচার ব্যবস্থার দিকে যদি তাকিয়ে দেখেন, তাহলে দেখবেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট এবং সেশন জজ একই অপরাধের সাজা দিতে পারেন, বিচার করতে পারেন। আমি সেকশনগুলি বলছি। Penal Code-এর সেকশন 123, 124(A), 314, 315, 327, 328, 367, 368, 286, 347 and 490 এগুলি ম্যাজিস্ট্রেটও বিচার করতে পারেন, আবার সেশন জজও পারেন। এসিসটেন্ট সেশন জজও পারেন। আবার এডিশনাল সেশন জজও পারেন। সুতরাং যেই মামলা সেশন জজ করছেন, মাননীয় স্পীকার, you are a very experienced lawyer in criminal law। যেই মামলা সেশন জজ করতে পারে, সেই মামলা সেশন জজ এডিশনাল সেশন জজকে দিয়ে করাতে পারেন। আবার একই মামলা এসিসটেন্ট সেশন জজ দিয়েও করাতে পারেন এবং একই সাজা দিতে পারেন। একটা হল, জুনিয়র কোর্ট, আর একটি হল সিনিয়র কোর্ট, ভিন্ন কোর্ট। সুতরাং এই ভিন্ন কোর্টে একই অপরাধের দুই মামলা দুই আসামী দুইভাবে face করছে। It is upto the State। Prosecution যদি মনে করে যে, এই আসামীকে এই কোর্টে বিচার করাবে, সেইভাবেই সেটা করা হয়। As long as it is not the same case। আজকে উনারা যেটা বলেছেন, তার প্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই, একই ধরনের offence-এর জন্য দুই ধরনের আদালতে বিচার করা এখনই আমাদের প্রচলিত আইনে সম্ভবপর, under the Criminal Procedure Code, এটা অস্বীকার করার কোন উপায় কারো নেই। আজকে ক্রিমিনাল ল' যাঁরা প্র্যাক্টিস করেন, তাঁরা ভালভাবেই জানেন। সিডিউল-২, কলাম-৮টা ভালভাবে পড়ে দেখেন। সেখানে দেওয়া আছে কোন্ কোন্ অপরাধের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটও বিচার করতে পারবে, আবার এসিসটেন্ট সেশন জজ বা সেশন জজ করতে পারবে। আর একটি কথা বলা দরকার। অনেক মামলায়, অনেক অফেন্সের জন্য concurrent juridsiction আছে। সেজন্য more than one court is already existing under our law। সুতরাং উনাদের যে argument, যে দুটো বিচার হচ্ছে বা একই অপরাধের জন্য দুটো আদালতে বিচার হচ্ছে—এই কথাটির মধ্যে কোন substance নেই।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে আমরা ট্রাইব্যুনাল কেন করলাম? মাননীয় স্পীকার, এটা কোন ভিন্ন আইন নয়, ভিন্ন একটা আদালত করেছি মাত্র। আপনাদের third প্রশ্ন pick and choose-এর কথা যেটা তুলেছেন সেটার জবাব আমি দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমি বলতে চাই কেন আমরা এই ট্রাইব্যুনাল করলাম, কেন দরকার হল?

আমি আগেই বলেছি দ্রুত বিচারের প্রক্রিয়া আমরা যেটা শুরু করেছি সেটা এখন মনিটরিং সেলের মাধ্যমে করা হয়। আমরা এটাকে institutionalise করতে চাই। আমাদের যদি আরও সম্পদ থাকত, অর্থ থাকত, আমরা আরও অনেক আদালত করতাম। এই যে, বছরের পর বছর মামলা বিলম্বিত হয়, কোর্টে পড়ে থাকে, এগুলির বিচারের ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু আমাদের সংগতি কম, আমাদের আর্থিক অসুবিধা আছে। তারপরেও আমরা চেষ্টা করছি, নতুন আর একটি আদালত করে আরও কিছু মামলা যদি দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় তাহলে দেশের মানুষ আমাদের বিচার বিভাগের উপর আস্থা ফিরে পাবে। এই ট্রাইব্যুনাল কেন করা হচ্ছে? মাননীয় স্পীকার, বর্তমানে যারা সেশন জজ আছেন। আপনি তো ভাল করেই জানেন, তারা motion শোনেন, তারা appeal case শোনেন, revisional case শোনেন, আবার জেলা জজ হিসাবে অনেক ধরনের civil caseও শোনেন। সুতরাং এখন যে কোর্টগুলি আছে, over loaded, they have to do so many types of cases। যার জন্য এই গুরুতর মামলা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। আমরা মনিটরিং করে কতগুলি করব? সেই জন্য এই ট্রাইব্যুনালগুলি শুধু পাঁচটি নির্দিষ্ট শাস্তির জন্য মামলা করবে, এর বাইরে কোন মামলা করবে না। হত্যা, ধর্ষণ, অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য এবং মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলাগুলি করবে, অন্য কোন মামলা করবে না। যার জন্য এই কোর্টগুলি freely এই মামলাগুলি করার সুযোগ পাবে এবং অন্য কোন মামলা করবে না। তারপরেও প্রয়োজন হলে আরও নতুন কোর্ট করা হবে এবং প্রচলিত আইনে কোর্ট করা হবে। এখানে মৌলিক ধরনের কোন নতুন আইন করা হয়নি, যেটা অনেকে ভুল বুঝে বলেছেন।

এই ordinance ছিল সম্পূর্ণভাবে সংবিধান সম্মত একটি আইন। আপনারা ordinance টাই পড়েছেন, আমরা যে বিল আজকে এনেছি, এই বিল আপনারা পড়েননি। আপনারা যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন, যদি এই বিলটি পড়তেন তাহলে আপনারা তার উত্তর পেতেন।

উনারা আরও একটি প্রশ্ন তুলেছেন মামলা স্থানান্তর করার ক্ষমতা সম্পর্কে। একটা মামলা হবে আর একটা হবে না। এই pick and choose এর ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে সরকারকে। আমি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিধান করা হয়নি। এটার প্রমাণ আমরা এরই মধ্যে দ্রুত বিচার আদালত আইনের মাধ্যমে দিয়েছি। যেটা আপনারা জননিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে দিতে পারেননি। আজকে আমরা যদি প্রতিহিংসার রাজনীতি করতে চাইতাম তাহলে জননিরাপত্তা আইন আমার প্রধানমন্ত্রী রহিত করার জন্য বলতেন না, বরং বলতেন, রাখ এই আইন, এটা দিয়েই তাদেরকে শায়েস্তা করব। কিন্তু আমরা রাখিনি। বিএনপি সরকারের জন্য আজকে ৮জন বক্তৃতা দিতে পেরেছেন অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আইন যে দিন করেছিলেন, ভুলে যাবেন না, ৪৫০০ সংশোধনী এনেছিল আমাদের সংসদ সদস্যরা, আর মাত্র ৮ মিনিট সময় দিয়েছিলেন। আপনাদের এই রেকর্ড আমরা পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। Please, allow me to speak 4500-এ সংশোধনী আলোচনার জন্য ৮ মিনিট সময় দিয়েছিলেন। Any how we have set a good example so that you follow it in future.

আমরা এর মধ্যে ৩০টি মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে পাঠিয়েছি। তাঁদের নালিশ হল জনাব হাসনাত[১] সাহেবের মামলা কেন ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হল। কিন্তু বাকি ২৯টির কথা বলেন নি। বাকি ২৯টি মামলা যে আমরা transfer করেছি সেই কথা বলেননি। জনাব হাসনাত আইনের উর্ধে নন। দলীয় নেতা তাঁদের, তাই তাঁরা খুব চিন্তিত। এই মামলাগুলি রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করার কোন অবকাশ নেই। তবে ধর্ষণ যদি করে থাকেন তাহলে সেই মামলা অবশ্যই দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে যাবে। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা কেউ হত্যার সঙ্গে জড়িত নন, আপনারা বেআইনী

১. ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে বরিশাল-১ আসনে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ।

www.pathagar.com

অস্ত্র রাখেন না, আপনারা মাদক ব্যবসা করেন না, আপনারা নারী ধর্ষণ করেন না। যদি করেন তাহলে ভয় পাবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। দলমত নির্বিশেষে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। আর যদি এগুলির সাথে জড়িত না থাকেন তাহলে চিন্তার কোন কারণ নেই।

আমি প্রায় আমার বক্তৃতা শেষ করে এসেছি। আমি আর দুটি কথা বলব। একটি হল—তাঁরা বলেছেন জবাবদিহিতার কথা। মাননীয় সদস্য জনাব সুরঞ্জিত খুব strongly বলেছেন যে, আদালতকে জবাবদিহিতা করার জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন, এটা বেআইনী, এটা অসাংবিধানিক।

শেখ হাসিনার বক্তব্য— *প্রথম আলো* ৫ আগস্ট ২০০০ সাল। "সাংবাদিক সম্মেলনে আদালতে জামিনের ব্যাপারে উকিলদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর পুনরুক্তি"—"যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। জনগণের ট্যাক্সের পয়সা যারা খায় তাদের সকলের জবাবদিহিতা থাকতে হবে।" এটা আমার কথা নয়, এটা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন। শেখ হাসিনা তখন বলেছেন—"আমি জনপ্রতিনিধি হয়েও যদি আমাকে জবাবদিহি করতে হয়, রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগকে যদি জবাবদিহি করতে হয়, তাহলে বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা থাকবে না কেন?" আমরা এতদূর যেতে চাই না। আমরা শুধু বলেছি যে, ট্রাইব্যুনালের জজ মামলা নিষ্পত্তি করতে অপারগ হলে প্রধান বিচারপতির কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন, সরকারের কাছে একটি অনুলিপি পাঠাবেন।

আমার শেষ বক্তব্য হল, আমরা বিলটি অর্ডিন্যান্সের আদলে এনেছি with some improvement। এই বিলটি আপনারা পড়লে বুঝবেন। প্রথম কথা হল, আমরা মজুদদারি শব্দটি বাদ দিয়েছি। Session শব্দটি হয় না, কারণ আমাদের সংবিধানে Session বলে কিছু নেই। সেজন্য ওটাকে দায়রা জেলা জজ ও দায়রা জজ করা হয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত জজ এটাকে বাদ দিয়েছি, সংবিধানসম্মত করার জন্য। শুধু ৫টি অপরাধের জন্যই এ মামলা হস্তান্তর করা যাবে, এর বাইরে করা যাবে না। অর্ডিন্যান্সে অনেকগুলি ছিল, কিন্তু এখন নেই। আর একটি হল, জবাবদিহিতার যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এব্যাপারে আমাদেরই একজন মাননীয় সংসদ সদস্য একটি সংশোধনী আনবেন।

এই অর্ডিন্যান্সটি হল একটি dying law। It is going to die to-day। জনাব সুরঞ্জিত, for nothing সময় নষ্ট করেছেন আপনি। বরং বিলের উপর আলোচনা করলে ভাল করতেন। আজকে এই বিল যখনই পাস হবে এই ordinance-এর মৃত্যু ঘটবে।

তবে আপনাদের argument অনেক উপভোগ করেছি।

মাননীয় স্পীকার আপনাকে ধন্যবাদ।*

---

* বিলটি ঐদিন কণ্ঠভোটে পাস হয় এবং সাথে সাথে অধ্যাদেশটি রহিত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের শুধু বেসামরিক বিচার প্রক্রিয়া থেকে দায়মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে

যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ এবং আইন, ২০০৩

২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদ অধিবেশন যখন থাকে না তখন রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ সরকার প্রয়োজন বোধ করলে অধ্যাদেশ জারি করে আইন প্রণয়ন করতে পারেন, তবে সেই আইন সংসদের পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম দিনে উত্থাপিত হতে হবে এবং সেই দিন থেকে সেই অধ্যাদেশ কেবল ৩০ দিনের জন্য বলবৎ থাকবে, যদি উক্ত সময়কালের মধ্যে সেই অধ্যাদেশটি রহিত করা না হয় অথবা সংসদ একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে তা অননুমোদন করেন। সরকার যদি এই অধ্যাদেশটি আইন আকারে অব্যাহত রাখতে চান তাহলে অধ্যাদেশটি তামাদি হওয়ার আগেই পৃথক একটি বিল সংসদে পাস করাতে হবে। নতুন বিলের অধীনে তখন অধ্যাদেশটি রহিত করে দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষিতে সরকার এই আইন বহাল রাখার জন্য যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ রহিত করার প্রস্তাব সম্বলিত একটি বিল, যৌথ অভিযান দায়মুক্তি বিল, ২০০৩ উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে কার্য প্রণালী বিধি অনুযায়ী বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বিলটির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন এবং অধ্যাদেশটি অনুমোদন না করার জন্য একটি দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন।

মাননীয় স্পীকার

আমি ভেবেছিলাম মাননীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত হাসপাতালে আছেন। I am glad to see him well। তবে সংবিধান, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা আওয়ামী লীগের মুখে শোভা পায় না। এই সংবিধানকে খণ্ড বিখণ্ড করেছিলেন আপনারা এই সংসদে। আপনারা আজ সংবিধানের কথা বলেন, মানবাধিকারের কথা বলেন। বিলের উপর আপত্তি তুলতে গিয়ে, he went out of track। উনি ট্র্যাকের বাইরে চলে গেছেন। একটি বিল এনেছি। বিল ভাল হতে পারে, খারাপ হতে পারে। সমালোচনা করতে পারেন। You can object to it but not make a long political statement like this। সামরিক বাহিনীর স্বার্থের কথা বলেছেন। এই সামরিক বাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের প্রথম সরকার চেষ্টা করেছিল। রক্ষী বাহিনী গঠন করেছিলেন। রক্ষী বাহিনীকে অনেক সাজসরঞ্জাম দিয়েছিলেন to undermine the Armed Forces of Bangladesh। এই সামরিক বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের ফসল। এই সামরিক বাহিনীকে তারা সেদিন দাঁড়াতে দেয়নি। আজকে সামরিক বাহিনীকে বিতর্কের উর্ধে রাখার কথা আপনারা বলছেন। কোনো কথা টিকবে না। Record will say, আপনাদের track record খারাপ। আমি ভেবেছিলাম বিলের উপর আমার বক্তব্যটা আমি পরে দেব। কারণ উনারা এই অর্ডিন্যান্সকে অননুমোদন করার জন্যে অনেকগুলি প্রস্তাব এনেছেন। নিয়ম হল আমি উত্থাপনের পর বিলটি বিবেচনায় যাওয়ার আগে উনাদের প্রস্তাবগুলি despose করতে হবে। কিন্তু not at this stage। অননুমোদন প্রস্তাব হাউজে গৃহীত হবে কি হবে না, সেই সিদ্ধান্তের পরে আমার বিলটা বিবেচনায় আসবে। কিন্তু আমার learned friend সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত যা বলার বলে ফেলেছেন। আমি ভেবেছিলাম আজকে আমি তাদের অননুমোদন করার জন্য যে প্রস্তাবগুলি এনেছেন, তার উত্তরে আমি আমার বক্তব্য রাখব। আর এটাই নিয়ম। কিন্তু he has raised some points which I have to contradict। Fourth Amendment-এর কথা ভুলে গেছেন? চতুর্থ সংশোধনী বিল ১১ মিনিটের মধ্যে পাস করেছিলেন পার্লামেন্টে। মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিলেন। বিচার বিভাগকে প্রশাসনের অধস্তন করেছিলেন। আপনারা এখন মানবাধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন।

আর এই সংবিধান? সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত you did not sign it. I told you last time. He did not sign it। এখানে Article 46-এর বিধান কেন করা হয়েছিল? সংবিধান প্রণয়নের সময় এখানে মোমেন সাহেব[১], জিল্লুর রহমান সাহেব, রাজ্জাক সাহেব[২] ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। এখানে বেশির ভাগই তখন ছিলেন না। এখন এই সুরঞ্জিত বাবু যদি Article 46 -এর বিরুদ্ধে কথা বলেন, আমার তাতে আপত্তি নেই। Because he is not a signatory to this constitution। But আওয়ামী লীগের সমস্ত লীডারই এই সংবিধানে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই বিল অবশ্যই সংবিধান সম্মত। সংবিধান অনুযায়ী এই বিল আনা হয়েছে। যে সংবিধান আপনারা রচনা করেছিলেন, যে Article-46 আপনারা সংবিধানে incorporate করেছিলেন সেই Article অনুযায়ী এই বিল আজকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংবিধানসম্মত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে আপনারা dispute করতে পারেন। There can be differences of opinion। এই differences of opinion you cannot resolve। I cannot resolve। This parliament cannot resolve। It lies with the Supreme Court। আমরা তো সংবিধান অনুযায়ী এনেছি। আপনারা বলবেন হয়ত এটা সংবিধানসম্মত হয় নি। It's upto you. But that does not mean যে, এটা সংবিধান সম্মত হয় নি।

সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। I was looking for an opportunity। আজকে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি substantive statement করেছেন। আপনাদের কেউ হলে বিরোধী দলকে আক্রমণ করে কথা বলতেন। কিন্তু তারপরও আপনারা নিজেদের দোষ নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নিয়েছেন। We will not spare you on this if the matter is discussed in this House. We have facts and figuures. We will substantiate our statement with facts.

কারা আজকে দায়ী বাংলাদেশের এই ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য? 8th Amendment-এর কথা বলে কোনো লাভ হবে না। কারণ Constitution-এর যে fundamental framework আছে সেই framework এর উপরে 8th Amendment-এর judgement-টা ছিল। মাননীয় স্পীকার, you are aware of that। সুতরাং সুরঞ্জিত বাবুর এই বক্তব্যটা একেবারেই অবান্তর এবং irrelevant।

(এই সময় শেখ হাসিনা তাঁর আসন থেকে লেখককে উদ্দেশ করে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে কিছু মন্তব্য করেন।)

Don't make any personal attack, it is unbecoming of a Leader of the Opposition। বিরোধী দলের নেত্রী হিসাবে শোভা পায় না। সুরঞ্জিত যদি আমাকে এ্যাটাক করে, ঠিক আছে। I can take on him. But when you say something courtesy demands that I should not take on you। সুতরাং আপনি যদি একটু personal attack বাদ দিয়ে কথা বলেন তাহলে বোধ হয় শোভনীয় হয়।

আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এই বিল এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত যা কিছু এখানে বলেছেন এটার কোনটাই আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ।*

---

* এই পর্যায়ে বিলটি উত্থাপনের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের সদস্যগণ ওয়াক আউট করেন। এরপর মাননীয় স্পীকার অধ্যাদেশটির উপর অননুমোদনের প্রস্তাবসমূহ ভোটে দিলে সংসদ তা প্রত্যাখ্যান করে।

১.আবদুল মোমিন, জাতীয় নির্বাচন ১৯৭৩ ও ২০০১-এ যথাক্রমে ময়মনসিংহ-২২ আসনে এবং নেত্রকোনা-২ আসনে সদস্য নির্বাচিত হন।

২.আবদুর রাজ্জাক।

www.pathagar.com

যৌথ অভিযান দায়মুক্তি আইন ২০০৩
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

বিরোধী দলের আনীত যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশটি অননুমোদনের প্রস্তাবটি সংসদ প্রত্যাখ্যান করার পর দায়মুক্তির বিলটি স্থায়ী কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত করে। বিলটি তখন সংসদে বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা হয়। কিন্তু বিলটির সবচাইতে বড় এবং যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা উত্থাপন করা হয় ধারা ৩-এর উপর। এই ধারা বলে শৃঙ্খলা বাহিনী এবং তাদের সদস্যদের সকল প্রকার আইনের প্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল, এমনকি তাদের নিজস্ব আইনসমূহ থেকেও। অর্থাৎ অভিযান চলাকালে কোন সেনা সদস্য যদি কোন অন্যায় বা নিয়মবহির্ভূত বা বেআইনী বা শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোন কাজ করে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও তারা অব্যাহতি পাবে। সরকার তাৎক্ষণিকভাবে তখন বিলে একটি সংশোধনী আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই পর্যায়ে বিলটির বিবেচনা স্থগিত করা হয়।

এই ধরনের একটি পর্যায়ে বিল বিবেচনা স্থগিত করা বা বিলে কোন সংশোধনী আনা যায় কিনা সে ব্যাপারেও আপত্তি উত্থাপন করা হয়। সাথে সাথে এই আইনকে ৯ জানুয়ারি থেকে retrospective effect দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় আর একটি সংশোধনীর মাধ্যমে।

মাননীয় স্পীকার

আমরা যখন সরকারের তরফ থেকে পার্লামেন্টে কোন বিল উত্থাপন করি তখন রুল্‌স অব বিজনেস অনুযায়ী এটা করা হয়। ১৯ তারিখে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী কিছু কথা উত্থাপন করেছিলেন। তিনি একটা constructive বক্তব্য রেখেছিলেন, সেইজন্য আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু যখন তিনি মানবতার কথা বলেন, তখন আমি একটু চিন্তিত হই। তাঁর অতীতের কোন কোন সময়ের ভূমিকা তখন মনে পড়ে যায়। যাই হোক তিনি বলেছেন, এই দায়মুক্তির বিল আনার জন্য দেশের মানুষ আমাকে সব সময় স্মরণ করবে। এমন একটা ভাব যেন, বিলটি আমি পাস করছি। আমি শুধু তাঁকে জানাতে চাই, this Bill will be passed by this Parliament, এই পার্লামেন্ট পাস করবে এই বিল under the Constitution of this country। এটা কোন ব্যক্তির বিল নয়। এটা এই সংসদের বিল। শুধু এটুকুই বলব। এটা আমি সংসদের transcript থেকে এজন্যই পড়েছি যে, কিছু কিছু সংবাদপত্র বলার চেষ্টা করেছে, I am not a party to this bill, সেই কথাটাও সঠিক নয়।

একটি সংবাদপত্র বলেছে, আমি নাকি বলেছি, It is not my bill। কথাটা সত্য নয়। সেটা বলি নি। আমি যেটা বলেছি, সেটা হল, এটা কোন ব্যক্তির বিল নয়, সেজন্য আমি প্রসিডিউরটা একটু বলার চেষ্টা করছি যাতে বিরোধী দলের সদস্যরাও বুঝতে পারেন। Concerned Ministry, যাঁরা এই বিল তৈরি করার দায়িত্বে থাকেন তাঁরা প্রথমে সেটাকে কেবিনেট ডিভিশনে পাঠান। কেবিনেট ডিভিশন মন্ত্রিপরিষদের সভায় এই খসড়া বিলটি agenda হিসাবে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারপরে বিলটির উপর মন্ত্রিপরিষদ উপযুক্ত মনে করলে প্রথমে একটা নীতিগত অনুমোদন দেন। তারপরে সেই আইনটিকে মন্ত্রিপরিষদ আবার চূড়ান্ত অনুমোদন দিলে সেই বিলটি তখন আমরা পার্লামেন্টে পাঠাই সংসদে উত্থাপনের ব্যবস্থা করার জন্য। সুতরাং এই বিলটি সরকারের বিল এবং আইন-মন্ত্রী হিসাবে আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি এবং এই দায়িত্ব I will continue to perform to the best of my ability। This is what I would like to say and have it recorded in this Parliament on behalf of the government.

আমি আমার বক্তব্য শুরু করার আগে আর একটু বলতে চাই, just to clarify। Kaul-এর বইয়ে ৫২০ পাতায় আছে:

> At any stage of a Bill which is under consideration in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned can be moved with the consent of the Speaker.

আপনি সেদিন সম্মতি দিয়েছেন এটা স্থগিত করার, সেজন্য সেটা স্থগিত হয়েছে। ৫২১ পাতায় আরও বলা হয়েছে:

> There have also been occasions when the debate on a Government Bill was adjourned either on a motion or without a motion having been moved and

www.pathagar.com

adopted, in order to enable the Government to have informal discussion with the members interested in the Bill.

আমরা exactly তাই করেছি। কারণ I needed to consult the Prime Minister and some of my collegues at that particular moment to meet the demand of the House। এটাও ৫০৮ পাতায় আছে:

A last minute amendment to a Bill may also be admitted, if agreed to and accepted by the mover of the Bill

I am the mover of the Bill। আমার বক্তব্য হল, এমনকি বিল পাস হয়ে যাওয়ার পরেও যখন এটা প্রেসিডেন্টের কাছে যায় for his assent। Before the assent is given, if the government thinks that an amendment will be needed to the Bill, তখন ঐ stage-এ প্রেসিডেন্ট বিলটি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন, সেটাও ৫১৮ পাতায় রয়েছে। তখন আবার বিলটি পার্লামেন্টে আসবে, আবার আমরা সংশোধনী আনতে পারব before it can be passed and then sent to the President for his assent। সুতরাং বিলের সংশোধনী যে কোন stage-এ আনা যায়। আমরা সেকেন্ড রিডিং শেষ করি নি এবং বিল পাসের প্রস্তাবও উত্থাপন করি নি। সুতরাং সহজেই সংশোধনী আনা যায়, সেটাই আছে আমাদের Rules of Procedure-এ। Convention আছে একই রকম।

এখন আমি যে তিনটি সংশোধনী এখানে আনা হয়েছে, সংক্ষেপে তার উপর দুয়েকটি বক্তব্য রাখব। আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাই না, শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের প্রতি, সংসদের প্রতি, সংবিধানের প্রতি কোন দিনই সম্মান দেখায়নি। আজকেও তাঁরা সেটা প্রমাণ করেছেন, তাঁরা সেটা দেখাতে নারাজ। তাঁদের Political কেমিস্ট্রিতে একটু গোলমাল আছে, তাঁদের blood stream এবং political genes-এ problem আছে। সেই জন্য তাঁরা সম্মান দেখাতে জানেন না। এখানে দাঁড়িয়ে সুরঞ্জিত বাবু বললেন যে তিনি বলবেন, তারপরে সালাউদ্দিন[৩] সাহেব বলবেন, তারপর আপনি আপনার রুলিং দেবেন। ভাল কথা, আপনি allow করলেন, you were very very kind to allow him to speak। তারপরে কী করেছেন? আপনি নিজেই দেখেছেন। নিয়ম-কানুন তারা মানতে চায় না।

আমি এখন আসি সংশোধনীগুলিতে। আগে ধন্যবাদ জানাই জনাব রেজাউল বারী ডিনাকে। আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি একটি সংশোধনী এনেছেন যার একটা গুরুত্ব এবং তাৎপর্য আছে। বাকি দুটি সংশোধনী জনাব সামসুল আলম প্রামাণিক এনেছেন, তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই। সংশোধনীগুলি হল, আমরা যে অর্ডিন্যান্স করেছিলাম সেই অর্ডিন্যান্সে দায়মুক্তি ব্যাপারে শৃঙ্খলা বাহিনীর সমস্ত আইনগুলিকে include করে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী তাদের নিজস্ব আইনে তাদের সদস্যদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত অপরাধের বিরুদ্ধে যে কতগুলি পদক্ষেপ নিতে পারত, সেটা থেকে আমরা তাদেরকে বঞ্চিত করে দিয়েছিলাম। সেই জন্য ডিনা সাহেব যে সংশোধনী এনেছেন, তাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। অর্থাৎ এই সংশোধনীর ফলে প্রতিরক্ষা বহিনী এখন তাদের সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। Total immunity প্রত্যাহার করা হল। শুধু Civil Law-এর অধীনে immunity থাকবে। এখন এই যে interim period ৯ জানুয়ারি থেকে এই বিল পাস করা পর্যন্ত—এ সময়টুকুর কী হবে। তাহলে এই period-এ যে right accrued হল, সেই right-এর কী হবে? সেটাকে overcome করার জন্য প্রামাণিক সাহেব দুটো সংশোধনী এনেছেন। প্রথমটি হল, "এই আইন ৯ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে"। অর্থাৎ এই আইনটি will be deemed to have come into existence on the 9th of January, retrospective effect দেওয়া হল। আর রহিতকরণের ব্যাপারে "যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ ২০০৩ এতদ্বারা এইরূপ রহিত করা হল যেন উহা জারি করা হয় নি"। In order to take care of that period এই দুটো amendmentও গুরুত্বপূর্ণ।

৩. সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী।

www.pathagar.com

এই দায়মুক্তি বিল সংশোধনের তাৎপর্য অপরিসীম। দায়মুক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক পরিবর্তন আনা হয়েছে এই সংশোধনীগুলির মাধ্যমে। সেনা সদস্যদের এভাবে ঢালাওভাবে দায়মুক্তি দেওয়ার বিরুদ্ধে সংস্থার বাইরেও বিশেষ করে সুশীল সমাজ এবং সংবাদপত্রে তীব্র প্রতিবাদের আওয়াজ ওঠে। As a responsible government we had to respond to such crticism and demand। এখন এই সংশোধনীর ফলে প্রতিরক্ষা বাহিনী তাদের নিজস্ব আইনের অধীনে স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাবে। যৌথ অভিযানকালে যদি প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোন সদস্য আইন-শৃঙ্খলাজনিত কোন অনিয়ম বা অপরাধ করে থাকে তাহলে তাদের কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব আইনসমূহের অধীনে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। আমি এর আগেও বলেছি যে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সকল বিতর্কের উর্ধে রাখতে হবে। তাদের মান, মর্যাদা, ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রতিরক্ষা বাহিনী একটা institution। এই দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানের কোন অফিসার বা সদস্যকে কোনভাবে প্রচলিত আইন-আদালতে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার সুযোগ আমরা সৃষ্টি করে দিতে পারি না এবং কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এ ধরনের কোন কার্যক্রমকে আমরা উৎসাহিত করতে পারি না। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহকে বেসামরিক justice system-এর বাইরে রাখা হয় এবং তাঁদের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশেও তাই রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ যারা এই যৌথ অভিযানকে সফল করে দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করেছে, দেশের ১৪ কোটি মানুষের মানবাধিকার রক্ষা করেছে, জীবনে শান্তি ও স্বস্তি এনে দিয়েছে, আমাদের সংবিধানের আলোকে তাঁদেরকে বেসামরিক বিচার প্রক্রিয়া থেকে দায়মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই আইনের মাধ্যমে।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ।*

*বিলটি সেদিন কণ্ঠভোটে পাস হয় এবং সাথে সাথে অধ্যাদেশটি রহিত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এই সংশোধনী দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার জন্য একটি ঐতিহাসিক সংস্কার

দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ২০০৩

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

সুশাসনের জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল দেশে একটি সুষ্ঠু গতিশীল যুগোপযোগী বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সহজে, কম খরচে, দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার সমস্ত সুযোগ উন্মুক্ত করা, জনগণের জন্য সুবিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা। এই সামষ্টিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার অনেকগুলি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, মামলা ব্যবস্থাপনা, আদালত প্রশাসন এবং মামলার জট নিরসনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জমি বা পারিবারিক বা আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত মামলার সংখ্যাই বেশি, অথচ এইগুলি বছরের পর বছর বিচারাধীন থাকে, সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গিয়ে আবার নিম্ন আদালতে ফিরে আসে। অনেক সময় কয়েক দশক চলে যায় কিন্তু মামলার নিষ্পত্তি হয় না। বিচারপ্রার্থীদের অজ্ঞতা, আইনজীবীদের পেশাগত স্বার্থ আর বিচারকদের শৈথিল্যের কারণে বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় যে কালচারের জন্ম হয়েছে তার পরিবর্তন প্রয়োজন। বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে রয়েছে একটি adversarial system অথচ adversarial বা প্রতিপক্ষের সাথে আইনী যুদ্ধ বা বিদ্বেষ বা সংঘর্ষের পথে না গিয়ে আপোসের পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে অনেক। অর্থাৎ accomodation, conciliation and compromise-এর culture develop করলে দেশে সুবিচার নিশ্চিত করা আরও সহজ হবে। তাই বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পন্থা অবলম্বন করাটা এখন আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সালিশী ব্যবস্থা বাংলাদেশের একটি পুরাতন সংস্কৃতি, কিন্তু এর আইনগত ভিত্তি ছিল দুর্বল এবং পরিধি ছিল সীমিত। এই প্রেক্ষাপটে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) কার্যক্রমকে আইনসম্মত করার জন্য Civil Procedure Code-এ সংশোধনী আনা হয়। এটা একটি ঐতিহাসিক সংস্কারমূলক আইন।

মাননীয় স্পীকার

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এই আইনের বিষয়টি যেহেতু নতুন সেজন্য একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে। দেশের বিচার ব্যবস্থাকে গতিশীল, সময়োপযোগী এবং বিচার ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার একটি ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এগুলির মধ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম যাকে ইংরেজীতে বলে Alternative Dispute Resolution অন্যতম। এই সংশোধনী হবে civil justice system-এর সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। একটি ঐতিহাসিক সংস্কার। আইনের শাসনের পূর্বশর্ত হল সুবিচার নিশ্চিত করা। সুবিচার বলতে আমরা বুঝি যে, একজন স্বাধীন বিচারক থাকবেন এবং তিনি নিরপেক্ষভাবে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করবেন। সহজে, কম খরচে, দ্রুত বিচার যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে আমাদের সংবিধানের যে ম্যান্ডেট, access to justice, সেটা আমরা ensure করতে পারব, আমাদের সকলের নিঃসন্দেহে সেটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের লিগ্যাল সিস্টেমটা একটা adversarial system-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা। শত বছর যাবত সেটা হয়ে আসছে। তাতে মামলা বিলম্বিত হচ্ছে, মানুষ বিচার পাচ্ছে না। অথচ আমাদের দেশের ৮০ ভাগ মামলাই হচ্ছে, ছোট-খাটো মামলা। গরিব মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ, এরাই মামলার সঙ্গে বেশিরভাগ জড়িত। অর্থ নিয়ে মামলা, জমি নিয়ে মামলা, pre-emption, বাটোয়ারা, যৌতুক, পারিবারিক এবং সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত মামলা। এই স্কীমটা অর্থাৎ মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করার এই কার্যক্রম যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে আমি মনে করি, এটা আমাদের বিচার ব্যবস্থায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। আমাদের লিগ্যাল কালচারে নতুন শিষ্টাচার আসবে। আমাদের কয়েকজন সদস্য এখানে বলেছেন

www.pathagar.com

যে, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলি একমত হতে পারে না জাতীয় সমস্যা সমাধানে, সেখানে কী করে এই মামলায় যারা অংশগ্রহণ করবে, তারা একমত হবে? আমি মনে করি দুটো ভিন্ন জিনিস। তাছাড়া যদি আমাদের লিগ্যাল কালচারে এই সিস্টেমটা আনতে পারি, of reconciliation, compromise and accommodation, তাহলে আমার মনে হয় যে, রাজনৈতিক অঙ্গনেও ভবিষ্যতে এর একটা প্রভাব পড়বে এবং আশা করি, এর ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনেও এই reconciliation, compromise-এবং spirit of accommodation-এর মাধ্যমে আমাদের নানা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারব।

এই আইনের দুই-একটি ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার। কারণ, অনেক সদস্য এখানে বিলটির উপর বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু তাঁরা আইনটা পড়েছেন বলে মনে হয় না। তাই আমি আইনের scheme সম্পর্কে একটু বলতে চাই, আমরা কী করতে চাই এই আইনের মাধ্যমে।

যদি আইনটি দেখেন, তাহলে দেখবেন, দুই পক্ষ যদি একমত হন, তাহলে মিডিয়েশনের প্রক্রিয়াটা শুরু হবে, অন্য কোন ভাবে নয়। অনেকে বলেছেন, সরকার বা সরকারী দল জড়িত হয়ে পড়বে এবং তার ফলে আইনটা নস্যাৎ হয়ে যাবে। এই ধরনের কোন সম্ভাবনা নেই। তার কারণ প্রথমে দুই পক্ষকে একত্রিত হতে হবে, একমত হতে হবে যে তারা আপোসে এটার মীমাংসা করতে চান। আমাদের বর্তমান আইনেও already মামলা আপোসে মীমাংসা করার একটা ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা এটাকে আরও strengthen করতে চাই, institutionalise করতে চাই। সেজন্যই এটাকে বিশদভাবে আইনের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছি। প্রথমে যদি তারা একমত হন, তাহলে বিচারক নিজেই মধ্যস্থতার দায়িত্ব নিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি না নেন বা নিতে না চান, তাহলে তিনি দুই পক্ষের আইনজীবীদের বলতে পারেন, জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, তাঁরা নিজেরা আপোস করতে চান কিনা। তাদেরকে দশ দিন সময় দেওয়া হবে। যদি তাঁরা চান এবং আদালতকে তা জানালে তখন একজন মিডিয়েটর হিসাবে তৃতীয় একজন ব্যক্তিকে মধ্যস্থতা করার জন্য নিয়োগ করা যাবে। সেই মধ্যস্থতাকারী কে হবেন সেটাও আইনে বলা আছে। সেখানে একজন মিডিয়েটর আইনজীবীও হতে পারেন বা একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিও হতে পারেন, যিনি একটা প্যানেলের সদস্য হবেন। সেই প্যানেলটা তৈরি করবেন জেলা জজ এবং আইন সমিতির সভাপতি। এই দুইজন মিলে একটা প্যানেল তৈরি করবেন। আমরা আইন সমিতির সভাপতিকে সম্পৃক্ত করেছি যাতে করে আইনজীবীদের confidence থাকে। সেখানে যাতে acceptable একজন ব্যক্তি mediator হিসেবে প্যানেল ভুক্ত হন। দুই পক্ষ চাইলে এই প্যানেলের বাইরে থেকেও একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করার প্রস্তাব দিতে পারেন। এটা করার পরে প্রথমে ৬০ দিন সময় দেওয়া হবে। ৬০ দিনের মধ্যে যদি না পারে তাহলে আদালতের অনুমতি নিয়ে আরও ৩০দিন সময় তারা পাবে। ৯০ দিনের মধ্যে মধ্যস্থতার মাধ্যমে তারা মীমাংসার ব্যবস্থা করবে। Mediator অর্থাৎ মধ্যস্থতকারী কোন office of profit holder হবে না অর্থাৎ সরকারী চাকুরী করে এমন কোন ব্যক্তিকে mediator করা যাবে না। আর mediator-এর fees দুই পক্ষ মিলে decide করবেন এবং তিনি কিভাবে proceed করবেন সেটার procedure কী হবে সেটা mediator নিজে decide করবেন। এর পরে যদি mediation successful হয়, তাহলে সেই আপোসনামা আদালতে জমা দেবেন, যা আদালতের একটা decree হিসেবে ঘোষিত হবে এবং তখন আর appeal বা revision করার প্রয়োজন হবে না। এই মধ্যস্থতার মাধ্যমে যদি নিষ্পত্তি হয়ে যায় তাহলে চিন্তা করে দেখেন যে কত রকমের উপকার হবে। সময় বাঁচবে, অর্থ বাঁচবে, হয়রানি বাঁচবে এবং আমাদের দেশের মানুষ সহজে বিচার পাবে এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। ৯০ দিনের মধ্যে যদি মধ্যস্থতার প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে সেটা প্রচলিত আইনের অধীনে নিষ্পত্তি হবে। বিচারক যদি নিজে mediator-এর role play করে থাকেন তাহলে সেই বিচারক এই মামলা নিষ্পত্তি করবেন না, তিনি আর একটা equal Jurisdiction-এর আদালতে সেটা Distirict Judge-এর মাধ্যমে transfer করে দেবেন।

আর একটি হল court-fee' র বিষয়, যদি মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যায় তাহলে court-fee ফেরত দেওয়া হবে। এটা একটা incentive হবে, অনেক সময় আমরা মামলায় অনেক টাকা দিই court-

www.pathagar.com

fee হিসেবে, বিশেষ করে compensatory suit-এর বেলায় ২৮,৭৫০ টাকা maximum court-fee আছে। এই আইনের মধ্যে এই court-feeটাও ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর একটি হল, execution-এর প্রশ্ন। এখানে execution-এর প্রশ্ন আর আসবে না। Amicable settlement হবে, agreement would be part of the decree। এই হল, মাননীয় স্পীকার, মূল scheme of this law। এটা যদি কার্যকর হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে, আমাদের সকলের জন্য দলমত নির্বিশেষে মঙ্গল বয়ে আনবে।

এই সংস্কার আনা হয়েছে posterity-র জন্য। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। আমাদের দেশের legal systemকে আরও rationalize এবং modernize করার জন্য এ ব্যবস্থা আমরা করেছি। এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন পড়বে। যদি আমরা সকলে সহযোগিতা করি তাহলে এই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম আমাদের legal culture-এ বিরাট পরিবর্তন আনবে। আমি কয়েকটি উদাহরণ দিই, মাননীয় স্পীকার, অর্থঋণ আদালত ছাড়া, এমনি যে money suit-গুলি আছে বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে তার সংখ্যা হল পাঁচ হাজার ছয়শ সত্তর এবং total amount involved হল সাত হাজার ছয়শ আট কোটি টাকা। মামলাগুলি দুই বছর থেকে সাত বছর পর্যন্ত বিভিন্ন আদালেত pending আছে। এগুলির কোন নিষ্পত্তি হয় না। অথচ টাকা পয়সার ব্যাপার, দেনা-পাওনার ব্যাপার, এগুলি সহজে মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

এই যে আমাদের pre-emption মামলা, সারা বাংলাদেশে সতের হাজার পাঁচশ আটান্নটি মামলা pending আছে, বিচারাধীন আছে। আর partition suit আছে একচল্লিশ হাজার সাতশ' ছিয়াত্তরটি। সারা বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ দেওয়ানী মামলা বিচারাধীন আছে। তার মধ্যে নিম্ন আদালতে প্রায় চার লক্ষের কাছাকাছি মামলা বিচারাধীন আছে। এবং এই মামলাগুলি ৮০% বাদ দিলাম, যদি ৫০% বা যদি ২০% ও এই মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়, মাননীয় স্পীকার, আপনি চিন্তা করে দেখেন what a great defference it will bring in our Justice delivery system.

এখন আমার বন্ধুরা যে সব প্রশ্ন তুলেছেন তার সামান্য উত্তর দিতে চাই। রহমত আলী সাহেব তো lawyers' movement, separation of judiciary-এবং Judge সাহেবদের appointment-এর দিকে চলে গেলেন। এই বিলের সঙ্গে আপনার বক্তব্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। তবুও বলি জজ নিয়োগের ব্যাপার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সুপারিশের কথা তিনি বলেছেন। আমি শুধু তাঁকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কী সুপারিশ করেছেন, আপনি কি সেটা জানেন? বা অন্য কেউ জানেন? কেউ জানেন না। সুতরাং কেন বলছেন যে, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সুপারিশ আমরা মানছি না। আপনি কি সেটা জানেন, বুকে হাত দিয়ে বলুন, অবশ্যই আপনি জানেন না। তাহলে কেন বলেন? আমাদের বন্ধু সন্দেহ করেছেন যে যেখানে আমাদের নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ নেই, বাংলাদেশের যে কালচার সেখানে এই কার্যক্রম কতটুকু সফল হবে? আমার উত্তর হবে, আমাদের তো সেটা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে দেখতে হবে। About the appointment of the mediator, আমি তো ব্যাখা করে বলেছি—mediatorকে appoint সরকার করবে না, মন্ত্রীও করবে না। এটা Distirct Judge এবং বার সমিতির সভাপতি মিলে তৈরি করা একটা প্যানেল থেকে দুপক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে আদালত করবেন। জনাব ফারুক খান বলেছেন এটা খুব ভাল একটি বিল। কিন্তু বাংলাদেশের মত একটি দেশে এটা প্রযোজ্য হবে না। তারপর তিনি আবার ঘুরে চলে গেছেন নির্যাতনের দিকে, এক দিকে, এগিয়ে অন্য দিকে চলে গেছেন। যাইহোক, তিনি অন্তত স্বীকার করেছেন যে এটা একটি ভাল বিল। সেজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

জনাব পঞ্চানন বিশ্বাস আইনটি ভালমত পড়েননি। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, কারণ সরকার এক জিনিস, আদালত আরেক জিনিস। সরকারের এখানে কোন ভূমিকা নেই। এই আইনের কোথাও সরকার শব্দ লেখা নেই। জনাব মোতাহার হোসেন—আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি তিনি বিলটি আর একটু ভাল করে পড়লে হয়তো আমার প্রতি অবিচার করতেন না। যে মন্তব্যগুলি তিনি করেছেন, সেগুলি একেবারে unwarranted।

www.pathagar.com

জনাব শাহজাহান খান বলেছেন, নতুন আইন আমি দিচ্ছি। এটা আপনি ঠিক বলেছেন। কবিতা পড়ে আজকে আপনি একজন কবি বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আসল কথা point out করতে পারেন নি। সন্ত্রাসের কথা বলেছেন। সন্ত্রাস সম্বন্ধে নাই-বা বললাম। আপনার background তো আমরা সবাই জানি। আপনি তো একসময়ে গণবাহিনীর সদস্য ছিলেন।

জনাব মসিউর রহমান বলেছেন, ঐক্যজোটই জটিলতার সৃষ্টি করবে। আর জনাব আতিকুর রহমান বলেছেন যে, আমি এমন আইন করেছি যে ৩০ হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী মুক্তি পেয়ে গেছে। তিনি কোন্ আইনটির কথা বলছেন? আমি এ ধরনের কোন আইন করিনি। এধরনের কোন আইন পাস করিনি। আপনি তো একজন সংসদ সদস্য, বলেন মুক্তি দেওয়া হয়েছে কোন্ আইনে? সেই আইনটি কি এই সংসদে পাস হয়েছিল? এবিষয়ে existing law আছে, কারো বিরুদ্ধে মামলা যদি প্রত্যাহার করতে হয় Criminal Procedure Code-এ বিধান আছে। এটা আমার তৈরি করা নয়, লর্ড ম্যাকোলে তৈরি করে রেখে গেছেন প্রায় দেড়শত বছর আগে।

আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না, আমি শুধু বলতে চাই— We would like to start something। আসুন আমরা শুরু করি এবং এব্যাপারে আসুন আমরা দলমত নির্বিশেষে আমাদের দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি। এই ঘুণে ধরা legal system-এ পরিবর্তন আনার চেষ্টা করি। সকলে মিলে যদি সহযোগিতা করি অর্থাৎ বিচারক, আইনজীবী এবং বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত অন্য সবাই, তাহলে অবশ্যই সফলতা আসবে। এই আইনের অধীনে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী বা ইউনিয়ন পরিষদের কোন রোল নেই, local political leader দের কোন ভূমিকা নেই। একজন বলেছেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা এগুলির সালিশ করবে, মীমাংসা করবে। না, এই আইনে তাদের জন্য কোন সুযোগ নেই।

যাই হোক, আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। যাঁরা জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন তাদের জানাতে চাই যে গত এক বছরের উপরে হবে অর্থাৎ ১৫ মাস যাবত এই প্রস্তাবিত আইনের উপর সারা বাংলাদেশে অনেক সেমিনার করেছি, কর্মশালা করেছি, জেলায় জেলায় গিয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত ৩১ অক্টোবরে জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা করা হয়েছে। সেখানে আপনাদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের সিনিয়র আইনজীবীদের সহ বার কাউন্সিল, সুপ্রীম কোর্ট বার, ঢাকা বার এবং অন্যান্য বার সমিতির সমস্ত সভাপতি এবং নেতৃবৃন্দকে আমরা ঢাকায় এক দিনব্যাপী বৈঠকে দাওয়াত দিয়ে এনেছিলাম। সবাই মিলে আমরা একটি ঐকমত্যে এসেছি যে, এই ব্যবস্থাটি আমাদের introduce করা দরকার। এই আইন এক বছর যাবত জনমত যাচাই করেই এখানে এনেছি, তাই জনমত যাচাইয়ের আর প্রয়োজন নেই।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।*

---

*বিলটি সেদিনই কণ্ঠভোটে পাস হয়।

www.pathagar.com

দুর্ভাগ্য হল আমাদের দেশে একটি ঋণখেলাপী কালচার গড়ে উঠেছে

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩

৫ মার্চ ২০০৩

ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ঋণ গ্রহণ করে টাকা সময়মত বা একেবারেই ফেরত না দেওয়ার প্রবণতা বাংলাদেশে তীব্র আকার ধারণ করে। সমাজে default culture একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়। ঋণখেলাপীদের সমাজচ্যুত করে তাদের কাছ থেকে দ্রুত অর্থ আদায় করার দাবি সার্বজনীন হয়ে ওঠে। গত দুই দশক যাবত এই সমস্যা দিন দিন প্রকট হয়েছে এবং সকল সরকারকেই এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিতে হয়। ১৯৮৯ সালে প্রথমে একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহের পাওনা অর্থ আদায় করার জন্য আদালত স্থাপন করা হয়। ১৯৯০ সালে উপরোক্ত অর্ডিন্যান্সকে রহিত করে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এই আইনের কার্যকারিতায় কোন সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয় নি কারণ, এটা ছিল একটা শিথিল আইন। ব্যাংকের দায়দায়িত্ব এবং আদালতের জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা ছিল না। মামলার ডিক্রি হলেও জারি (execution)সহ মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণে টাকা আদায় সম্ভবপর হয় নি, যার ফলে বছরের পর বছর ব্যাংকসমূহ কোন মামলায় চূড়ান্ত ফল ভোগ করা থেকে বঞ্চিত থাকে। ঋণ গ্রহীতাদেরও নানাভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়। ব্যাংকগুলি নানা ভাবে সুদসমূহ যোগ দিয়ে দু-চার-দশ বছর পর মামলা দায়ের করে একটা দায়সারা দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। বন্ধকী সম্পত্তির বিক্রয়, নিলাম, জারি মামলাসহ সকল ক্ষেত্রেই বিরাজ করেছে অনেক জটিলতা। আইনের নানা দুর্বলতার কারণে উভয় পক্ষই মামলা বিলম্বিত করার সুযোগ নিত। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে বর্তমান দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ আইনটাকে রহিত করে একটি comprehensive, sefl-contained effective আইন প্রণয়ন করার প্রস্তাব করা হয়।

মাননীয় স্পীকার

সবচেয়ে আগে আমি সম্মানিত সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, এই বিলটি সম্পর্কে তাঁদের মতামত প্রকাশ করার জন্য। তবে একটা জিনিস তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, বিলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ধরনের একটা বিল আনা দরকার ছিল। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত আমাদের মধ্যে নেই।

ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা হল জনগণের সম্পদ। সাধারণ মানুষের টাকা। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য, আমাদের দেশে একটি ঋণখেলাপী কালচার গড়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে বছরের পর বছর আমরা সকলেই পার্লামেন্ট এবং পার্লামেন্টের বাইরে আলোচনা করেছি, সমালোচনা করেছি। সংবাদপত্রগুলি এই বিষয়ে সবচাইতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে চলেছে। যারা সৎ ব্যবসায়ী, যাঁরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে রীতিমত শোধ করেন এবং ভাল ব্যবসা করেন, দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি হাতাশাগ্রস্ত হন যখন দেখেন যে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যাঁরা খেলাপী তাঁরা দিব্যি ভাল আছেন, আরামে আছেন। আর, যাঁরা কষ্ট করে বিনিয়োগ করে অর্জন করে ব্যাংকের টাকা শোধ করছেন তাঁদের জন্য আমরা কোন রিওয়ার্ডের ব্যবস্থা রাখি নি। আজকে সেই সঙ্গে একথাও বলতে হয় যে, ব্যাংকেরও অনেক গাফিলতি আছে। শুধু ঋণ গ্রহীতাদের উপরে দায়িত্ব না দিয়ে ব্যাংকের যারা ঋণ দান প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকে তারাও অনেক সময় যাচাই-বাছাই না করে ঋণ দিয়ে থাকে, নানা কারণে দিয়ে থাকে। একটা যোগসাজশে এই ব্যবস্থাটা হয়, এটাও দেখা গেছে। যে সব কারণে ঋণ উদ্ধার করা একটা কঠিন কাজ হয়ে গেছে।

এই সরকারের commitment to bring reform in the financial sector-এর প্রতিফলন ঘটেছে আজকের এই বিলে। বিলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। It needs immediate approval of the Parliament। আমি জানি যে, ৭ দিনের নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এমন কতগুলি বিল আছে যেগুলির ব্যাপারে সংসদকে একটু নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতে হয়। কঠোরভাবে যদি আমরা ফলো

www.pathagar.com

করি তাহলে দেখব যে, জনগণের ভোগান্তি বেড়ে যাবে। তাছাড়া মাননীয় স্পীকারের এখতিয়ার আছে এই সময়টা সংক্ষেপ করে দেওয়ার জন্য। আজকে যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ এই সরকার গ্রহণ করেছে তার মধ্যে অর্থঋণ আদালত আইন হল একটি অন্যতম প্রধান এবং মূল সংস্কারমূলক আইন। এতদিন যে আইনটি ছিল তা ছিল অপর্যাপ্ত। আইনটিতে মাত্র ১১টি বিধান ছিল। সেই আইনের মাধ্যমে, frankly speaking, কোন রকমের realisation হয় নি। তার কারণ, সেই আইনের মধ্যে অনেক দুর্বলতা ছিল, একটা ineffective law ছিল।

অনেকেই এই বিলটি জনমত যাচাইয়ের জন্য দিতে বলেছেন। জনমত যাচাইয়ের প্রয়োজন হতো যদি এই আইনটি একটি সম্পূর্ণ নতুন, অপরিচিত আইন হতো। আমরা, আপনারা, আমরা সবাই, বাংলাদেশের সকল মানুষ এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। যারা আজকে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়েছে অথচ দিচ্ছে না, সেই টাকাটা দ্রুত এবং কত effectively realise করা যায় এটাই হল আমাদের সকলের কনসার্ন। সেই objective-টা আমাদেরকে সামনে রেখে আলোচনা করতে হবে।

এই আইনের মাধ্যমে আমরা কতগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আগে যেমন ডিক্রি হতো কিন্তু এক্সিকিউশন হতো না। ডিক্রি হতে যদি দুই বছর লাগত, এক্সিকিউশন হতে ৬ বছর লাগত। তার মানে টাকা realise হতো না। এ ধরনের অনেকগুলি কারণে ব্যাংকের ৯৫% টাকা realise করা সম্ভবপর হয় নি। আমি একটা সমীক্ষা দিচ্ছি। সারা বাংলাদেশে এখন ব্যাংকের ৪০ হাজার ১২৯টি অর্থজনিত মামলা পেন্ডিং আছে, এর মধ্যে ৫ বছর হয়ে গেছে তাদের সংখ্যাই হল ২২ হাজার। ৫ বছরে কোন রিয়েলাইজেশন, কোন হিয়ারিং পর্যন্ত করা সম্ভবপর হয়নি। তার কারণ শুধু অর্থঋণ মামলাগুলি এককভাবে নিষ্পত্তি করার কোন সুযোগই এ আদালতগুলির নেই। আজকে তাই এতগুলি মামলা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এবং ৯ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা, জনগণের টাকা, সাধারণ মানুষের টাকা বছরের পর বছর অনাদায় এ আদালতগুলিতে পড়ে আছে। নিষ্পত্তি করার কোন সুযোগই নেই। আমরা এখানে টাইম লিমিট করে দিয়েছি। ১৫ দিনের মধ্যে যদি অপর পক্ষ না আসে তাহলে তারপরের ১৫ দিনে খবরের কাগজে প্রচার করার পরে সে মামলা নিষ্পত্তি করে দেওয়া হবে। সময়ের স্বল্পতা নিয়ে অনেকে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এখন এ আদালতগুলি শুধু অর্থঋণ আদালত হিসাবেই কাজ করবে। এই আদালতে অন্য কোন মামলা করা হবে না। যেসব শহরে বা যেসব জেলায় অল্পসংখ্যাক মামলা আছে, সেসব শহরে হয়ত একজন জজ ২/৩ ধরনের মামলা করবে, কিন্তু বড় বড় শহরগুলিতে যেখানে বেশি মামলা রয়েছে সেখানে শুধুমাত্র অর্থঋণ আদালত রাখা হবে। যাতে করে এ মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর হয়।

এই আইনটি একটা comprehensive self-contained law। এ আইনের প্রয়োগ খুব effective হবে। কারণ আইনটি এমনভাবে করা হয়েছে যে, প্রয়োগ না করে কোন উপায় নেই। এখানে সমস্ত কিছুর একটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি কয়েকটি উদাহরণ আপনাকে দিচ্ছি। প্রথম হল, এ আদালত এককভাবে কাজ করবে। দ্বিতীয় হল, এ আদালতে ৫০ হাজার টাকার নিচের মামলা হবে না। বিচার পদ্ধতির কিছুট পরিবর্তন করেছি। আমরা যারা আইনজীবী, এটা আমরা সকলে জানি যে, আপনি আরজি দিলেন, রিটেন স্টেটমেন্ট আসল, তারপর এগুলির জন্য সাক্ষীদান করাতে হবে আদালতে। আমরা এগুলি ডিলিট করে দিয়েছি। আইনে এমন ব্যবস্থা করেছি যে, আরজি এবং বিবাদীর লিখিত বর্ণনা, সংযুক্ত দলিল, মৌলিক বিষয় হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এর উপর ভিত্তি করে সরাসরি রায় প্রদান করার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হয়েছে।

তারপর দ্রুত এবং কার্যকর সমন জারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১ মাসের মধ্যে সমন জারির সমস্ত প্রক্রিয়া নিষ্পত্তি করতে হবে এবং তারপরই শুনানি হবে।

তৃতীয় হল, আপনি ১২ নম্বর ধারায় দেখবেন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জামানতি সম্পত্তি বিক্রয়। যেমন ধরেন, একজন বন্ধকী দিয়ে টাকা নিয়েছে। তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা করার আগে সেইসব সম্পত্তি ব্যাংক বিক্রি করে দেবে। তারপর adjust করবে। তারপর তার বিরুদ্ধে মামলা করবে। বিক্রয় আপীলের উপরে আমরা সময় নির্ধারণ করে দিয়েছি। যাতে করে এ ব্যাপারে ব্যাংকের এবং বিবাদীর খরচ কমে যায় তার ব্যবস্থা করেছি।

www.pathagar.com

আর একটি বিষয় হল, জারি। এব্যাপারে সব অসুবিধা দূর করে দেওয়া হয়েছে। ডিক্রি হওয়ার সাথে সাথেই execution-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাওনা টাকা মূল ঋণের তিনগুণ হওয়ার আগেই ব্যাংককে মামলা দায়ের করতে হবে। ১ কোটি তিন কোটি হওয়ার আগেই। ব্যাংক এবং ঋণ গ্রহীতার জন্য আপোস মীমাংসার চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়ছে। বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি কার্যক্রমের (ADR) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মোহাম্মদ নাসিম সাহেব বলেছেন যে, আইনের প্রয়োগ হবে কিনা? আমি আপনার সাথে একমত। অবশ্যই প্রয়োগের উপর নির্ভর করবে আইনের সফলতা। কিন্তু আপনি বলেছেন, ঋণখেলাপীরা সব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। আপনাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, তাহলে দেখবেন যে, কারা কালো টাকা দিয়ে নির্বাচন করেছে? এটা এই নির্বাচনই প্রমাণ করেছে।

আমাদের মাননীয় সদস্য জনাব খ ম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেছেন, ১৯৯০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কেন কারো শাস্তি হয় নি? আমি আপনার সাথে একমত। শাস্তি হয় নি, because the law was too weak, একটা দুর্বল আইন ছিল। তার সুযোগ-সুবিধা ব্যাংক এবং খেলাপী ঋণওয়ালারাই নিয়েছে। আর আমরা তাদেরকে পেট্রোনাইজ করেছি। সেজন্য এটা হয় নি।

Mr. Gupta[১]. Now I come to you. 50% deposit-এর কথা বলেছেন। It has been upheld already in the Supreme Court। ডিক্রীর বিরুদ্ধে যদি আপীল করে, ৫০% টাকা আগেই জমা দিতে হবে এবং it is a good provision of law, আমরা এখানে আরও ২৫% বাড়িয়েছি। হাইকোর্টে যদি রিভিশন করা হয়, তাহলে ২৫% জমা দিয়ে তারপর যেতে হবে। কিন্তু আপনি কমিটি সম্বন্ধে একটা কথা বলেছেন। স্পেশাল কমিটিতে দেওয়ার কথা অনেকেই বলেছেন। I agree with you। একটা কমিটি যদি আমাদের থাকত, আমরা অবশ্যই এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনকে কমিটিতে প্রেরণ করতাম। কিন্তু আমি যতদূর জানি যে, আপনাদের অসহযোগিতার কারণে কমিটি করা সম্ভব হয় নি।

মির্জা আজম সাহেব অত্যন্ত হতাশা ব্যক্ত করেছেন যে, বড় খেলাপীদের ধরার কোন উপায় নেই। আমি আপনাদেরকে assure করছি, এই আইন প্রয়োগ হলে কোন ঋণ খেলাপী বাদ যাবে না। বাংলাদেশে প্রত্যেককে এই আইনের অধীনে আসতে হবে। মাননীয় সদস্য মিঃ ফারুক খান, আপনি settlement কনফারেন্সের কথা বলেছেন যে, আদালত কী করে এটাকে সেটেল করবেন। It is optional not mandatory। যদি দুই পক্ষ রাজি হয়, এটা সেটেল করার একটা এখতিয়ার আমরা আদালতকে দিয়েছি। এইজন্য দিয়েছি যে, একটি মামলা হয়ত বছরের পর বছর চলবে। সেটা তাড়াতাড়ি করে নিস্পত্তি হওয়ার জন্য দিয়েছি। যদি মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিস্পত্তি হয় তাহলে আপীল হবে না, সময় বাঁচবে এবং অল্প খরচে মামলা নিস্পত্তি করা সম্ভব হবে।

মাননীয় স্পীকার, আমি মনে করি যে, এই বিষয়টি বছরের উপর আলোচিত হয়েছে। এখানে জনমত যাচাইয়ের আর কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। আমরা সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে আলোচনা করেছি। ব্যাংকের সংগে আলোচনা করেছি, ট্রেড অর্গানাইজেশনের সাথে আলোচনা করেছি। আইনজীবীদের সাথে আলোচনা করেছি। সকলের সাথে আলাপ-আলোচনা করার মাধ্যমে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ আইন এখানে উপস্থাপন করেছি।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।*

---

১. সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।

* বিলটি সেদিনই সংসদে পাস হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

২০০৩-২০০৪ সালের বাজেট

২৮ জুন ২০০৩

বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনার মধ্য দিয়ে এবারও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু আলোচিত হয়। যেমন, সামগ্রিকভাবে দেশের অর্জন, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, দুর্নীতি, হরতাল, বিদেশে বিরোধী দলীয় নেত্রীর মন্তব্য, সংসদ, গণতন্ত্র এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের উপর সরকারের অবস্থান এই বক্তৃতায় তুলে ধরা হয়।

মাননীয় স্পীকার

এই বাজেট সম্পর্কে আমাদের সংসদ-সদস্যরা এবং বিরোধীদলের সদস্যরা অনেক মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। আমি detail-এ কিছু বলতে চাই না। শুধু এটুকু বলতে চাই যে, আমার কাছে মনে হয়েছে এটা একটি বাস্তবমুখী সংস্কারমূলক বাজেট। শহীদ জিয়ার যে কর্মসূচী ছিল, দেশকে স্বনির্ভর করার জন্য, আমার মনে হয় যে, এই স্বনির্ভরতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই বাজেট একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। আমি অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই।

প্রধান বিরোধীদলের সমালোচনা শোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু বাইরে তারা অনেক কিছু বলেছেন। ১৯৯২-৯৩ সালের বাজেটের ব্যাপারে কি বলেছিলেন, সেটা দিয়ে আমি শুরু করি। একই কথা বলেছেন তখন। তাঁরা বলেছিলেন। যে, "এটা হল একটি ফাঁকা বুলির বাজেট।" *দৈনিক জনতা* ১১ জুন ১৯৯৩ সাল। আর এক পত্রিকা আজকের কাগজে ছাপিয়েছে "এখানে সংকট উত্তরণের কোন সুস্পষ্ট দিক নেই।" মাননীয় স্পীকার, অভাবের অর্থনীতিতে বাজেট সমালোচিত হবেই, তবে ঢালাওভাবে সমালোচনা করা ঠিক নয়।

প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির বক্তব্য দিয়েছেন, তাঁর বক্তব্যে ২/৪টি কথা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক ছিল। সেটা মাননীয় ডেপুটি স্পীকার পরের দিন expunge করে দিয়েছেন। Expunge করে দেওয়ার পরে আমার মনে হয় না যে, তাঁর দুঃখ প্রকাশ করা বা ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটা আর কোন গুরুত্ব বহন করে। সুতরাং আমি বলতে চাই যে, এটা সারা বছরের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বাজেট সেশন। দেশের জন্য, সরকারের জন্য, দেশের সকল মানুষের জন্য। বিরোধী দলের উপর জনগণের ম্যান্ডেট ছিল সরকারের দুর্বলতা, বাজেটের দুর্বলতাগুলি তাঁরা তুলে ধরবেন। আমরা যেটুকু পারি সেগুলি সংশোধন করার চেষ্টা করব। কিন্তু তাঁরা সেটা করেননি। তাঁরা তাঁদের নিজেদের দুর্বলতার শিকার হয়েছেন এবং সে কারণে আজকে তাঁরা সংসদে নেই। আমার তাই মনে হয় এই বাজেটের সমালোচনা করার মত substantive কোন ইস্যু তাঁরা পাননি।

আজকে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাদের অর্জন কম নয়। আমাদের দেশ একটি ক্ষুদ্র দরিদ্র দেশ, তারপরও আমরা গণতন্ত্র চর্চা করছি। দেশে একটি সংবিধান আছে। এই যে আমরা এখানে বসে আছি, একটি সুষ্ঠু, অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আমরা এখানে এসেছি। পৃথিবীর খুব কম অনুন্নত দেশে এই ধরনের সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। যখন আমরা স্বাধীন হই তখন আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে, আমরা হলাম তলাবিহীন ঝুড়ি অর্থাৎ বাংলাদেশের কোন ভবিষ্যৎ নেই। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ভাবে কোনদিনই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে না, এটা viable economy হবে না। কিন্তু দেখুন, আজকে খাদ্য উৎপাদন হয়েছে ২৭০ লক্ষ টন। জমি একই বরং জমি আরও নষ্ট হয়েছে, urbanisation-এর কারণে, population প্রায় double হয়েছে, কিন্তু খাদ্য উৎপাদন তিনগুণ হয়েছে। এটি আমাদের সকলের জন্য একটি বিরাট অর্জন। ১৯৭২ সালে

www.pathagar.com

জনসংখ্যার হার ৩.৪ শতাংশ ছিল। সেটা কমে এখন ১.৪ শতাংশে এসেছে। এটা বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট সাফল্য বলে মনে করি। এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিকভাবে সকলেই আমাদের প্রশংসা করেন। আজকে প্রায় ৯৮ শতাংশ মানুষ pure drinking water পাচ্ছে, ৯০% children are immunised today। আমাদের দেশ আজকে Polio free। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ একটি example সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের আরও অনেক মৌলিক অর্জন আছে তবে আপনি বলতে পারেন যে, আমরা আরও অনেক কিছু অর্জন করতে পারতাম। তার সাথে আমি একমত। হয়তো আমরা আমাদের অনেক মূল্যবান বছর নষ্ট করেছি। প্রথম সাড়ে তিন বছর নষ্ট করেছি socialism-এর নামে। পাবলিক সেক্টর এক বছরে ১৫শ' কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। ১৯৭২-এ ৯৫% industrial asset nationalised করা হয়েছিল, 85% of the banking business had been nationalised। তার হিসাব, তার ক্ষতিপূরণ এবং তার মাশুল জাতি আজ পর্যন্ত দিচ্ছে। সুতরাং আমাদের অনেক মূল্যবান বছর নষ্ট হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের অর্জন যে অনেক বেশি হতে পারতো, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

আমি কোন political rhetoric-এ যেতে চাই না। সংক্ষেপে আমি একটি performance sheet উত্থাপন করতে চাই। আমাদের জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের মানুষের কাছে অনেকগুলি অঙ্গীকার করেছেন। এই অঙ্গীকারগুলির মধ্যে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার করেছেন, সেগুলি পূরণ করার চেষ্টা যে আমরা করেছি বা করছি এটাই আমি আপনার মাধ্যমে উত্থাপন করতে চাই। প্রথমে আসি আমাদের অর্থনীতির ব্যাপারে। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেটাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তবুও আমি বলতে চাই যে, আজকে সামষ্টিক অর্থনীতিতে যে stability আনা হয়েছে which is world recognised today—এটা আমরা মাত্র ১৮ মাসে আনতে সক্ষম হয়েছি। আমি বিগত সরকারের সেই ভঙ্গুর অর্থনীতির কথা বলতে চাই না। The fact is that, আজকে macro-economy stabilised হয়েছে, যেটা অনেকেই বলেছিলেন যে আমরা কোন দিনই অর্জন করতে সক্ষম হব না। Foreign exchange reserve বেড়েছে, export বেড়েছে, remittance বেড়েছে। আমরা Anti-Money Laundering Act করেছি। সব থেকে বড় কথা যে, একটি দেশের অর্থনীতির শক্তি নির্ভর করে international exchange rate-এ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে সেই দেশের টাকার মূল্য কত তার উপর। আজকে আমরা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, পৃথিবীর একটি অন্যতম দরিদ্র দেশ হয়েও পৃথিবীর সব চেয়ে ধনী দেশ আমেরিকার ডলারের সঙ্গে আমাদের টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল রয়েছে, এটাতেই প্রমাণ করে যে, বর্তমান সরকারের সামষ্টিক অর্থনীতি সফল হয়েছে।

আগেই বলেছি সরকারী খাতে আমরা এই বছর ১৫শ' কোটি টাকা লোকসান দিয়েছি। বিগত সরকার বা তার আগের সরকারগুলির কাছে কতগুলি soft option ছিল এবং কতগুলি hard option ছিল। আমরা প্রমাণ করেছি যে, government meant business। যার জন্য আমরা কিছু hard option গ্রহণ করতে পেরেছি। যেই আদমজীর উপরে কেউ হাত দিতে পারেনি, এই সরকার সেই আদমজীর উপরে হাত দিয়েছে। এই কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে আমরা শ্রমিকদের সবাইকে খুশি করে বিদায় দিয়েছি। এটার জন্য প্রয়োজন ছিল tremendous amount of political will on the part of the government। আওয়ামী লীগ এখনো socialism-এর hang-over-এ suffer করছে, যার জন্য privatisation এর কথা বলেছে কিন্তু কার্যকর করতে পারেনি। আজকের বিশ্বায়নের যুগে তারা সবাই মুক্ত অর্থনীতির কথা বলেছে। But they did not believe in it. They did not have the conviction for it। যার জন্য তাদের সময় কোন major industry privatisation হয়নি। আমরা ইতিমধ্যে দেশবন্ধু চিনিকল হস্তান্তর করেছি। তিনটি কারখানা হস্তান্তরের চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। ৯টি কারখানা হস্তান্তরের letter of intent issue হয়ে গেছে, আর ৬টি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। আমরা এই কারখানাগুলি বন্ধ করে নতুন লাভজনক কারখানা গড়ে তুলব। এই আদমজীতে একটা Techno-park স্থাপন করা হবে। সেখানে আশা করি দেড় লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এটা করতে পারলে যে কর্মসংস্থান

www.pathagar.com

হারিয়েছি তার প্রায় চারগুণ বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এনার্জি সেক্টরে যখন আমরা privatisation করি তখন regulation-এর প্রয়োজন হয়। Public interest protect করার জন্য এটা দরকার ছিল। তাই আমরা Energy Regulatory Commission করেছি। T & T তেও আমরা Telecommunication Regulatory Commission করেছি। কারণ privatisation-এর সাথে সাথে Regulatory Commission জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য থাকতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় করেছি। মুক্তিযুদ্ধের সব চাইতে বড় প্রবক্তা যারা, তারা ৫ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যারা জড়িত, মুক্তিযুদ্ধের জন্য যাদের এতো মায়াকান্না তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় করেন নি। মুখে বলেছেন কিন্তু কাজে কিছুই করেন নি। এটা আমরাই করেছি। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এই সরকার করেছে। ১৮ মাসের মাথায় নয় ৬ মাসের মাথায় করেছি। এরই মধ্যে পরিবেশের কল্যাণে পলিথিন ব্যগ বন্ধ করা হয়েছে শাজাহান সিরাজের উদ্যোগে। অটোরিক্সা, ইটের ভাটা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। পরিবেশ রক্ষার্থে সুন্দরবন সহ সারাদেশে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাজেটে শিক্ষার জন্য ১৪%, ৬৭৪০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক এই প্রথমবারের মত জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে আমাদের ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এটা আগে কোনো দিন করা সম্ভবপর হয়নি। নকল প্রতিরোধ করেছি আমরা। বই উপহারের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। কি চমৎকার কথা যে, ক্রেস্ট দেবেন না, অন্য কিছু দেবেন না, বই উপহার দিন। এই সুন্দর একটি কথার সাংঘাতিক রকমের প্রতিক্রিয়া হয়েছে দেশের মানুষের মধ্যে, আমাদের শিশুদের, আমাদের অভিভাবকদের মধ্যে। এবার তিনি বলেছেন পাঠাগার স্থাপন করতে হবে। আমরা লেখা-পড়া করার কথা ভুলেই গেছি। আজকে সেখানে একটা নতুন দিক-দর্শন, নতুন emphasis দেওয়া হল। নারী শিক্ষার কথা অনেকে বলেছেন। আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও বলেছে। ৫ বছরে উনারা ৯টা এ্যাম্বুলেন্স দিয়েছেন। আর আমরা ১৯৪টা এ্যাম্বুলেন্স এরই মধ্যে দিয়েছি।

আমরা ৫৫টি আইন এরই মধ্যে প্রণয়ন করেছি। অর্থ বিলসহ আরও ১৯টি আইন এই মাসে পাস করা হবে। এই ৭৪টি আইনের মধ্যে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আইন এই সংসদ পাস করেছে। আমি সব নাম উল্লেখ করতে চাই না। তবে কতগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন। এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, এসিড অপরাধ দমন আইন করেছি। জননিরাপত্তা বিশেষ বিধান আইন আমরা রহিত করেছি। যেটা আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল। এন্টি মানি লন্ডারিং আইন করেছি, যার ফলে রেমিট্যান্স বেড়েছে, আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ বেড়েছে এবং কালোবাজারে সোনা, অস্ত্র এবং বিভিন্ন ধরনের মাদক-দ্রব্যের পরিবর্তে যে মানি লন্ডারিং হতো সেটা কিছুটা বন্ধ হয়েছে। পরিবেশ আদালত করা হয়েছে। দ্রুত বিচার আদালত এবং দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল করা হয়েছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য অবসর সুবিধা প্রদানের জন্য আইন করেছি আমরা। তারপরে গ্রাম সরকার আইন করেছি। ব্যাংক কোম্পানী আইন সংশোধন করে ব্যাংকগুলির মধ্যে নতুন শৃঙ্খলা আনা হয়েছে।

Good governance-এর কথা আমরা বলি। সুশাসনের সব চাইতে বড় pre-condition হল, পূর্বশর্ত হল rule of law, আইনের শাসন। আর আইনের পূর্ব শর্ত হল সুবিচার নিশ্চিত করা। আজকে এই লক্ষ্যে আমরা কতগুলি major judicial reforms এনেছি। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রমের জন্য আমরা আইন প্রণয়ন করেছি। এটা ১ জুলাই থেকে effective হবে। আমরা অর্থঋণ আদালত আইন নতুন করে করেছি, একটি exhaustive, self-contained law। এই আইনের মধ্যেও আমরা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রেখেছি। আমরা বিলম্ব কমিয়ে এবং easy access to justice ensure করার জন্য যত কিছুর প্রয়োজন, আইনগতভাবে সেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। Service of notice, adjournment, injunction, interlocutory application-এর প্রত্যেকটির ব্যাপারে বাজেট পাসের পরে একটা আইন আসবে। তাছাড়া সুপ্রীম কোর্টের রুল্স পরিবর্তন করার জন্য প্রধান বিচারপতিকে আমরা লিখেছি, অনুরোধ করেছি। চতুর্দিকে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আদালতগুলি ভাল কাজ করছে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টে যদি এটার প্রতিফলন না হয় তাহলে সেটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সেই জন্য সুপ্রীম কোর্টের রুল্স সংশোধন

www.pathagar.com

করার জন্য অনুরোধ করেছি। Speedy Trial Court-এ last ১২ মাসে, আপনি শুনে খুশি হবেন যে, ৩৯৫৯টি মামলা এই আদালতগুলিতে জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১৮৬০টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে যা ২০ বছরেও করা সম্ভবপর হতো না। It vindicates the political will of the government, আজকে যদি আমাদের এই উইল না থাকতো তাহলে আমরা এটা করতে পারতাম না। আমার এক বন্ধু বলেছেন যে, আওয়ামী লীগ ৫ বছর ক্ষমতায় ছিল তারপরেও শেখ মুজিবুর রহমানের মামলা কেন তারা শেষ করতে পারলেন না? Because they did not have that will।

আর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের কথা বলি, আজকে মাত্র ৮ মাস হয়েছে কাজ করছি। ৩১৬টি মামলা তাদের বিচারাধীন আছে এবং এর মধ্যে আজ পর্যন্ত ৭২টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এর এক একটি মামলার নিষ্পত্তি ৫, ৭, ১০ বছরেও করা সম্ভব হতো না। কিন্তু আজকে ৭২টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং আরও হতে থাকবে। বড় বড় মামলা। বর্তমান মাসে অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী হত্যা মামলা, ঢাকায় ফরিদা বেগমের মামলা, গৃহবধূ হালিমা খাতুনের মামলা, সুত্রাপুরের জোড়া খুনের মামলার রায় হয়েছে। নরসিংদীর আওয়ামী লীগের রবিউল আউয়াল কিরণের হত্যা মামলা, বিগত সরকার ৫ বছর ক্ষমতায় ছিল, তাঁদেরই একজন সাবেক সংসদ সদস্য মারা গিয়েছেন, কিন্তু তার বিচার তারা করেননি। এডভোকেট হাবিব মণ্ডলের হত্যা মামলা, ঝিনাইদহের সেলিম হত্যা মামলা, বাগেরহাটের সাবেক ইউপি সদস্য হত্যা মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে। ফাহিমা আত্মহনন মামলার রায় হয়ে গেল। সনি হত্যা মামলার রায় আগামীকাল হবে। ডন, বুশরা, রুবেল ও জুয়েল এদের হত্যা মামলার রায় আগামী ৭ দিনের মধ্যে হবে। যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, সুশাসন মুখে বললে চলবে না। আমরা কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে সুশাসনে আমরা বিশ্বাস করি এবং এ ব্যাপারে যা কিছু করা প্রয়োজন তা আমরা করেছি।

আর একটি বিষয়, আমরা মানবাধিকারের কথা বলি এবং সুবিচারের কথা বলি। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আমরা আইনী সহায়তা কার্যক্রম জোরদার করেছি। দেশের প্রতিটি জেলায় জেলা জজের সভাপতিত্বে একটি করে কমিটি এ বিষয়ে কাজ করছে। প্রতিটি জেলায় একটি করে panel of lawyers আছে। সুপ্রীম কোর্টে যেসব কোর্ট আপীল আছে, কয়েদীরা যারা জেলখানায় আছে তাদের বিচারের শুনানি কোনদিন হতো না। আমাদের সেখানেও একটি panel of lawyers আছে। তারা এরই মধ্যে ৮ মাসে ১২টি মামলার শুনানি করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা প্রায় সবাই জেলখানায় গিয়েছি। অনেকে দাবি করেন যে, তাঁরা নাকি সবচেয়ে বেশিবার গিয়েছেন। তাঁদের নেতা সবচেয়ে বেশি বছর জেলখানায় ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা যখন জেলখানায় যাই তখন জেলখানার কথা আমরা খুব চিন্তা করি। এই অমানবিক এবং মানবেতর অবস্থার অবসান করব বলে এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করি। কিন্তু যে মুহূর্তে কারাগার থেকে বেরিয়ে মুক্তির স্বাদ পাই, আমরা সেটা ভুলে যাই। কিন্তু যেই ব্যক্তি কোন দিন জেলে যান নি, সেই শহীদ জিয়াউর রহমানই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কারা সংস্কার কমিশন গঠন করেছিলেন। কিন্তু সেই কমিশনের সুপারিশগুলি তিনি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেন নি কারণ তার আগেই তিনি শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু আজকে তাঁর সেই কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে আমরা কাজ করছি। একটি মন্ত্রিপরিষদ কমিটি আছে। আপনি শুনে আনন্দিত হবেন যে, আজকে সেন্ট্রাল জেলে পাখা লাগানো হবে সকল বন্দীর জন্য, টেলিভিশন সেট দেওয়া হবে, ভিডিও লিংকেজ স্থাপন করা হবে, হাজতীদেরকে যেন জেলখানা হতে আদালতে আনতে না হয়। এই যে তাদের করুণ অবস্থা, শত শত লোককে জেলখানা থেকে আদালতে আনা, তাদের জন্য পুলিশ দেওয়া, লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট দেওয়া, খাওয়া-দাওয়া, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, এগুলি করার আর প্রয়োজন হবে না। আমরা ভিডিও লিংকেজ স্থাপন করতে যাচ্ছি ঢাকাতে যাতে করে শুধু হাজিরা দেওয়ার জন্য হাজতীদের আর আদালতে যেতে না হয়।

আমাদের জেলখানাগুলিতে এখন সত্তর হাজার মানুষ বসবাস করে, যদিও ধারণ ক্ষমতা হল মাত্র পঁচিশ হাজার ছয়শত। কিন্তু এইবার অর্থ-মন্ত্রী, চল্লিশ কোটি টাকা বেশি দেওয়াতে ইনশাআল্লাহ এই বছরের মধ্যে দুই হাজার পাঁচশত কারাবন্দীদের থাকার জন্য নয়টি জেলখানার সংস্কার করা হচ্ছে।

এই বিষয়গুলি বলা দরকার। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজের উদ্যোগে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যার জন্য তিনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অনুদান

www.pathagar.com

দিয়েছেন। মহিলারা যারা জেলখানায় যায়, তাদের সাথে যে সব শিশু থাকে, শিশুরা তো কোনো অপরাধ করে নি, তারা কেন মায়ের সঙ্গে বন্দি অবস্থায় থাকবে? মহিলাদেরকে রাখার ব্যবস্থাও আমরা অন্য জায়গায় করছি। কিন্তু যতদিন এখানে থাকবে ততদিন তাদের শিশুরা যাতে খেলাধুলা, লেখাপড়ার সুযোগ পায়, ডে-কেয়ার সেন্টারে সেই ব্যবস্থা থাকবে। আমরা আরও দুইটি কাজ করব। একটি হল বিচার বিভাগের প্রশাসন থেকে পৃথকীকরণ। এটার ব্যাপারে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এটা প্রক্রিয়াধীন আছে, ইনশাআল্লাহ, আশা করি আমাদের সরকারের আমলেই এই বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের কাজ শেষ করা সম্ভবপর হবে।

আর একটি হল, আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী একটি নিরপেক্ষ, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন করার জন্য আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে এবং এটাও আশা করি যতো শীঘ্র সম্ভব এখানে উপস্থাপন করতে পারব।

এখন আমি দুই-একটি কথা বলতে চাই হরতালের উপর। এটা হল *ভোরের কাগজ*, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৮ সাল।

> আওয়ামী লীগ আর কখনো হরতাল ডাকবে না। প্রধানমন্ত্রী ও দলের সভানেত্রী হিসাবে শেখ হাসিনার একতরফা ঘোষণা—প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছেন তাঁর দল আওয়ামী লীগ আর কখনো হরতাল করবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসাবে একতরফাভাবে এই ঘোষণা করছি।

আজকে দুঃখের বিষয় যে এই বছরেই তারা ১৭ বার হরতাল ডেকেছে, সব তারিখ আমার কাছে আছে, মাননীয় স্পীকার। আর এই মাসে তারা হরতালে হ্যাটট্রিক করেছে। হরতালে হ্যাটট্রিক, ১২ তারিখ, ১৯ তারিখ আর ২৮ তারিখ, আজকে। I congratulate them, কারণ each one of the Hartals was counter-productive. It has gone against them. I think Awami League has become restless, impatient হয়ে গেছে। তারা কতগুলি মারাত্মক ধরনের political blunder commit করেছেন। যেমন একটা করেছেন ১৯ তারিখে হরতাল দিয়ে। হরতালের আগে হাসিনা বলেছিলেন, "বিজিএমই নেতাদের হাসিনার আশ্বাস—পাওয়েলের সাথে কোটা শুল্কমুক্ত সুবিধা নিয়ে আমি কথা বলব।" *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ জুন ২০০৩। কিন্তু পাওয়েলের সাথে হরতালের কারণে তাঁর দেখা করার সুযোগ আর হয় নি। I think she made a very big mistake। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণপুত্রীর সাথে একই কারণে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে ওঠেনি। এইসব ফ্রাস্টেশনের কারণে আমার মনে হয় তাঁরা সংসদে আসছেন না এবং আসেন না।

আজকে আমাদের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী একটি খুব ভাল তথ্য আমাদেরকে দিয়েছেন। কিন্তু এর একটি প্রেক্ষাপট আছে। তিনি বলেছেন যে দুপচাঁচিয়া থানার কৃষক লীগের সভাপতির বাড়ি থেকে কালকে ভোররাতে প্রায় ৬২ হাজার চাইনিজ রাইফেলের গুলি ও ৪০ কেজি এক্সপ্লোসিভ পাওয়া গেছে। আওয়ামী লীগের নেতার বাড়িতে। হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। এটার একটি back ground আছে। এই back ground আমি একটু ব্যাখ্যা করে বলতে চাই।

বিরোধীদলের নেত্রী তিনটি উল্লেখযোগ্য বিদেশ সফর করেছেন। প্রথমটি তিনি করলেন নিউইয়র্কে। এটা হল ৫ জানুয়ারি ২০০২। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পরপরই। জানুয়ারি ২০০২ মানে আমরা ক্ষমতা গ্রহণের ২ মাস পর। তিনি সেখানে বলেছেন, "আফগানিস্তানের তালেবান সমর্থকরা বাংলাদেশে সক্রিয় রয়েছে এবং ক্ষমতাসীন জোট সরকারের ছত্রছায়ায় তারা কাজ করছে।" বিদেশে গিয়ে বলার চেষ্টা করলেন এখানে তালেবানরা কাজ করছে। এটা একটি লম্বা আর্টিকেল, এর পুরোটা আমি পড়তে চাই না। শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, তিনি এই ধরনের প্রচার বিদেশে গিয়ে প্রথম থেকেই শুরু করেছেন। তারপরে দেখেন উনি বলেছেন, "ভদ্রলোকের জন্য বাংলাদেশে বসবাসের পরিবেশে আজ বিপন্ন।" বিদেশে বললেন, "কোন ভদ্রলোক বাংলাদেশে বসবাস করতে পারবে না।" ফ্লোরিডাতে গিয়ে ১৮ মে, ২০০২ সালে এই বক্তৃতা করলেন। উনি তো ফিরে এসেছেন। তাহলে তিনি ফিরে আসলেন কেন? যদি ভদ্রলোকের বসবাসের জন্য বিপন্ন হয়েই থাকে তাহলে ওখানে থাকলেই পারতেন। তারপরে বিবিসিতে তিনি একই কথা বললেন, "জোট সরকারের ছত্রছায়ায় তালেবানরা সক্রিয় এবং বাংলাদেশে এখন তাদের আখড়া।"

www.pathagar.com

তারপরে দেখেন, ৩০ নভেম্বর ২০০২ সালে উনি ভারতে গেলেন। যাওয়ার আগে ৮ নভেম্বর ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী বললেন যে, "After the change of government in Bangladesh there has been an increase in the activities of the Al-Kaida and ISI". উনি বললেন যে "আল-কায়দার terror network growing in Bangladesh." এটা ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী বললেন। আরও বললেন যে "ভারতে হানা দিতে আল-কায়দা জঙ্গীরা ঘাঁটি গেড়েছে বাংলাদেশে।" এই সব irresponsible statement করলেন। কেন করলেন? তারও একটি back ground আছে। "Bangladesh has 140-terror camps" এটা হল *স্টেস্‌ম্যান* পত্রিকার ২২ নভেম্বর ২০০২ সালের ছাপানো হেডলাইন। *দৈনিক ভোরের কাগজে* লিখল, "জ্যোতি বসু বলেছেন, বাংলাদেশে মৌলবাদীদের কারণে পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস বাড়ছে।" তারপর *Hindustan Times*, ২৮ নভেম্বর "Delhi will dub Dhaka as Al-Qaida hub।" ততদিনে শেখ হাসিনা দিল্লিতে অবতরণ করেছেন। দিল্লি অবতরণ করে শেখ হাসিনা প্রথমে যে বক্তব্য রাখলেন, সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। "বাংলাদেশে আল-কায়েদা সদস্যরা আশ্রয় নিচ্ছে।" ভারতে বসে এই কথাটা বললেন। এ কথা বলার পর, ভারতের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীও একই ধরনের কথা বললেন। এসব বলার পরে শেখ হাসিনা আর কী বললেন, সেটা আমি আপনাকে শোনাতে চাই।

The Statesman, 28th November 2002.

> Hasina afraid to return to Bangla–A distinctly nervous former prime minister of Bangladesh Sheikh Hasina Wazed appeared cowed down by the threats that the government headed by Begum Khaleda Zia had unleashed on her and her party supporters

চিন্তা করে দেখুন, *স্টেটসম্যান*-র মত কাগজে কী রকমের কত বড় হেডিং "She said a lot of terrorist activities were going on in Bangladesh" এবং "She is feeling insecure to go back to Dhaka"– চিন্তা করে দেখুন।

আজকে উনারা এখানে নেই। থাকলে আরও অনেক কিছু বলতাম। দেশে যা খুশি বলুন। কিন্তু বিদেশের মাটিতে গিয়ে এই কথাগুলি কেন বলবেন? তাঁর উচিত ছিল তখন এই আদভানি, পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আর প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করা। যদি সত্যিকার দেশপ্রেমিক হতেন, তা হলে তাঁর বলা উচিত ছিল যে, আমরা এটার প্রতিবাদ করি। তাহলে আজকে শেখ হাসিনাকে সালাম দিতাম। বলতাম যে আপনি ভালো কাজ করে এসেছেন। মাননীয় স্পীকার, এই যে তিনি ইন্ডিয়াতে গেলেন, ইন্ডিয়াতে গিয়ে কী হল একটু শুনুন। শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে আদভানি বলেছেন, "দীর্ঘদিন নজর রাখার পরই বাংলাদেশ সম্পর্কে দিল্লি মন্তব্য করেছে।" খুব ভালো কথা। শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টায় তিনি অনেকের সাথে দেখা করেছেন, "হাসিনা তারপরে আদভানির সাথে একটি একান্ত বৈঠক করেন।" এই মিটিং করার পর এখানে লেখা হয়েছে, হাসিনা বা আদভানি দুজনের তরফ থেকে অবশ্য এই একান্ত বৈঠক সম্পর্কে সরাসরি কোন কিছু জানানো হয়নি।

এই কাগজের বরাত দিয়ে এখানে *জনকণ্ঠ* একই কথা লিখেছে। একই দিনে ৩০ নভেম্বর একই কথা লিখেছে যে, "তাঁদের বৈঠকে কি হয়েছে, কেউ জানে না।" আপনি আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আমার দেশের বিরোধীদলীয় নেত্রী, আমার দেশের অন্তত ৪০ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন বলে আপনি দাবি করেন, আর আপনি একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গিয়ে এই কথাগুলি বললেন, আর গোপন বৈঠক করলেন। দেশের মানুষ আপনাকে সন্দেহ করবে না তো কী করবে?

Bangladesh Today লিখেছে Hasina continues to demean Bangladesh abroad। "A systematic political and religious persecution is persued by the four party alliances"—দিল্লির কনফারেন্স এ ধরনের আরও অনেক কথা নিজের দেশ সম্পর্কে বলেছেন। লজ্জা কোথায় রাখি, মাননীয় স্পীকার। আমরা মনে করি যে, যারা রাজনীতি করে দেশের মানুষকে ভালবেসে করে। দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য করে। সবাই দেশপ্রেমিক। এটাই আমরা ভাবতে চাই। কিন্তু এ সব যখন দেখি, তখন সেই ভাবনাটা একটু দূরে সরে যায়।

www.pathagar.com

তারপর দেখুন, তিনি প্যারিসে গেলেন। প্যারিসে গিয়ে কী করলেন? সে আর এক কাহিনী। প্যারিসে গিয়ে তিনি বললেন যে, প্যারিসের পার্লামেন্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করতে হবে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে resolution pass করতে হবে। *OBSERVER* ১৩ মে ২০০৩, her last visit abroad, এই যে এই বার ফিরে আসলেন। "Hasina lobbying for resolution in French parliament against Bangladesh", চিন্তা করে দেখুন। ওখানে গিয়ে তিনি ওদেরকে address করেছেন, address করে তিনি বলছেন, ওনার languageটা ছিল এরকম, *যুগান্তরে* বেরিয়েছে। *যুগান্তর* লিখেছে শেখ হাসিনা, "উন্নয়নের স্বার্থে বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষা এবং রাজনৈতিক নিপীড়ন বন্ধের লক্ষ্যে ফ্রান্স পার্লামেন্টকে এ বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করে একটি প্রস্তাব পাস করার জন্য অনুরোধ করেন।" চিন্তা করুন। Is it the testimony of patriotism? তিনি প্যারিসে পার্লামেন্টারী মেম্বারদের সাথে মিটিংয়ে বলেছেন যে, "বাংলাদেশে প্রতিদিন ১০ জন খুন হচ্ছে।" বাংলাদেশে এসে বলেন। ওদের কাছে কেন বলেন? বিদেশে গিয়ে দেশের সুনাম করবেন। একথাটুকু আমাদেরকে বলে দিতে হবে নাকি?

আওয়ামী লীগ মধ্যবর্তী নির্বাচন চেয়েছে। "অবিলম্বে মধ্যবর্তী নির্বাচন দিন"—শেখ হাসিনা, বগুড়ায় বলেছেন। আর আব্দুল জলিল সাহেব বলেছেন, "আন্দোলনের মাধ্যমে খালেদা সরকারকে মধ্যবর্তী নির্বাচন দিতে বাধ্য করতে হবে।" Have they gone out of their sense? দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আমরা নির্বাচিত হয়েছি। সেই জন্য আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, they have lost their nerves. They have become desparate। তারা যা খুশি তা করতে পারে। আজকের পত্র-পত্রিকায় আছে যে আওয়ামী লীগের এক নেতার বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণের অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এখানে একটা লিংক খুঁজে পাওয়া যায়। আজকে আওয়ামী লীগ স্টাইলের আল-কায়েদা বাংলাদেশে স্থাপন করার জন্য তারা চেষ্টা করছে বলে মনে হয়। হ্যাঁ, নতুন আল-কায়েদা, আওয়ামী আল-কায়েদা। যার জন্য ৬২ হাজার চাইনিজ রাইফেলের গুলি পাওয়া গেছে। রাইফেলগুলি কোথায় গিয়েছে? They must be there. They must tell us where those rifles are। দেশের মানুষের জানার আধিকার আছে। এই ৬২ হাজার চাইনিজ রাইফেলের গুলি যখন আছে, রাইফেলও তাদের কাছে আছে। ৪০ কেজি এক্সপ্লোসিভ পাওয়া গেছে। বোমা মারার উপর কত না নাটক তারা করলো তাদের সময়। এইখানে বোমা, ঐখানে বোমা। আর এখানে ৪০ কেজি বোমাতে কত ধ্বংস হতে পারে, চিন্তা করে দেখেন। আর এগুলি পাওয়া গেছে কার বাড়িতে? কৃষক লীগের সভাপতির বাড়িতে পাওয়া গেছে। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, এই ষড়যন্ত্র কত গভীর ষড়যন্ত্র। আল-কায়েদার নাম করে বাংলাদেশের দুর্নাম করে নিজেরা এখানে আল-কায়েদা স্থাপন করার যে ষড়যন্ত্র করছেন, বাংলাদেশের মানুষ কোন দিন তা ক্ষমা করবে না।

ওআইসির ব্যাপারে আমি সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে শুধু assure করতে চাই, আওয়ামী লীগ তার বিরুদ্ধে যত বেশি প্রোপাগান্ডা করবে তত বেশি ভোট আপনি পাবেন। It is another political blunder। এটা তো সালাউদ্দিনের বিরোধিতা করা না, এটা হল বাংলাদেশের বিরোধিতা করা। And they are doing it। তাদের এতটুকু লজ্জা নেই, তারা বিদেশী রাষ্ট্রদূতদেরকে গিয়ে বলছে যে, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে ভোট দিও না।

কিন্তু উনি তো নিজের ভোট করছেন না। হয় বাংলাদেশ জিতবে, না হয় জিতবে না। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর জেতা মানেই বাংলাদেশ জেতা।

মাননীয় স্পীকার Democracy, rule of law, independence of judiciary সম্পর্কে আমি অনেকবার এ পার্লামেন্টে বলেছি। চতুর্থ সংশোধনী পাস করার পর আওয়ামী লীগের মুখে এগুলি শোভা পায় না।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এই আইনের ফলে দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থায় একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আসবে

দেওয়ানী কার্যবিধি (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৩

১৩ জুলাই ২০০৩

সহজে, কম খরচে, দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই আইনের অধীনে অনেকগুলি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিচার ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য দেওয়ানী কার্যবিধিতে cost element introduce করা হয়। বর্তমান আইনের অপব্যবহার এবং দীর্ঘসূত্রতার প্রক্রিয়া রোধ করার জন্য খরচ, ক্ষতিপূরণ এবং জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়। এই আইনের অধীনে আদায়কৃত খরচ এবং জরিমানা সরকারী কোষাগারে জমাদানের বিধান রাখা হয়। এই আইন যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ এবং বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থায় এক সুদূরপ্রসারী মঙ্গলজনক পরিবর্তন আসবে।

মাননীয় স্পীকার

আমি আমাদের দুইজন সংসদ সদস্য জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের এবং জনাব বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তমকে ধন্যবাদ জানাই যে তাঁরা অন্তত আইনটি পড়েছেন এবং কিছু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন।

এই আইনটি প্রস্তাব করার আগে আমরা গত এক বছর যাবত বিভিন্ন আইনজীবী সংগঠনের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছি এবং মন্ত্রিপরিষদে নেওয়ার আগে বাংলাদেশে যাঁরা স্বনামধন্য আইনজীবী আছেন, প্রায় সকলের পরামর্শ আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা অনেকের কাছ থেকে লিখিত মন্তব্যও পেয়েছি। সেগুলির উপরে ভিত্তি করে এই আইনের খসড়া তৈরি করা হয়। এরপরে এই সংসদে এটা উত্থাপন করা হয় এবং স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। আমি এখানে আপনার মাধ্যমে স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি এবং সদস্যদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা অনেক পরিশ্রম করে বেশ কয়েকদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই বিলটির উপর রিপোর্ট সংসদে পেশ করেছেন। রিপোর্টটি যথাসময়ে উত্থাপিত হয়েছিল এবং সেই রিপোর্টটির উপর ভিত্তি করেই আমি বিলটি বিবেচনার জন্য সংসদে এনেছি।

এখানে একটি বিরল দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করেছি। আমাদের স্থায়ী কমিটিতে এই প্রথমবারের মত, আমি জানি না অন্য কোনো বার এটা হয়েছে কিনা, দেশের পাঁচজন সুপরিচিত আইনজীবীকে এই কমিটির দুটি মিটিং-এ আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং তাঁরা হলেন, আমাদের বর্তমান এটর্নী জেনারেল জনাব হাসান আরিফ, সাবেক এটর্নী জেনারেল, আওয়ামী লীগ আমলে যিনি এটর্নী জেনারেল ছিলেন জনাব মাহমুদুল ইসলাম, সাবেক এটর্নী জেনারেল ব্যারিস্টার রফিকুল হক, যিনি জেনারেল এরশাদ সাহেবের সময়ে এটর্নী জেনারেল ছিলেন, সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ এবং আরেকজন ড. মোহাম্মদ জহির। এই পাঁচজনকেও আপনার মাধ্যমে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে, সক্রিয়ভাবে স্থায়ী কমিটির সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এই বিলটি চূড়ান্ত করার ব্যাপারে একটি অবদান রেখেছেন।

আইনের শাসন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং দেশের দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থা আরও গতিশীল এবং আস্থাপূর্ণ করার জন্য সরকার অনেকগুলি সুদূরপ্রসারী সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এরই মধ্যে বেশ কিছু সংস্কারমূলক আইন সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৫ লক্ষের মত দেওয়ানী মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন আছে। কিন্তু এগুলির অনেকগুলি মামলাই আমরা অতি সহজে নিষ্পত্তি করতে পারি এবং অনেকগুলি মামলা আছে যেগুলির কোনো

www.pathagar.com

প্রয়োজন ছিল না। তারপরেও আমাদেরকে একটি আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই জট কমাতে হবে। মূল উদ্দেশ্য হল সহজে, কম সময়ে, কম খরচে নাগরিকদের আইনের আশ্রয় পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

এই সরকারের এটাই হল একটি অন্যতম লক্ষ্য। আমরা এরই মধ্যে দ্রুত বিচার আদালত করেছি। আমি বিস্তারিত বলতে চাই না, তবে এই দ্রুত বিচার আদালত এবং দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর বিচার ব্যবস্থায় মানুষের আস্থা ফিরে আসা শুরু করেছে। আজকে ৯টি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ৯২টি মামলার নিষ্পত্তি করেছে গত ১০ মাসে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা একটি বিরাট ঘটনা। দ্রুত বিচার আদালতে, পাঁচ বছর পর্যন্ত যেখানে সাজা দেওয়া যায় সেখানে ২ হাজারের উপরে মামলা গত ১৪ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে। চাঞ্চল্যকর বহুল আলোচিত মামলার জন্য একটি মনিটরিং সেল আছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে সেটা অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে কাজ করছে এবং বিগত সরকারের ফেলে রাখা অনেকগুলি মামলার নিষ্পত্তি আদালত এরই মধ্যে করতে সক্ষম হয়েছে। এসিডের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং এসিড সম্পর্কিত অপরাধ দমন আইন করেছি, শিশু ও নারী নির্যাতন আইন সংশোধন করেছি। জননিরাপত্তা আইন বাতিল করেছি। কারা সংস্কারে আমরা হাত দিয়েছি এবং অনেকগুলি পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। আইন সহায়তা প্রদানকে আমরা শক্তিশালী করেছি। সারা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এখন একটি করে আইন সহায়তা কমিটি জেলা জজের সভাপতিত্বে আছে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম প্রচলন করার জন্য দেওয়ানী কার্যবিধি আমরা সংশোধন করেছি। যেটার সুফল দেশের জনগণ এখনই পাওয়া শুরু করেছে। আজকে adversarial যে system আমাদের দেশে আছে সেটা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা accommodation, reconciliation, compromise-এর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির কালচারটা আমাদের বিচার ব্যবস্থায় আনতে চাই। এর ফলে মানুষ অতি সহজে ও কম খরচে বিচার পাবে। এজন্য হাইকোর্টে যেতে হবে না। আপীল বিভাগে যেতে হবে না। কাজেই আমরা সুবিচার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবো। আজকের এই বিলটি একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উত্থাপন করা হয়েছে বিবেচনার জন্য। এই বিলটি পাস হলে দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থায় একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আসবে।

আমি এখন এই বিলের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করতে চাই। অল্প সময়ে কম খরচে বিচার সম্পন্ন করা হল আজকে সময়ের দাবি। যদি আমরা এই দাবি পূরণ করতে না পারি তাহলে আমাদের পুরো বিচার ব্যবস্থার উপর মানুষের আর আস্থা থাকবে না এবং আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব না। প্রথমে আসুন মিথ্যা মামলার বিষয়টি আলোচনা করি। আমাদের দেশে জাল দলিল বা মিথ্যা দলিলের উপর ভিত্তি করে মানুষ যাতে অযথা মিথ্যা মামলা না করে, বুঝে শুনে যাতে মামলা করে, সেইজন্য এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমান আইনে আছে মাত্র ৫০০০ টাকা। এই সব মামলায় যদি দেখা যায় যে একটি মিথ্যা, ভুয়া মামলা দায়ের করা হয়েছে আর তার বিরুদ্ধে যদি একটা জরিমানার বিধান থাকে তাহলে মানুষ সতর্ক হবে। তারা অনর্থক কোর্টে মিথ্যা মামলা করতে আর যাবে না।

এরপর আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট করা তারিখের মধ্যে লিখিত বিবৃতি বা কোন দরখাস্ত দাখিল না করলে সেখানে একটি খরচ দিতে হবে। এই খরচটা রাষ্ট্র পাবে, কোন ব্যক্তি পাবে না। এটা রাজস্ব হিসাবে ট্রেজারিতে জমা হবে। সেখানে কমপক্ষে ১০০০ টাকা রাখা হয়েছে, উর্ধে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত আদালত নির্ধারণ করতে পারেন। মাননীয় স্পীকার, আপনি জানেন যে আমাদের একটি অভ্যাস হল যে মামলায় যখন জানি হেরে যাচ্ছি তখন একটি দরখাস্ত করে দিলাম মামলাটাকে বিলম্বিত করার জন্য। আদালত যদি মনে করে যে মামলা বিলম্বিত হতে পারে অথবা বিলম্বিত করার জন্যই এই দরখাস্ত করা হয়েছে তাহলে আদালত ইচ্ছা করলে সে দরখাস্ত গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু একটা খরচ দিতে হবে অপর পক্ষকে হয়রানি করার জন্য বা তাদের সময় নষ্ট করার জন্য বা আদালতের সময় নষ্ট করার জন্য, সর্বোচ্চ ১০ হাজার সর্বনিম্ন ২ হাজার টাকা।

তারপর আসুন দেওয়ানী কার্যবিধির সেকশন ১১৫তে। এ সম্পর্কে দুজনেই বলেছেন যে আমরা ভাল কাজ করেছি, অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে সেইজন্য। এটা বহুল প্রতীক্ষিত বিষয়। নিম্ন আদালতের যে কোন আদেশের বিরুদ্ধে এখন বর্তমান আইনে হাইকোর্টে আসতে হয়। বাংলাদেশের

www.pathagar.com

কতজন গরিব মানুষ হাইকোর্টে আসতে পারে। আজকে সেখানে আমরা হাইকোর্টের মৌলিক এখতিয়ারকে অক্ষুণ্ন রেখে নিম্ন আদালতের যে কোন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজকে এই revision-এর এখতিয়ারটা দিয়েছি যাতে করে লোকাল লেভেলে জেলা জজ সাহেবরা বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পারেন। সারা বাংলাদেশে যত আইনজীবী আছে এটা সকলের দাবি এবং আজকে আমরা সেই দাবিটা পূরণ করতে পেরেছি এই সংশোধনীটার মাধ্যমে। মাননীয় স্পীকার, আপনি তো জানেন মামলা বিলম্বিত হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হল শুনানির মুলতবি চাওয়া বা দেওয়া। কিন্তু adjournment-এর কোন limit নেই। একটা মামলায় ৩, ৪, ৫ এমনকি ১০ বছর পর্যন্ত adjournment হতে পারে। এটা তো হতে পারে না। যার জন্য মামলার জট বেড়ে চলেছে। এর জন্য কিছু সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণগুলি আমি বলছি। মুলতবি, adjournment at any stage of the proceedings, তিনটি adjournment allow করা হবে। অনেকে বলেছেন, আমাদের স্পীকার সাহেবও বলেছেন, শুধু একটা adjournment-এর সুযোগ দিলেই যথেষ্ট। আমরা সেখানে তিনটি adjournment, from each side allow করেছি। এর চেয়ে বেশি যদি নিতে হয়, কেউ যদি আরও সময় নিতে চায়, তার জন্য তাকে সর্বোচ্চ ২ হাজার আর সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা খরচ দিতে হবে। মামলার একতরফা নিষ্পত্তির পরে কেউ যদি আবার সেই মামলা পুনর্বহাল করতে আসে, তাকে একটা খরচ দিতে হবে, ৫ হাজার টাকা। জেলা কোর্টে, এক একটা কোর্টে ১৫০ থেকে ২০০ মামলা কার্য তালিকায় থাকে। আমরা সেটা limit করেছি, তিনটির বেশি মামলা চূড়ান্ত hearing-এর জন্য থাকবে না। এটা আমরা এখন নির্দিষ্ট করে দিচ্ছি। তাতে সাধারণ মানুষের উপকার হবে। যারা মামলা করেন, বিচারপ্রার্থী, তাদেরকে অহেতুক আদালতে যেতে হবে না। যেদিন শুনানি নেই, তাদেরকে সেদিন কোর্টে যেতে হবে না। তাদের খরচ কমে যাবে এবং জজ সাহেবদেরও কাজ সহজ হবে। তারা দুটা বা তিনটা মামলা যদি ক্যালেন্ডারে রাখেন, তাদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে মামলাগুলি নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর হবে।

আর একটি হল affidavit করে যদি আর্জি বা লিখিত জবাব এবং অন্যসব দলিলপত্র দেওয়া হয়, তাহলে একজামিনেশন-ইন-চীফের দরকার হবে না। সরাসরি cross-examination করা যাবে । এ ক্ষেত্রে আমরা একটা স্তরকে কমিয়ে দিয়েছি। তার ফলে একটা বিরাট সুফল সকল পক্ষই পাবে। বাদী পক্ষ, বিবাদী পক্ষ, আদালত সকলেই এটার সুবিধা পাবে। বিচারপ্রার্থীরাও এটার সুবিধা পাবে।

মাননীয় স্পীকার, সার্ভিস অব নোটিশের সময়টা এখন একটা unlimited ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আমরা একটা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছি। খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার বিষয়টা optional রাখা হয়েছে, compulsory কিছু নয়। আমরা যেটা করেছি maximum ২৫ দিনের একটা প্রভিশন already আইনের ভেতরেই আছে। আমরা শুধু এটা বাস্তবায়ন করার জন্য এখন mandatory করে দিয়েছি।

ইনজাংশনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় স্পীকার government-এর development work-এর ব্যাপারে ইনজাংশন দেওয়ার tendencyটা বেড়ে চলেছে, এটা সংবিধানে মানা করা আছে। রাষ্ট্র বা সরকারকে না শুনে একতরফাভাবে ইনজাংশন দেওয়া যাবে না, development work-এর ব্যাপারে। জনগণের জন্য একটা বড় রাস্তা হচ্ছে, একটা ব্রিজ হচ্ছে, একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হচ্ছে, একটা উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত কোন কাজ হবে বা হচ্ছে, সেখানে flimsy ground-এ একটা ইনজাংশন দিয়ে দেওয়া হয় এবং সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটা কিন্তু সংবিধানে মানা আছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২(৪)-এ যা আছে, এটাই আমরা এখানে সন্নিবেশিত করেছি। ইনজাংশন দিতে পারবে না তা নয়। তবে সরকারকে না শুনে দিতে পারবে না। সরকারকে শোনার একটা সুযোগ দিতে হবে। সরকার যেন তার পজিশনটা explain করে বলতে পারে। তারপর কোর্ট যেটা ভালো মনে করবেন, সেটা করবেন।

তারপর আসুন between two private parties-এর বেলায়ও আমরা একতরফা অন্তর্বর্তীকালীন ইনজাংশন নিরুৎসাহিত করেছি। একটা ইনজাংশন হয়ে যাওয়ার পর এটা যেন অনেকটা অনির্দিষ্টকালের জন্য হয়ে যায়। একপক্ষ হয়ত একজনের বিরুদ্ধে ইনজাংশন চেয়েছে, কোর্ট ইনজাংশন

www.pathagar.com

দিয়ে দিল। অপরপক্ষ হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে এই ইনজাংশনের কারণে। সেইজন্য এখানে আমরা একটা বিধিনিষেধ এনে দিয়েছি যে, যদি বিবাদী পক্ষ হাজির হয়, তাহলে ৭দিনের মধ্যে মামলার শুনানি নিষ্পত্তি করে দিতে হবে। আর যদি দেখা যায় injunction পাওয়ার কোন অধিকার বাদীর ছিল না এবং injunction-এর ফলে বিবাদী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাহলে বাদীকে সর্বনিম্ন ৫ হাজার এবং সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান করা হয়েছে। আর যে কোন ধরনের ইনজাংশনের জন্য একটা সিকিউরিটি জমা দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার, এই সিকিউরিটির অর্থ কোন আয় করার জন্য নয়। এটা হল মিথ্যা মামলা বন্ধ করার জন্য। এটা হল বিলম্ব কমিয়ে আনার জন্য এবং effective justice administer করার জন্য, যাতে অহেতুক injunction না চাওয়া হয়।

এই আইন কার্যকর হলে দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে। বিচার দ্রুত সম্পন্ন হবে এবং সুবিচার নিশ্চিত হবে। এই আইনের অর্থপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য আদালত, আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী, সকল রাজনৈতিক দল এবং সুশীল সমাজের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। মাননীয় স্পীকার, আর দুটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। জনাব গোলাম কাদেরের বক্তব্যের জবাবে বলতে চাই, এই সকল অর্থ অর্থাৎ খরচ আর জরিমানা রাষ্ট্রের তহবিলে যাবে। আর নিউজ পেপারের কথা বলেছি, এটা optional, compulsory না। গরিব মানুষের এটা না করলেও চলবে, কোন অসুবিধা নেই।

জনাব কাদের সিদ্দিকী সাহেব দ্রুত বিচারের ব্যাপারে বলার চেষ্টা করেছেন যে, "justice delayed justice denied" যে রকম, "justice hurried, justice buried"ও হতে পারে। ঠিকই বলেছেন। কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে দুটোর মধ্যে একটা balance রাখতে হবে। আমি এখানে জানাতে চাই যে, বিচার পদ্ধতিতে বর্তমানে যে established fundamental structure আছে সেটা আমরা স্পর্শ করিনি। এই যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচার হচ্ছে, আমরা তো বিচার সংক্ষিপ্ত করিনি। Criminal Procedure Code-এর অধীনে যে বিচার প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বিচার হচ্ছে। কিন্তু আমরা আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমরা প্রমাণ করেছি যে, Government-এর যদি strong political will থাকে তাহলে এই সবকিছুই অর্জন করা সম্ভবপর। আজকে তৃষা হত্যা মামলা ২ মাস ১৪ দিনে সম্পন্ন হয়েছে, এটা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হয় নি, নরমাল কোর্টে হয়েছে। অর্থাৎ সরকারের পক্ষে যদি তদন্তকারী, সাক্ষী এবং প্রসিকিউটরের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব হয় তাহলে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করা, অর্জন করা সম্ভবপর। This is what the government believes, that speedy trial can be achieved in the normal course of law.

জনমত যাচাইয়ের যে প্রস্তাব করেছেন, আমি আগেই বলেছি এটা আমরা বছরখানেক ধরেই আলাপ-আলোচনা করেছি। আইনজীবী, বিচারক, সকলের সঙ্গে আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে জনমত যাচাই বা বাছাইয়ের আর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া স্থায়ী কমিটি এটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই এই রিপোর্টটি এখানে পেশ করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, No law is sacrosanct, এটা বাইবেল নয়, Law is always amendable। Trial and error-এর মাধ্যমে একটি আইন ডেভেলপ করে। যদি আমরা দেখি কোন কোন জায়গায় আমাদের আইনে দুর্বলতা আছে সেটা সব সময় আমাদের সংশোধন করার সুযোগ থাকবে। The whole idea হল to discourage adjournment এবং অহেতুক injunction কে discourage করার জন্যই এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।

জনাব গোলাম কাদের সাহেব বলেছেন যে, খরচ, জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপার the courts will be used as business organisation. Not at all. Already প্রচলিত আইনের মধ্যে খরচের ব্যাপার আছে। অপর পক্ষকে cost দিতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু উকিল এবং বিশেষ করে বেঞ্চ ক্লার্কের কাছে ঐ নগদ টাকা দেওয়া will be very unreliable। তাই এটা সম্ভব হচ্ছে না for the management of the fund itself. ক্যাশ টাকা সেটি ৫০০ টাকাই হোক, আর ৫০০০ টাকাই হোক, এই cash transaction-এ একটা risk আছে, ওখানে একটা দুর্নীতি হতে পারে। সেজন্য আমরা এটাকে রেভিনিউ খাতে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

www.pathagar.com

আর interim injunction দিতে পারবে না কেন? আমরা আদালতের কোন ক্ষমতা নিয়ে নিইনি। আদালতের discretionary power যা আছে তার সবকিছুই রক্ষা করা হয়েছে, আমরা তো power নিয়ে নিইনি। Interim injunction দিতে পারবে, এমনকি exparte injunction দিতে পারবে, কিন্তু সেখানে কতগুলি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে করে আদালতও সাবধান হন, একটা injunction দেওয়ার আগে চিন্তাভাবনা করে দেন। আইনজীবীও যাতে চিন্তাভাবনা করে একটা মামলা নিয়ে যান, কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিয়ে যান, যাতে বোঝেন যে, his client can be penalised for obtaining a wronful injunction। যদি আমি বাদী হয়ে injunction নিই, তারপর দেখা গেল যে ঐ সম্পত্তির উপর আমার কোন মালিকানাই নেই অথচ আমি আপনার বিরুদ্ধে injunction নিয়ে আপনার অনেক ক্ষতি করেছি, তাহলে এটার জন্য আপনি compensation পাবেন না কেন? Compensation-এর ব্যবস্থা অত্যন্ত ন্যায্য এবং fair।

এই Cost element in legal proceedings শুধু আমাদের দেশে নয়, আমাদের দেশের আশেপাশে প্রায় সকল দেশেই এটা introduced হয়েছে। অন্যান্য যেসব দেশ একটু উন্নতি লাভ করেছে সেসব দেশে এই cost element in legal proceedings অনেক দিন যাবত, বহু বছর যাবত চলে এসেছে। আমাদের ল'তেও আছে, কিন্তু এটা এত সামান্য টাকা যে এটার কোন এফেক্ট নেই। সেজন্য আমরা এখন সিভিল প্রসিডিউর-এর বিভিন্ন স্টেজে এই element-টা introduce করেছি। এতে আমাদের বিচার ব্যবস্থা যুগোপযোগী হবে, আধুনিক হবে এবং সাধারণ মানুষের উপকার হবে। তারা সহজে দ্রুত বিচার পাবে।

আমি বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যদের প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি গ্রহণ করতে পারলাম না বলে অত্যন্ত দুঃখিত।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।*

---

* বিলটি সেদিনই সংসদে পাস হয় কিন্তু আইনজীবীদের দাবির প্রেক্ষাপটে আইনটি কার্যকর করা হয় নি। পরবর্তী সময়ে দেওয়ানী কার্যবিধি (তৃতীয় সংশোধনী) আইন প্রণয়ন করা হয় এবং এই আইনকে রহিত করে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩

১৩ জুলাই ২০০৩

এই আইনটির উদ্দেশ্য খুবই ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই আইনটির অপপ্রয়োগ এবং অপব্যবহার সর্বজনবিদিত। এই আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলাসমূহের মধ্যে শাস্তি হয় গড়ে মাত্র পাঁচ শতাংশের মত বা তারও কম। বাকি সব হয় মিথ্যা, না হয় আপোসের কারণে খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু হয়রানির শেষ থাকে না। This law is used as an instrument of extortion, humiliation and blackmail। সেইজন্য সারা দেশে এই আইনের অধীনে মামলার সংখ্যাও অনেক বেশি। জনসাধারণের অহেতুক হয়রানি বন্ধ করা এবং এই আইনের প্রয়োগ আরও সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজনে কিছু সংশোধনী এনে আইনটাকে rationalise করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

আমি মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব গোলাম কাদের এবং জনাব কাদের সিদ্দিকীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই যে, তাঁরা আইনটি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে পড়েছেন এবং তাঁরা এর নানা দিক তুলে ধরেছেন। আমি বিশেষ করে তাদের ধৈর্যের প্রশংসা করি। আর গোলাম কাদের সাহেবের perseverence-এর জন্য তাঁকে একটি reward দেওয়া যায় কি না মাননীয় স্পীকার আপনি একটু বিবেচনা করে দেখবেন।

সরকারে আসার পর গত দেড় বছর যাবত এই আইনটি সম্পর্কে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যরাসহ বিভিন্ন নারী সংগঠন, আইনজীবী, বিচারক সকলেই আমাদেরকে বলেছেন যে, এই আইনের অপব্যবহার ব্যাপক এবং এটার অপপ্রয়োগের কারণে এই আইনটির যে মূল উদ্দেশ্য ছিল, সেই উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভবপর হচ্ছে না। এই আইনটির সংশোধনের প্রয়োজন।

এই আইনটি প্রথম প্রণীত হয় ১৯৯৫ সালে আমাদের বিএনপি সরকারের সময়। এটা একটি balanced আইন ছিল। কিন্তু ২০০০ সালে বিগত সরকারের সময় এই আইনটি কিছু সংশোধন করে আরও কঠোর করা হয় এবং কিছু কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়, যার ফলে এই আইনের অপপ্রয়োগ আরও বেশি হওয়া শুরু করে। আমরা দেখেছি, যখনই কোন আইন খুব বেশি কঠোর করা হয়, তখন সেই আইনটি বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয় না, সেই আইনের তখন অপপ্রয়োগ করা হয়, অপব্যবহার হয় এবং সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার হয়। দেখা যাচ্ছে যে অপরাধ দমনের জন্য কঠোর আইন যথেষ্ট নয়।

মাননীয় স্পীকার, this law has been used as an instrument of extortion, blackmail and humiliation instead of really achieveing justice for those who are victims of oppression.

আজকে এই দিকগুলি বিবেচনা করে এখনো আমি মনে করি না, এই সংশোধনীর পরও এটা একেবারে perfect law হবে। এখনও হয়ত কিছু কিছু জায়গায় অপব্যবহার করার সুযোগ থেকে যাবে। কিন্তু আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এটাতে balance আনার জন্য। ৩৫টি নারী সংগঠনের সঙ্গে আমি নিজে বসেছি। তাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে আমরা এই সংশোধনীগুলি এনেছি। আশা করি সব না হলেও অপব্যবহার অনেকটা প্রশমিত হবে এই সংশোধনীর পরে। আমি ছোট একটি সমীক্ষা দিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করব। এই আইনের অপপ্রয়োগ কিভাবে হয়েছে, একটা সমীক্ষা দিলেই বুঝতে পারবেন। ঢাকা-১ নম্বর নারী ও শিশু দমন ট্রাইব্যুনালে এক বছরে ১৭৭টি মামলার মধ্যে ১৭৫টি মামলা খারিজ হয়ে গেছে। মাত্র দুটি মামলায় ৬জন মানুষের শাস্তি হয়েছে। Rate of

www.pathagar.com

conviction is less than 2%। সমস্ত বাংলাদেশের হিসাব আমার কাছে আছে এবং latest যে figureগুলি এসেছে, একই রকমের picture। Rate of conviction সর্বোচ্চ ১০ থেকে ১২%-এর বেশি নেই। অর্থাৎ বাকিগুলি হয় তারা compromise করে ফেলে, নইলে extortion করে, কাউকে blackmail করার জন্য জেলখানায় নিয়ে হয়রানির মাধ্যমে জোর করে টাকা আদায় করে, মামলার নিষ্পত্তি সেখানেই করে ফেলে। তখন সে মামলা খারিজ করা ছাড়া আদালতের কোন উপায় থাকে না। আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য গোলাম কাদের এবং কাদের সিদ্দিকী সাহেব বলেছেন, এর ফলে আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী ব্যক্তিরাও একটি সুযোগ পায়, এই আইনকে ব্যবহার করে কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। কথাটা হয়তো সত্য।

আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের স্থায়ী কমিটিকে। কারণ এই কমিটিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের এই সংশোধনের ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে। আমরা যে পাঁচজন আইনজীবীর কথা উল্লেখ করেছি, বিগত সরকারের আমলের এটর্নী জেনারেল, বর্তমান সরকারের এটর্নী জেনারেল এবং এরশাদ সরকারের এটর্নী জেনারেল, ড. জহির এবং বর্তমান সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি, তাঁরাও এ বিলের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং কিছু কিছু সুপারিশ করেছেন। তার উপর ভিত্তি করে স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে যা আমি সংসদে এনেছি বিবেচনা করার জন্য।

বিলের উপর দুয়েকটি কথা না বললে তো হয় না। কোথায় কোথায় আমরা পরিবর্তন এনেছি সেটা বলার দরকার। আমরা বয়সটা ১৪ বছরের জায়গায় ১৬ বছর করেছি। অতীতে ১৪ বছর ছিল, it was impractical. যদিও ১৮ বছর করলে আরও ভালো হতো। কিন্তু ১৮ বছর আমরা করিনি। কারণ ১৮ বছর করলে আরও misuse করার সম্ভাবনা থাকত। সেজন্য আমরা মাঝামাঝি একটি বয়সের ব্যবস্থা রেখেছি।

মাননীয় স্পীকার, নারীর আত্মহনন ঘটনার জন্য একটি নতুন provision আমরা করেছি। আপনার মনে আছে সীমা বা তৃষা হত্যার কথা, some people forced the girls to commit suicide. কিছুদিন আগে আর একটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল। এখানে দেখা যাচ্ছে এটার জন্য কোন আইন ছিল না। আমরা সেটা এখানে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

আমরা "অশোভন অঙ্গভঙ্গি" শব্দগুলি বাদ দিয়েছি। কারণ এই শব্দগুলির কারণে এই আইনটির অনেক misuse হয়েছে। যেমন গোলাম কাদের সাহেব যদি একটু বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকান বা কোন মহিলার দিকে, তাহলে বলতে হবে তিনি অশোভন অঙ্গভঙ্গি করেছেন। আপনার নামটা FIR-এ দিলে জেলখানায় যাবেন। ৯ মাস বা এক বছরের আগে বের হতে পারবেন না। হাইকোর্টে যেতে হবে, bail-পেতে হলে, একবার যদি নাম FIR-এ যায়। সুতরাং এই হয়রানি থেকে আপনাকে বাঁচানোর জন্য আমরা ওটা বাদ দিয়েছি।

মাননীয় স্পীকার, জখম। সাধারণ জখম বা আহত হলেই যাবজ্জীবন। অর্থাৎ চিমটি কাটলেও এর সাজা যাবজ্জীবন। যার জন্য আমরা দুটো ভাগ করেছি। According to Penal Code, grievous hurt and simple hurt, দুটোর জন্য দু'ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।

ধর্ষণের পর জন্মলাভ করা শিশুর অবস্থান একটি বিরাট সমস্যা। এতে দুটো দিক রয়েছে। একটি হল শিশুর পরিচিতি এবং অন্যটি হল শিশুর ব্যয়ভার কে বহন করবে। বর্তমান আইনে আছে ধর্ষণকারী বহন করবে। এটা নারীদের জন্য একটি বিরাট অপমানজনক ব্যাপার। নারী সংগঠনগুলি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সোচ্চার। তারা বলেন যে, ধর্ষণকারীর নিকট থেকে সন্তানের জন্য ভরণ-পোষণ নেওয়াটা খুব অপমানজনক। সেজন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি যে এই ব্যয়ভার রাষ্ট্র বহন করবে। আর যে বাচ্চাটা হবে, তার স্বার্থের কথা চিন্তা করে, আমরা সেখানে পিতা বা মাতার নামে তাঁর পরিচয় নির্ধারণ করেছি। মা'র নামেও তাঁর identity থাকবে, সে ব্যবস্থা এই বিলে রাখা হয়েছে।

তারপরে মামলা প্রমাণের ব্যাপারে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যেটা বর্তমান আইনে ছিল না। এই জবাবদিহিতার ব্যবস্থা শুধু তদন্তকারী অফিসারের জন্য নয়, পুলিশ অফিসারের জন্য নয়, আদালতেরও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা এই আইনে করা হয়েছে। সময় সীমাবদ্ধ করে দেওয়া আছে। যদি তারা আইনের provisions comply না করে, সেটা তাঁদের এসিআর-এ অসদাচরণ হিসেবে

www.pathagar.com

উল্লেখ করা হবে। এটা দেওয়া মানে এই নয় যে, আমরা তাদের শাস্তি দিতে চাই। এই provision করার অর্থ হল, তারা যাতে সাবধান হন, তারা যাতে আইনটি ভালো করে প্রয়োগ করেন এবং আইনটি বাস্তবায়ন করতে তাঁরা যেন সাহায্য করেন।

আগের আইনে অঙ্গভঙ্গি দেখানোর জন্য মামলা হলে সেখানে আসামীকে এক থেকে দেড় বছর জেল খাটতে হত কারণ জামিন ছিল দুরূহ। তবে নারী ও শিশু নির্যাতনে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাদের ব্যাপারে আমরা কোন আপোস করিনি। তাদের ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তারা সহজে যাতে জামিন না পায় তার ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে। কিন্তু যারা কোনভাবেই জড়িত নন, আদালত যদি তাই মনে করেন, তাহলে আদালতকে জামিন মঞ্জুর করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখনকার যে অবস্থা, এফআইআর-এ নাম দিলেই যথেষ্ট। তাহলে কোন উপায় নেই, তাকে জেলে নিতে হবে, তাকে ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দিতে পারবেন না, ট্রাইব্যুনালও দিতে পারবেন না। হাইকোর্টে গিয়ে তাকে জামিন নিতে হয়। সেখানে প্রায় তিন থেকে ছয় মাস সময় লেগে যায়। তাই জামিন দেওয়ার বিষয়টি আমরা একটু শিথিল করেছি। যার ফলে আশা করি যে আইনের অপপ্রয়োগ কম হবে। Blackmail আর extortion-এর মাত্রা কমবে।

আমরা ট্রায়াল ইন ক্যামেরার ব্যবস্থা করেছি। অনেক সময়ে একজন ধর্ষিত নারী আদালতে জনসমক্ষে কথা বলতে চায় না, যে জন্য আদালতে শুধুমাত্র বিচারকের সামনে কথা বলার সুযোগ পেলে হয়তো সব কথা স্বাধীনভাবে বলতে পারবে। আমরা আর একটি ব্যবস্থা করেছি, এটাও নারী সমাজের একটি বিরাট দাবি ছিল যে, পুলিশ অনেক সময় মামলা নেয় না বা চার্জশীট না দিয়ে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দেয়, যার কারণে মামলা আর তখন হয় না। সেই জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে তদন্ত করার একটা ব্যবস্থা আমরা এই আইনের মধ্যে করেছি। চূড়ান্তভাবে সময়সীমা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করেছি। আর মেডিক্যাল পরীক্ষাটা একটি বিরাট সমস্যা। মেডিক্যাল রিপোর্টের ব্যাপারে ডাক্তারদের জবাবদিহিতা বলতে কিছুই নেই। বর্তমান আইনে আমরা সেটা পরিবর্তন করেছি যাতে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটসহ ডাক্তারের evidence নিয়ে ধর্ষণ যে হয়েছে বা হয়নি তার প্রমাণ তাড়াতাড়ি করা সম্ভবপর হয়।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা দেড় বছর যাবত জনমত যাচাই করেছি। আমরা হঠাৎ করে এই সংশোধনী আনিনি। এই আইনটি করতে আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, সময় লেগেছে। আমার মনে হয় না যে, এখানে জনমত যাচাইয়ের আর কোন প্রয়োজন আছে। স্থায়ী কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে, বিজ্ঞ আইনজীবীদেরকে নিয়ে আলোচনা করে এই আইনটি চূড়ান্ত করেছেন। আমার মনে হয় না যে, জনমত যাচাই বা বাছাইয়ের আর কোন প্রয়োজন আছে।

মাননীয় সদস্য জনাব গোলাম কাদের সাহেব পুরুষ নির্যাতনের ব্যাপারে বলেছেন। তিনি যদি পুরুষ নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি বিলের খসড়া তৈরি করে আনেন তাহলে সেটা আমরা বিবেচনা করে দেখব। আর "ফুসলাইয়া" শব্দটি মাননীয় সদস্যের খুব প্রিয় বলে আমার মনে হচ্ছে। এই "ফুসলাইয়া" শব্দটি বাদ দেওয়া যায় কিনা তা আমরা দেখব। এগুলিকে বেশি শিথিল করা হলে বাইরের যে মহিলা সংগঠনগুলি আছে তারা আবার প্রতিবাদ জানাবে, সেটাও মনে রাখতে হবে। জনাব কাদের সিদ্দিকী সাহেব, I would like to assure you that sick and infirm people are included. আপনি খেয়াল করবেন languageটি আছে, "নারী ও শিশু কিংবা শারীরিকভাবে অসুস্থ।" Sick and infirmটি আমরা section 497 of the Criminal Procedure Code থেকে নিয়েছি। ওখানে ঠিক এই language আছে। It will include old people also.

মাননীয় স্পীকার, আমি বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের সংশোধনীগুলি এই মুহূর্তে গ্রহণ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। কিন্তু ভবিষ্যতে অবশ্যই মনে রাখব।

আপনাকে ধন্যবাদ।*

---

* বিলটি সেদিনই পাস হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মামলার জট হ্রাস এবং দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য এটা আরেকটি সংস্কার

বিশেষ আদালত (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন, ২০০৩

১৫ জুলাই ২০০৩

বিচার বিভাগের সংস্কার কর্মসূচীকে বাস্তবায়ন করার জন্য এই আইনটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কোন কোন আদালতে মামলার সংখ্যা অতি বেশি, যার ফলে মামলার নিষ্পত্তিতে অত্যধিক বিলম্ব হচ্ছে, সুবিচার ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে এমন কিছু আদালত আছে যেখানে মামলার সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। তাই আদালতগুলির মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনা প্রয়োজন। মামলা ব্যবস্থাপনা এবং আদালত প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য তাই এই আইনটি যথেষ্ট সুফল বয়ে আনবে। আইনটি উপস্থাপন করার পর কার্যপ্রণালী বিধির অধীনে আইনের নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংসদ সদস্য বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী আপত্তি উত্থাপন করেন এবং তার উত্তরে এই বক্তব্য রাখা হয়।

মাননীয় স্পীকার

জনাব কাদের সিদ্দিকী এই আইনটির উপর জনমত যাচাই করার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সাথে আমি একমত হতাম যদি এই আইনটি প্রয়োগ করার জন্য কোন প্রশিক্ষণ বা গণসচেতনতার প্রয়োজন হতো, যদি যাঁরা stake holders যেমন—আইনজীবী, বিচারক এবং অন্যান্য যাঁরা জড়িত তাঁদের সকলকে যদি আইনটির প্রয়োগ কিভাবে করতে হবে সেটা জানানোর প্রয়োজন হতো। এটা আমরা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম আইনের বেলায় করেছি। তখন আমরা আইন প্রণয়ন করার আগে অনেক সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ করেছিলাম। কিন্তু এই আইনটি একটি enabling law। মামলার ব্যবস্থাপনাকে আরও গতিশীল করার উদ্দেশ্যে জেলা জজকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করার জন্য এই আইন প্রস্তাব করা হয়েছে। মামলার জট কমানো এবং দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আদালতগুলির মধ্যে মামলা বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এটা আমি একটু বুঝিয়ে বলি। আমরা দেখতে পারলাম যে, বিশেষ বিশেষ আইনের অধীনে কিছু কিছু বিশেষ আদালত আছে। যেমন পরিবেশ আদালত, জননিরাপত্তা ট্রাইব্যুনাল আর বিশেষ জজ আদালত—যাঁরা দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাগুলি শুনানি করেন। এই গুলি সৃষ্টি করা হয়েছে Special Law-এর অধীনে। আর দেখা যাচ্ছে যে, এই আদালতগুলিতে এখন মামলার সংখ্যা অত্যন্ত কম, অথচ অন্যান্য অনেক আদালতে মামলার সংখ্যা অনেক বেশি, যার ফলে সেই সব আদালতে মামলার নিষ্পত্তি হতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। মামলার দীর্ঘসূত্রতা কমানোর জন্য আমাদের সরকার কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হল—বিলম্ব কমানো, খরচ কমানো, সুবিচার নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি সংস্কারমূলক আইন এরই মধ্যে সংসদে পাস করেছি, আইন হয়েছে এবং তার কার্যকারিতা খুব সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। দ্রুত বিচার আদালত, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, এডিআর সংক্রান্ত আইন সবই আমরা করেছি। এই সপ্তাহেই দুটো আইন পাস করেছি, Code of Civil Procedure এবং নারী ও শিশু নির্যাতন আইন amend করেছি। এই আইনটাও সেই সংস্কারমূলক কর্মসূচীরই একটি অংশ।

আপনাকে একটি সমীক্ষা দিই। ঢাকার পরিবেশ আদালতে মাত্র ৪টি মামলা বিচারাধীন আছে, চট্টগ্রামে আছে ৩টি। পরিবেশের যে আপীল আদালত—সেখানে একটি মামলাও নেই। অথচ বিচারকের জন্য সরকারের প্রচুর অর্থ খরচ হচ্ছে। তাঁদের বেতন ভাতা, যানবাহন, তাঁদের অফিসের স্টাফ সবকিছুই আছে অথচ কোন কাজ নেই, তাঁরা বসে আছেন। সুতরাং আমি যদি সাধারণ আদালত থেকে কিছু মামলা এইসব আদালতে transfer করতে পারি, তাহলে এ সব আদালতের

www.pathagar.com

বিচারকরা তাঁদের মেধা এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারবেন। অন্যদিকে মামলার আধিক্যের কারণে অন্য আদালতে যে মামলার জট সৃষ্টি হয়েছে সেটাও লাঘব হবে।

ঢাকায় আজকে চারটি জননিরাপত্তা ট্রাইব্যুনাল আছে। এরা সবাই জেলা জজের সমপর্যায়ের এবং সমমর্যাদা সম্পন্ন জজ হিসাবে এসব ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্য পরিচালনা করে থাকেন। প্রথম ট্রাইব্যুনালে আছে মাত্র ৮৪টি মামলা, দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনালে ৯৯টি, তৃতীয় ট্রাইব্যুনালে ৫২টি, চতুর্থ ট্রাইব্যুনালে ৪৭টি, সিলেটের ট্রাইব্যুনালে মাত্র একটি মামলা আছে। কুমিল্লায় মাত্র ১৩টি, খুলনায় মাত্র ২টি মামলা রয়েছে। অথচ প্রত্যেক জজের জন্য একটি করে গাড়ি আছে, বারজন কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন, একটি বাড়ি আছে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা রয়েছে। অফিসের খরচ আছে। কিন্তু কাজ নেই। আমাদের দেশে বিশেষ আদালত ১৯টি আছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর আর কুমিল্লা এই চারটি জেলা ছাড়া বাকি সব জেলায় আদালতে ৫০-এর নিচে মামলা রয়েছে। এমনকি ১১টি মামলাও আছে। এই ধরনের কোর্ট অনেকগুলি আছে। কিন্তু বর্তমান আইনে এই আদালতগুলি অন্য কোন ধরনের মামলা করতে পারেন না। করতে হলে আইন সংশোধন করে ক্ষমতা দিতে হবে জেলা জজকে মামলা হস্তান্তর করার জন্য।

আজকে আমি যদি এই আইনটি করি, তাহলে যাঁরা জেলা জজ আছেন, তাঁদেরকে সিভিল কোর্ট এ্যাক্টের অধীনে এবং Criminal Procedure Code'র অধীনে, যখন যেটা প্রযোজ্য, সাধারণ মামলা হস্তান্তর করার যে এখতিয়ার আছে, সেটা যদি দিই অর্থাৎ জেলা জজকে সাধারণ আদালত থেকে বিশেষ আদালতসমূহে মামলা হস্তান্তর করার পাওয়ারটি দিই, তাহলে তিনি সাধারণ আদালতের মামলাগুলি এসব কোর্টে ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে পারবেন। তাহলে কয়েক হাজার মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা এই আইনের মাধ্যমে করা সম্ভবপর হবে। ভবিষ্যতেও যদি আমরা কোন Special Law-এর অধীনে Special আদালত করি, তাহলে সাধারণ আদালতগুলি থেকে মামলা transfer করে মামলা নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা করতে পারব। আমাদের স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি এবং সদস্যদের আমি ধন্যবাদ জানাই যে, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই আইনটি চূড়ান্তভাবে পেশ করেছেন। বিরোধী দলের সদস্যকে বলতে চাই যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলাম না। কারণ it is only an enabling law এবং জনমত এটার পক্ষেই আছে।

আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এম এম শাহীন ও বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তমকে। তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এই আইনটি যে পড়েছেন তা তাঁদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। তাঁরা যে সকল সংশোধনীর কথা উল্লেখ করেছেন এগুলির ২/১টির উপরে আমি শুধু বলতে চাই যে, আদালত আর বিচারক এ-দুটির মধ্যে অনেক তফাত। আদালত হচ্ছে একটি ইনস্টিটিউশন আর বিচারক হচ্ছেন একজন ব্যক্তি। এখানে আমরা ইনস্টিটিউশন নিয়ে deal করছি। সে জন্য আদালত শব্দটাই থাকতে হবে। এখানে বিচারক বলা যাবে না। আর এক জায়গায় বলেছেন যে, 'জেলা জজ পদের কর্মকর্তা' শব্দগুলির স্থলে জেলা জজ পযমর্যাদার বিচারক রাখার জন্য। এটাও আবার ইনস্টিটিউশনাল পয়েন্ট। আমরা তো পদের কথা বলছি, মর্যাদার কথা নয়। মর্যাদা যদি বলি তাহলে যে কোন বিচারককে ঐ পদমর্যাদায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। সে জন্য এটা এই আইনের এখতিয়ারের মধ্যে আসে না। তাঁরা আরও একটি কথা বলেছেন। এখানে 'স্থানান্তরিত' 'সকল' মামলার কথা বলেছেন। কিন্তু এখানে 'সকল' শব্দটি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তার কারণ 'সকল' দিলে আবার অন্য রকমের একটা interpretation হতে পারে। সে জন্য 'সকল' শব্দটি আমরা বিবেচনায় আনিনি।

কিন্তু কোন আইনই perfect নয়, trial and error এর মধ্য দিয়ে আইনের উন্নয়ন সাধিত হয়। ভবিষ্যতে এই আইনটি যখন প্রয়োগে যাবে আর তখন যদি এধরনের অসুবিধা দেখা দেয় তাহলে আমরা সেগুলি অবশ্যই বিবেচনা করব। বাংলাদেশে এখন প্রায় ৫ লক্ষ দেওয়ানী মামলা বিচারাধীন আছে। আর এগুলির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এই আইনটি পাস হলে আমরা দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সাফল্য অর্জন করতে পারব। আমাদের পরিবেশ আদালত ২টি, আপীল আদালত ১টি, জননিরাপত্তা ট্রাইব্যুনাল ৯টি, আর বিশেষ জজ আদালত আছে ১৯টি। আপনি যদি

www.pathagar.com

দেখেন ৩+৯+১৯=৩১টি আদালতে যদি ১ হাজার করে মামলাও ট্রান্সফার করি তাহলে ৩১ হাজার মামলা অবিলম্বে ট্রান্সফার করে এই মামলাগুলি এই আদালতগুলিতে আমরা সম্পন্ন করতে পারব। আর এ কারণে বিচার প্রার্থীদের উপকার হবে, বিচার বিভাগের উপর দেশের মানুষের আস্থা ফিরে আসতে সাহায্য করবে এবং দেশে সুবিচার নিশ্চিত করার পথ আরও উন্মুক্ত হবে। দেশের মানুষের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তা পূরণ করা এই আইনের মাধ্যমে সামান্য হলেও সম্ভবপর হবে।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।*

* বিলটি সেদিনই সংসদে পাস হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বার কাউন্সিলের দায়িত্ব হল আইনজীবীদের পেশাগত শৃঙ্খলা রক্ষা করা, আদালত বর্জন করা নয়

দি বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনারস এন্ড বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩

১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩

বার কাউন্সিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই সংগঠন আইনজীবীদের সনদ প্রদান, পেশাগত মান উন্নয়ন, শৃংখলা এবং মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। অথচ বর্তমান আইনের কিছু দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য অর্জন করার পরিবর্তে বার কাউন্সিলকে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রয়াস চলেছে। পর পর তিনবার অর্থাৎ প্রায় ৯ বছর যাবত একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলপন্থী আইনজীবীরা বার কাউন্সিলকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে ব্যবহার করেছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। তাই সরকার একটা পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বার কাউন্সিলের মর্যাদা এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করার জন্য কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করে।

মাননীয় স্পীকার

আপনি জানেন এই বার কাউন্সিলের মূল দায়িত্বগুলির মধ্যে দুটি দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল নতুন আইনজীবীদের সনদ প্রদান। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল আইনজীবীদের পেশাগত মান বজায় রাখার জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ পেশাগত অসদাচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাস্তি প্রদান করা, আইনজীবীদের পেশাগত শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করা। কিন্তু এই বার কাউন্সিল এখন আইনজীবীদেরকে আদালত বর্জন করার জন্য কর্মসূচী দেয়। আদালত বর্জন মানে হল বিচারপ্রার্থীদের বিচার থেকে বঞ্চিত করা, আর বিচারপতিদের অপমান করা। এটা আদালতকে অপমান করার শামিল বলে আমি মনে করি। বার কাউন্সিল এ্যাক্ট বা অর্ডারে যা বলা আছে এটা হল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। যেখানে আইনজীবীদেরকে বলা দরকার যে, আপনারা আদালতকে সম্মান করবেন, বিচারপতিদের সম্মান করবেন, আদালতের মান-মর্যাদা-ভাবমূর্তি রক্ষা করবেন, বিচারপ্রার্থীদের স্বার্থ রক্ষা করবেন এবং আপনারা এমন কোন আচরণ করবেন না যাতে আমাদের বিচার বিভাগের এবং সুপ্রীম কোর্টের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, কিন্তু আজকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এই বার কাউন্সিলের উদ্যোগে, তাদেরই আহবানে গত ৬ সেপ্টেম্বরেও সুপ্রীম কোর্ট আঙিনায় আদালত বর্জনের আহবান জানানো হয়েছে। আর মেধার ওপর ভিত্তি না করে রাজনৈতিক বিবেচনায় আইনজীবীদের এখন সনদ দেওয়া হয়। সেই জন্য এই প্রেক্ষাপটে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের আইনজীবী নেতারা এই অবস্থা নিরসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার জোর দাবি জানিয়ে এসেছে। এই আইন করা হয় ১৯৭২ সালে। আজ থেকে ৩১ বছর আগে। সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে আরও আস্থাশীল এবং গতিশীল করার জন্য সরকার এরই মধ্যে অনেকগুলি যুগান্তকারী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। একই ধারাবাহিকতায় বার কাউন্সিলের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং এই প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সংস্কার প্রয়োজন। মেধার ভিত্তিতে যোগ্য এবং উপযুক্ত আইনজীবীদের সনদপত্র দেওয়ার একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এটি একটি সংস্কারমূলক আইন। এই আইন পাস করা হলে বার কাউন্সিলের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে, এই প্রতিষ্ঠান আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী হবে এবং সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন আইনজীবীদের মেধাভিত্তিক মান অর্জনের প্রক্রিয়া একটি স্বচ্ছ ও নিরক্ষেপ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিশ্চিত হবে।

www.pathagar.com

যে ৫টি সংশোধনী আমরা এনেছি সেগুলি সবই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সময়ের দাবি হিসেবে আনা হয়েছে। প্রথমটি হল, এখন বার কাউন্সিল ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কাউন্সিল। এর মধ্যে এটর্নী জেনারেল হলেন এক্স-অফিসিও চেয়ারম্যান। কিন্তু বার কাউন্সিল অর্ডারে তার ক্ষমতা তেমন নেই। আর বাকি যে ১৪ জন নির্বাচিত হন তাঁদের ৭ জন নির্বাচিত হন সাধারণভাবে। তাঁরা সারা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। আর বাকি ৭ জন আঞ্চলিক ভিত্তিতে বার কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু যখন তাঁরা নির্বাচনে দাঁড়ান তখন তাঁদেরকে সারা বাংলাদেশে অন্য ৭ জনের মতই ভোট চাইতে হয়। অর্থাৎ চট্টগ্রাম অঞ্চলকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যদি কেউ নির্বাচনে দাঁড়ান তাহলে তাঁকে পঞ্চগড়ে যেতে হয় ভোটের জন্য। প্রত্যেকটি বার সমিতি থেকে এই দাবি উঠেছে, আঞ্চলিক যে বার সমিতিগুলি আছে সেই অঞ্চলের ভোটাররাই আঞ্চলিক প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে, সারা দেশের ভোটারদের কাছে যাতে যেতে না হয়। আমরা সেইজন্য এই সংশোধনী এনেছি। এই বিল পাস হলে তখন এটা আরও গণতান্ত্রিক হবে এবং এরিয়াভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব করার যে বিধান এই অর্ডারে আছে সেটা আরও অর্থপূর্ণ হবে এবং আরও প্রতিনিধিত্বমূলক হবে।

দ্বিতীয় হল enrolment committee। বার কাউন্সিলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব হল নতুন আইনজীবীদের সনদ মঞ্জুর করা। সনদ পেলে তাঁরা যে কোন আদালতে প্র্যাকটিস করতে পারেন। সেজন্য এই সনদটা খুব important. Quality of our profession depends on the quality of recruitment of the lawyers.

এই আইনজীবীদের কোয়ালিটি যদি আমরা ভালো করতে না পারি তাহলে বিচার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর হবে না। কারণ, আইনজীবীদের গুণগত মানের উপর পুরো বিচার ব্যবস্থার গুণগত মান অনেকটা নির্ভর করে। আমরা পছন্দ করি আর না করি, আজকাল প্রায় সকল সংস্থার নির্বাচন দলীয়ভাবে হওয়ার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে, যার ফলে গত তিন মেয়াদে বার কাউন্সিলে সনদ দেওয়ার ব্যাপারে কোন নিরপেক্ষতা maintain করা হয়নি। অনেক রকম অভিযোগ আমরা পেয়েছি, যেখানে রাজনৈতিক বা ব্যক্তি বিবেচনায় সনদ দেওয়া হয়েছে যার ফলে যোগ্য আইনজীবীদের অনেকে হয় সনদপত্র পাননি অথবা যাঁরা পেয়েছেন তাঁদেরকে এক বছর দু'বছর পর দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য এই enrolment committee-কে আমরা পুনর্বিন্যাস করেছি। আমরা এখানে কোন রাজনীতি আনার চষ্টা করিনি। আমরা posterity'র জন্য এই সংস্কার এনেছি। এই enrolment committee-তে সুপ্রীম কোর্টের এপিলেট ডিভিশনের একজন বিচারক এবং হাইকোর্টের আর একজন বিচারক চীফ জাস্টিস দ্বারা মনোনীত হবেন। Attorney General being the Chairman of the Council—তিনি সদস্য থাকবেন। আর দুজন বার কাউন্সিলের সদস্য থাকবেন। অর্থাৎ তিনজন হলেন কাউন্সিলের আর দুজন হলেন বিচারপতি। তাঁরা মিলে এই সনদপত্র দেওয়ার কমিটি গঠন করবেন। আমি মনে করি, এটা হলে অন্তত সনদ দেওয়ার ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ থাকার আর অবকাশ থাকবে না। নিরপেক্ষভাবে স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে এই সনদপত্র দেওয়া হবে। তাতে আইনজীবীদের মান বাড়বে এবং যোগ্য আইনজীবীদের সনদপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

আমাদের অরিজিনাল আইনটা প্রণীত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। তখনও চারজন বিচারপতি enrolment committee-তে ছিলেন। সেজন্য এটা নতুন কিছু নয়। এই উপমহাদেশে enrolment committee-তে বিচারপতিদের থাকাটা অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। আমরা মনে করি যে, এটা থাকলে দেশের জন্য, আইনজীবীদের জন্য, বার কাউন্সিলের জন্য ভাল হবে।

তৃতীয় হল, এখন একজন আইনজীবী অনেকগুলি বার সমিতির সদস্য হতে পারেন এবং অনেকগুলি বার সমিতিতে ভোট দিতে পারেন। আমরা দেখেছি, আপনিও নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন যে, এই সুযোগে আমাদের মধ্যে অনেক অনিয়ম এসে গেছে। ভোটের সময় যেসব কাজ হয়, সেগুলি এখানে আমি বলতে চাই না। তবে আমরা জানি, আমাদের Dignity of Profession আর রাখতে পারছি না। সুপ্রীম কোর্টের নির্বাচন যখন হয়, তখন যোগ্য ব্যক্তিরা দাঁড়াবেন, আইনজীবীরা সবাই সচেতন, তারা যাকে ভাল মনে করবেন তাকে ভোট দেবেন। কিন্তু এখন সেরকম আর নেই। অনেক রকমের অনিয়ম এবং অনৈতিক বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যা

www.pathagar.com

অত্যন্ত দুঃখজনক। সকল বার সমিতির বিশেষ করে সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। সেইজন্য এই ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একজন আইনজীবী, ধরুন আমি ৯৯% প্র্যাকটিস করি নরসিংদী বারে বা নারায়ণগঞ্জ বারে বা গাজীপুর বারে বা সুপ্রীম কোর্ট বারে কিন্তু আমি সব বার-এর মেম্বার এবং সব বারের নির্বাচনে ভোট দিতে পারি। নির্বাচনের সময় আমি সব জায়গায় গিয়ে ভোট দিয়ে থাকি। তাতে সত্যিকার অর্থে প্রতিনিধি বলতে যেটা বুঝায় সেটা নির্ধারণে ত্রুটি থেকে যায় এবং অনেক অনৈতিক ঘটনা ঘটে। সুপ্রীম কোর্টের প্রতিনিধি নির্বাচন করা বা অনুরূপভাবে, যে কোন বার-এর ব্যাপারে, যারা যেই বারে সব সময় প্র্যাকটিস করেন, তাদেরই উচিত সেই বার-এর প্রতিনিধি নির্বাচিত করা এবং তাঁরাই ভাল বুঝবেন যে কে উপযুক্ত। সেজন্য আমরা বিধান করেছি যে, একজন আইনজীবী, তিনি যত আইনজীবী সমিতির সদস্য হন না কেন, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ভোট দেবেন সেখানেই যেখানে তিনি নিয়মিত practice করেন। যিনি সনদ পান, তিনি আইনজীবী সমিতির সদস্য হোক আর না হোক, প্র্যাকটিস করার অধিকার তাঁর থাকে। সারা বাংলাদেশের যে কোন কোর্টে গিয়ে একজন সনদপ্রাপ্ত আইনজীবী প্র্যাকটিস করতে পারেন। কিন্তু আমরা বিধান করেছি আইনজীবী সমিতির সদস্য হিসেবে ভোট এক জায়গায় দেবেন। ৬০ দিনের জন্য তাকে একটা অপশন দেওয়া হবে, তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে, তিনি কোথায় ভোট দেবেন। তিনি পাঁচ জায়গায় মেম্বার থাকুন, তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ভোট এক জায়গায় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাতে অনেক শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এবং সত্যিকার আইনজীবীদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সুবিধা হবে। এটা আইনজীবীদের অনেক দিনের দাবি। তাঁরা বলে আসছেন যে, ভোটের ব্যাপারে শৃঙ্খলা আনা দরকার। যাতে করে আমাদের যে কোন বার সমিতি সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে নির্বাচিত হতে পারে, তাদের নিজস্ব পছন্দ, নিজস্ব সিলেকশনের মাধ্যমে যাতে হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য এই বিধান করা হয়েছে। এর ফলে সুপ্রীম কোর্টের পবিত্রতাও রক্ষা করা যাবে।

চতুর্থত, অনেক পত্র-পত্রিকায় বার কাউন্সিলের হিসাব-পত্র নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছে। বার কাউন্সিল হল বাংলাদেশের আইনজীবীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠুক তা দেশের মানুষ দেখতে চায় না। সেজন্য বার কাউন্সিলের হিসাবের স্বচ্ছতা আনার জন্য একটা সংশোধনী এনে আমরা বলেছি যে, পার্লামেন্টের পাবলিক একাউন্টস কমিটিতে তাদের অডিটেড একাউন্টস জমা দেবে। Parliament is sovereign, পার্লামেন্টের একাউন্টস কমিটিতে সরকারী দল থাকেন, বিরোধী দলের সদস্যরাও থাকেন এবং তাদের কাছে এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জমা দিলে দেশের মানুষের কাছে বার কাউন্সিল সম্পর্কে আস্থা বাড়বে, যাতে তাদের হিসাব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন জনগণের কাছে না থাকে।

তারপরের বিষয়টি হল বার কাউন্সিলের সদস্যদের মেয়াদ দুই টার্ম সংক্রান্ত। যে ব্যাপারটি নিয়ে আমার বন্ধুরা বেশি প্রশ্ন তুলেছেন এবং প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক যে, মন্ত্রীদের জন্য দুই টার্ম নেই, এমপিদের জন্য দুই টার্ম নেই, তবে কেন বার কাউন্সিলের জন্য দুই টার্মের বিধান থাকবে? তার জবাব আমি দিচ্ছি।

[বাধা প্রদান]

আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেব।

বার কাউন্সিলের মেয়াদ তিন বছরের, যদি দুই টার্ম হয় তাহলে ছয় বছর। এটা একটি পেশাজীবী সংগঠন। এটা এদেশের পার্লামেন্টের ইলেকশন না। এটা মাত্র ২০ থেকে ২২ হাজার আইনজীবীদের একটা সংস্থা। এই সংগঠনে যাতে সকলেই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার এবং সেজন্য এটাকে অন্যান্য সংগঠনের সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না। তবে দেশের আরও যেমন, সমবায় সমিতি আছে সেখানেও এই ধরনের বিধান আছে, 'Not more than two terms'। আর আমাদের এখানে এটা একটা professional organisation এখানে আমরা চাই যে কোন রকমের কোন সিন্ডিকেট করে অন্যান্য আইনজীবীদেরকে একটা দলের মধ্যে আবদ্ধ করতে কেউ না পারে, সিনিয়র আইনজীবীরা চান যে তাঁদের জন্যও নেতৃত্ব দানের একটা সুযোগ-সুবিধা থাকুক। সেই জন্য আমরা এমন কিছু করিনি যে একজন নির্বাচন করতে পারবেন না। দুই টার্ম মানে ছয় বছর থাকার

www.pathagar.com

পর এক টার্ম বাদ দিয়ে পরবর্তী টার্মে তিনি আবার নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন। এই সুদূরপ্রসারী সংস্কারগুলির মাধ্যমে আইনজীবীদের পেশাগত মান, শৃঙ্খলা ও যোগ্যতা রক্ষার ক্ষেত্রে বার কাউন্সিল একটি নিরপেক্ষ, একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে। এর কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপের কোন অবকাশ নেই। বার কাউন্সিল তার নিজস্ব আইন ও বিধির দ্বারাই পরিচালিত হবে এবং সেখানে সরকারের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না।

আমি আর দুই-একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। কাদের সিদ্দিকী সাহেব নেই, তাহলে আর তাঁর কথার উত্তর কি দেব?

[বাধা প্রদান]

আমি তো আপনাকে আপনার সীটে দেখছি না?

কাদের সিদ্দিকী সাহেব এটাকে আইউব খানের বুনিয়াদী গণতন্ত্রের সাথে compare করেছেন। তিনি নিজেও জানেন যে বুনিয়াদি গণতন্ত্রের সঙ্গে এটার কোন সাদৃশ্য নেই। এটা একটা আইনজীবীদের সংগঠন, professional organisation, এটার সঙ্গে আমাদের পার্লামেন্টের ইলেকশন বা মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা, এগুলি কোন কিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তবে তাঁকে আমি বলতে চাই যে আমাদের দেশে ৬ কোটির উপরে, প্রায় সাড়ে ছয় কোটি ভোটার। তাই এটার সাথে ওটার compare করা ঠিক হবে না। আর একটি বিষয় তিনি বলেছেন যে, এমপিদের, সচিবদের ব্যাপারে আমরা এই ধরনের কিছু চিন্তা করছি কিনা? আমি আপনাকে assure করতে চাই যে, আমরা চিন্তা করছি না। আপনি যতবার পারেন এই পার্লামেন্টের সদস্য হন, কোন অসুবিধা হবে না। তিনি বলেছেন, গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন কিনা? এই ব্যাপারে গণতন্ত্রের সঙ্গে কি সম্পর্ক আমি বুঝলাম না। এটা একটা পেশাজীবী সংগঠন। সুতরাং গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন হওয়ার কোন কারণ আমি দেখি না। হাফিজ[১] সাহেব মোটামুটি একই বক্তব্য রেখেছেন। রাঙ্গা[২] সাহেবও তাই বলেছেন। গোলাম হাবিব দুলাল, তিনিও এই দুই মেয়াদের কথা বলেছেন। আর বলেছেন স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতার কথা। এতদিন যে সনদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভবপর হয়নি। দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই সনদগুলি দেওয়া হয়েছে। সেজন্য এখন আমরা একটি নিরপেক্ষ কমিটি করেছি। এই কমিটির মাধ্যমে সনদ দিলে স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা ফিরে আসবে। আমরা এই সংশোধনীগুলি কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা দলয়ি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আনিনি। Posterity-র জন্য এনেছি। বার কাউন্সিলে কারা নির্বাচিত হবেন সেটা আইনজীবীরাই নির্ধারণ করবেন। আমরা এই সংশোধনীগুলি এনেছি বার কাউন্সিলকে একটি সুন্দর সুষ্ঠ নিরপেক্ষ পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাচিয়ে রাখার জন্য।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।*

---

১. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, দিনাজপুর-৩ আসনে নির্বাচিত জাতীয় পার্টির সদস্য।

২. মশিউর রহমান রাঙ্গা, রংপুর-১ আসনে নির্বাচিত জাতীয় পার্টির সদস্য।

* বিলটি সেদিনই সংসদে পাস হয়।

www.pathagar.com

সহজে, কম খরচে, দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে

দেওয়ানী কার্যবিধি (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৩

১৯ নভেম্বর ২০০৩

বিচার ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা এবং গতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য খরচ, ক্ষতিপূরণ এবং জরিমানার বিধান সম্বলিত দেওয়ানী কার্যবিধির দ্বিতীয় সংশোধনী পাস হওয়ার পর আইনজীবীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বার কাউন্সিল এবং সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতিসহ দেশের অন্যান্য বারসমূহ এই আইনটির তীব্র সমালোচনা করে। দলমত নির্বিশেষে সকল আইনজীবী মহল এই আইনটি রহিত করার দাবি তোলে। বার কাউন্সিল এবং সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির মাধ্যমে এই আইনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য সরকারবিরোধী একটি আন্দোলন হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়। ১৩ জুলাই তারিখে দ্বিতীয় সংশোধনী সংসদে পাস হয় এবং ১ অক্টোবর ২০০৩ সাল থেকে আইনটি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল।

একটি গণতান্ত্রিক সরকার হিসাবে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর একটি অধ্যাদেশ জারি করে দ্বিতীয় সংশোধনীর কার্যকারিতা স্থগিত করা হয়। এরপর ঢাকায় দুটি গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় পুরনো সুপ্রীম কোর্ট ভবনে যেখানে ঢাকার সিনিয়র আইনজীবী, বিচারক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে আইনটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা এবং পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় বৈঠকটি হয় রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আরও বড় পরিসরে, যেখানে সমগ্র দেশের সকল বার সমিতির নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী, বিচারক এবং আইন বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। সারা দিন আলোচনা এবং মতবিনিময় চলে। এই দুইটি গোল টেবিলের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় সংশোধনী রহিত করে দেওয়ানী কার্যবিধির তৃতীয় সংশোধনী বিল উপস্থাপন করা হয়। আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অক্ষুণ্ন রেখে এই সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়। খরচ, ক্ষতিপূরণ আর জরিমানার পরিমাণ কমিয়ে আনা হয় এবং মূল আইনের কয়েকটি বিধান সংশোধন করা হয়। আমাদের দেশের রাজনীতিতে কোন সরকারের জন্য এধরনের উদার গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখানোর দৃষ্টান্ত বিরল। সংসদে পাস করা একটি আইনকে বাস্তবায়নে যাওয়ার আগেই স্থগিত করে একই বিষয়ে আর একটি আইন প্রণয়ন করার নজির আর নেই।

মাননীয় স্পীকার

একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন এখানে আজকে বিবেচনার জন্য এসেছে। এই আইনটি কেন আমরা করতে চাচ্ছি, এটা রেকর্ডে থাকা দরকার for posterity। আর সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে সাধারণ মানুষের জন্য সহজে কম খরচে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু আমাদের বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রতার কারণে মানুষ আজ দারুণভাবে হতাশ। মূলত এ কারণে সমগ্র বিচার ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা কমে গেছে। এটার একটা বিহিত করা জরুরী। আজ তাই দেশে একটি গতিশীল ও যুগোপযোগী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে এখন একটি জাতীয় দাবি, সময়ের দাবি। আমাদের সকলের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান সরকার বিচার ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এরই মধ্যে এ মহান সংসদে অনেকগুলি আইন পাস করা হয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, প্রতিটি আইনের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। বর্তমানে দেশে সাড়ে ৪ লক্ষ দেওয়ানী মামলা বিচারাধীন আছে। এদের মধ্যে ৩০% মামলা হয়রানিমূলক, যার কোন অর্থ হয় না। এ মামলাগুলি বহু বছর ধরে বিচারাধীন আছে, তার কোন সমাধান নেই।

আমি দু-একটি পরিসংখ্যান আপনাকে দিতে চাই। আমরা ইনভেন্ট্রি করে দেখেছি যে, শুধুমাত্র ঢাকায় ৩৫ বছরের উপরে ৮৯টি মামলা বিচারাধীন আছে। ৩০ থেকে ৩৫ বছরের পুরনো মামলার

www.pathagar.com

সংখ্যা হচ্ছে ১২২৫টি, এগুলির নিষ্পত্তি এখনো হয়নি। ২৫ থেকে ৩০ বছরের মামলা আছে ৯৬৫টি, ১৫ থেকে ২০ বছরের পুরনো মামলার সংখ্যা ১৩৩৭টি, যার কোন নিষ্পত্তি নেই। ১০ থেকে ১৫ বছরের মামলা আছে ৪৫৯৪টি, যার কোন নিষ্পত্তি হয় নি। ৭ থেকে ১০ বছরে পর্যন্ত মামলা আছে ২৬২৫টি, আর ৫ থেকে ৭ বছরের মামলা আছে ২৮৬৫টি। কুমিল্লায় ২ থেকে ৫ বছরের উপরে মামলা আছে ২২৫১টি, ৫ থেকে ৭ বছরের উপরে আছে ৭২৪টি, ৭ থেকে ১০ বছরের উপরে আছে ৫৯১টি, ১০ বছরের উপরে আছে ১৭৩০টি। These are all pending।

এটা আপনিও জানেন এবং আমিও জানি যে, আমি উকিল হিসাবে একটা মামলা শুরু করে গেলাম। সেটা আমার ছেলেও উকিল হয়ে চালাবে। আর বিচারের জন্য যিনি এসেছেন সেই গরিব মানুষটি তার জমি বিক্রি করবে, তার বউয়ের গয়না বিক্রি করবে, সে নিঃস্ব হয়ে যাবে। তার ছেলে আর এ মামলা চালাতে পারবে না। যার জন্য এ মামলাগুলির কোন নিষ্পত্তি নেই। খুলনায় ৫ বছর, ৭ বছর, ১০ বছর এবং ১০ বছরের উপরে সব মিলে প্রায় ৫ হাজারের মত মামলা আছে। মামলাগুলির কোন নিষ্পত্তি নেই। এভাবে প্রতিটি জেলার হিসেব আমার কাছে আছে।

এ মামলাগুলির নিষ্পত্তি কেন হয় না? আমি প্রথমেই বলেছি যে, এ মামলাগুলি একটা অংশ আছে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা, জাল দলিলের উপরে মামলা। এ ধরনের মামলাগুলি সহজে নিষ্পত্তি হয় না। আর আছে অহেতুক বিলম্বের প্রক্রিয়া। খুলনায় একটি মামলার ইনভেন্ট্রি আছে আমার কাছে আছে। ১২২৬ বার adjournment নিয়েছে। ৫০ বছর হয়ে গেছে সে মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। বার বার adjournment নেয়া হয়। আইনজীবীরা গিয়ে adjournment চান, আদালতও খুশি হয়ে adjournment দিয়ে দেন। আমাদের বিরোধী সদস্য গোলাম কাদের সাহেব বলেছেন যে, সাক্ষী হওয়ার পরে সময় দেওয়ার কোন বিধান নেই। আপনি ঠিকই বলেছেন, but we have developed a bad culture, আমাদের legal system-এর বর্তমান culture-এর জন্য আমরাই দায়ী। বিশেষ করে আমরা যারা আইনজীবী এবং বিচারক। এর ফলে মুলতবির কোন শেষ নেই। ইচ্ছে করলে একজন বিচারক বলতে পারেন যে this is the last chance, কিন্তু cultureটা এরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, it has become more a question of accomodation of each other। একজন জুনিয়র গিয়ে আদালতে বললেন যে, আমার সিনিয়রের আজকে সুপ্রীম কোর্টের এ্যাপিলেট ডিভিশনে মামলা আছে, adjournment granted। Good ground for an adjournment। কিন্তু যখন একই কারণে বার বার সময় চাওয়া হয় সেটা ঠিক নয়। তাছাড়া অহেতুক কারণে adjournment-এর কোন লিমিট নেই।

নিষেধাজ্ঞা বা ইনজাংশনের বিষয়টা দেখুন। একজনের জমির উপর আর একজন দেওয়াল তুলতে গেল, এই কাজের বিরুদ্ধে ইনজাংশন হল, তারপর মেইন স্যুটের আর হিয়ারিং হয় না। বছরের পর বছর এই ইনজাংশন চলতে থাকে। আর যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন তিনি মামলার শুনানি আর করাতে পারলেন না। অনেক সময় নোটিশও সময়মত পান না। সরকারের অনেক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ইনজাংশন দিয়ে দিচ্ছেন কোর্ট। ইনটেরিম ইনজাংশন, এক্সপার্টি ইনজাংশন। বিবাদী কোর্টে হাজিরা দিয়েছেন, শুনানি আর হয় না। এভাবে তো আর চলতে দেওয়া যায় না। এই সব কারণে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন। দেশের মানুষকে জিজ্ঞেস করেন, বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের কি ধারণা। তাঁরা আজকাল রীতিমত শঙ্কিত হন। যেমন পুলিশের কাছে গিয়ে নালিশ করতে শঙ্কিত বোধ করেন, তেমন আদালতে যেতেও শঙ্কিত বোধ করেন। মামলার বিচারটা কবে পাবে, কবে এই মামলার নিষ্পত্তি হবে এটাই তাঁদের প্রশ্ন। এ জন্য আমরা সবাই দায়ী। আজকে সেইজন্য আমরা সেকেন্ড এ্যামেন্ডমেন্ট বিল এনেছিলাম। সেই বিলটা আমরা এখন রহিত করার প্রস্তাব এনেছি আইনজীবীদের দাবির প্রেক্ষাপটে, কিন্তু আইনের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ cost element-এর ভিত্তিটা অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। নতুন সংশোধনীতেও খরচ, ক্ষতিপূরণ এবং জরিমানার বিধান রাখা আছে, শুধু অঙ্কের পরিমাণটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

দেওয়ানী কার্যবিধির দ্বিতীয় সংশোধনী জুলাই মাসে আমরা পাস করেছিলাম এই পার্লামেন্টে। স্ট্যান্ডিং কমিটি রিকমেন্ড করে দিয়েছিলেন, সংশোধন করেছিলেন। আমরা দেশের ৫ জন প্রখ্যাত আইনজীবীকে এই স্ট্যান্ডিং কমিটিতে দাওয়াত দিয়ে এনেছিলেন, আওয়ামী লীগের সময়কার এটর্নী জেনারেল, জাতীয় পার্টির সময়কার এটর্নী জেনারেল, আমাদের এটর্নী জেনারেল, সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির সভাপতি এবং ডক্টর মোঃ জহিরকে। সেই ৫ জনের মতামতের উপর ভিত্তি করে আমরা দ্বিতীয় সংশোধনী বিল এনেছিলাম এবং যেহেতু সময়ের প্রয়োজন ছিল, সবাইকে বোঝানোর জন্য যে we would like to introduce a new culture in our legal system, আইনটাকে কার্যকর করার জন্য তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থায় কোন cost element নেই অর্থাৎ আপনি ৫ বছর মামলা চালানোর পরে আমি যদি জিতে যাই, আমি কোন cost পাই না। আমার ৫ বছর যে খরচ হল, সময় গেল, কোর্টের সময় গেল এর কোন খরচ নেই, কোন ক্ষতিপূরণ নেই, সামান্য খরচ দেওয়ার যে বিধানটি আছে এখন সেটাও কোন কোর্ট impose করে না। সর্বশেষ অর্ডারে কোন খরচ উল্লেখ থাকে না, বরং বলা হয় "no order as to cost"। ১০ বছর বা ১৫ বছর পরে মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে, কিন্তু খরচ বাবদ কোন নির্দেশ নেই। এটা তো হতে পারে না। পৃথিবীর সকল দেশে এখন বিচার ব্যবস্থাকে আধুনিক এবং যুগোপযোগী করার জন্য, দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার জন্য dispensation of justice within the shortest possible time করার জন্য সংস্কারের কাজ চলছে। যে কারনে লর্ড ডেনিং বলেছিলেন, justice delayed is justice denied। বিচার প্রক্রিয়ায় এই বিলম্বের কারণগুলি দূর করার জন্যই দেওয়ানী কার্যবিধির দ্বিতীয় সংশোধনী আমরা এনেছিলাম এবং সেই আইন ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এরমধ্যে বিভিন্ন আইনজীবী সমিতি এবং নেতৃবৃন্দসহ সকল আইনজীবী কিছু কিছু বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন। এ আপত্তিগুলির মধ্যে কিছু কিছু আছে যুক্তসঙ্গত, আবার কিছু কিছু আছে যা আমাদের দেশের জন্য নতুন মনে হয়েছে। যার ফলে আইনের কোন কোন বিধানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করারও চেষ্টা করা হয়েছে।

যাই হোক, we are a democratic government. It is unprecedented in our history that a law passed by this Parliament only four months ago is now being repealed and a new Bill has been introduced on the same subject। এটা আমাদের ইতিহাসে কোন দিন হয়নি। এই আইনটি ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। ৩০ সেপ্টেম্বর অর্ডিন্যান্স করে আমরা এই আইনের কার্যকারিতা স্থগিত করেছি। এটা কোন দিন অন্য কোন সরকার করত না। এটা করা একমাত্র বর্তমান সরকারের জন্যই সম্ভব হয়েছে। কারণ, আমরা দায়িত্ববান, দায়িত্বপরায়ণ এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি সরকার বলেই এটা করা সম্ভব হয়েছে। সেজন্য দুটি গোল টেবিল বৈঠক করেছি। সেই বৈঠকগুলিতে সিনিয়র আইনজীবী এবং আইন বিশেষজ্ঞ, বিচারকবৃন্দ, বিরোধী দল এবং সংসদীয় দলের সদস্যবৃন্দ, সুশীল-সমাজ সকলকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। সেখানে জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, thank you Mr. Kader, you are very co-operative, আমাদের এডভোকেট হারুনুর রশীদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান, the out-spoken critic of this law, তাঁদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এসব উদাহরণ আওয়ামী লীগ সরকারে থাকলে কোন দিন দেখাতে পারতো না। কোন দিনই না। But we had the courage and tolerance to bear with their criticism face to face। এক সপ্তাহ পরে রমজান মাসে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে বার সমিতির সমস্ত প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী এবং অন্যান্য আরও যারা আইনজীবী ছিলেন, প্রত্যেককে নিয়ে বসে, আমরা মত বিনিময় করেছি। দলমত নির্বিশেষে বার সমিতির অনেক নেতৃবৃন্দ, যারা বিরোধী দলের সদস্য, তাঁদেরকেও আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং তাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা চার ঘণ্টা যাবত আলোচনা করেছি এই

www.pathagar.com

আইনটির উপরে এবং সেখানে তারা কিছু কিছু ভালো সুপারিশ দিয়েছেন এবং ঐসব সুপারিশ আমরা গ্রহণ করেছি।

তাঁরা বলেছেন যে, খরচ জরিমানা এবং জামানতের পরিমান বেশি হয়ে গেছে। আমি একটি উদাহরণ দেই—জাল দলিল বা মিথ্যা মামলা বা হয়রানিমূলক মামলা করলে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে এটা হয়রানিমূলক বা মিথ্যা মামলা, তাহলে ১৯৬১ সালে জরিমানা ধরা হয়েছিল ৫ হাজার টাকা, আমরা সেটা বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করেছিলাম, ড. জহির বলেছিলেন এটা ৫ লক্ষ টাকা করে দিতে। কিন্তু আমরা ১ লক্ষ টাকা করেছিলাম, অর্থাৎ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত আদালত জরিমানা করতে পারবেন যদি আমার বিরুদ্ধে কেউ মিথ্যা মামলা বা জাল দলিলের উপর ভিত্তি করে মামলা দায়ের করে। তখন অন্যান্য সব আইনজীবীরা বললেন যে, এটা খুব বেশি হয়ে গেছে, এতে সাধারণ নাগরিকরা ভয় পেয়ে আর আদালতে আসতে চাইবে না। এক লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে আমরা এখন ২০ হাজার টাকার প্রস্তাব করেছি।

দ্বিতীয়ত, আমরা খরচ ও জরিমানা সরকারের ট্রেজারীতে জমা দেওয়ার প্রভিশন রেখেছিলাম কিন্তু তারা বললেন যে এটা অপর পক্ষকে দেওয়া দরকার। আমি মনে করি যে এটা একটি সঠিক সমালোচনা ছিল। এটা সংসদ সদস্য জনাব গোলাম কাদেরও প্রশ্ন করেছেন সরকার কেন পাবে? এটা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের পাওয়া উচিত। আমরা এখন তাই প্রস্তাব করছি।

তৃতীয় হল, খরচ, জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে অনুর্ধের সাথে সাথে অন্যুন অর্থাৎ minimum একটি অংক নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম। আইনজীবীরা বললেন যে, এটা কোর্টের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, ন্যূনতম হার ধার্য করা ঠিক হবে না। তাই অন্যূন পরিমাণটা আমরা তুলে দিয়েছি। শুধুমাত্র মুলতবির ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সব খাতে আমরা ন্যূনতম হার তুলে দিয়েছি আর সর্বোচ্চ হারটাকে আমরা অনেক কমিয়ে দিয়েছি, এটাকে সহনীয় করেছি, সাধারণ মানুষের ক্ষমতার মধ্যে এনেছি।

আর স্থগিতাদেশের ব্যাপারে আমরা প্রভিশন করেছিলাম যে, যে কোনো স্থগিতাদেশের জন্য একটি সিকিউরিটি দিতে হবে। তারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, গরিব মানুষরা যদি নিষেধাজ্ঞা চায়, তাহলে তারা এই সিকিউরিটির অর্থ কোথা থেকে পাবে? এই পয়েন্টটিও অত্যন্ত সঠিক এবং সেই বিধানটি বাদ দিয়েছি। নোটিশ সার্ভিসের জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে একটি অপশন রেখেছিলাম। সেখানে যুক্তিতর্ক হয়েছে যে বড়লোক যারা তারা বিজ্ঞাপন দিতে পারবে, গরিব মানুষরা বিজ্ঞাপন দেওয়ার টাকা কোথায় পাবে? একটি বিজ্ঞাপন দিতে ১০-১৫ হাজার টাকা লাগে। সেই বিধান এখন তুলে দেওয়া হয়েছে।

মামলার প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্তকরণের জন্য আমরা examination-in-chief-এর স্তরটি তুলে দিয়ে সরাসরি cross-examination-এ যাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছিলাম, কিন্তু আইনজীবীরা বললেন যে তাতে মামলা পরিচালনায় বাদী পক্ষ বা বিবাদী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সেটাও আমরা তুলে দিয়েছি।

আইনের মূল উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন রেখে এই পরিবর্তনগুলি আমরা এনেছি in response to the demand of the lawyers। আমি আগেই বলেছি এটা আমাদের সংসদের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। আজকে সেইজন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্য গোলাম কাদের সাহেবকে বলতে চাই যে জনমত যাচাই বা বাছাই কমিটিতে যাওয়া বা নেওয়ার আর কোন প্রয়োজন আছে কি? এরকম কোন আইনের উপরে বাংলাদেশে এত আলোচনা আগে কখনও হয়েছে বলে অন্তত আমার জানা নেই। Never, never any law passed by the Parliament has been debated out side the Parliament so extensively. It has never happened। আমি মনে করি এই আইন পাস হলে দেশের দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থায় একটি গুণগত পরিবর্তন আসবে। সাধারণ মানুষ সহজে, কম খরচে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিচার অর্জনে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

আমি এখন সম্মানিত সংসদ সদস্য জনাব গোলাম কাদেরের উত্থাপিত দুয়েকটি পয়েন্টের জবাব দিতে চাই।

প্রথমত আপনি বলেছেন যে, পার্লামেন্টে আইন পাস করে আবার সেটিকে রহিত করে আবার নতুন আইন আনা সংসদের জন্য সম্মানজনক হয় নি। এর উত্তর আমি দুইভাবে দিতে চাই। প্রথমে বলতে চাই যে, no law is sacrosanct, আইনের বির্বতন একটি চলমান প্রক্রিয়া। Continuously we are bringing laws for amendment। সুতরাং প্রত্যেক বারই যখন আমরা কোন আইনের সংশোধনী আনি তার মানে এই নয় যে, আমরা পার্লামেন্টের কোন অসম্মান করছি। কারণ, পার্লামেন্ট আছেই তো আইন প্রণয়নের জন্য। Development of law is a continuous process। এই আইনটিকে আরও উন্নত করার জন্য কিছুদিন পরেই আরও সংশোধন করতে হতে পারে। It is only part of the process।

দ্বিতীয়ত হল, a word of appreciation should have come from you। আমরা যেভাবে গণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে respond করেছি it has never happened before। সুতরাং brighter side is much more important than what you have said। আমি মনে করি আমরা এই সংসদের সম্মান বৃদ্ধি করেছি এবং সরকারের দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছি, Second Amendmend repeal করে Third Amendment পাস করানোর জন্য।

এরপর interlocutory-ব্যাপারে আসি। মাননীয় স্পীকার, আপনি জানেন যে, আমাদের দেশে একেবারে মামলার শেষ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর হঠাৎ একটি দরখাস্ত করে বলা হয়, আর্জির সংশোধন করতে চাই বা পার্টি এ্যাড করতে চাই বা আদালত পরিবর্তন করতে চাই। হেরে যাবে জেনে একটি দরখাস্ত দিয়ে দিল মামলার বিলম্ব ঘটানোর জন্য। If the Court is satisfied যে, তার এই দরখাস্তটা সে এক বছর আগে করতে পারতো, ছয় মাস আগে করতে পারতো বা it is done only to delay the process of justice, তাহলে দরখাস্ত admit করা হলে অপর পক্ষকে খরচ দিতে হবে।

আর injunction-এর ব্যাপারে উত্তর হল, গরিব মানুষও কোর্টে যেতে পারবে। It's a guaranteed right। শুধু বলেছি যে, development work যদি হয়, যদি সরকারের কোন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হয়, আর যদি সেই ক্ষেত্রে injunction চাওয়া হয় তাহলে গভর্নমেন্ট প্লিডারকে নোটিশ দিতে হবে। কিন্তু তারপরও সে যদি না আসে, বা তার যদি কোন অথরাইজড প্লিডার না আসে, injunction দেবে। আর যদি আসেও তার কথা শুনে উপযুক্ত ক্ষেত্রে injunction দিতে পারবে। Injunction দেবে না without hearing, without giving a notice। তার মানে এই নয় যে, আদালতের অধিকার থাকবে না ad interim injunction দেওয়ার। ভাল করে পড়ুন, তাহলে দেখবেন যে বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার।

মাননীয় স্পীকার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।*

---

* বিলটি সেদিন পাস হওয়ার সাথে সাথে দেওয়ানী কার্যবিধির দ্বিতীয় সংশোধনী রহিত হয়ে যায়। নতুন আইনে নিম্নরূপ পরিবর্তনগুলি আনা হয়ঃ

- মিথ্যা মামলা দায়ের নিরুৎসাহিত করার জন্য জরিমানার পরিমাণ অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ;
- আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত বা আরজি দাখিল না করলে সর্বোচ্চ ৫ হাজার থেকে কমিয়ে ২ হাজার টাকা নির্ধারণ;
- ইচ্ছাকৃতভাবে মামলা বিলম্বিত করার জন্য অহেতুক কোন অন্তর্বর্তীকালীন দরখাস্ত দাখিল করলে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকার বিধান কমিয়ে অনূর্ধ্ব ৩ হাজার টাকা নির্ধারণ;

www.pathagar.com

- দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ৯৫-এর অধীনে মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য জরিমানা ৫০ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ;
- মামলা শুনানি সংক্ষিপ্তকরণের জন্য আদালতে দাখিল করা যে কোন দরখাস্ত, দলিল বা তথ্য হলফনামার মাধ্যমে দাখিল করা আরজি, plaint-এর লিখিত বক্তব্য (written statement)-কে মৌখিক সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করে সরাসরি cross-examination-এর বিধান তুলে দেওয়া;
- মামলার কোন পর্যায়ে কোন পক্ষ মুলতবি চাইলে সেই পক্ষকে সর্বোচ্চ ২ হাজার এবং সর্বনিম্ন ৫ শত টাকা খরচের বিধান কমিয়ে সর্বোচ্চ ৫০০ এবং সর্বনিম্ন ২০০ টাকা নির্ধারণ;
- চূড়ান্ত শুনানির পর্যায়ে আছে এমন মামলা আদালতের কার্য তালিকায় একদিনে সর্বোচ্চ ৩টি বিধান থেকে বাড়িয়ে ৫টি মামলার বিধান নির্ধারণ;
- সমন বা নোটিশ জারির বিধানে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিধান তুলে দেওয়া;
- অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞার কারণে কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতির অন্যান্য দাবি ছাড়াও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫০ হাজার থেকে কমিয়ে অনূর্ধ্ব ১০ হাজার টাকা করা;
- যে কোন ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করার আগে জামানতের বিধান তুলে দেওয়া; এবং
- খরচ, ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা রাজস্ব খাতে জমা না দিয়ে অপর পক্ষকে দেওয়ার বিধান করা হয়।

www.pathagar.com

মামলা ব্যবস্থাপনা এবং আদালত প্রশাসনে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে

আদালত সংস্কার বাস্তবায়ন (সহায়ক বিধান) আইন, ২০০৪

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

দেশের বিচার ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ এবং গতিশীল করার জন্য সরকার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে বেশ কিছু আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেগুলির বাস্তবায়ন অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। উপরন্তু, মামলা ব্যবস্থাপনা এবং আদালত প্রশাসন আধুনিকীকরণ করা এই সংস্কার কর্মসূচীর একটি অন্যতম বিষয়। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় লিগ্যাল এন্ড জুডিশিয়াল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের অধীনে দেশী-বিদেশী পরামর্শকরা দু'বছর যাবত নানা রকম গবেষণা করে অনেকগুলি পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রস্তাব করেছে যা পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রচলিত কিছু নিয়ম-কানুন, পদ্ধতিগত বিধি-বিধান ও আইন স্থগিত করা এবং নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী সেইসব পরিবর্তন প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন হবে। এই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং ক্ষেত্রমতে প্রকল্পাধীন জেলা জজকে আইনগত ক্ষমতা দেওয়ার জন্য এই আইনটি সংসদে উত্থাপন করা হয়।

মাননীয় স্পীকার

আমি সম্মানিত সংসদ-সদস্য কাদের সিদ্দিকীকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি আমাকে বলার সুযোগ করে দিয়েছেন, তিনি এই বিলে objection না দিলে আমি এই বিলটি explain করার সুযোগ পেতাম না।

আমি যদি একটু ব্যাখ্যা দিই, তাহলে সহজেই অনুমেয় হবে যে, বিলটি কেন আনা হয়েছে। এই সরকার বিচার বিভাগকে যুগোপযোগী করার জন্য অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে একটি অন্যতম পদক্ষেপ হল যে আমাদের দেশে সহজ পদ্ধতিতে স্বল্প ব্যয়ে দেওয়ানী আদালতে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। এটা করতে গেলে আমাদেরকে বর্তমানে যে 'মামলা ব্যবস্থাপনা' যাকে ইংরেজীতে বলে Case Management আর 'আদালত প্রশাসন' যাকে বলে Court Administration এ দুটোকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে মামলার ব্যবস্থাপনা করা হয়, আমাদের যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, যাঁরা আদালতে গেছেন একবার, তাঁদের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। আদালত প্রশাসন এখন যেভাবে চলে এটা একেবারে পুরনো আমলের ব্যবস্থা। আমরা এই দুটো ব্যবস্থাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই যাতে করে জনগণের হয়রানি কমে এবং দেশের মানুষ সহজে কম খরচে দ্রুত বিচার পায়। এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্যই আমাদের একটি প্রকল্প আছে, Legal and Judicial Capacity Building Project। এই প্রকল্পের অধীনে আমরা কিছু experiment করছি এখন। সারা বাংলাদেশে সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া ৫টি জেলাকে আমরা আপাতত পাইলট আদালত হিসেবে নিয়েছি—গাজীপুর, খুলনা, ঢাকা, কুমিল্লা এবং রংপুর জেলা। এই আইনটি দু'বছরের জন্য করা হচ্ছে। দয়া করে যদি একটু পড়ে দেখেন। প্রকল্পের অধীনে experimentগুলি পরীক্ষা করার কাজ শেষ হলেই এই আইনের আর প্রয়োজন হবে না। It is a temporary law। দেশী এবং বিদেশী পরামর্শকরা গত দুবছর যাবত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। They have gone deep into the problems of our Court System। আমাদের Court Administration এবং Case Management-এর একেবারে গভীরে গেছেন এবং এগুলি যুগোপযোগী করার জন্য তাঁরা কিছু মডেল তৈরি করেছেন। যেগুলি তাঁরা experiment করবেন। এখন এই পাঁচটি পাইলট জেলাতে experiment করার জন্য কিছু কিছু আইন হয়তো স্থগিত করতে

www.pathagar.com

হতে পারে, procedural আইন, no substantive law, এবং কিছু বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন যা এখন প্রচলিত আছে। আমি একটা example দিই। মাননীয় স্পীকার, এখন যে, certified কপি আমরা আনতে যাই কোর্টে, কাদের সিদ্দিকী সাহেবেরও এব্যাপারে নিশ্চয়ই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, তার কপি পেতে কত অসুবিধা হয় আমরা সকলেই সেটা জানি। এটাকে simplify করতে হবে, যাতে করে পাঁচজন মানুষ একই certified কপির জন্য দরখাস্ত করলে পুরনো আমলের বিধি অনুযায়ী টাইপ রাইটার দিয়ে আলাদা করে সবগুলি টাইপ করতে না হয়। রায় বা আদেশের প্রত্যেকটি কপি আলাদা করে হলুদ রংয়ের রুল টানা বিশেষ ধরনের কাগজে যেন টাইপ করতে না হয়। কিন্তু এটার জন্য আমি যদি computer allow করি, তাহলে আমাকে ঐ বিধিটা স্থগিত করে নতুন করে সংযোজন করে বলতে হবে এখন টাইপ মেশিন দরকার নেই, কম্পিউটার টাইপ প্রিন্ট এবং কপি করা যাবে একই সাথে। এটা করতে গেলে একটা লিগ্যাল ব্যাকিংয়ের প্রয়োজন। সেই জন্য কোন আইন স্থগিত বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে। আর বিধি-বিধানের ব্যাপারে Constitution-এর under Article 107 and under Section 221 & 222 of the Civil Procedure Code-এ এই ক্ষমতাটি প্রধান বিচারপতির অনেকটা আছে, কিন্তু নতুন সিস্টেম চালু করতে গেলে যদি পুরনো সিস্টেমের কোন কোন জায়গায় বিধি-বিধানকে স্থগিত করতে হয় বা নতুন কোন experiment করার জন্য যদি বিকল্প কিছু পদ্ধতি introduce করতে হয়, তাহলে প্রধান বিচারপতিকেও ঐ ক্ষমতাটা এখন পূর্ণাঙ্গভাবে দেওয়া হয়েছে। এই দুটি কারণেই আইনের ব্যাপারে সরকারকে, আর বিধির ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি এবং ক্ষেত্রমতে প্রকল্পাধীন জেলা জজকে এই আইনের অধীনে এই ক্ষমতাটা দেওয়া হয়েছে। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে প্রয়োগ করার জন্য দুই বছর মেয়াদী এই আইন করা হচ্ছে। যদি সরল বিশ্বাসে, in good faith একজন public servant যদি এই আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে কোন ভুলত্রুটি করেন, কোন omission হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা করা যাবে না। অর্থাৎ তাঁকে দায়ী করা যাবে না। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিকর কিছু করেন তাঁকে আমরা immune করে দিচ্ছি। এই আইনটি যাঁরা implement করতে যাবেন তাঁদেরকে একটি প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য এই বিধান রাখা হয়েছে।

আমরা একটি যুগান্তকারী সংস্কারমূলক কাজে হাত দিয়েছি। এই ৫টি জেলার আইনজীবীরা দলমত নির্বিশেষে, বিচারকবৃন্দসহ সকলেই যারা সংশ্লিষ্ট, all stake holders will unitedly try to implement the experiments। কারণ এটা জনগণের কল্যাণের জন্য করা হচ্ছে। বিচার বিভাগকে দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে হবে এবং এই বিচার বিভাগ ও বিচারব্যবস্থা সেদিনই গ্রহণযোগ্য হবে যেইদিন এ দেশের মানুষ সহজে, কম খরচে, দ্রুত বিচার পাবেন। সেটা নিশ্চিত করার জন্যই এই আইনটি আজকে আনা হয়েছে। যদি আমরা experiment করে successful হই তাহলে এটা শুধু ৫টি পাইলট জেলায় নয়, প্রথম পর্যায়ে আরও ২১টি জেলায় introduce করা হবে। আমরা তখন substantive law পরিবর্তন করার জন্য নতুন আইন এখানে আনব সারা বাংলাদেশের সকল আদালতের জন্য। এখন আপাতত ৫টি পাইলট জেলায় প্রয়োগের জন্য দুই বছরের মেয়াদী এই আইনটি করা হচ্ছে। আদালতের বিদ্যমান মামলা ব্যবস্থাপনা ও আদালত প্রশাসনে সংস্কার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার ও প্রধান বিচারপতি এবং ক্ষেত্রমতে প্রকল্পাধীন জেলা জজকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করার জন্য এই বিলটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।*

---

*বিলটি সেদিনই সংসদে পাস হয়।

www.pathagar.com

স্বাধীন একটি কমিশন দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

দুর্নীতি আজ সমাজকে গ্রাস করতে চলেছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সমাজে দুর্নীতি দমন করা এবং সেই লক্ষ্যে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং বাস্তবায়ন করার জন্য এই আইন সংসদে উপস্থাপন করা হয়।

মাননীয় স্পীকার

আজকে বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন এবং বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের জন্য একটি গৌরবময় দিন। দেশের দুর্নীতি দমন করা ছিল জাতির কাছে বর্তমান সরকারের একটি নির্বাচনী অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার রক্ষা করার জন্য আজকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। এই আইন করার মাধ্যমে এই সরকার আবারও প্রমাণ করেছে যে, আমরা যা বলি তা করি। বেগম খালেদা জিয়া জাতির কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন বা ওয়াদা দিয়েছিলেন, সে ওয়াদা আজকে তিনি রক্ষা করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, যাচাই বাছাইয়ের কথা বলে মাননীয় সদস্য জনাব কাদের সিদ্দিকী কোথায় চলে গেলেন? তিনি এতক্ষণ যা বললেন আমরা ধৈর্য সহকারে তা সব শুনলাম, কারণ তিনি এখন বিরোধী দলের মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। সেজন্য আপনিও তাঁকে পর্যাপ্ত সময় দিচ্ছেন। আর আমাদেরকে তাই অনেক অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর কথা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে শুনতে হয়। এখন তিনি নেই। মাননীয় সদস্য এসেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ। যাচাই-বাছাইয়ের কথা বলে মাননীয় সদস্য অনেকগুলি সেকশনের কথা বলেছেন। সেজন্য আমাকে দু'একটি কথা বলতে হচ্ছে তার জবাবে।

এই আইনের মাধ্যমে দেশে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশনের মেয়াদ হবে ৪ বছর, আর এতে একজন চেয়ারম্যানসহ মোট ৩ জন কমিশনার থাকবেন। তাঁদের নিয়োগের পর সরকার বা প্রশাসন তাদের কার্যাবলীতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কমিশনারদেরকে তাঁদের মেয়াদ সুনিশ্চিত করার জন্য অপসারণ করার কোন ক্ষমতা সরকারের থাকবে না। সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে যে পদ্ধতিতে অপসারণ করা হয়, যদি তাঁদের বেলায় কখনও সে ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে শুধু সেভাবেই অপসারণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এইভাবে তাঁদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে যাতে করে তাঁরা নির্ভয়ে তাঁদের কর্তব্য পালন করতে পারেন।

এই আইনের অধীনে যে তফসিল দেওয়া হয়েছে সেই তফসিলে Prevention of Corruption Act 1947 অন্তর্ভুক্ত করা আছে। Penal Code-এর যে সকল provision পাবলিক সার্ভেন্টসদের দুর্নীতির সাথে সম্পর্কিত সেগুলিও আছে। এই আইনের তফসিলের মধ্যে abetment-এর provision সেকশন ১০৯ রাখা হয়েছে। পাবলিক সার্ভেন্টসদের সঙ্গে যদি কোন প্রাইভেট সিটিজেনের যোগাসাজশে কোন অপরাধ হয় তাহলে সেই ব্যক্তিদেরও শাস্তির ব্যবস্থা রাখা আছে।

এই আইন কার্যকর করার পরে অর্থাৎ স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন যেদিন গঠিত হবে সেদিনই বর্তমান দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই কমিশনকে এই আইনের তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ তদন্তের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের অনুমোদন ছাড়া কোন মামলা দায়ের করা যাবে না। অর্থাৎ প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কোন হস্তক্ষেপ থাকবে না। তাঁরা শুধু তদন্তই নয়, তদন্ত করার জন্য যত ক্ষমতার প্রয়োজন সেই ক্ষমতা তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছে। কমিশনকে

www.pathagar.com

আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আপনার সংসদ সচিবালয়ের যে স্বাধীনতা আছে, সুপ্রীম কোর্টের যে স্বাধীনতা আছে, সেই একই স্বাধীনতা এই কমিশনকে দেওয়া হয়েছে।

এই আইনের অধীনে অপরাধগুলি কমিশন শুধু তদন্তই করবে না, তদন্ত করার পরে প্রসিকিউশন করার জন্য তাদেরকে পুলিশ বা অন্য কারো উপরে নির্ভর করতে হবে না। তাঁরা নিজেরা একটি prosecution unit তৈরি করবেন অর্থাৎ তাঁদের নিজস্ব প্রসিকিউটরস থাকবে। তাঁরা সেই অপরাধগুলির মামলা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন যাতে করে তাঁদের দায়বদ্ধতা কমিশনের কাছে থাকে, সরকারের কাছে নয়। Criminal Law Amendment Act 1958 এর অধীনে কমিশনের দায়েরকৃত মামলাগুলির বিচার এবং নিষ্পত্তি হবে। সেই আইনের অধীনে একটি সেকশন আছে—সেকশন ৬-এর (৫) এবং (৬)। মাননীয় স্পীকার আপনি জানেন যে সেকশন ৬(৫) হল, সরকারের অনুমোদন লাগবে কোন পাবলিক সার্ভেন্টকে প্রসিকিউট করতে হলে। আর ৬(৬)-এ আছে সরকার প্রসিকিউটর নিযুক্ত করবে মামলা পরিচালনার জন্য। তাই এই দুটো ক্ষমতা যদি সরকারের কাছে থেকে যায় তাহলে এই কমিশন গঠন করার কোন অর্থ হয় না। আমরা সেকশন ৩৩-এ সেই ব্যবস্থাটা রেখেছি। কিন্তু তারপরেও কিছু অস্পষ্টতা আছে। সেই কারণে সেটাকে স্পষ্ট করার জন্য আমাদের স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ একটি সংশোধনী এনেছেন, যে সংশোধনীটা আমরা বিবেচনা করব। সেই সংশোধনী আমরা সন্নিবেশিত করলে তখন সরকারের কোন প্রকারের হস্তক্ষেপের আর কোন সুযোগ থাকবে না। মাননীয় সংসদ সদস্য কাদের সিদ্দিকী সাহেব বলেছেন যে, গোলাম কাদের সাহেব যা প্রস্তাব করেছেন আর খন্দকার মাহবুব উদ্দিন সাহেব যে প্রস্তাব করেছেন দুটি একই। আপনাকে আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই আপনি যদি মেহেরবানি করে পড়েন, দুটো একেবারেই এক নয়। বরং কাদের সাহেব বলেছেন ২৮ দফার (২) উপ-দফাটি বর্জন করা হোক। আর আমরা বলছি (২) ধারা প্রতিস্থাপিত করে নতুন একটি বিধান করা যেতে পারে। Criminal Law Amendment Act সেকশন ৬-এর (৫) এবং (৬) এর অধীনে সরকার যেন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না পারে সেইজন্য এটা এক নয়। দেখবেন আকাশ-পাতাল তফাত। তারপরে মাননীয় স্পীকার, Criminal Law Amendment Act-এর অধীনে একজন বিশেষ জজ থাকবেন এই মামলাগুলির বিচার কার্য পরিচালনা করার জন্য। আর এই আইনে Anti-Corruption Act 1957 এবং Anti-Corruption Tribunal Ordinance 1960 রহিত করার প্রস্তাব করেছি।

মাননীয় সদস্য যাচাই বাছাইয়ের জন্য প্রস্তাব এনেছেন। উনি নিজেই বলেছেন যে, এই আইনটি আমরা উত্থাপন করেছি ১০ জুলাই ২০০৩ সালে। আজকে প্রায় ৭ মাস হতে চলেছে। এতদিন আমরা এই বিলটি পাস করানোর জন্য উত্থাপন করি নি। কেন করি নি? জনমত যাচাই করার জন্য করি নি। উনি আমাকে বলেছেন যে, আমি সর্বনাশ করার জন্য আগে বাছাই কমিটিতে অর্থমন্ত্রী আর আমার নিজেকে রেখেছিলাম। এটা একটা কেবিনেট সিদ্ধান্ত ছিল। এটা আমার সিদ্ধান্ত নয়, সরকারের সিদ্ধান্ত। আপনাকে জানতে হবে, সরকারে একবার যোগদান করেন, তাহলে বুঝবেন যে, সরকার কি করে চলে? সরকারে একবার join করে দেখেন। I welcome you. Then you will only understand the intricacies of formulation of a law, the process, the stages it has to go through। আমরা সাত মাস ধরে এই আইনটা নিয়ে সকলের সঙ্গে আলোচনা করেছি। খবরের কাগজের সাংবাদিকদের আমি ধন্যবাদ জানাই। অনেক সম্পাদকীয় বেরিয়েছে। অনেক মতামত বেরিয়েছে। অনেক বড় বড় আর্টিক্যাল বেরিয়েছে বিভিন্ন খবরের কাগজে এবং আমরা গোলটেবিল বৈঠক করেছিলাম। সেই গোলটেবিল বৈঠকে বিরোধী দলের অনেক নেতা, সংসদ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আমরা খোলাখুলি আলোচনা করেছি। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, যাকে নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন, আমরা তাদের ফাইন্ডিংসের সঙ্গে একমত নই, তাদের Methodologyর সঙ্গে একমত নই, তারা যে conclusion draw করেছে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা তাতে একমত নই। কিন্তু তারপরও সেই সংগঠনের প্রতিনিধিকে নিয়ে আমি দুবার বৈঠক করেছি। একবার আমি নিজে বৈঠক করেছি ব্যক্তিগতভাবে, আর একবার গোলটেবিল বৈঠকে ডেকে তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি। তাঁরা তাঁদের পরামর্শ দিয়েছেন। আজকে আমি আনন্দের

www.pathagar.com

সঙ্গে বলতে চাই, because we are a democratic government, আমরা সকলের মতামতের উপর ভিত্তি করে এই আইনের অনেক উন্নতিসাধন করেছি। যেমন স্বেচ্ছায় আমি এবং আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী, আমরা বলেছি যে, বাছাই কমিটিতে আমাদের থাকার দরকার নেই, because our intention is very genuine, আমাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত আন্তরিক। আমরা সত্যিকার অর্থে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করতে চাই এবং আমরা চাই সে কমিশন সুষ্ঠুভাবে কাজ করুক। সেজন্য আমরা আমাদের নাম বাদ দিয়েছি। আমি জানি না অন্য কোন সরকার বাদ দিতে রাজি হতো কিনা। সেখানে দুইজন বিচারককে বাছাই কমিটিতে রাখা হয়েছে। বাছাই কমিটির চেয়ারম্যান হবেন প্রধান বিচারপতির সুপারিশে এ্যাপিলেট ডিভিশনের একজন বিচারপতি এবং একজন হাইকোর্টের বিচারপতি। এরচেয়ে আর ভালো নিরপেক্ষ বাছাই কমিটি কি করে করা যায়? তারপর আমরা যেটা করেছি, আর্থিক স্বাধীনতা, এটাও আমাদের মূল বিলে ছিল না। আমরা আর্থিক স্বাধীনতার ব্যবস্থা করেছি। কারণ এই প্রশ্ন অনেকে তুলেছেন যে, আর্থিক স্বাধীনতা যদি না থাকে, তাহলে হয়ত প্রতিষ্ঠানটি নিরপেক্ষভাবে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। তাই সেটা আমরা করেছি। তৃতীয় হল যে, এই মূল বিলে কমিশনের prosecute করার কোনো ক্ষমতা ছিল না। আমরা সেটাও agree করেছি। কারণ যদি prosecution করার ক্ষমতা পুলিশকে দিই, তাহলে এই কমিশনের যে দায়িত্ব, যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্যটা ব্যাহত হবে। সে জন্য কমিশনের নিয়ন্ত্রণেই prosecutionটা আমরা রেখেছি। এরপর এই original lawতে section 109 ছিল না। আমরা schedule-এ section 109 অন্তর্ভুক্ত করেছি। অর্থাৎ কলাবরেটর, যোগসাজশে যাঁরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকবেন, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা আমরা করেছি।

এই আইনের তফসিল আমরা সংক্ষিপ্ত রেখেছি। কেন? ফোকাস হল, on corruption of public functionaries and public servants। এটা থেকে আমরা অন্যদিকে যেতে চাই না। Anti-Corruption Act 1957-এর অধীনে লম্বা তফসিল ছিল। তারাই আমাদেরকে জানিয়েছে যে, নয়টি আইনের অধীনে গত তিন বছরে কোন মামলা হয়নি। অথচ এই তফসিল থাকার কারণে জনসাধারণের হয়রানির শিকার হওয়ার সুযোগ ছিল। আমরা সেই সুযোগ কমিয়ে দিয়েছি। আমরা ফোকাল পয়েন্টে নিয়ে এসেছি পুরো জিনিসটা, কমিশনের কি দায়িত্ব হবে, কাদের বিরুদ্ধে কমিশন action নিতে পারবেন, কাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করবেন, কি ধরনের অপরাধের জন্য তদন্ত করতে পারবেন। সুনির্দিষ্টভাবে আমরা সেটাই ফোকাস করার চেষ্টা করেছি। সেটা হল, বাংলাদেশে সরকারের প্রশাসনে নিয়োজিত কেউ আইনের ঊর্ধ্বে থাকতে পারবে না। এদের সকলের হিসাব নিতে হবে। এই কমিশন যদি চান, হিসাব নিতে পারবেন। এই ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া আছে। Anti-Corruption Act 1957-এর আর প্রয়োজন নেই। এন্টি করাপশন ব্যুরো এখন যেটি আছে, তারা মানুষকে হয়রানি করে। আমি সরকারের একজন মন্ত্রী, তাই আর বেশি কিছু বলতে চাই না। এন্টি করাপশন ব্যুরোর ভাবমূর্তিটা যে কি সেটা সকলেই জানে। সেই জন্য এন্টি করাপশন ব্যুরো আর থাকবে না। সেটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আমি আমার বক্তব্য প্রায় শেষ করে এনেছি। এখানে কমিশনকে গ্রেফতারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে subject to the consent of the Court। সম্পত্তির ঘোষণার প্রভিশনটা আছে, কাদের সিদ্দিকী সাহেব, আপনিও একটু সাবধান হয়ে যাবেন। হিসাব আপনারও নেওয়া হতে পারে। আমাদের সকলের যেমন পারে, আপনারও পারে।

উনি দুটি প্রশ্ন করেছেন। একটি হল, সরল বিশ্বাসে কাজকর্মের বিষয়টি। প্রতিটি আইনে এই প্রভিশনটা রাখা হয় কেন? যাঁরা এই আইন প্রয়োগ করবে তাঁদের ভুলভ্রান্তি হতে পারে। তাঁরা যদি সেটা in good faith-এ করেন তাহলে তাঁদের কোন শাস্তি দেওয়া যাবে না কিন্তু যদি দুরভিসন্ধিমূলকভাবে, কোন ফ্রড যদি কেউ করে, তার জন্য কোন exemption এই আইনে নেই। সুতরাং সরল মনে করলে ঠিক আছে। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আপনার ক্ষতিসাধন করার জন্য কিছু করে তার জন্য কোন immunity এই আইনে রাখা হয় নি।

আর একটি হল, জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতার বিষয়টি। যদি এই আইনের প্রয়োগের ব্যাপারে, ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় কে এর উত্তর দেবে? এটার নিরসন তো

www.pathagar.com

একমাত্র সরকারই করতে পারে। সরকারকে যদি নিরসন করার জন্য আবার পার্লামেন্টে আসতে হয়, যদি কোন সংশোধনী আনতে হয় সেটাতো সরকারকেই করতে হবে। এটাতো অন্য কোন অথরিটিকে দেওয়া যাবে না। এধরনের বিধান অনেক আইনে রয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়।

আমি ভেবেছিলাম কাদের সিদ্দিকী সাহেব আমাকে এই আইনটির জন্য congratulate করবেন। কিন্তু তিনি বললেন যে, আমি সর্বনাশ করেছি। আমি সেটার উত্তর দিতে চাই না। নিশ্চয়ই তিনি এই মন্তব্যের জন্য অনুশোচনা করবেন। তবে, আমাদের দেশে একটা মনোবৃত্তি develop করেছে যে, কোন কিছু শুরু করার আগেই রায় দিয়ে দেওয়া। উনি রায় দিয়ে দিলেন যে, এটি একটি পরাধীন কমিশন হবে। কিন্তু কেন পরাধীন হবে সে ব্যাখ্যাটি তিনি দেন নি। শ্লোগান হিসাবে তিনি দিয়েছেন publicity পাওয়ার জন্য। কালকে খবরের কাগজে বের হবে, আপনি বলেছেন এটা একটা পরাধীন কমিশন হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে পরাধীন বলতে কোন কিছু হতে পারে? এটি তো কোন দেশ নয়, এটি একটি সংগঠন। আর একটি কথা বলার দরকার। রাষ্ট্রপতিকে আমরা অব্যাহতি দিয়েছি। মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সংবিধানের article 51-এর প্রতি। যে immunity রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়েছে সেটা constitution-এ দেওয়া আছে। তার বাইরে আমাদের যাওয়ার উপায় নেই। কিন্তু একথা আপনাদেরকে জানাতে চাই যে, যতদিন তিনি রাষ্ট্রপতি থাকবেন ততদিন এই immunity তিনি enjoy করবেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে তিনি আর রাষ্ট্রপতি থাকবেন না, সেইদিন থেকে তিনি আর এই immunity enjoy করতে পারবেন না। জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জন্য আপনার সহমর্মিতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। কারণ হল তাঁর বিরুদ্ধে যখন প্রসিডিং ড্র করা হয় তখন তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন না। তাছাড়া ক্রিমিনাল offence এর ব্যাপারে article 51 কতটুকু applicable হবে, একটু পড়ে দেখবেন। সেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে immunityটা কতটুকু পাবেন?

আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী হাউস থেকে চলে গেছেন এবং অনেক কথাই বলে গেছেন। আমি তার জবাব দিতে চাই না, শুধু এইটুকু বলতে চাই, এই পার্লামেন্টের সকল সদস্যই শুনেছেন আমি কি বলেছি। কোন একটি কটাক্ষমূলক অসংসদীয় শব্দ আমি ব্যবহার করিনি। বরং অনেক কিছু সহ্য করে গেছি এই হাউজের পরিবেশ যাতে ভাল থাকে সেজন্য। যাহোক, তারপরও আমার কোন কথায় তিনি যদি মনোক্ষুণ্ন হয়ে থাকেন সেইজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। আশা করব তিনি আবার সংসদে ফিরে আসবেন এবং তাঁর যে ভূমিকা সেটা তিনি রাখবেন। তাঁর মতামত freely express করবেন এবং আমরা সেটা শুনতে সব সময় আগ্রহী থাকব। Apprehension এবং presumption-এর উপর base করে তিনি বলে গেছেন যে, এটা একটি কালো আইন বলে পরিচিত হবে। সাধারণত আমরা repressive law কে কালো আইন বলি। কিন্তু এই আইনটিকে কি হিসাবে repressive বলা যেতে পারে, আমার জ্ঞানের মধ্যে সেটা আসে না। আমি বাংলাদেশের জন্য এই আইনকে একটি golden law বলে আখ্যায়িত করতে চাই। This law is going to take us a long way। আসুন আমরা কাজ শুরু করি। কোন দিনই কোন প্রতিষ্ঠান overnight develop করে না। আজকে আমাদের মত সরকার আছে বলে, আমরা আমাদের নিজেদেরকেও একটি স্বাধীন কমিশনের অধীনে নিয়ে এসেছি। এই কথাটি সকলের appreciate করা উচিত হবে। আজকে আমরা যাত্রা শুরু করছি। কোন আইনই sacrosanct নয়, কোন আইনই perfect নয়। একটি আইন trial and error-এর মধ্য দিয়ে develop করে। একটি প্রতিষ্ঠানও trial and error এর মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। Overnight এই প্রতিষ্ঠানটি perfect একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে যাবে এটা দাবি করা ঠিক হবে না। তবে আসুন, আমরা যাত্রা শুরু করি। আসুন, আমরা সবাই মিলে এই আইনটিকে সম্ভাষণ জানাই, এই আইনটিকে আমরা গ্রহণ করে নিই এবং এই আইনটিকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সকলেই সহযোগিতা করি, যাতে করে আমরা সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন করার একটি সক্রিয় প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারি। এই কমিশন দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী এনেছেন। আমরা কি উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য

www.pathagar.com

নিয়ে এই আইনটি করেছি সেই সম্পর্কে দেশের মানুষের কাছে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। এখানে section ৩৩-তে যেটা দিয়েছি সেটা অনুযায়ী অনেকে বলতে পারেন যে, এটা না দিলেও পারতাম। কিন্তু তারপরেও এই সংশোধনীটা দিয়ে বিষয়টা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। Criminal Law Amendment Act-এর Section ৬-এর (৫) এবং (৬) will not be applicable অর্থাৎ এই কমিশন যদি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতির মামলা দায়ের করতে চায় তাহলে সরকারের কোন sanction বা পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন পড়বে না। আমি সকলকে এই সংশোধনীটি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।*

---

*সেদিনই সংসদ বিলটি পাস করে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জাতি হিসাবে আমরা ভাগ্যবান যে আমাদের একটি সুলিখিত সংবিধান আছে

সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪

১৭মার্চ এবং ২৬ এপ্রিল ২০০৪

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪, ৫৯ ও ৮২র সংশোধন এবং ৬৫, ১৪৮ ও চতুর্থ তফসিলের অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) বিল, ২০০৪ ইংরেজী অনুবাদসহ The Constitution (Fourteenth Amendment) Bill, 2004 উত্থাপন করার প্রস্তাব করা হলে কার্যপ্রণালী বিধির অধীনে সংসদ সদস্য জনাব কাদের সিদ্দিকী আপত্তি উত্থাপন করেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করার পর বর্তমান সরকারের এটাই ছিল প্রথম সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব। এই বিলে সংবিধানের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়।

মাননীয় স্পীকার

আমি জনাব কাদের সিদ্দিকীকে ধন্যবাদ জানাই। তবে তার আগে আমি এই গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনীর উপর কিছু বলতে চাই।

সংবিধান জাতির একটি পবিত্র মৌলিক দলিল। জাতি হিসেবে আমরা ভাগ্যবান যে, আমাদের একটি সুলিখিত সংবিধান আছে এবং এই সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অধীনে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। তবে পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের কল্যাণের জন্য কোন কোন সময় সংবিধানের সংশোধনী প্রয়োজন পড়ে। তবে সেই সংশোধনী আনতে হবে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো অটুট এবং অক্ষুণ্ন রেখে। অর্থাৎ যদিও সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা সংসদের সমর্থনপ্রাপ্ত দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আছে, কিন্তু তা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী হতে পারবে না।

আমরা এই সংশোধনীতে ৬টা পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করেছি। অনুচ্ছেদ-৪, ৫৯, ৬৫, ৮২, ১৪৮ এবং চতুর্থ তফসিলে। মহিলা আসনের বিষয়ে যাওয়ার আগে বাকি বিষয়গুলি আমি প্রথমে আলোচনা করতে চাই। সাধারণত প্রতিকৃতির বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে, এই বিষয়টির একটি সাংবিধানিক সমাধানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অনেকে মনে করেন যে, একটি নির্বাহী আদেশ দিয়ে এই একই উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভবপর হতো, কিন্তু সেটা সঠিক নয়। কারণ নির্বাহী আদেশ দূরে থাকুক, আমাদের দেশে এই প্রতিকৃতির জন্য প্রণীত একটি আইন করার পরও এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর হয় নি। আমাদেরকে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সম্পর্কিত আইনটি রহিত করতে হয়েছে। তাই এই সম্পর্কে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই সংশোধনীটা আমরা এনেছি। কোন একক ব্যক্তির জন্য নয়, প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য এই নতুন বিধান করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী, যিনিই হোন না কেন, সরকারী কার্যালয়সমূহে শুধু তাঁদের প্রতিকৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। সুতরাং এখানে প্রতিষ্ঠানগতভাবে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৫৯-এ স্থানীয় সরকারের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, ঠিক নির্বাচনের আগে যাঁরা পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেম্বার থাকেন, সেটা ইউনিয়ন পরিষদ হোক বা পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন হোক তাঁরা বা তাঁদের সমর্থনপুষ্টরা আদালতে গিয়ে কোন একটি গ্রাউন্ড দেখিয়ে সেই নির্বাচনকে স্থগিত করেন। এর ফলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরও অনির্দিষ্টকালের জন্য একজন

www.pathagar.com

নির্বাচিত প্রতিনিধি, পুনঃনির্বাচিত না হয়েই তাঁর পূর্বপদে কাজ চালিয়ে যান। নারায়ণগঞ্জে একজন চেয়ারম্যান ১৮ বছর যাবত ছিলেন, তার মেয়াদ ৫ বছর উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর আরও ১৩ বছর তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। এই ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে আছে। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি।

আপনাকে assure করতে চাই যে, কোন সংশোধনী আমরা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আনি নি। যদি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আনতাম তাহলে এই অনুচ্ছেদ ৫৯-এর সংশোধনীটা আমরা আনতাম না। ১৪৮ অনুচ্ছেদে শপথ নেওয়ার ব্যাপারে সংশোধনী আনতাম না। কারণ আপনি আমাদের স্পীকার আছেন এবং আপনি থাকবেন পরবর্তী সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের শপথ দেওয়ার জন্য। যদি আমরা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতাম তাহলে আমরা এখানে কোন পরিবর্তন আনার প্রয়োজন বোধ করতাম না। আমরা ৫৯ এবং ১৪৮ অনুচ্ছেদে সংশোধনী posterity-র জন্য এনেছি যাতে করে দেশে স্থিতিশীলতা আসে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। আমরা এখানে যে ব্যবস্থা করেছি সেটা হলো মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই আইনানুযায়ী যে প্রতিষ্ঠান থাকবে, যে body থাকবে তারাই নির্বাচন অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা করবে। এটাই হল আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, নির্বাচিত একটি body কে একজন অনির্বাচিত ব্যক্তি দিয়ে replace করা। সেখানে সংবিধানেও বলে দিচ্ছে যে, ৯০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন করতে হবে। স্থানীয় সরকার পরিষদে যাঁরা থাকবেন তাঁরা যদি তাঁদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে না পারেন, তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন ৯০ দিনের জন্য একজন সরকারী কর্মকর্তাকে সেই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়া হবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য। আমাদের ধারণা তখন তাঁরা ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করার জন্য উদগ্রীব হবেন। তাঁরাও তখন চাইবেন না যে নির্বাচন স্থগিত হোক। আমি মনে করি যে এর ফলে আমাদের স্থানীয় সরকারসমূহ আরও সুদৃঢ় এবং গণতান্ত্রিক হবে। যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানগুলি চালাবেন অর্থাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই মেয়াদের মধ্যে থেকে তাঁরা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ ৮২র সংশোধনী হল অর্থ বিল সংক্রান্ত। বর্তমান সংবিধানে একটু confustion আছে। এখানে ইংরেজীতে একরকম আছে এবং বাংলায় অন্যরকম আছে। এটাকে খুব সহজ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে বুঝতে সুবিধা হয়। Money Bill দুই ধরনের হয়। এক ধরনের Money Bill হয় যেখানে আয়-ব্যয় এবং করারোপের প্রশ্ন জড়িত থাকে যা বাজেটের মাধ্যমে আসে। আর এক ধরনের Money Bill হয় যেটা সরকারী খাতের ব্যয়জনিত কোন বিল, যেখানে সংসদে উপস্থাপনের আগে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ নিতে হয়। অথচ Money Bill বলতে সব একই রকম মনে করা হয়। কিন্তু না, Money Bill দুই ধরনের হয়। সেটাকে পরিষ্কার করার জন্য আমরা এই সংশোধনীটা এনেছি।

অনুচ্ছেদ ১৪৮-এর অধীনে পরবর্তী সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমরা প্রস্তাব করেছি যে, নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হবার তারিখ থেকে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে স্পীকার যদি শপথ পরিচালনা করতে ব্যর্থ হন তাহলে পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পাঠ পরিচালনা করবেন। এই বিষয়ে জনাব কাদের সিদ্দিকী বলেছেন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য দ্বারা শপথ পাঠ করানোর ব্যবস্থা করা। এটা আমরা স্থায়ী কমিটিতে অবশ্যই বিবেচনা করে দেখব। আপনি বলেছেন যে, আপনার কোন কথাই আমরা বিবেচনা করি না। কিন্তু এটা খুব seriously বিবেচনা করব, এ আশ্বাস আপনাকে দিচ্ছি।

এখন আমি অনুচ্ছেদ ৬৫ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। এটা হল নারীর ক্ষমতায়ন ও সংসদে মহিলা আসন সংক্রান্ত। এর পটভূমি হল ১৯৭২ সালে যখন এই সংবিধানের প্রণেতারা, যাঁরা এই সংবিধান রচনা করেছিলেন, যাঁরা আজকে ১০০ আসন দাবি করছেন, তাঁরা মহিলাদের জন্য ৫% আসন রেখেছিলেন, যার ফলে ১৫টি আসন সংরক্ষিত ছিল। সাধারণ নির্বাচনে যেই দল জিতবে অর্থাৎ ৫১% সদস্য যাদের পক্ষে থাকবে তারাই ১৫টি আসন পাবে। শহীদ জিয়া ১৯৭৮ সালে

www.pathagar.com

নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করার জন্য ৫%-এর জায়গায় ১০% করে দিয়ে সংবিধানে ৩০টি মহিলা আসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এটা শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৯৯০ সালে, কিন্তু তার আগে এরশাদ সরকারের সময় এই ব্যবস্থার মেয়াদ আরও দশ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। সেটাও শেষ হয়েছে ২০০০ সালে। বর্তমানে যে সংবিধান আছে এই সংবিধানে নারীদের বা মহিলাদের জন্য কোনো সংরক্ষিত আসন নেই।

প্রায় ৪০টি নারী সংগঠনের সাথে আমি কথাবার্তা বলেছি। গত দুই বছরে এই বিষয়ের উপর আমি ৩৬টি সেমিনার, কর্মশালা, গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম এবং আলোচনায় অংশ নিয়েছি। তাঁরা সরাসরি নির্বাচন চান, কিন্তু সুনির্দিষ্ট একক কোন প্রস্তাব তাঁরা দিতে পারেন নি। যেখানে তাঁরা প্রস্তাব দিয়েছেন, বেশির ভাগ সংগঠন শুধু সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নির্বাচনের প্রক্রিয়াটা কি হবে সেটা সঠিকভাবে উল্লেখ করেন নি। সেই ব্যাপারে কোন কোন সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব করেছেন যা আমি একটু পরেই উল্লেখ করব। নির্বাচন একটি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী বিজ্ঞান। বিভিন্ন প্রস্তাব এসেছে কিন্তু কিভাবে সরাসরি নির্বাচনটা সংবিধান সম্মত করা হবে, কেউ সেটা সুনির্দিষ্টভাবে বলেন নি এবং আমার পক্ষেও সেটা বলা সম্ভবপর হয় নি। কারণ এটা একটা মেকানিজম। এই মেকানিজমটা এতো সহজ বা সরল নয়। আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ৬০টি আসনের কথা বলেছেন, কেউ বলেছেন ১০০টি, কেউ বলেছেন ১৫০টি, কিন্তু এই ১৫০টি আসনে কিভাবে নির্বাচন হবে, বলেন নি। জনাব কাদের সিদ্দিকীও মহিলাদের জন্য ১৫০টি আসন চান, কিন্তু নির্বাচন কিভাবে হবে তা বলেন নি। আমরা তাকে স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ডাকব, যেখানে we would like to hear your suggesion.

কয়েকটি নারী সংগঠন ও সংস্থা থেকে যে প্রস্তাবগুলি এসেছে তার মধ্যে প্রথম প্রস্তাবটি আমি বলি। সারা দেশকে ৬০টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করতে হবে। তার মানে ৬০টি নির্বাচনী এলাকা হবে। ৩০০টি আসনে গড় জনসংখ্যা হল ৫ লক্ষ আর তার মধ্যে ভোটার আড়াই লক্ষ। এখানে জনসংখ্যা হবে প্রায় ২৫ লক্ষ। ৫টি নির্বাচনী এলাকা মিলে একটি নির্বাচনী এলাকা হবে। আর ভোট সংখ্যা হবে প্রায় ১৩ লক্ষ। এটা কতটুকু বাস্তবসম্মত হবে, কতটুকু সংবিধানসম্মত হবে সেটা আমাদেরকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব এসেছে যে, পালাক্রমে নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করা। By rotation। আজকে দিনাজপুর জেলার অমুক নির্বাচনী এলাকাটা শুধু মহিলাদের জন্য থাকবে, ৫ বছর পর সেই নির্বাচনী এলাকা ঘুরে আরেকটি নির্বাচনী এলাকায় চলে যাবে। এমনকি কাদের সিদ্দিকী সাহেবের এলাকাতেও তাই হতে পারে। এমন একটা সময় আসতে পারে যে, পালাক্রমে নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা গেল কাদের সিদ্দিকী সাহেবের নির্বাচনী এলাকা মহিলা আসন হিসাবে নির্ধারিত হয়ে গেল। এই ব্যবস্থা করলে ভোটাররা আত্মবিশ্বাস পাবেন না, আর যিনি নির্বাচিত হবেন, তিনি জানেন যে আগামী পাঁচ বছর পর তিনি আর সেই নির্বাচনী এলাকায় থাকবেন না, তিনি দাঁড়াতে পারবেন না। সুতরাং সেই নির্বাচনী এলাকার জন্য তাঁরও কোনো কমিটমেন্ট থাকবে না। এটা একটি বাস্তবমুখী প্রস্তাব কিনা সেটাও আমরা বিবেচনা করে দেখেছি। এই দুটো প্রস্তাব সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, সেটাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমরা Article-27, Article-31-এর অধীনে সমান অধিকারের কথা বলি, তাই এই প্রস্তাবগুলি বৈষম্যমূলক হবে কিনা সেটাও আমাদেরকে বিবেচনা করে দেখতে হয়েছে।

তৃতীয় প্রস্তাবটি হল, delimitation -র মাধ্যমে বর্তমান নির্বাচনী এলাকাসমূহকে ক্ষুদ্রাকার করে মোট আসন সংখ্যা আরও ৬০টি বা ১০০টি বাড়িয়ে শুধু মহিলাদের জন্য নির্ধারণ করা। অর্থাৎ চিরজীবন একটি আসনের ভোটাররা শুধু মহিলাদেরকেই নির্বাচন করবে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এতে তাঁদের right of choice under the constitution restricted হবে কিনা? মাননীয় স্পীকার, প্রশ্ন হল এধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে, whether you are taking away the fundamental right of a citizen, his right of choice। কারণ নির্বাচন মানে its a right of choice। একজন ভোটার যাকে খুশি তাকে ভোট দেবেন, তিনি পুরুষ হোক, মহিলা হোক, তাঁর choice-এর সুযোগ থাকতে হবে তাঁর প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করার জন্য।

www.pathagar.com

চতুর্থ প্রস্তাবটি হল, আইন করে রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মনোনয়নদানে বাধ্য করা। এধরনের আইন নেপাল প্রণয়ন করেছে কিন্তু এখন তারা regret করছে, কারণ এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়নি। এই আইন করার ফলে তাদের পার্লামেন্টে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়েনি। যেসকল নির্বাচনী এলাকা দুর্বল, যেখানে জেতার সম্ভাবনা নেই সেখানে রাজনৈতিক দলগুলি বেছে বেছে একজন দুর্বল প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়, একজন মহিলা প্রার্থী দেয়, তার ফলে মহিলাদের যে আশা, যে ambition সেটা পূরণ হওয়ার আর সম্ভাবনা থাকে না। সেই জন্য বাস্তবতার নিরিখে রাজনৈতিক দলগুলির চেষ্টা করতে হবে, সাধারণ নির্বাচনে সরাসরি মহিলাদেরকে আরও বেশি মনোনয়ন দিতে। কিন্তু এটা নির্ভর করবে সে মহিলা সেই এলাকায় জিততে পারবেন কিনা? জেতার তার শক্তি আছে কি না? বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলির জন্য আসন জয় করার বিষয়টি হয় মুখ্য, এটা দেখে মনোনয়নটা ঠিক করা হয়। মাননীয় স্পীকার, এটাও অতি সহজে এখন কার্যকর করা বাস্তবসম্মত বলে আমরা মনে করি না।

বিরোধীদলীয় নেত্রী গত পরশু দিন বলেছেন, নারীদের জন্য সংসদে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। এটা বিরোধীদলের নেত্রী বলেছেন। কিন্তু I am sure she didn't mean it। কারণ মাননীয় স্পীকার, আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে লেখা আছে সরাসরি নির্বাচন হবে ৬০টি আসনে। বিগত সংসদে কিন্তু তাঁরা যখন এই সংসদে ছিলেন তাঁরা একটি বিল এনেছিলেন। সংসদে উত্থাপিত হয়েছিল এবং স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল, তারপর স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট এই সংসদে পেশ করা হয়েছে। আমি একটু আপনাকে পড়ে শুনাই। সংসদের ছাপানো বই।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) বিল, ২০০০ পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ সম্পর্কে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট। এই বিলে তারা কি চেয়েছিলেন? তারা প্রস্তাব করেছিলেন মহিলাদের জন্য ৩০টি আসন থাকবে আর তাঁরা indirectly elected হবেন। আর মেজরিটি পার্টি ৩০টি আসনই পাবে। পুরনো ব্যবস্থাটা আরও ১০ বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব তারা এনেছিলেন। কিন্তু আজকে আবার সরাসরি নির্বাচনের কথা বলছেন। একবার বলছেন ৬০, একবার বলছেন ১০০ সরাসরি আসন আর ক্ষমতায় যখন ছিলেন তখন সেসব ভুলে গিয়ে আগের মত পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ৩০টি আসনের কথা বলছেন। এইখানে হল আওয়ামী লীগের double standard. This double standard is their trade-mark। কোন উন্নত দেশে যদি কোন রাজনৈতিক দলে এ ধরনের double standard বা self-contradiction ধরা পড়তো, তাহলে মিডিয়া এবং সুশীল সমাজ তাদেরকে সমালোচনা করে খণ্ড বিখণ্ড করে দিত। তাদের প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনী বিলটি আমি পড়ি। শুধু একটা সংশোধনী প্রস্তাব করেছিলেন, তা ছিল "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) দফায় উল্লিখিত '১০ বছর কাল' শব্দগুলির পরিবর্তে '২০ বছর কাল' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে।"

তাঁদের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলেন বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। সংসদে পেশ করা তাঁদের রিপোর্টে তিনি বলেছেন:

> প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ এবং প্রধান প্রধান নারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। নারী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে প্রধানত দুটি ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে। একটি হচ্ছে সংসদে মহিলা আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং অপরটি হচ্ছে সরাসরি ভোটে সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন করা। আমরা এ ধারণাগুলি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছি।" "...স্থায়ীভাবে মহিলা আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করলে বা সরাসরি ভোটে মহিলা আসন সংরক্ষিত করা হলে বিপরীত বৈষম্যের reverse discrimination-এর প্রশ্ন উঠতে পারে।"

আমি তাঁর সাথে একমত। এ ধরনের ব্যবস্থা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। তিনি নিজেই reverse discrimination-এর কথা বলেছেন। আমিও বলি, সাধারণ ৫টি আসনের সমতুল্য একটি আসনে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণটা বৈষম্যমূলক হবে। সাধারণ নির্বাচনে আমাকে আড়াই লক্ষ ভোটারের কাছে যেতেই হিমশিম খেতে হয়। আর একজন মহিলাকে বলবেন, আপনাকে ২৫ লক্ষ জনসংখ্যা আর ১৩ লক্ষ ভোটারের কাছে যেতে হবে। তাই সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি তাঁদের সংসদের স্থায়ী কমিটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে এবং সংসদে

www.pathagar.com

নারীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা আগের মতই রাখার প্রস্তাব করেছে। অর্থাৎ আরও দশ বছরের জন্য ৩০টি আসন থাকবে, কোন সরাসরি নির্বাচন থাকবে না, indirect election হবে। আর যাঁরা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাবেন তাঁরা ৩০টি আসনই পেয়ে যাবেন।

মাননীয় স্পীকার, আজকে ১৬ মার্চের ইত্তেফাক দেখুন, বিরোধীদলের নেত্রী বলেছেন, তিনি মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন চান। আমার প্রশ্ন, দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেদিন কেন তিনি এই প্রস্তাব করেন নি? এটা একটা হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মেনিফেস্টোতে বলেছেন ৬০টি আসনের কথা, এখন বলছেন এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১০০টি, আর মাত্র সেদিন যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন প্রস্তাব করেছেন পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ৩০টি আসনের জন্য, যার সবকটাই পাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। এটা double নয় triple standard ছাড়া আর কিছুই নয়। একেই বলে আওয়ামী লীগ।

তারপরও বলব, পার্লামেন্টে আসুন। এসে আলোচনা করুন। প্রস্তাব দিন। আমরা তো এই আইন আজকেই পাস করছি না। এটা স্থায়ী কমিটিতে যাবে। আমরা স্থায়ী কমিটিতে আপনাদের ডাকব। আপনারা সংশোধনী আনুন। আমরা বিবেচনা করব। আমি আওয়ামী লীগকে আবারও জানাতে চাই, আপনারা যদি সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করেন এবং আপনারা যদি মনে করেন যে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল, যদি আপনারা সত্যি নারীদের স্বার্থ রক্ষা করতে চান, তাহলে আপনাদেরকে এইখানে এসে আপনাদের প্রস্তাব দিতে হবে। আমরা অবশ্যই সেটা বিবেচনা করব। আর যদি না আসেন, তাহলে ধরে নেব, আপনারা যে কথা বলছেন, এই কথা মনের কথা নয়। আপনাদের আন্তরিকতা নেই, সদিচ্ছা নেই। এটা বলছেন, শুধু রাজনীতি করার জন্য, দেশ গঠন করার জন্য বলছেন না।

নারীদের ক্ষমতায়নের কথা বলছেন। আওয়ামী লীগ প্রথমে সাড়ে তিন বছর ক্ষমতায় ছিল, এবারে ছিল পাঁচ বছর। এই আওয়ামী লীগ নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য কি করেছে? নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য যদি কেউ কিছু করে থাকে, সেটা বিএনপি করেছে।

বাংলাদেশে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় শহীদ জিয়া স্থাপন করে গেছেন। তিনি মহিলা আসন সংখ্যা ১৫ থেকে বাড়িয়ে ৩০ করেছেন। আওয়ামী লীগ সংবিধান রচনা করেছেন। তখন তাঁরা সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দিলেই পারতেন, আসন সংখ্যা ৫০ করে দিতে পারতেন। ১০০ করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা করেন নি। কারণ, তাঁরা নারী ক্ষমতায়নের ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন না। আজকে নারী শিক্ষার জন্য এই সরকার এবং বিগত বিএনপি সরকার যে অবদান রেখেছে সেজন্য আজকে সারা বিশ্বে আমরা প্রশংসিত হয়েছি। World Bank-এর যে latest report বেরিয়েছে সেটা আমার কাছে আছে। লম্বা রিপোর্ট। সেখানে তারা বলছে যে, এই দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারত-পাকিস্তান-শ্রীলংকার তুলনায় নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ সবচাইতে বেশি বাংলাদেশে হয়েছে। আজকে ৬ শত কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এই সরকার নারীদের শিক্ষার জন্য এবং মহিলাদের সজাগ সচেতন করার জন্য। যদি আমরা আমাদের এই policy pursue করি তাহলে নারী সমাজের সত্যিকার ক্ষমতায়ন এই শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব হবে। আশা করি একদিন কোন সংরক্ষিত আসন রাখারই প্রয়োজন হবে না। আমরা সেই দিন চাই, যেদিন মহিলাদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসনের দরকার হবে না। এটাই হোক আমাদের মূল লক্ষ্য।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে একটি তথ্য জানাতে চাই। এটার ভিত্তি হল United Nations Development Fund for Women's Report (Progress for the Women) 2002, সেখানে বলা হয়েছে বিশ্বের পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্বের গড় হল এখন ১৫.২ অর্থাৎ ১৫ শতাংশ, ২৮ মার্চ, ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত। সবচাইতে উন্নত দেশ যেমন সুইডেন এবং নরওয়েতে পার্লামেন্টে মহিলাদের সংখ্যা বেশি, কিন্তু তারা সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নয়। তারা সরাসরিভাবে নির্বাচিত। সেই দেশগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলির ভিতরে মহিলাদের শক্তি বেশি। সেখানে তারা মূল স্রোতধারার একটি অংশ হয়ে গেছেন। তাঁরা মূল রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের চাপে পড়ে দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়, দল তাঁদের মনোনীত করে। তাঁরা সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। আজকে মোজাম্বিক, সিসিলি, নামিবিয়া, উগান্ডা, তানজানিয়া, সিয়েরালিয়ন—এসব জায়গায় মহিলা

www.pathagar.com

আসন সংরক্ষিত আছে। কিন্তু সরাসরি অথচ সংরক্ষিত এই দৃষ্টান্ত এই উপমহাদেশের কোন দেশে নেই। আমার জানামতে দুনিয়ার অন্য কোথাও নেই। কেউ আমাকে এধরনের দৃষ্টান্ত দেখাতে পারে নি। কোন নজির নেই। আজকে পাকিস্তানে ৬০ জন রাখা হয়েছে, কিন্তু indirect election, সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা নেই। ভারতেও নেই। অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা ৩০০টি আসনে রয়েছে। এই ৩০০টি আসনেই মহিলারা সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বিরোধী দলের নেত্রী নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, আমাদের নেত্রী নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। এখানে আরও ৫-৬ জন সরাসরি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। সুতরাং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা সংবিধানে রয়েছে।

আজকে সেইজন্য আমাদের করণীয় কি হবে? আমি মনে করি নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হলে মহিলাদের রাজনীতির মূল স্রোতধারায় আসতে হবে। তাঁদেরকে পার্টি করতে হবে। দূর থেকে বসে বলবেন যে, আমাদের জন্য সংরক্ষিত আসন চাই, সেটা হবে না। আমরা চাই যে, তাঁরা রাজনীতির মূল স্রোতধারায় আসুন। যাঁরা নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করেন তাঁদেরকে রাজনীতির মূল স্রোত ধারায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, এটা সময় লাগবে। এটা একদিনে, এক বছরে, বা অনেক সময় একযুগে হয় না।

আপনি জানেন, আমেরিকান সিনেটে কতজন মহিলা সদস্য আছেন? ব্রিটিশ হাউজ অব কমনস্-এ কতজন মহিলা সদস্য আছেন? সুতরাং যা কিছু আমরা চিন্তা করি না কেন, সেটা বাস্তবমুখী হতে হবে, সংবিধানসম্মত হতে হবে। বৈষম্যমূলক যাতে না হয় সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। এটা আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার বলে সমালোচনা করা হয় এবং বলা হয়, আমাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে সরাসরি নির্বাচন এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলা আছে। কিন্তু আমরা এখন কেন সরাসরি নির্বাচন দিচ্ছি না। আমি এর উত্তরে বলতে চাই, আমাদের অঙ্গীকার রয়েছে, থাকবে এবং আমাদের এই লক্ষ্য আমরা অর্জন করার চেষ্টা করব। যখনই আমরা মনে করব আমাদের নারী সমাজ মূল রাজনীতির স্রোতধারায় একটা অংশ হিসাবে এসেছে, তখন অবশ্যই এটা আমাদের বিবেচনার বিষয় হবে। তখন হয়তো সংরক্ষিত আসনের আর প্রয়োজনই হবে না।

এছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলি অধিকসংখ্যক মহিলাকে সরাসরি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। There is no bar, every Party can do that। যদি আমরা মনে করি আমাদের দলে একজন মহিলা আছেন, তাঁকে একটা আসনে মনোনয়ন দিলে তিনি জিতে আসবেন, আমরা অবশ্যই তাঁকে মনোনয়ন দেব। আমি আওয়ামী লীগের প্রতি আহ্বান জানাব যে, আপনারাও ভবিষ্যতে অধিক সংখ্যক মহিলাকে মনোনীত করবেন। আমরা তাঁদেরকে এটা করার জন্য আহবান জানাই। আমরাও চেষ্টা করব।

মাননীয় স্পীকার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমাদের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আবার বলছি। মহিলাদের জন্য সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ বিদ্যমান সংবিধানে আছে। আমরা আরও মহিলাদেরকে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি এবং আমরা সকল রাজনৈতিক দলই আরও বেশি সংখ্যক মনোনয়ন দিতে পারি। তারপর আমাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার যে অঙ্গীকার করেছিলাম সেটা আমরা রক্ষা করেছি। আমরা আন্তর্জাতিকমানের ধারাবাহিকতায় আসন সংখ্যা ১৫% করেছি। কিন্তু আমরা আসনগুলি আনুপাতিক হারে বন্টনের ব্যবস্থা করেছি। এটা একটা উন্নতমানের উদার ব্যবস্থা। আমরা ক্ষমতায় আছি। আমাদের শুধু majority নয়, দুই তৃতীয়াংশ majority আছে। আমরা ইচ্ছা করলে, যেই ব্যবস্থা আগে ছিল সেটাই রাখতে পারতাম। ৪৫টি আসনই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে আমরা নিতে পারতাম। কিন্তু আমরা সেটা করি নি। আমরা চেয়েছি বিভিন্ন মতের, বিভিন্ন দলের মহিলারাও পার্লামেন্টে এসে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অংশগ্রহণ করুন। সেইজন্য আমরা এ ব্যবস্থা করেছি। এটা আমাদের শুধু উদারতা নয়, বিশ্বাসের একটি অংশ। সংবিধানের ৪র্থ তফসিলে আমরা দুটো অয়োজন করেছি। একটা হল, আগামী সংসদ যখন বসবে, সেই সংসদ বসার পরে ১০ বছর এই ৪৫টি আসন সংরক্ষিত থাকবে মহিলাদের জন্য, আনুপাতিক হারে তাঁদের নির্বাচন হবে। সেটার জন্য একটা আইন করতে হবে।

www.pathagar.com

কিভাবে নির্বাচনে মহিলারা প্রতিনিধিত্ব করবেন, কিভাবে আনুপাতিক হারে আসন বণ্টন হবে এটা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে। আর দ্বিতীয়টি হল এই সংসদের মেয়াদের বাকি সময়ের জন্য একই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এই বাকি সময়ের জন্য আইনানুযায়ী ৪৫টি মহিলা আসনে আনুপাতিক হারের ভিত্তিতে নির্বাচন হবে। এর ফলে আমরা মহিলা প্রতিনিধিদের এই সংসদেই দেখার সুযোগ পাব। এই বিলটি এখন স্থায়ী কমিটিতে যাবে এবং এটা আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। আমরা আরও আলাপ-আলোচনা করব, আরও মত বিনিময় করব। The door is not closed, I would rather say that the door is wide open। বিচার বিবেচনা করে আরও যদি ভালো পরামর্শ আসে, বিরোধী দল যদি আসে, আলাপ-আলোচনা করে একটি সমঝোতার ভিত্তিতে এই সংশোধনীটি সংসদের বিবেচনার জন্য আনার চেষ্টা করব।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।*

সংসদে উত্থাপিত একটি আইন যে কোন সময় প্রত্যাহার করা যায়

সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ প্রত্যাহার
২৬ এপ্রিল ২০০৪

এই বিলটি যখন সংসদের স্থায়ী কমিটিতে বিবেচনাধীন ছিল তখন সরকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারক, সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্যবর্গ এবং মহাহিসাব নিরীক্ষকের অবসরগ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু যেহেতু এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন ছিল সেই জন্য আর একটি সংশোধনী বিল প্রবর্তন না করে একই বিলে এই বয়স বৃদ্ধির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বর্তমান বিলটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

মাননীয় স্পীকার

আমি এই বিলটি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব উত্থাপনের আগে দুই-একটি কথা আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই।

গত ১৭ মার্চ ২০০৪ সালে আমি এই সংসদে সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) বিল ২০০৪ উত্থাপন করি এবং এই বিলটি সেদিনই আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। এই বিলটিতে আমরা সংবিধানের কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব করেছিলাম। তার মধ্যে আর্টিকেল ৪ ক-তে প্রতিকৃতির বিষয় রয়েছে। আর্টিকেল ৫৯-এ স্থানীয় সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মেয়াদের বিষয় রয়েছে। আদালতের বিভিন্ন আদেশের কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং মেম্বারদের অনেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্বীয় পদে বহাল থেকে যাচ্ছে। এই প্রবণতা বন্ধ করা উচিত। কিন্তু যেহেতু বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী এবং গণতন্ত্রকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চায়, সেইজন্য এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আমরা একটি সংশোধনী এনেছি। এরপর আমরা অনুচ্ছেদ ৬৫তে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার এবং নারী প্রতিনিধিত্ব সংসদে বৃদ্ধি করার জন্য আরও ১০ বছর পর্যন্ত আনুপাতিক হারে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ৪৫টি মহিলা আসন সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর একইভাবে এই সংসদের মেয়াদের বাকি সময়ের জন্য একটি ইন্টেরিম ব্যবস্থা শিডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই সংশোধনী বিল সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর স্থায়ী কমিটিতে যখন বিবেচনাধীন তখন উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির উপর জাতীয়ভাবে আলোচনার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। আমরা স্থায়ী কমিটিতে বেশ কিছুদিন এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য সকল বিরোধীদল সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কমিটির সভাগুলিতে জনাব কাদের সিদ্দিকী এবং জনাব আবদুল মান্নান[১] এই বিল সম্পর্কে, বিশেষ করে মহিলা আসন এবং

---

*বিলটি সেদিনই সংসদে উত্থাপিত।

১. আবদুল মান্নান, বিএনপি, ঢাকা-২

www.pathagar.com

স্পীকারের শপথ গ্রহণের ব্যাপারে কিছু সুপারিশ করেছিলেন। এরকম একটি পর্যায়ে সরকার মনে করেন যে সংবিধানের আরও কিছু সংশোধনীর প্রয়োজন এবং অনুচ্ছেদ ৯৬(১)-এর অধীনে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের অবসরগ্রহণের বয়স ৬৫ থেকে ৬৭, অনুচ্ছেদ ১২৯(১)-এর অধীনে মহাহিসাব নিরীক্ষকের অবসরগ্রহণের বয়স ৬০ থেকে ৬৫, অনুচ্ছেদ ১৩৯-এর অধীনে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের জন্য অবসরগ্রহণের বয়স ৬২ বছর থেকে ৬৫ বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকার মনে করে যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই ৩টি সংশোধনী আনা প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু একটা সংবিধান সংশোধনী বিল ইতোমধ্যে উত্থাপিত হয়ে আছে তাই আমরা নতুন আর একটি সংশোধনী বিল আনা প্রয়োজন বোধ করি নি। কারণ সংবিধান সংশোধনী এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বার বার করা ঠিক নয়, পঞ্চদশ সংশোধনী হিসাবে যদি আর একটি নতুন সংশোধনী আনতাম তাহলে এটা unprecedented হতো যে in the same session we bring two amendments to the constitution। সুতরাং আমার মনে হয় যে আমরা একটি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগের ৫টি সংশোধনীর সঙ্গে এই ৩টি নতুন সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করে পুনর্বিন্যাসিত একটি বিল আমরা উত্থাপন করতে চাই। সেই জন্য for the convenience of passage of the Bill and convenience of amending the constitution আমি এই বিলটি প্রত্যাহার করে নিতে চাই। প্রত্যাহার করার এই প্রস্তাব স্থায়ী কমিটিতে যাবে। স্থায়ী কমিটির অনুমোদনমূলক রিপোর্ট এই হাউজে আবার আসবে। হাউজের অনুমতি নিয়ে আমাকে প্রত্যাহার করার যদি সুযোগ দেন, তারপরে আশা করি ২ দিনের মধ্যে সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধনী) বিল আবার এখানে উত্থাপন করব। আগে যে সংশোধনী এনেছি সেগুলি এবং পরের যে ৩টি সংশোধনী আমরা আনতে চাই এগুলির সবগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিল এক সাথে এই সংসদে উত্থাপন করতে চাই। এই প্রেক্ষাপটে আজকে আমি বর্তমানে যে বিলটি স্থায়ী কমিটিতে বিবেচনাধীন আছে সেটা প্রত্যাহার করবার জন্য প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।*

* সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী সেদিন বিলটি প্রত্যাহার করার অনুমতি পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

সংবিধানে সাধারণত প্রতিকৃতির বিষয়টি উল্লেখ করা হয় না

সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪(চূড়ান্ত)

২৮ এপ্রিল এবং ১৬ মে ২০০৪

সংবিধান চতুর্দশ সংশোধনী বিল প্রত্যাহার করার দুদিন পর অনুচ্ছেদ ৯৬, ১২৯ এবং ১৩৯-এ সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরও তিনটি সংশোধনী সংযোজন করে এই বিলটি পুনরায় উত্থাপন করা হয়।

মাননীয় স্পীকার

আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় সংসদ সদস্য কাদের সিদ্দিকীকেও শুধু ধন্যবাদ জানাই না, তাঁর প্রশংসা করি। এই বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার জন্য তিনি চার ঘণ্টা অপেক্ষা করে ছিলেন। তাঁর ধৈর্যের জন্য আমি মোবারকবাদ জানাই। এটা আমাদের সকলের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এই সংশোধনীর প্রথমে যে ৬টি সংশোধনী আছে, এগুলি আমি ১৭ মার্চে উত্থাপন করেছিলাম। তখনও জনাব কাদের সিদ্দিকী আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন এবং আমি প্রতিটি সংশোধনীর উপরে দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়েছি। তারপরও সংক্ষেপে আবার বলছি। প্রতিকৃতির ব্যাপারে অনুচ্ছেদ "৪ক" আমরা নতুন সংযোজন করেছি। অনুচ্ছেদ ৫৯(১ক) এবং (১খ)তে স্থানীয় সরকারের ব্যাপারে আমরা সংযোজন করেছি যে, একজন ব্যক্তি যেই মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন, সেই মেয়াদ পার হয়ে যাওয়ার পরে তিনি ঐ পদে আর বহাল থাকতে পারবেন না। আমরা যে সংশোধনী এনেছি তাতে স্থানীয় সরকারগুলি আরও সুসংহত হবে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতিকৃতির ব্যাপারে আমি আগে দীর্ঘ বক্তব্য দিয়েছি। কিন্তু আমাদের একটি omission হয়েছিল। সেটা আমরা সংযুক্ত করেছি। আগে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি রাখার ব্যবস্থাটি বাদ পড়ে গিয়েছিল। It was just a genuine omission, এটা আমরা এখন অন্তর্ভুক্ত করেছি। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েও রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি থাকবে। আমি এর আগেও বলেছি এবং আমি আপনাদের সঙ্গে একমত যে, সংবিধানে সাধারণত প্রতিকৃতির বিষয়টি উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই আলোকে আমাদের প্রজন্মের জন্য এ বিষয়টির একটি স্থায়ী সমাধান হওয়া প্রয়োজন। আমরা কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি এখানে স্থাপন বা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করি নি। একটি প্রতিষ্ঠানের—যিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন, তাঁর জন্য, যদি কাদের সিদ্দিকী সাহেব কোনদিন প্রধানমন্ত্রী হন, তাঁর প্রতিকৃতি রক্ষা করার জন্যই আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং রাষ্ট্রপতি যিনিই হোন না কেন, তাঁর প্রতিকৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। এটা আমাদের দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, আমার মনে হয়, একটি সঠিক সিদ্ধান্ত এবং এই প্রশ্নে এই সংশোধনীর মাধ্যমে একটি স্থায়ী সমাধান হবে বলে আমি আশা করি।

অনুচ্ছেদ ৬৫তে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আমরা মহিলা আসনের যে ব্যবস্থা করেছি সেই ব্যাপারে কাদের সিদ্দিকী সাহেব গতবারও তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন।

তিনি নারীদের পক্ষে খুব জোরালো বক্তব্য দিয়েছেন এবং তিনি নারীর ক্ষমতায়নের একজন strong advocate, এটা আমরা জানি। কিন্তু আমরা চাই আমাদের দেশের নারী সমাজ মূল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তাঁদের অধিকার আদায় করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করুক। দলের মধ্যে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করার শক্তি সঞ্চয় করুক যাতে করে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তিনশটি

www.pathagar.com

সরাসরি আসনের যে ব্যবস্থা আছে, সেই সরাসরি আসনে মহিলাদেরকে বেশি মনোনয়ন দিয়ে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যে, একদিন যাতে আমাদের এখানে কোন সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজন না পড়ে। সেই ব্যবস্থাটা আমরা চাই। আমাদেরকে আরও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। আমরা মহিলাদেরকে কোটার মধ্যে রাখতে চাই না। তারপরও আজকে আমরা দুদিক থেকে এই নারী আসনের বেলায় উন্নতি করেছি। একটি হল, আমাদের দেশে আগে ছিল ত্রিশ জন, অর্থাৎ ১০ শতাংশ, সেটাকে আমরা বাড়িয়ে এখন ১৫ শতাংশ করেছি। সারা দুনিয়ার এভারেজ হল—taking all the Parliaments of the world put together, the average is 15.2%। আমরা তাই ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ মহিলা আসনের ব্যবস্থা করেছি।

আরেকটি ভাল কাজ আমরা করেছি। সেটা হল, আগে যে ত্রিশজন মহিলা নির্বাচিত হতেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ত্রিশটি মহিলা আসনই জয় করে নিতে পারতেন কিন্তু আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। তাই আমরা মনে করি যে, বিভিন্ন মতাবলম্বী মহিলাদেরও পার্লামেন্টে আসার সুযোগ করে দেওয়া উচিত। সেই সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যই আজকে আমরা মহিলাদের এই পঁয়তাল্লিশটি আসনে আনুপাতিক হারে নির্বাচন করার ব্যবস্থা করেছি। আমার মনে হয়, এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যাঁদের প্রতিনিধি পার্লামেন্টে থাকবে, তাঁরাও আনুপাতিক হারে তাদের মহিলা নেতৃবৃন্দকে পার্লামেন্টে আসার সুযোগ করে দিতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ ৮২-র সংশোধনীটা অর্থ বিলের বাংলা অনুবাদকে আরও স্বচ্ছ করে দেওয়ার জন্য করা হয়েছে। এটা মৌলিক কোনো পরিবর্তন নয়।

১৪৮ অনুচ্ছেদ-এ স্পীকারের শপথের বিষয়টি সম্পর্কে জনাব কাদের সিদ্দিকী সাজেশনটা দিয়েছেন যে, কার্যপ্রণালী বিধিতে যেভাবে আছে সেভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা দেখার জন্য। গতবার আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলাম এবং আমরা স্থায়ী কমিটিতে তাঁকে দাওয়াত দিয়েছিলাম। তাঁর মতামত আমরা শুনেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি। তবে এর whole idea-টা হল, একটা নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণে কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাতে কোন রকমের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়, সেজন্যই এভাবে বলা হয়েছে। এখন আমাদের দেশের যে বর্তমান অবস্থা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে, সুতরাং রাষ্ট্রপতিকেও সেই সিটিং গভর্নমেন্ট বা বিদায়ী সরকার influence করতে পারে। সেই জন্য আমরা মনে করি যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার relatively একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি। সেই নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছ থেকেই শপথ নেওয়াটা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এবং দেশের সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সংসদ সদস্যদের জন্য আরও বেশি নিরাপদ ও সম্মানজনক হবে।

আর fourth schedule-এ আমরা ১০ বছরের জন্য ৪৫টি মহিলা আসনের ব্যবস্থা করেছি। সেটা আগামী নির্বাচনের পরে সংসদ যেদিন বসবে সেদিন থেকে ১০ বছরের জন্য। আর এই সংসদের বাকি মেয়াদের জন্যও আমরা একই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাই। সেই জন্য এ সরকারের আরও আড়াই বছর এবং পরবর্তী ১০ বছর, মোট সাড়ে বার বছর এই সংসদে নারী সমাজ সংরক্ষিত আসনে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। এই জন্যই আমরা এই ব্যবস্থা করেছি।

নতুন যে তিনটি সংশোধনী আমরা এনেছি সেই ব্যাপারে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব কাদের সিদ্দিকীকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে, বিচারপতিগণের চাকুরীতে বয়স বৃদ্ধিটা আমরা নিজেদের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য করছি না, posterity-র জন্য করছি। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য। এই সুপ্রীম কোর্টকে আরও শক্তিশালী করার জন্য করছি। সুপ্রীম কোর্টের যে দায়-দায়িত্ব আছে, যে কর্তব্য আছে, সেই দায়িত্ব তাঁরা যাতে আরও স্বাধীনভাবে পালন করতে পারেন, সম্মানের সঙ্গে পালন করতে পারেন, সেই জন্যই আমরা এই ব্যবস্থা করেছি। এই ব্যাপারে ৯৬(১) দফায় তাঁদের চাকুরীর বয়স ৬৫ থেকে ৬৭ বছরে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি এই কথাগুলি রেকর্ড করতে চাই। বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সুপ্রীম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এই আদালতের কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে সমাজের সার্বিক ভারসাম্য। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ

www.pathagar.com

ও শেষ আদালত হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা, প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা, নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল, রিভিশন-এর ফলাফল প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার সাংবিধানিক দায়িত্ব হল সুপ্রীম কোর্টের। তাই এই গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ, দক্ষ এবং mature বিচারক। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচার বিভাগকে শক্তিশালী, সুসংহত করা এবং এর স্বাধীনতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার এখন সময়ের দাবি। এছাড়া সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ-এর অধীনে হাইকোর্ট বিভাগের আদি অধিক্ষেত্র অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। একইভবে admiralty মামলাও হাইকোর্ট বিভাগের আদি অধিক্ষেত্রের এখতিয়ারভুক্ত। সুপ্রীম কোর্টের প্রদত্ত রায় অধীনস্থ আদালতসমূহের জন্য বাধ্যতামূলক। অথাৎ সুপ্রীম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে অনেক নতুন আইনের সৃষ্টি হয়।

আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে আপীল বিভাগের ৭ জন বিচারকের মধ্যে ৩ জনই অবসর গ্রহণ করবেন। ২০০৬ সালের মধ্যে একজন ও ২০০৭ সালের মধ্যে আরও একজন অর্থাৎ আগামী এক থেকে সাড়ে তিন বছরের মধ্যে আপীল বিভাগের ৭ জনের মধ্যে ৫ জনই অবসর গ্রহণ করবেন। হাইকোর্ট বিভাগ হতে আগামী ৯ মাসের মধ্যে একজন, ২০০৬ ও ২০০৭ সালের মধ্যে যথাক্রমে ৪ জন ও ৩ জন অর্থাৎ আগামী এক থেকে তিন বছরের মধ্যে মোট ৮ জন বিচারক অবসর গ্রহণ করবেন। এভাবে আগামী ৪ বছরের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের ২৫ জন বিচারক অবসরে যাবেন, যাঁদের মধ্যে আপীল বিভাগের ৬ জন এবং হাইকোর্ট বিভাগের ১৯ জন বিচারক রয়েছেন। এর ফলে সুপ্রীম কোর্টে একটি বিরাট শূন্যতা দেখা দেবে। হাইকোর্ট বিভাগে এখন চারটি রীট বেঞ্চ, তিনটি ডেথ রেফারেন্স বেঞ্চ রয়েছে। এছাড়াও আপীল ও রিভিশন পিটিশন শুনানির জন্য বেঞ্চগুলিতে সিনিয়র বিচারকদের দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয়। কিন্তু আপনাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, বিচারপতিদের বয়স যদি বৃদ্ধি করা না হয়, তাহলে মাত্র ৬-৭ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিচারকরা আপীল বিভাগে বসবেন। আর হাইকোর্টের সিনিয়র বেঞ্চগুলিতে মাত্র ৪-৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিচারকদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমি মনে করি, আমাদের বাংলাদেশের জন্য এটা ক্ষতিকর হবে, সুপ্রীম কোর্টের জন্য ক্ষতিকর হবে, বিচার ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর হবে। সে জন্যই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সুপ্রীম কোর্টের মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করা তথা বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা যেই প্রস্তাব এখানে এনেছি তা গ্রহণ করা উচিত। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ আজীবন দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যুক্তরাজ্যের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। পাকিস্তান এবং ভারতে বিচারকদের দায়িত্ব পালনের বয়সসীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব এখন বিবেচনাধীন। তাই আমি মাননীয় সংসদ-সদস্য বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমরা এটা posterity-র জন্য করছি। আমরা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং উন্নয়নে বিশ্বাস করি। এ প্রেক্ষাপটেই প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি উত্থাপন করা হয়েছে।

মহা হিসাব নিরীক্ষক হল বাংলাদেশের হাজার হাজার কোটি টাকার হিসাব রক্ষক। সরকারী খরচের ক্ষেত্রে আমরা যদি স্বচ্ছতা আনতে চাই, প্রশাসনে যদি স্বচ্ছতা আনতে চাই, সরকারের ব্যয়ের ক্ষেত্রে যদি স্বচ্ছতা আনতে চাই, তাহলে এ অফিসটিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। আর এই অফিসের স্বচ্ছতা, দায়িত্ববোধ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য যিনি এ অফিসে থাকবেন, তাকে অবশ্যই একজন দায়িত্বশীল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে। এটা একটা সাংবিধানিক পদ এবং ১২৯ অনুচ্ছেদের অধীনে এপদে সার্ভিসের শেষ পর্যায়ে যে ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হন তিনি অল্প সময়ের পর ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করে চলে যান। অর্থাৎ কোন ধারাবাহিকতা থাকে না। যিনি এখানে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি যেন অন্তত ৫ বছর অথবা ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেই ধরনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ঠিক একই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক সংস্থা। এদের অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছতার উপর বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রশাসন নির্ভর করছে। কারণ তারাই আমাদের দেশে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের মাধ্যমে প্রশাসনের সমস্ত স্তরে কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হয়। বর্তমান সংবিধানে তাদের চাকুরীর বয়সীমা এখন ৬২ বছর। আমরা সংবিধানের ১৩৯ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ৫ বছরের মেয়াদ অথবা বয়সসীমা ৬৫ বছর পর্যন্ত করার প্রস্তাব করেছি।

www.pathagar.com

আমি মনে করি যে, সংবিধানের এ সংশোধনীগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজন। এ বিলটি আমাদের সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। সংশোধনীগুলি সম্পর্কে বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা যা বলেছেন তা আমরা অবশ্যই বিবেচনা করার সুযোগ পাব। এ বিলটি স্থায়ী কমিটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় সকলের মতামত গ্রহণ করে এটাকে যেন চূড়ান্ত করতে পারি সেই জন্য আপনার কাছে সময় প্রার্থনা করব।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।*

নারী সমাজকে রাজনীতির মূল স্রোতধারায় আসতে হবে, সংরক্ষিত আসনের উপর নির্ভর করলে চলবে না

সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪
১৬ মে ২০০৪

তিনটি অতিরিক্ত সংশোধনী সংযোজন করে এই সংবিধান সংশোধনী বিলটি ২৮ এপ্রিল নতুন করে সংসদে উত্থাপনের পর স্থায়ী কমিটি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জনমত বিবেচনা করে স্থায়ী কমিটি স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত বিধানটি বাতিল করার সুপারিশ করে। স্থায়ী কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিলটি চূড়ান্ত করা হয় এবং সংসদে পেশ করা হয়।

মাননীয় স্পীকার

আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, প্রধান বিরোধীদল আজকে এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীর উপরে আলোচনা করার জন্য বা অংশগ্রহণ করার জন্য এখানে নেই। তাদের আজকে এখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। আমি দেখতে পাচ্ছি জনমত যাচাইয়ের জন্য বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, আলহাজ্ব এডভোকেট মোঃ রহমত আলী, জনাব মোঃ শামসুর রহমান শরীফ, জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদেরের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু আলহাজ্ব মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী তো এখানে আছেন। তিনি কেন কোন বক্তব্য রাখলেন না, তা বুঝতে পারলাম না। কারণ আমি তাঁর নামও দেখতে পাচ্ছি। তিনিও একটি প্রস্তাব রেখেছেন যে, ৩০ জুন তারিখের মধ্যে জনমত যাচাইয়ের জন্য বিলটি প্রচার করা হোক। যাই হোক আমি আজকে বিশেষ করে প্রধান বিরোধী দলের উদ্দেশে বলতে চাই যে, আমরা এই বিলটি প্রথম ৬টি সংশোধনীসহ ১৭ মার্চ ২০০৪ তারিখে সংসদে উপস্থাপন করি। এরপরে এই বিলটি ১৭ মার্চ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত স্থায়ী কমিটিতে ছিল। স্থায়ী কমিটিতে থাকাকালীন, এই আইনটি বিশেষ করে মহিলা আসন সংক্রান্ত, সেইজন্য আমরা একটি সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেছিলাম। কারণ এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী যদি আমরা, সরকারী দল এবং বিরোধীদল, একটি সমঝোতার মাধ্যমে চূড়ান্ত করতে পারতাম তাহলে হয়তো জাতি উপকৃত হতো। স্থায়ী কমিটির তরফ থেকে সমস্ত বিরোধীদলের নেতাদের লিখিতভাবে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনাকে স্থায়ী কমিটির সভাপতি খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ প্রথমে দাওয়াত পাঠান ২১-৩-২০০৪ তারিখে। এই চিঠিতে তিনি লেখেন:

> আলোচ্যসূচীভুক্ত সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) বিল, ২০০৪ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে আপনাকে এবং আপনার মনোনীত দলীয় দুইজন সম্মানিত সংসদ-সদস্যকে উক্ত সভায় উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং সুচিন্তিত মূল্যবান মতামত প্রদান করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এরপরে অন্যান্য সংসদ-সদস্যদের সহ বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনাকে আবার ৫ এপ্রিল ২০০৪ সালে স্থায়ী কমিটির সভাপতি চিঠি লিখেছিলেন, এই চিঠিতেও একই আহবান তাঁকে জানানো হয়েছিল। এরপরে যেহেতু আরও তিনটি সংশোধনী এর সাথে আনতে চেয়েছিলাম, সেজন্য ২৬ এপ্রিল ২০০৪ সালে আগের বিলটি প্রত্যাহার করে নিই। দ্বিতীয় বিলটি অর্থাৎ এখন যে বিলটি consideration-এ এসেছে, এই বিলটি ২৮-৪-২০০৪ তারিখে এই সংসদে উপস্থাপিত হয় এবং স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আবার সমস্ত বিরোধীদলের নেতা ও সংসদ-সদস্যদের এই বিল সম্পর্কিত

* সেদিন বিলটি পুনরায় উত্থাপন করা হয়।

www.pathagar.com

আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিরোধীদলের নেত্রীকে মে মাসের ২ তারিখে লিখিতভাবে এবং মে মাসের ৯ তারিখে আর একবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। অর্থাৎ মোট চারবার বিরোধীদলের নেত্রীকে বিনীতভাবে দাওয়াত দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি সেই স্থায়ী কমিটির সভায় যোগদান করেন নি এবং কোন প্রতিনিধিও পাঠান নি।

আমি মনে করি যেহেতু তাঁরা জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন, কিন্তু আজকে উপস্থিত নেই, সেহেতু এমনও হতে পারে যে এই সংবিধান সংশোধনী সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য রাখার মত তেমন কিছু নেই। তাঁদের যদি বক্তব্য রাখার মত কোন জোরালো যুক্তি এবং মনোবল থাকত, তাহলে আজকে তাঁরা এই সংসদে এসে তাদের বক্তব্য রেখে তাদের মতামত দিতে পারতেন। কিন্তু তা তাঁরা করেন নি। না করার আরও কতগুলি কারণ আছে। এক নম্বর কারণ হল, তাঁরা জানেন, আমরা তাঁদেরকে প্রশ্ন করব যে স্থায়ী কমিটির সভায় আসেননি, এখানে এসে এই বক্তব্যগুলি কেন রাখছেন? এই কথাটি আজকে আমরা তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম।

মূল কারণটি হল এই ব্যাপারে আওয়ামী লীগের একটা বিরাট স্ববিরোধিতা রয়েছে। সেই জন্য তাঁরা এই মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীতে অংশগ্রহণ করতে আসেননি। আওয়ামী লীগের Manifesto-তে তাঁরা বলেছিলেন যে মহিলা আসনের জন্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৬০টি আসন থাকবে। এরপরে যখন আমরা এই বিষয়ে সংশোধনী আনলাম, তখন বিরোধীদলের নেত্রী সংবাদপত্রে statement দিয়ে বলেছেন যে, নারীদের জন্য সংসদে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের Manifesto-তে ৬০ আছে, তিনি ওটা ১০০-তে উন্নীত করেছিলেন।

কিন্তু মাননীয় স্পীকার, এই আওয়ামী লীগই বিগত সরকারের সময় ক্ষমতায় থাকাকালীন একটি সংশোধনী এনেছিল। তাঁরা জানতেন যে, এই সংশোধনী কোনদিন পাস হবে না। কারণ, তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু তারপরও তাঁরা এই সংশোধনী এনেছিলেন। কি এনেছিলেন সেই সংশোধনীতে? তাঁরা সেই সংশোধনীতে আগের যে নিয়ম ছিল—ত্রিশ জন মহিলা সংসদ সদস্য হবেন এবং তাঁরা সকলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য হবেন। অর্থাৎ যে পার্টি মেজরিটি পাবে, ৫১% পাবে, একশ একান্নটি আসন পাবে, তারাই ত্রিশটি আসন পাবে। তাঁদের ওই সংশোধনীতে তাঁরা বলেছেন, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'দশ বৎসরকাল' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে। অর্থাৎ আরও দশ বছরের জন্য তাঁরা ত্রিশটি মহিলা সংরক্ষিত আসন মেজরিটি পার্টিকে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন এবং এই সংশোধনী স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল। স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট এখানে আছে। তাঁদের সেই কমিটির সভায় সরাসরি নির্বাচনের ব্যাপারে মহিলা সংগঠনগুলি যখন দাবি তুলেছিল, তার প্রেক্ষাপটে এই কমিটির সভাপতি হিসাবে বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন, "স্থায়ীভাবে মহিলা আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করলে বা সরাসরি ভোটে মহিলা আসন সংরক্ষিত করা হলে বিপরীত বৈষম্য, reverse discrimination-এর প্রশ্ন উঠতে পারে।" অর্থাৎ তাঁরা মুখে এক কথা বলেছেন কাজে আরেকটা করেছেন। মুখে বলেছেন সরাসরি মহিলাদের ভোটের কথা। এমনকি এক-তৃতীয়াংশ মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের কথাও এখন বলছেন। কিন্তু তাঁরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন, ঠিক তার উল্টো কাজটি করেছেন। এটা typical of Awami League, যাঁদের কথা এবং কাজে কোন মিল নেই। বক্তৃতা, বিবৃতি ও সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনের কথা বলেন। আর নিজেরা যখন বিল তৈরি করেছিলেন সেই বিলে তাঁরা কেন সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে গেলেন না? এই কারণেই মাননীয় স্পীকার, আজকে প্রধান বিরোধী দল এই সংসদে আসেন নি। কারণ, তাঁদের এই স্ববিরোধিতা জাতির সামনে আজকে সুস্পষ্ট। তাই এই সংসদে এসে তাদের বক্তব্য রাখার সাহস তাঁরা খুঁজে পাননি।

আমি ভেবেছিলাম, মাননীয় সংসদ সদস্য বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী আসবেন। তিনি হয় ভেবেছেন যে, প্রশ্নোত্তর হবে, ৭১ বিধি হবে। ভেবেছেন হয়ত আরও সময় লাগবে সেজন্য তাঁরা এখনো উপস্থিত হন নি। আমি ভেবেছিলাম যে, আপনাকে বলব, এটা যদি আপনাদের দিনের কর্মসূচীতে থাকত যে, প্রশ্নোত্তর laid হয়ে যাবে, তাহলে সংসদ সদস্যরা সবাই জানতেন ৭১ বিধি হবে না, তাহলে তাঁরা হয়ত সময়মত আসতেন।

মাননীয় স্পীকার, এই বিলে আমরা ৭টি সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। অর্থাৎ অনুচ্ছেদ-৪, অনুচ্ছেদ-৬৫, অনুচ্ছেদ-৮২, চতুর্থ তফসিল, অনুচ্ছেদ-৯৬, অনুচ্ছেদ-১২৯ এবং অনুচ্ছেদ-১৩৯-এ।

www.pathagar.com

আমাদের প্রথম বিলে অনুচ্ছেদ-৫৯-এর উপর স্থানীয় সরকার সম্পর্কে একটি সংশোধনীর প্রস্তাব ছিল। কিন্তু স্থায়ী কমিটিতে আলাপ-আলোচনা, বিশেষ করে মাননীয় সদস্য বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী এবং জনাব গোলাম কাদেরের সুপারিশ, সুশীল সমাজের মতামত এবং দেশের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর কথা বিবেচনা করে আমরা স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ-৫৯টি স্থায়ী কমিটির সভায় প্রত্যাহার করে নিই। ফলে স্থায়ী কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনুচ্ছেদ-৫৯টি বাদ দিয়ে বাকিগুলি চূড়ান্ত করে এই বিলটি এখন চূড়ান্ত আকারে সংসদে বিবেচনার জন্য আনা হয়েছে। এখানে অনুচ্ছেদ-৬৫ হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার আগে আমি অনুচ্ছেদ-৪ ক সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমরা এখানে প্রতিকৃতি প্রদর্শন সম্পর্কে একটি বিধান করেছি। সাধারণত এ বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে এই বিষয়টির একটি সাংবিধানিক প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বলে আমরা মনে করি। অনেকে মনে করেন একটি নির্বাহী আদেশ দিয়ে একই উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভবপর হতো। কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রতিকৃতির জন্য একটি আইন করার পরও এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর হয় নি। আমাদেরকে সেই আইনটি রহিত করতে হয়েছে। তাই এই সম্পর্কে একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই সংশোধনী আমরা এনেছি। এই সংশোধনী কোন দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আনা হয় নি। এই সংশোধনী আনা হয়েছে আগামী প্রজন্মের জন্য। এই সংশোধনীতে মূলত দেশের রাষ্ট্রপতি যিনি হবেন, তিনি যেই হোক না কেন এবং দেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, সরকারপ্রধান হবেন, তিনি যেই হোক না কেন, শুধু এই দুজনের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং স্পীকারের কার্যালয়ে এবং অন্যান্য সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারপ্রধান হিসাবে শুধু প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার মনে হয় যে, এই সমাধান, এই সংবিধানিক সংশোধনীর ফলে আমাদের দেশে প্রতিকৃতি নিয়ে যে অহেতুক রাজনীতি হয় সেই রাজনীতি বন্ধ হবে এবং জাতি ভবিষ্যতে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে।

মাননীয় স্পীকার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যেসব সংশোধনীগুলি এনেছেন, অথচ এখানে উত্থাপন করেন নি বা আজকে আসেন নি সেগুলির উপর ভিত্তি করেই আমার এই বক্তব্যগুলি রাখছি।

অনুচ্ছেদ-৬৫ হল নারীর ক্ষমতায়ন ও সংসদে মহিলা আসন সংক্রান্ত। ১৯৭২ সালের সংবিধানের মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল অর্থাৎ সংসদের সদস্য সংখ্যার ৫%। শহীদ জিয়া নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৭৮ সালে নারী আসনের সংখ্যা ১৫ থেকে বাড়িয়ে ৩০টি করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ ১০%। এরপর দশম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯০ সালে মেয়াদ আরও ১০ বছর বৃদ্ধি করা হয়।

বিগত সংসদের পর সেই বিধানের পরিসমাপ্তি ঘটে। বর্তমান সংবিধানে মহিলাদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন নেই। বিভিন্ন নারী সংগঠনের প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করেছি। ৩৬টি সেমিনার, কর্মশালা এবং বৈঠকে আমি নিজে অংশগ্রহণ করেছি। বিভিন্ন প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করেছি। আসন সংখ্যা কোন মহিলা সংগঠন ৬০-এ উন্নীত করতে চেয়েছেন, কেউ ৬৪, কেউ ১০০ এমনকি আমাদের বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী তাঁর সংশোধনীতে এখানে ১৫০টি আসন করার প্রস্তাব করেছেন।

সারা দেশকে ৬০টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করার প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করেছি। পালাক্রমে, বাইরোটেশন নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণের বিষয়টিও আমরা বিবেচনা করেছি। মোট আসন সংখ্যার সাথে আরও ৬০টি বা ১০০টি আসন বৃদ্ধি করে শুধু মহিলাদের জন্য নির্ধারণ করা এটাও আমরা বিবেচনা করেছি। আরও বিবেচনা করেছি যে, আইন করে রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মনোনয়ন দানে বাধ্য করা যায় কিনা?

এই ধরনের আইন নেপালে করেছে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। তার কারণ, নেপালের রাজনৈতিক দলগুলি মহিলাদের মনোনয়ন দিয়েছে ঠিকই কিন্তু যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসতে চান সেই রাজনৈতিক দলের নজর ছিল কি করে সীট পাওয়া যায়। সেইজন্য যেই আসনগুলিতে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই আসনগুলিতে মহিলাদেরকে মনোনয়ন দিতে পারেনি। সাধারণত যেই সব আসনে পুরুষ প্রার্থী দুর্বল বা পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, সেই সব আসনে মহিলাদের মনোনয়ন দিয়েছে। যার কারণে সেই আইনের যথার্থতা নেপালের নারী সমাজ ভোগ করতে পারেনি। আজকে বাকি যে প্রস্তাবগুলি রয়েছে তার মধ্যে আছে দেশকে ৬০টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা। তার উত্তরতো মাননীয়

www.pathagar.com

সদস্য শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত তাঁর স্থায়ী কমিটির রিপোর্টে দিয়েছেন যে এটা হবে reverse discrimination। একজন মহিলার জন্য সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচনের সুবিধা রয়েছে, অর্থাৎ ৩০০ আসনে মহিলারা সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু তারপরেও তাঁদের জন্য যদি ৬০টি আসন সংরক্ষিত রেখে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় বা ৩০০ নির্বাচনী এলাকা থেকে আমরা যারা জয়ী হয়ে এসেছি, সেখানে গড়ে হবে আড়াই লক্ষ ভোটার আর ৫ লক্ষ জনসংখ্যা। কিন্তু যদি ৬০টি আসনে বিভক্ত করা হয় তাহলে এক একটি আসনের জন্য মহিলাদেরকে নির্বাচন করতে হবে ২৫ লক্ষ জনসংখ্যার প্রায় ১২/১৩ লক্ষ ভোটারের মাধ্যমে। এটা হবে reverse discrimination। আমার মতে এটা সংবিধানসম্মত হবে না এবং বাস্তবসম্মতও হবে না। আমাদেরকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে নারী সমাজকে রাজনীতির মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে পারি। যেসব দেশের সংসদে মহিলা আসন বেশি আছে সেসব দেশে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে তাঁরা সদস্য হননি। সেখানকার মহিলারা রাজনৈতিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মূল রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। সেজন্য নারী সমাজের সত্যিকারের ক্ষমতায়ন তখনই হবে যখন তাঁরা রাজনীতির মূল স্রোতধারায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আর একমাত্র তখনই তাঁরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

আমি এরই মধ্যে বলেছি যে এই বিষয়ে আওয়ামী লীগ দ্বিমুখী নীতি পালন করেছে। একদিকে তাঁরা সরাসরি নির্বাচনের কথা বলেন, আসন বৃদ্ধির কথা বলেন। কিন্তু অন্যদিকে আমরা দেখেছি, বিগত সরকারের সময়ে সংবিধানের যে সংশোধনী এনেছিলেন সেটাতে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রস্তাব এনেছিলেন। তাঁরা মহিলাদের জন্য ৩০টি আসনই রাখতে চেয়েছিলেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ৩০টি আসনই নিয়ে যাবে, সেই ব্যবস্থা তারা করেছিলেন। আমি মনে করি এটা হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিএনপি এবং চারদলীয় ঐক্যজোটের অবদান অনেক। শহীদ জিয়াউর রহমান মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় করে গেছেন। নারী ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের আসন ১৫ থেকে ৩০-এ উন্নীত করেছিলেন। আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শুধু আসন সংখ্যা ৪৫-এ উন্নীত করেননি, আনুপাতিক হারে আসন বণ্টনের ব্যবস্থা করে একটি উদার গণতন্ত্রমনার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী বিগত বিএনপি সরকারের সময় থেকে নারী শিক্ষার উপরে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। কারণ নারীদের ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তি হল শিক্ষা। যদি নারীদের শিক্ষাদান না করা যায় তাহলে ক্ষমতা দিলেও সে ক্ষমতা তারা ব্যবহার করতে পারবে না। সেই লক্ষ্যে নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন সেই সমস্ত উপাদান আগে নারীদের মধ্যে দিতে হবে। স্কুল-কলেজে উপবৃত্তির যে ব্যবস্থা এখন রয়েছে তার জন্য বর্তমান বজেটে ৬০০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। আজকে প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী স্কুলের এনরোলমেন্ট বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি এবং ছেলেদের চাইতে মেয়েদের সংখ্যার অনুপাত ১০২%। অর্থাৎ স্কুল-কলেজে ছেলেদের চাইতে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য এর চাইতে উত্তম আর কী ব্যবস্থা হতে পারে। এই পরিকল্পনা এবং এই নীতি যদি আমরা অব্যাহত রাখি, বাংলাদেশে এরই মধ্যে যে নারী বিপ্লব ঘটছে, সেটা আরও সুসংঘটিত হবে। ভবিষ্যতে আমরা এমন একটি সংসদ দেখব, যেখানে সাধারণ আসন থেকে নারীরা সরাসরি নির্বাচন করে আরও অধিক সংখ্যায় এই পার্লামেন্টে আসবে।

বৃহৎ রাজনৈতিক দলসমূহের উচিত হবে আরও বেশি করে সাধারণ আসনে মহিলাদেরকে মনোনয়ন দেওয়া এবং তাঁদেরকে মূল রাজনৈতিক সংগঠনে সম্পৃক্ত করা। তাহলেই আমার মনে হয় আমরা নারীর ক্ষমতায়নের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব এবং সেই লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে পারব। আমাদের অঙ্গীকার ছিল আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন। এখন আমরা প্রস্তাব করছি, দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে রাজনৈতিক দলগুলিকে অধিক সংখ্যক মহিলাদেরকে সরাসরি নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে।

নরওয়ে এবং সুইডেনের মত যে সব দেশে মহিলাদের আসন সংখ্যা বেশি আছে পার্লামেন্টে তাদের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত নেই। কিন্তু সেই সব দেশে মহিলারা রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা রাখতে পারে বলে সাধারণ নির্বাচনে তারা নিজেদের পক্ষে অধিক সংখ্যক মনোনয়ন নিতে সক্ষম হয়। দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বাস্তব এবং সংবিধানসম্মত প্রস্তাব আমরা নিয়ে

www.pathagar.com

এসেছি। দুইভাবে আমরা এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করতে পারি। সরাসরি নির্বাচনের সুযোগ তিনশত আসনে রয়ে গেছে। আর আমরা এখন সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি।

সারা পৃথিবীতে যত পার্লামেন্ট আছে, যার সব তথ্য আমার কাছে আছে। পার্লামেন্টে মহিলা সদস্যদের এখন গড় হল ১৫.২%। আমরা ওয়ার্ল্ড এভারেজকে ধরে নিয়ে আসন সংখ্যা ১৫%-এ বৃদ্ধি করেছি। আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যে আমরা মহিলাদের আসন বাড়াব, সেটা আমরা রক্ষা করেছি। আমরা আমাদের অঙ্গীকার থেকে সরে যাই নি। মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার যে পদক্ষেপগুলির কথা আমি বলেছি, আমাদের জোট সরকার এবং আমাদের দল সেই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা রেখে যাবে বলে আমি আশা করি। আমরা আর একটি উন্নতি করেছি। এই সংশোধনী আনার আগে সংবিধানে যে ব্যবস্থা ছিল তাতে মহিলাদের মধ্যে যে মতাদর্শের পার্থক্য থাকে, বা বিভিন্ন মতাবলম্বী মহিলারা থাকেন, তারা সংসদে আসার কোন সুযোগ পেতেন না। আমরা এই ব্যবস্থাকে আরও গণতান্ত্রিক করেছি, উদারতার পরিচয় দিয়েছি। আজকে আওয়ামী লীগ যদি এই প্রস্তাব আনতেন তাঁরা গতবারের মত ৩০টির জায়গায় ৪৫টি নিজেদের জন্য রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। আমরা তা করি নি। আমরা ইচ্ছা করলে এই ৪৫টি মহিলা আসন আমাদের নিজেদের জন্য রাখতে পরতাম। গত ৩০ বছর যে ব্যবস্থা ছিল তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরই ৪৫টি আসন পাওয়ার কথা। কিন্তু আমরা সেটা করি নি। বিরোধীদল আওয়ামী লীগের আজকে এটা appreciate করা উচিত যে, আমরা আমাদের সময়ে সংবিধান পরিবর্তন করে তাদের দলীয় মহিলাদেরকে এই সংসদে আনার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

৩টি নতুন সংশোধনী সংযোজন করে এই বিল এখন আমরা নতুন করে উত্থাপন করেছি। এই ৩টি সংশোধনীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের অবসর গ্রহণর সময়সীমা বৃদ্ধি করা। আমাদের মনে রাখতে হবে, বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে এটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সুপ্রীম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এই আদালতের কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে সমাজের সার্বিক ভারসাম্য। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও শেষ আদালত হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে সংবিধান ব্যাখ্যা, প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা এবং নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল, রিভিশন প্রতিফলিত হয়। একটি দেশে আইনের শাসন সুনিশ্চিত করার সাংবিধানিক দায়িত্ব হচ্ছে সুপ্রীম কোর্টের। তাই এই গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ, দক্ষ এবং পরিপক্ব বিচারকের। সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিচার বিভাগকে শক্তিশালী ও সুসংহত করা এবং এর স্বাধীনতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার সময়ের দাবি। এছাড়া সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২-এর অধীনে হাইকোর্ট বিভাগের আদি অধিক্ষেত্র অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। একইভাবে এডমিরালটি মামলাও হাইকোর্ট বিভাগের আদি অধিক্ষেত্রের এখতিয়ারভুক্ত। সুপ্রীম কোর্টের প্রদত্ত রায় পালন করা অধীনস্থ আদালতসমূহের জন্য বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে নতুন নতুন আইনের নীতিমালা সৃষ্টি হয়।

আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে আপীল বিভাগের ৭ জন বিচারকের মধ্যে ৩ জনই অবসর গ্রহণ করবেন। ২০০৬ সালের মধ্যে একজন ও ২০০৭ সালের মধ্যে আরও একজন অর্থাৎ আগামী এক থেকে সাড়ে তিন বছরের মধ্যে আপীল বিভাগের ৫ জন অবসর গ্রহণ করবেন। হাইকোর্ট বিভাগে আগামী ৯ মাসের মধ্যে ১ জন, ২০০৬ ও ২০০৭ সালের মধ্যে যথাক্রমে ৪ জন ও ৩ জন অর্থাৎ আগামী এক থেকে তিন বছরের মধ্যে মোট আট জন অবসর গ্রহণ করবেন। মাননীয় স্পীকার, এইভাবে আগামী ৪ বছরের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের ২৫ জন বিচারক অবসরে যাবেন, যাঁদের মধ্যে আপীল বিভাগের ৬ জন এবং হাইকোর্টের ১৯জন রয়েছেন। যার ফলে সুপ্রীম কোর্টে একটি বিরাট শূন্যতা দেখা দেবে। হাইকোর্ট বিভাগে এখন চারটি রীট বেঞ্চ, ৩টি ডেথ রেফারেন্স বেঞ্চ, ১টি এডমিরেলিটি কোর্ট এবং ৩টি ফৌজদারী মোশন শোনার বেঞ্চ রয়েছে। এইসব বেঞ্চ ছাড়াও আপীল ও রিভিউ পিটিশনের বেঞ্চগুলি রয়েছে। এইসব বেঞ্চগুলিতে সিনিয়র বিচারকদের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান বিচারকদের বয়স বিবেচনায় দেখা যায় যে, আপীল এবং হাইকোর্ট বিভাগে ৬ বছরের কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিচারকরা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের বিচারকের দায়িত্ব পালন করবেন, যা দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। এই অবস্থার অবসান করা একটি নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকারের কর্তব্য। এখানে উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রে বিচারকরা আমৃত্যু দায়িত্বপালন করে থাকেন। ইংল্যান্ডে ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত এবং আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস, এসব দেশে ৭০ বছর পর্যন্ত বয়সসীমা আছে।

www.pathagar.com

ভারত এবং পাকিস্তানে এই বয়স বৃদ্ধি করার প্রস্তাব এখন বিবেচনাধীন আছে। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় সরকার এই সংশোধনী আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, সুপ্রীম কোর্ট এবং বিচার বিভাগের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য প্রথমে প্রয়াত নেতা শহীদ জিয়াউর রহমানের কথা স্মরণ করতে হয়। আওয়ামী লীগ সরকার যখন ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে দেশে একদলীয় একনায়কত্ব স্বৈরাচারী বাকশালী শাসনব্যবস্থা কায়েম করে বিচার বিভাগকে প্রশাসনের অধস্তন করে দিয়েছিল, সেই দিনগুলির কথা আমরা ভুলি নি। আজকে বিরোধী দল সেজন্যই এই পার্লামেন্টে আসে নি। কারণ গণতন্ত্রের কথা, আইনের শাসনের কথা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা, তাদের মুখে শোভা পায় না বলেই তারা আসে নি। আজকে এই বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য, সংবিধান রক্ষা করার জন্য বিএনপি এবং শহীদ জিয়াকে স্মরণ করতে হবে, যিনি দেশের মানুষকে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং যিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তারপর আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন। দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেছেন। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এবং গণতন্ত্রের জন্য, বিচার বিভাগের জন্য, আমরা যা কিছু করেছি, সবকিছু আমাদের প্রজন্মের জন্য করেছি। একটি প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি সঞ্চয় করার জন্য করেছি যাতে করে দেশের মানুষ আমাদের এই contribution, আমাদের এই অবদানকে স্মরণ করে। এটা হবে বিএনপির সবচাইতে উজ্জ্বল legacy।

গণতন্ত্রের জন্য কোন কাজ করেছে আওয়ামী লীগ সেধরনের একটি দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে না। তাঁরা বক্তৃতা দেন, বিবৃতি দেন, সাংবাদিক সম্মেলন করেন, জনসভা করেন, কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য কী কাজটা করেছেন তার কোন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন না। একটা ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন বিগত সরকারে থাকার সময়, জননিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করেছিলেন এবং সেই আইনের অধীনে বিরোধী দলের ২৬ হাজার নেতাকর্মীর উপর নির্যাতন করে তাদেরকে জেলে পাঠিয়েছিলেন। নির্বাচনের সময় আমরা ওয়াদা করেছিলাম যে, আমরা সেই আইনটি রহিত করব।

আমরা যদি চাইতাম, সেই আইন আমরা রাখতে পারতাম। রেখে সেই আইন আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, সেজন্য আমাদের অঙ্গীকার আমরা রক্ষা করেছি। সেই আইনটি আমরা রহিত করে দিয়েছি। এটা অন্য কোন সরকার করত না। আমরা করেছি এইজন্য যে আমরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করি।

আজকে যারা এই আইনের উপর সংশোধনী এনেছিলেন তাদের অনেকে নেই। এই সংশোধনীগুলি যদি উত্থাপিত হতো তাহলে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাতাম, কিন্তু তারপরও আমার পক্ষে সেই সংশোধনীগুলি গ্রহণ করা সম্ভবপর হতো না।

মাননীয় স্পীকার, আপনি আজকে অনেক উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীকে কার্যপ্রণালী বিধি শিথিল করে কিছু বলার সুযোগ দিয়েছেন, সেজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে একথা বলার প্রয়োজন যে, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী আমাদের স্থায়ী কমিটির সভায় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। সব সময় একটি গঠনমূলক ভূমিকার মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। আমি তাঁকে গভীরভাবে ধন্যবাদ জানাই। আর স্থানীয় সরকার সম্পর্কে ৫৯ অনুচ্ছেদ যেটা আমরা প্রত্যাহার করে নিয়েছি, সেই ব্যাপারে বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, সেটাও বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী এবং সংসদ-সদস্য জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদেরসহ আমাদের দলের অনেক সংসদ সদস্যদের সুপারিশ বিবেচনা করে আমরা শেষ পর্যন্ত এই অনুচ্ছেদটি প্রত্যাহার করি। সেজন্য আমি তাঁদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

আমি এখন আপনার অনুমতি নিয়ে বিলটি পাস করার প্রস্তাবটি উত্থাপন করছি।

ধন্যবাদ মাননীয় স্পীকার।*

* একই দিনে সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে মোট সংসদ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সই করা ভোটে এই সংশোধনী এবং এর ইংরেজী ভাষ্য পাস হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এই হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত তাদের কোন দল নেই, তারা সন্ত্রাসী এবং অপরাধী

সংসদ সদস্য আহসানউল্যাহ্ মাস্টারের হত্যাকাণ্ড

১২ মে ২০০৪

৭ মে ২০০৪ সালে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য, জাতীয় শ্রমিক লীগের কার্যকরী কমিটির সভাপতি জনাব আহসানউল্যাহ্ মাস্টার, তাঁর বাসভবনের সামনে একটি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে তাদের অঙ্গসংগঠন, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন শেষে মঞ্চ থেকে নামার প্রস্তুতিকালে ১০-১২ জন সন্ত্রাসীর ব্রাশফায়ারে নিহত হন। ব্রাশফায়ারের গুলিতে তাঁর বুক ও পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। এই ঘটনায় আরও একজন স্কুলছাত্র নিহত হয়। ঘটনার পর টঙ্গী এলাকার মানুষের মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষোভকারীরা সহিংস হয়ে ওঠে, কলকারখানা বন্ধ করে শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে আসে। স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা টঙ্গী ও গাজীপুরে ট্রেন, বাস ও দোকানপাট ভাংচুর করে এবং বিএনপির কয়েকটি কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করে। এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দল নিন্দা জ্ঞাপন করে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীও কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং সরকার অবিলম্বে এই হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করেন। হত্যাকাণ্ডের সুবিচারের জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আহসানউল্যাহ্ মাস্টার পরপর ২ বার গাজীপুর-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। সরল, সাধারণ প্রকৃতির একজন নিবেদিতপ্রাণ, সংবেদনশীল ও সহমর্মী ব্যক্তি হিসাবে সমাজে তিনি পরিচিত ছিলেন।

সংসদের ঐতিহ্য অনুযায়ী জনাব আহসানউল্যাহ্ মাস্টারের জন্য একটি শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। আলোচনায় সংসদে সকল দলের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মাননীয় স্পীকার

আমাদের সাথী, এ মহান সংসদের সম্মানিত সংসদ-সদস্য আহসানউল্যাহ্ মাস্টারের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে আমরা সকলেই মর্মাহত। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, একজন নিবেদিতপ্রাণ, সৎ ও সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। তিনি একজন সংবেদনশীল, সহমর্মী অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে মানুষের অতি নিকটের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবেও চিনতাম। আজকের এদিনে আমি তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। সংসদে এসে এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমি বিরোধী দলকে স্বাগত জানাই। আমাদের প্রবীণ নেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ তাঁর বক্তব্যের শেষের দিকে যে কথাগুলি বলেছেন, আশা করি আপনাদের এ আশাটা অব্যাহত থাকবে। এ সংসদকে কার্যকর করার জন্য আপনাদের যে ভূমিকা থাকা দরকার সে ভূমিকাটা আপনারা রাখবেন। আর আমাদের তরফ থেকে আপনাদেরকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব।

মাননীয় স্পীকার, আজকে আমাদের দলীয় সংসদ-সদস্যগণ এবং বিরোধী দলের সদস্যগণ যে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সে ব্যাপারে আমাদের একাত্মতা রয়েছে।

এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই—আহসানউল্যাহ্ মাস্টারের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের কোন দল নেই। তারা সন্ত্রাসী, তারা অপরাধী, তারা খুনী। তাদের বিচারের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। আজকে আমাদের অনেকের ইচ্ছা ছিল যে, আমরাও টঙ্গীতে গিয়ে শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের রাষ্ট্রপতি এ ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই শোক প্রকাশ করেছেন, সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। আমাদেরও ইচ্ছা ছিল যাওয়ার, কিন্তু যাওয়ার পরিবেশ ছিল না। আপনি জানেন বিএনপির অনেক অফিস পোড়ানো হয়েছে সেখানে। আমাদের অনেক নেতা-কর্মীকে নিগৃহীত করা হয়েছে এবং এমন একটা ভাব দেখানো হয়েছে যে, বিএনপির কর্মীরাই বা বিএনপি'র সমর্থকরাই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। যখন আপনারা বলেছেন, এই সরকারের মদদে এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে, ঠিক একইভাবে আজকে আমরাও সেই কথা আপনাদেরকে দোষারোপ করে বলতে

www.pathagar.com

পারি। আপনারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি প্রেস নোটের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু যে ঘটনা সেখানে ঘটেছে এবং যে বক্তব্য আপনাদের তরফ থেকে এসেছে, সেটাও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে আমি অন্তত মনে করি না। যাই হোক আমাদের খুব ইচ্ছা ছিল যাওয়ার। কিন্তু তখনকার পরিবেশ এমন ছিল যে আমরা ঠিক জানতাম না, ওখানে গেলে, সমবেদনা জানাতে গেলে, এটার প্রতি স্বাগত জানানো হবে কিনা? সেটাকে একটা সুন্দর মন দিয়ে দেখা হবে কিনা? সেই কারণেই আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেই রকমের পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভবপর হয় নি।

মাননীয় স্পীকার, আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাই যে, এই ব্যাপারে সরকার কোনো আপোস করবে না। যারা সন্ত্রাসী, সে যে কোনো ব্যক্তি হোক, তার তো কোনো দল নেই। সুতরাং তাদের অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদেরকে গ্রেফতার করে, তদন্ত শেষ করে মামলা নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমি এখানে বলতে চাই যে, সরকারের সততা এবং পলিটিক্যাল উইল নিয়ে আপনারা প্রশ্ন তুলবেন না বা সন্দেহ করবেন না। কেননা, এই সনি হত্যা মামলায় আমাদের ছাত্রদলের দু'জন নেতার বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ হয়েছে। আমরা তাদের বিচার হোক এটাই চেয়েছি। আমরা হস্তক্ষেপ করি নি। মহানগরের আমাদের একজন নেতা খাজা হাবিবের ২৭ বছরের সাজা হয়েছে, আমরা হস্তক্ষেপ করি নি। এই সরকার আইনের শাসনের ক্ষেত্রে কোন আপোস করে না। সুতরাং এ ব্যাপারেও আমরা কোন আপোস করব না, এই আশ্বাস আপনাদেরকে দিতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, বিচার বিভাগীয় তদন্ত আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ চেয়েছেন। আপনারা চিন্তা করে দেখুন, seriously চিন্তা করুন। কারণ, বিচার বিভাগীয় তদন্তটা সাধারণত পুলিশ যখন কোন অপরাধ বা গুলি করে বা কোন একটা ঘটনা ঘটায় তখনই বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে কে দোষী তা সাব্যস্ত করে তার একটা finding দেয়। এই বিচার বিভাগীয় তদন্ত যদি করেন তাহলে কী বিষয়ে করবেন? তার terms of reference-টা কী হবে? তিনি কি একজন ম্যাজিস্ট্রেটের role play করবেন? বিচারপতি বা বিচারক যাঁকে নিয়োগ দেওয়া হবে, তাঁর দায়িত্বটা কী হবে? আমি মনে করি বিচার বিভাগীয় তদন্ত এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের বিচারকে অনেক বিলম্বিত করে দেবে। আমাদের তো মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত খুব তাড়াতাড়ি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে, অপরাধীদের চিহ্নিত করে, চার্জশীট দিয়ে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করা। যেদিন এই মামলার চার্জশীট হবে, তার ৭ দিনের মধ্যে এই মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে পাঠিয়ে বিচার করার ব্যবস্থা করা হবে, এই আশ্বাস আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, আজকে আমাদের সামাদ আজাদ সাহেব যদিও বলেছেন, আইনের শাসন নেই, গণতন্ত্র নেই, কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি আমরা যে সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছি, সংবিধান আছে বলেই তো এখানে উপস্থিত হয়েছি। আইনের শাসন আছে বলেই তো এখানে আছি। গণতন্ত্র আছে বলেই তো আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আমাদের যার যার বক্তব্য, মতামত দিতে পারছি। সুতরাং দেশে আইনের শাসন আছে। গণতন্ত্র আছে এবং গণতন্ত্র থাকবে। ইন্‌শাআল্লাহ এই গণতন্ত্র অব্যাহত থাকবে। গণতন্ত্র আরও সুদৃঢ় করা হবে এ ব্যাপারে আপনাকে আমরা নিশ্চিত করতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, সর্বশেষে আমি মরহুম মোঃ আহ্‌সানউল্যাহ্‌ মাস্টারের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। আসুন আমরা সবাই মিলে, দলীয়ভাবে চিন্তা না করে তাঁকে এই সংসদের একজন সংসদ সদস্য, আমাদের একজন বন্ধু এবং সহকর্মী হিসাবে স্মরণ করি। আসুন আমরা সবাই মিলে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করি। আপনারাও সহযোগিতা করুন এবং আপনাদের যে কোন ধরনের সুপারিশ এই ব্যাপারে সরকার অবশ্যই বিবেচনা করবে।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।

www.pathagar.com

ভূমি ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে

দি রেজিস্ট্রেশন (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০৪

৯ জুন এবং ২৮ নভেম্বর ২০০৪

জনসংখ্যার আধিক্য, জমির স্বল্পতা এবং শতাব্দীকালের ঐতিহ্যগত বিধি-বিধান, রীতি-নীতি এবং আইন-কানুনের কারণে বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা খুবই জটিল আকার ধারণ করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রায় প্রতিটি সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনায় সংস্কার আনার চেষ্টা করেছে। ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণ এবং সেই জমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণ, বর্গাদারদের অধিকার সংরক্ষণ, মালিকানায় জমির পরিমাণ সীমিতকরণ, কৃষিশ্রমের মূল্য নির্ধারণ—এধরনের উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু জমির মালিকানা, জমি হস্তান্তর এবং সামগ্রিকভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য বিরাজ করে তার আইনগত সংস্কারের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। ভূমি হস্তান্তর এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে না পারলে ভূমি সংস্কারের কোন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগই সফলতা অর্জন করতে পারবে না। এরই প্রেক্ষাপটে সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান ব্যবস্থায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনার জন্য এই আইন সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। মূল সংশোধনী আনা হয়েছে The Registration Act-এ, আর এই সংশোধনীগুলি কার্যকর করার জন্য The Transfer of Property Act এবং The Specific Relief Act-এর corresponding provisionsগুলির সংশোধন এবং নিবন্ধীকরণের সময়সীমা কমানোর জন্য The Limitation Act-এও সংশোধনী আনা হয়েছে। এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিল একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত বলে একই সময় বিলগুলি উত্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মাননীয় স্পীকার

আমি মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব কাদের সিদ্দিকীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। এই আইনের কিছু কিছু বিষয়ের উপর তিনি সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর যে মূল বক্তব্য, সেটার সাথে আমি একমত। কারণ, জমি সংক্রান্ত যে জটিলতা আমাদের দেশে বিরাজ করছে এবং যে হয়রানি দেশের মানুষকে ভোগ করতে হয়, এ বিষয়ে একটা কিছু করা প্রয়োজন। বর্তমানে যে আইনগুলি আছে সেগুলি প্রায় শত বছরের পুরনো আইন। সুতরাং তিনি যে সমস্যাগুলির কথা বলেছেন, তার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করছি না। আমরা সংশোধনীগুলি এনেছি ঐ সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্যই।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জটিল এবং সেকেলে। সীমিত ভূমি সম্পদের উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, ভূ-সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহার, রেজিস্ট্রেশন, সংরক্ষণ এবং ভূমি সম্পর্কিত গ্রহণযোগ্য রেকর্ড প্রণয়নে নিয়োজিত বিভাগসমূহের কার্য পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা, মালিকানার প্রামাণিক দলিল নিরূপণের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা এবং ভূমি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ও অনিশ্চয়তা, ইত্যাদি বিষয় আমাদের ভূমি ব্যবস্থাপনাকে উত্তরোত্তর আরও জটিল করে তুলেছে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা আজকে চারটি আইন এখানে উপস্থাপন করব। প্রথম আইনের সঙ্গে বাকি তিনটি আইন সম্পৃক্ত। They are more or less consequential and some are corresponding corrections and amendments। কিন্তু এই চারটি আইন শত বছরের পুরনো আইন। রেজিস্ট্রেশন আইন প্রণীত হয় ১৯০৮সালে, ভূমি হস্তান্তর আইন প্রণীত হয় ১৮৮২ সালে, The Specific Relief Act প্রণীত হয় ১৮৮৭ সালে, The Limitation Act আইন প্রণীত হয় ১৯০৮ সালে। এসব আইনের কার্যকারিতার সঙ্গে জড়িত রয়েছে আরও পুরনো আইন দেওয়ানী কার্যবিধি আইন যা প্রণীত হয় ১৯০৮ সালে এবং ফৌজদারী কার্যবিধি আইন ১৮৯৮ সালে।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, আপনি বুঝতেই পারছেন যে, এই আইনগুলি অনেক পুরনো হয়ে গেছে। বর্তমান যুগে এসব আইনের যদি একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে তাহলে আমরা যে সংস্কারের কথা চিন্তা করছি এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি হস্তান্তরের যে নৈরাজ্য এখন বিরাজ করছে, এই নৈরাজ্য দূর করতে সক্ষম হব না। বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকরী ও বেগবান করার জন্য ভূমির মালিক এবং ভূমি ব্যবহারকারীদের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে আইনের সংস্কার এখন সময়ের দাবি। জাল দলিল, একই জমি বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্নভাবে হস্তান্তর, জমি সংক্রান্ত মামলা এবং এই ভূমি জটিলতার কারণে নিরীহ মানুষ সবচাইতে বেশি suffer করে।

এই কারণে বেকারত্ব বাড়ছে, ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়ছে। অনেক পরিবার আছে, যারা ভিক্ষুকে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এই জটিল ব্যবস্থাপনার কারণে। আজ এই জন্যই, যেটা সম্মানিত সংসদ সদস্য জনাব কাদের সিদ্দিকী বলেছেন যে, ভূমিকে কেন্দ্র করে ৮০ শতাংশ সিভিল এবং ক্রিমিনাল মামলা হয়ে থাকে। ৮০ শতাংশ হবে কিনা জানি না, তবে কাছাকাছি নিশ্চয়ই হবে। এই জমি ও জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে দেশে খুন হয় এবং দেশে যে অপরাধগুলি হয়, যে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা হয়, সে ব্যাপারে আপনার নিজেরও বিরাট অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং বর্তমান সরকার মনে করে যে, ভূমি ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে, দেশের মানুষের হয়রানি কমাতে হবে এবং জনগণের কল্যাণের জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে হবে, যুগোপযোগী করতে হবে। এই কারণেই আমরা এই সংশোধনীগুলি এনেছি। তার প্রথম সংশোধনী হল, রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্টের কিছু সংশোধনী। শত বছরের এই আইনটি বর্তমান প্রেক্ষাপট থেকে অনেকাংশে ভিন্ন। বিদ্যমান এই আইনের বিধি-বিধান বর্তমানে অপর্যাপ্ত ও অকার্যকর। সুতরাং সময়ের প্রয়োজনে এই আইনটি অধিক যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে আমরা কিছু সংশোধনী এনেছি।

মাননীয় স্পীকার, রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট, ১৯০৮-এ দেখা যায়, ১০০ টাকার কম মূল্যের স্থাবর সম্পত্তির জন্য রেজিস্ট্রেশন লাগে না। বাংলাদেশে এমন কোন স্থাবর সম্পত্তি আছে, যেটা ১০০ টাকার নিচে প্রমাণ করা যায়? সুতরাং এটা redundant। আমরা এটাকে বাদ দিয়ে দেওয়ার কথা বলেছি। তাই আমরা Section-17-এর, sub-section (1), (2) সংশোধন করেছি।

মাননীয় স্পীকার, জনাব কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, আমরা হেবা দলিল রেজিস্ট্রেশন করার জন্য নিয়ে এসেছি কেন? প্রথমত, এর সাথে ইসলামিক আইনের কোন সংঘর্ষ নেই। হেবা করার অধিকার প্রত্যেকেরই থাকবে। কিন্তু হেবার ফলে যাঁরা সম্পত্তির মালিক হচ্ছেন, তাঁদের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্যই সামান্য একশত টাকা দিয়ে একটা রেজিস্ট্রেশন করা হলে ঐ জমি নিয়ে আর দু'বার, তিন বার, চারবার হেবা হবে না। এখন যেটা আছে মৌখিক হেবা করা, এটার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যখনই এটাকে কেউ কোন ধরনের লিখিত হলফনামা অর্থাৎ দলিলে পরিণত করবেন, দলিলটা সামান্য একশত টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করলে, যাঁরা দলিলের মালিক হবেন বা দলিলের অধীনে beneficiary হবেন, তাঁদের জন্যই মঙ্গলজনক হবে। এর ফলে একই জমি অন্য কাউকে হেবা করলে তা কার্যকর হবে না, সেজন্যই এই ব্যবস্থাটা করা হয়েছে। তবে হেবা রেজিস্ট্রেশনের সময় অন্য কোন ধরনের ফি বা খরচ দিতে হবে না।

মাননীয় স্পীকার, দ্বিতীয়, যেটা বন্ধক বা মর্টগেজ রাখা হয় ব্যাংকে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের কাছে, এই বন্ধকীগুলি আমরা রেজিস্ট্রেশন করতে বলেছি। কেন বলেছি? একই কথা যে, একই দলিল, একই জমি বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ব্যাংকে বন্ধকী হিসাবে দাখিল করা হয় এবং এইভাবে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে একই জমি বন্ধকী দেখিয়ে টাকা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু সেই বন্ধকী যদি রেজিস্ট্রেশন হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয় কোন ব্যাংকে একই জমি রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভবপর হবে না।

তৃতীয়, বাটোয়ারা দলিল। আমাদের দেশে হাজার হাজার মামলা হয়ে যাচ্ছে এই বাটোয়ারা দলিলের উপর। কারণ, এটা রেজিস্ট্রেশন করা হয় না। আমরা সেটা রেজিস্ট্রেশন করার কথা বলেছি।

এরপর আসে বায়না দলিল। মাননীয় স্পীকার, আপনি জানেন, একই জমি পাঁচ বার বায়না করছে, পাঁচ জনের কাছে বায়না করছে। পাঁচ জনের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। এই নৈরাজ্য বন্ধ করা

www.pathagar.com

দরকার। যার কারণে আমরা এই বায়না দলিলও রেজিস্ট্রেশন করার ব্যবস্থা করেছি। আপনি খেয়াল করবেন যে, আমরা এখানে সরকারের রেজিস্ট্রেশন ফী অত্যন্ত সামান্য রেখেছি, কারণ রেজিস্ট্রেশন করার উপর আমরা বেশি জোর দিয়েছি, ফি বা টাকার অঙ্কের উপর নয়।

মাননীয় স্পীকার, হস্তান্তর দলিল সংক্ষিপ্তকরণ। এই যে উনি যেটা বললেন যে, দলিল লেখকদের ব্যাপার। দলিল লেখকরা সবাই দলিল লেখার কাজে নিয়োজিত থাকবেন। কিন্তু আমরা তাদের কাজকে আরও সহজীকরণ করে দিচ্ছি যাতে করে সাধারণ মানুষের সুবিধা হয়। এখন যে style-এ দলিল লেখা হয়, এটা কারেক্ট ফরম্যাট না, এটা কোন স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট না, এটা কোন পরীক্ষিত ফরম্যাট না, একটা সায়েন্টিফিক ফরম্যাট অনুযায়ী এই দলিল যাতে রেজিস্ট্রেশন হয়, দলিল লেখকরা যাতে দলিল সুন্দরভাবে লিখে দিতে পারেন, তারই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা করেছি এবং এখানে আরও কতগুলি requirement include করেছি সেটা হল, খতিয়ান নম্বর দিতে হবে এবং তাদেরকে কতগুলি বৃত্তান্ত দিতে হবে, ২৫ বছর এই জমির মালিক কারা ছিল, তার একটি বৃত্তান্ত দিতে হবে। আমি মনে করি যে দলিল লেখকদের জন্য অনেক সুবিধা হবে এবং অনেক প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য include করার জন্য তারা একটা গাইড লাইন এই আইনের মাধ্যমে পাবে।

মাননীয় স্পীকার, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, দলিল সম্পাদনের ৪ মাসের মধ্যে দলিল রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক ছিল, এটাকে আমরা ৩ মাসে নামিয়ে এনেছি। আর যে বিষয়গুলি এখানে বলা দরকার, সেটা হল, আমি ভেবেছিলাম কাদের সিদ্দিকী সাহেব আমাকে congratulate করবেন বা সরকারকে congratulate করবেন। আমরা তো একটা অনেক পুরনো সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করছি। এই আইনটি trial and error-এর মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপলাভ করবে এবং আমি এটাকে আমাদের সরকারের ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ।*

একই জমি বিভিন্ন ব্যাংকে বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়ার অপকৌশল বন্ধ হবে

The Transfer of Property (Amendment) Act, 2004

মাননীয় স্পীকার

I share the concern of the honourable Member of Parliament। কিন্তু এই concern গুলি দূর করার জন্যই আমাদেরকে কোন না কোন পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের কিছু না করার চেয়ে কিছু করা অনেক ভাল। এটা আমি agree করি যে, হয়তো initial stage-এ এই একশত টাকা একটি অত্যন্ত নগণ্য টাকা হলেও রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে one may face some harassment। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এটাকে দেখতে হবে। জনগণের কল্যাণের জন্য এ কাজটি করা হচ্ছে। যাঁরা এই রেজিস্ট্রেশনের জন্য যাবেন হয়তো প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁদের একটু কষ্ট হতে পারে। কিন্তু যখন সেই নাগরিক এটা realise করবেন যে এটা তার মঙ্গলের জন্য করা হয়েছে তিনি সেটাকে আর mind করবেন না। কারণ it will secure his property almost permanently by way of registration। সেই জন্যই এটা করা। আমি আগেই বলেছি, বায়নার ব্যাপারে আপনি জানেন কত জাল, কত প্রতারণা, back date দিয়ে একই জমি কতবার করে বায়না করছে এবং এই বায়নাপত্রের ব্যাপারে Transfer of Property Act-এ যে provisionটা আছে এই provisionটা আমরা এখানে amend করার জন্য এনেছি। একই জমি বন্ধক রেখে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার অপকৌশল বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জন্য section 53 A থেকে

* এরপর বিলটি কণ্ঠভোটে সংসদে উত্থাপিত হয় এবং স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। একই দিনে এই আইনের অধীনে যে সকল সংশোধনী প্রস্তাব করা হয় সেগুলি কার্যকর করার জন্য Transfer of Property Act and Specific Relief Act-এর corresponding বিভিন্নধারা এবং নিবন্ধীকরণের সময়সীমা কমানোর জন্য প্রস্তাবসহ তিনটি সংশ্লিষ্ট বিল উত্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

53 F পর্যন্ত নতুন provisions করেছি। আর বন্ধকী দলিল Registration-এর জন্য Transfer of Property Act-এ section 59-এর অধীনে বাধ্যতামূলক Registration বিধান করে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব করেছি এবং হেবার ব্যাপারে এই আইনে section 123 এবং 129-এর সংশোধনীগুলি আনা হয়েছে। Registration Act-এর অধীনে যে সব amendment আমরা এনেছি সেগুলিকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য Transfer of Property Act-এ corresponding সংশোধনী আনার জন্য প্রস্তাব এনেছি এবং এখানে হলফনামার একটা ব্যবস্থা করেছি। এই সংশোধনীগুলি কার্যকর করলে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরসহ সামগ্রিকভাবে এদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা আরও স্বচ্ছ এবং দক্ষ হবে।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

একই জমির উপর একাধিক বায়নার কারণে মানুষের হয়রানির শেষ নেই

The Specific Relief (Amendment) Act, 2004

মাননীয় স্পীকার

আমি আবার জনাব কাদের সিদ্দিকীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। I share his concern, কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল, কোন্‌টা ভাল হবে, সেটাই হল কথা। দেশের সাধারণ মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। বায়নার উপর ভিত্তি করে কত মানুষ যে হয়রানির শিকার হচ্ছে, এটা আপনিও ভাল করে জানেন। Ultimately আমি তো বলেছি, যে কোন সংস্কার আনতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে কতগুলি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সাধারণ মানুষের মনে অনেক সন্দেহ দেখা দেয়। কিন্তু এই বিলটি পাস হওয়ার পরে যাঁরা আজকে এটার বেনিফিসিয়ারি হবেন, তাঁরা শোকর আদায় করবেন, তাঁরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করবেন, যে আমরা এই সংস্কারগুলি এনেছি। এর ফলে সাধারণ মানুষের হয়রানি কমে যাবে, মামলার সংখ্যা কমে যাবে, তাদেরকে আদালতে যেতে হবে না, তাঁদের জমি secured থাকবে, তাঁদের টাইটেল secured থাকবে, তাঁদের সম্পত্তি আরও secured হবে। এটি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। সামান্য একটু অসুবিধার কথা আপনি যেটি বলেছেন, সেগুলি আইনের দোষ নয়, মানুষের দোষ। এটা তো সর্বক্ষেত্রে বিরাজ করছে। সুতরাং প্রাথমিকভাবে যেটুকু অসুবিধার সম্মুখীন হবেন, আমার মনে হয় in the larger context the benefit will be much higher than the little trouble a person will suffer at the beginning। কিন্তু মনে মনে সবাই খুশি হবেন। যাঁরা আজকে এই জমি নিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন, যাঁরা একই জমি বার বার হস্তান্তরের কারণে victim হচ্ছেন, আজকে যাঁদের জমির মালিকানা থেকে স্বত্ব চলে যাচ্ছে, তাঁরা এই সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলিকে welcome করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মাননীয় স্পীকার, এই সংস্কারগুলি আনার ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় একটি আমূল পরবর্তন আসবে। ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাননীয় সংসদ-সদস্য কাদের সিদ্দিকী সাহেবের যদি এর চেয়ে আরও উন্নতর কোন সুপারিশ থাকে, তা স্থায়ী কমিটিতে আলোচনাকালে দিলে আমরা অবশ্যই সেগুলি বিবেচনা করে দেখব। আমাদের intention is very genuine। আমরা চাচ্ছি, এই সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য। সুতরাং যদি আরও কোন সুপারিশ থাকে সেগুলি আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করব।

ধন্যবাদ মাননীয় স্পীকার।

১৯০৮ সালে গরুর গাড়ি করে যাতায়াতেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না

The Limitation (Amendment) Act, 2004

মাননীয় স্পীকার

আমি সম্মানিত সংসদ সদস্য জনাব মোঃ গোলাম হাবিব দুলালকে ধন্যবাদ জানাই। অন্তত তিনি নীতিগতভাবে একমত যে, তিন বছর থেকে কমিয়ে আনা দরকার। কিন্তু এক বছরে আনাতে তাঁর

www.pathagar.com

আপত্তি। ১৯০৮ সালে এই আইনটি হয়েছিল। তখন গরুর গাড়ি করে যাতায়াতেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। মানুষ হেঁটে মাইলের পর মাইল যাতায়াত করত। এখন আপনি যদি তুলনা করে দেখেন, আমি তো মনে করি এটা আরও কমানো উচিত। কারণ এখন বাংলাদেশে এমন কোন জায়গা নেই যে, যেখান থেকে রাস্তা দিয়ে ট্রেনে করে বা লঞ্চে করে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করা যায় না। আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। সুতরাং তিন বছর থেকে এক বছর নামানোতে অসুবিধা হওয়ার কোন কারণ নেই। আমি বলি এটা খুব যুক্তিসঙ্গত। আমি তাঁকে সম্মান জানাই কিন্তু তিনি বোধ হয় বলতে চেয়েছেন যে, এক বছরের পরিবর্তে দুই বছর করা উচিত। কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন তখন ছিল ১৯০৮ সাল, প্রায় ১০০ বছর আগের এই আইনে তিন বছর রাখা হয়েছিল, এখন এটাকে কমিয়ে এক বছর করাটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলে আমি মনে করি।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।

(সংসদের স্থায়ী কমিটিতে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাস পর বিলগুলি বিবেচনার সময় নিম্নোক্ত বক্তব্য রাখা হয়)

২৮ নভেম্বর ২০০৪

মাননীয় স্পীকার

আপনাকে ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ জানাই আমার সম্মানিত সংসদ সদস্যদের যাঁরা সংশোধনী এনেছেন। জনমত যাচাইয়ের জন্য তাঁরা যে বক্তব্য রেখেছেন তার প্রতি সম্মান জানিয়ে আমি দু'একটি কথা বলতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, আমরা এই আইনটি পার্লামেন্টে উপস্থাপন করেছি ৯ জুন। আজকে প্রায় পাঁচ মাস হয়ে গেছে। তার আগে প্রায় বছর খানেক যাবত এই আইন সম্পর্কে, এই আইনের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে সংবাদপত্রে এবং সুশীল সমাজে আলোচিত হয়েছে। তারপর এটা মন্ত্রিপরিষদে গেছে এবং মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদন করেছে। পার্লামেন্টে উপস্থাপন করার পর পার্লামেন্টে যে স্থায়ী কমিটি আছে, সে স্থায়ী কমিটিতে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং এখন পাঁচ মাস পরে এই পার্লামেন্টে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আমার মনে হয়, জনমত যাচাইয়ের যে যুক্তি সে যুক্তি তাঁরা দেখাতে পারেন নি। আমি মনে করি যথেষ্ট সময় পাওয়া গেছে দেশের মানুষের এই বিলটি বিবেচনা করার জন্য। জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব আনার অধিকার তাদের আছে কিন্তু আমি বলতে চাই যে জনমত যাচাইয়ের আর কোন প্রয়োজন নেই। তবে তাঁদের বক্তব্যের উত্তর দেওয়াটা আমার কর্তব্য।

মাননীয় স্পীকার, ৯ জুন আমি যখন এই বিলটি উপস্থাপন করি, এই বিলের সঙ্গে আরও তিনটি বিল উত্থাপন করেছি The Transfer of Property (Amendment) Bill, The Specific Relief (Amendment) Bill and The Limitation (Amendment) Bill। তবে মূল সংশোধনী হল The Registration Act-এ। বাকি তিনটি আইনে corresponding provisions গুলিতে সংশোধনী আনতে হবে, সেইজন্য আনা হয়েছে। সুতরাং মূল আইনের মূল সংশোধনী এটাই এবং এটার নীতির উপরে আমি বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছি যেটা আমি আজকে repeat করতে চাই না। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, আপনারা আমাদের দেশের যে সব সমস্যার কথা বলেছেন, সেগুলি দূর করার জন্যই এই সংশোধনী আনা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে জমি ব্যবস্থাপনা এবং জমি হস্তান্তরের বিষয়টি একটি অত্যন্ত জটিল সমস্যা হিসাবে বহুদিন যাবত চিহ্নিত হয়ে আছে। এই সমস্যাটিকে একটি জাতীয় সমস্যা বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। মানুষের মাথাপিছু জমির পরিমাণের স্বল্পতা এবং ব্রিটিশ আমলে প্রণীত পুরনো আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা ধরনের অপব্যবহার এবং পদ্ধতিগত জটিলতা এই সমস্যাটিকে আরও প্রকট করে তুলেছে। ফৌজদারী এবং দেওয়ানী মামলার প্রায় ৭০ ভাগ হল জমি সংক্রান্ত। এই বিষয়ে একটি মন্ত্রিপরিষদ

www.pathagar.com

কমিটি দীর্ঘ এক বছর যাবত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশমালা তৈরি করে। সরকার নীতিগতভাবে এটা অনুমোদন করে। জমি ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তরের বিষয়ে যে সব সুপারিশ মন্ত্রিপরিষদ কমিটি করেছে, সেই সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে Registration Act-এর এই সংশোধনীগুলি আনা হয়েছে। এর ফলে জমি ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা ও দক্ষতা ফিরে আসবে এবং দুর্নীতি ও হয়রানি কমবে। জমি ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর সহজতর করার জন্য এটা একটি ঐতিহাসিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আমি জানি, বিরোধীদলের মাননীয় সংসদ সদস্য যারা বক্তব্য রেখেছেন, বিরোধীদলে আছেন, সেই জন্য বিরোধিতা করেছেন। তবে দুই একজন স্বীকার করেছেন যে, উদ্যোগটা ভাল এবং প্রস্তাবগুলি খারাপ নয়, কিন্তু আরও যাচাই-বাছাই করা দরকার।

মাননীয় স্পীকার, জাল দলিল, বায়নানামা, হেবা এবং জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের দেশে যে প্রতারণা, যে দুর্নীতি হয় এবং যে নৈরাজ্য দেশে আছে, সেগুলিকে দূর করে সহজীকরণ করার জন্য, যারা জমির মালিক বা উত্তরাধিকারী, তাদের অধিকারকে স্বচ্ছ করার জন্য, নিশ্চিত করার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি জানি রেজিস্ট্রেশন অফিসে গেলে অনেক হয়রানি হয়। কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখুন, যখন একটা জমি পাঁচবার বায়নানামা হয়, পাঁচ জনের কাছে বিক্রি করা হয় বা বিক্রি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, এর পরে যখন এর উপর মামলাগুলি হয়, কী অসম্ভব রকমের হয়রানি মানুষের হয়। আমরা সেটা বন্ধ করে দিতে চাই। যদি একবার কেউ এক জমি নিয়ে বায়না করে, সেই বায়নার জমি যাতে অন্য কারও আছে আর বায়না দিতে না পারে বা করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এটা কী দেশের মানুষের জন্য মঙ্গলজনক হবে না? হেবা হয় গ্রামে, আপনারা দরিদ্র মানুষের কথা বলেছেন। এখনও দলিল হচ্ছে, গরিব মানুষ দলিল করছে না? ৬২ শতাংশ লোকজন স্বাক্ষর দিতে পারে বলেছেন। বাকি যারা আছে তারা কি জমি হস্তান্তর করছে না? করছে, টিপসই দিয়ে করছে। কিন্তু আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি, হেবার নামে, এটা মুসলমানদের একটি আইন-আমাদের হেবা করতে দলিলও করতে হয় না কিন্তু আজকাল for security reason—একটা হলফনামা সবাই করে, একটা declaration দেয়, একটা affidavit করে কিন্তু ঐ affidavit-কে বা ঐ declaration-কে আমরা বলছি মাত্র ১০০ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে রাখুন। যাতে করে বেনিফিশিয়ারিরা, হেবার বেনিফিশিয়ারিরা যাতে affected না হয়। আবার যাতে নতুন একটি হেবা একই সম্পত্তি সম্পর্কে যাতে উত্থাপিত না হতে পারে সেই জন্য এটাকে আমরা simplify করার চেষ্টা করেছি।

মাননীয় স্পীকার, ঋণ নেওয়ার জন্য ব্যাংকে জমি mortgage দেওয়া হয়। একজন borrower একই জমি পাঁচটি ব্যাংকে mortgage দিয়ে পাঁচটি লোন নিয়ে নিচ্ছে। এই provision already law-তে আছে। কিন্তু নানা কারণে বাস্তবায়ন হয় না। আমরা অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছি। অর্থাৎ মর্টগেজটি রেজিস্ট্রেশন করতেই হবে। কিন্তু amount অত্যন্ত অল্প। ৫০ লক্ষ টাকার উপরের সম্পত্তি হলেও মাত্র তিন হাজার টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। অত্যন্ত কম। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। এই জন্য যে, ব্যাংকের টাকা মানে জনগণের টাকা। এই defaulter—গণ বা borrower-গণ তারা একই জমি পাঁচটি ব্যাংকে রেখে borrow করছে, এটা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা কি ভাল করিনি আমরা? সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রেই যদি সমালোচনার খাতিরে সমালোচনা করেন সেটা ঠিক নয়।

এখানে কতিপয় উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সংশোধনীগুলি এনেছি। উত্তরাধিকার সূত্রে বাটোয়ারার কথা বলেছেন। বাটোয়ারা উত্তরাধিকারসূত্রে যখন হয়ে যায়, রেজিস্ট্রেশন করে নিলে ভাল হয় না? কারণ আমাদের বাটোয়ারা মামলা আদালতগুলিতে প্রায় ৩০ হাজারের মত আছে। প্রত্যেকটি মামলাই ভাই বোনদের মধ্যে, ভাই ভাইদের মধ্যে, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে। একবার বাটোয়ারা করে তারপর এই বাটোয়ারা মানে না। আর একবার বাটোয়ারা হয়। তারপর আদালতে গিয়ে বলে, এই বাটোয়ারা আমি মানি না। সেজন্য এই পার্টিশন স্যুট হয়। এই স্যুটগুলি কমে যাবে, যদি বাটোয়ারাগুলির রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, সেকশন ৫২ক-এর কথা বলা হয়েছে। সেকশন ৫২ক হল most effective এখানে। দেখেন আমরা খুব simplify করে দিয়েছি। এখন যদি একটি দলিল করতে যান

www.pathagar.com

Transfer এর জন্য, দলিলের মধ্যে কত কিছু যে লেখে তার কোন ইয়ত্তা নেই। আমি আমার নিজের দলিল কোন দিন পড়ে দেখিনি, সেটাতে কি লিখেছে। আমরা একটি ফর্ম করে দেব, যা অত্যন্ত সহজ। একপাতা বা দু'পাতার একটি ফর্ম। এখানে যে সমালোচনা জনাব শহীদ সাহেব[১] করেছেন, তিনি সমালোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তারপরে উত্তর শোনার জন্য যে ধৈর্যের প্রয়োজন হয়, সেই ধৈর্যটি উনি দেখাতে পারেন নি। উত্তর শোনার আগেই চলে গেছেন। কিন্তু তারপরও বলছি জমি নিবন্ধীকরণের জন্য একটি ফর্ম আমরা তৈরি করে দেব। সেই ফর্মের মধ্যে simple জিনিস থাকবে। সেখানে খতিয়ানের দাগ ও খতিয়ান নম্বরটি থাকবে। আর উত্তারধিকারসূত্রে যদি পাওয়া যায় তাহলে লাস্ট খতিয়ান লাগবে। আগের পূর্বপুরুষের খতিয়ান দিলেই চলবে। তারপরে জমির প্রকৃতি। এটা তো আমরা এমনিতেই লিখি। কিন্তু এখন অনেক elaborately লেখা হয়, অনেক নিষ্প্রয়োজন জিনিস উল্লেখ করা হয়। Property-র একটি price দিতে হবে। আর একটি চৌহদ্দি দিতে হবে, একটি বিবরণ ম্যাপ আকারে দিতে হবে। এটা যদি করে, আর দলিলটা যদি একবার রেজিস্ট্রেশন হয় তাহলে ঐ জমি নিয়ে হয়রানি বা জালিয়াতির কোন সুযোগ থাকবে না। এজন্য সেকশন ৫২ক এখানে introduce করেছি।

মাননীয় স্পীকার, রেজিস্ট্রেশন ফি'র ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত মামুলি ফি'র ব্যবস্থা করেছি যা যে কোন জমি হস্তান্তরের জন্য এই আইন পাস হওয়ার পরে বাধ্যতামূলক হবে। কোন সম্পত্তির হস্তান্তর রেজিস্ট্রেশন ছাড়া enforced করা যাবে না। করতে পারেন কিন্তু আপনি Specific Relief Act-এর অধীনে specific performance-এর জন্য আদালতে যেতে পারবেন না। যার জন্য আমরা Transfer of Property Act, Specific Relief Actগুলিতেও এখানে amendment এনেছি। Corresponding amendments এনেছি। ফি'র ব্যাপারে দেখেন।

হেবার ফি মাত্র একশত টাকা। কিন্তু এটা আমরা করছি কাদের জন্য, যারা বেনিফিশিয়ারি হবে— তাঁদের জন্য, যাতে করে হেবা নিয়ে কোন রকমের জাল-জালিয়াতি বা কোন রকমের হয়রানি বা একই সম্পত্তি বিভিন্ন হেবার মাধ্যমে দেওয়ার কারণে মামলা করার মত কর্মকাণ্ড সৃষ্টি না হয়, সে জন্য তা বন্ধ করে দিচ্ছি। অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫ লাখ টাকার নিচে যদি সম্পত্তি হয় তাহলে মাত্র ৫০০ টাকার রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে। আর ৫০ লাখ টাকার নিচে হলে মাত্র ১ হাজার টাকার রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে। আর ৫০ লাখ টাকার উপরে হলে মাত্র ২ হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে। আর হেবার বেলায় আমি বলেছি মাত্র ১০০ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে। হেবার বেলায় প্রভিশন করেছি যে, আর কোন ধরনের কোন ফি দিতে হবে না। রেজিস্ট্রেশন অফিসে নানা ধরনের ফি চার্জ করে কিন্তু হেবার বেলায় বলেছি যে, সে সব চার্জ করা যাবে না। শুধুমাত্র ১০০ টাকা দিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, মর্টগেজ সম্পত্তির জন্য মোট সম্পত্তির ১% কিন্তু তা ৫০০ টাকার উপরে হতে পারবে না। সুতরাং মাত্র ৫০০ টাকা দিতে হচ্ছে। আর যে সব সম্পত্তি where the amount of money is above ৫ লাখ, সেখানে সর্বোচ্চ ২ হাজার টাকা। আর যেখানে ২০ লাখ টাকার উপরে সেখানে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা ফি-এর ব্যবস্থা রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আমি মনে করি যে, এই আইনটি পাস হলে দেশের মানুষের মঙ্গল হবে এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন শৃঙ্খলা ফিরে আসবে, দক্ষতা ফিরে আসবে এবং রেকর্ড রক্ষা করতে অনেক বেশি সুবিধা হবে। আমরা ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণভাবে কম্পিউটারাইজড করার পরিকল্পনা ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছি এবং এর উপরে কাজ করে চলেছি। আমি অনেক ব্যাপারে একমত হওয়া সত্ত্বেও জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখতে পারছি না। আমার মনে হয় না যে, জনমত গ্রহণ করার আর কোন প্রয়োজন আছে।

মাননীয় স্পীকার, মাননীয় সংসদ সদস্য বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী কয়েকটি সংশোধনীর মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী এনেছেন। তিনি যদিও এখানে নেই, কিন্তু এটাকে আমার নিজের সংশোধনী হিসেবে বিবেচনা করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। এই বিলটি কার্যকর করার জন্য যে পয়েন্ট আপনারা উত্থাপন করেছেন যে, পহেলা জানুয়ারি থেকে আইনটা কার্যকর করলে

১. মোঃ আবদুস শহীদ, মৌলভীবাজার-৪ আসনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য।

www.pathagar.com

দেশের মানুষ তা জানবে না। As a matter of fact, আপনারা তো দেখেছেন যে, এটি জুন ম. বিল। সেই জন্য আমরা পহেলা জানুয়ারি কথা বলেছিলাম এবং ৬ মাস সময় দিয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু কয়েক মাস পার হয়ে গেছে অথচ বিলটি পাস করা গেল না, সেই জন্য মাননীয় সদস্য বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী পহেলা মে ২০০৫ সন থেকে এই আইন কার্যকর করার কথা বলেছেন। দফা-১-এ এটা আপনি দেখবেন। কিন্তু আপনারা যদি একমত হন এটাকে পহেলা জুলাই করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে প্রস্তাব আছে মে ২০০৫-এর এবং পহেলা জুলাই কথাটি নেই। সুতরাং আমি পহেলা জুলাই ২০০৫-এর সংশোধনীটি আপনার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করলাম। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বিলের উত্থাপনকারী হিসাবে এই ধরনের সংশোধনী আনার অধিকার আমার রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, We accept it. Let it be decided unanimously that it would be effective from 1st July, 2005। বিরোধীদলের মাননীয় সদস্য জনাব আ খ ম জাহাঙ্গীর চারটা বিলের ব্যাপারে একই ধরনের নোটিশ দেবেন এবং সেগুলি গ্রহণ করলে আমি বাধিত হব। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই, জনাব রহমত আলী সাহেবকে। কারণ উনি যে কথাগুলি বলেছেন, খুব বেশি দ্বিমত করার কিছু নেই। এটা একটি সমস্যা, সামাজিক সমস্যা। এটা আমাদেরকে সবাই মিলে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। আপনার প্রস্তাব অনেক ভাল। কিন্তু আমি গ্রহণ করতে পারছি না এই জন্য যে আপনি বলেছেন, ৬ মাসের জায়গায় ৩ মাস করতে। এটা হলে existing যে সব agreement আছে, তাদেরকে আপনি সময়টা কমিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আমার মনে হয় এটা কম হয়ে যায়। বরং ৬ মাস থাকলে দেশের মানুষ জানবে, existing যে সব agreement রেজিস্ট্রি হয় নি, সেগুলিকে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আমরা একটা লম্বা সময় দিয়েছি ৬ মাস। সুতরাং আপনার প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারলাম না।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ।*

---

*বিলটি সেদিন সংসদে কণ্ঠভোটে পাস হয়। পরের দিন অর্থাৎ ২৯শে নভেম্বর ২০০৪ বাকি তিনটা বিল The Transfer of Property (Amendment) Bill 2004, The Specific Relief (Amendment) Bill 2004 এবং The Limitation (Amendment) Bill, ২০০৪ সংসদে পাস হয়। এই চারটি আইন কার্যকর হয়েছে ১লা জুলাই ২০০৫ সাল থেকে।

www.pathagar.com

বিরোধী দলে যারাই থাকেন তারা সবসময় বাজেটকে "গরিব মারার বাজেট" বলে আখ্যায়িত করেন

২০০৪-২০০৫ সালের বাজেট

২৮ জুন ২০০৪

এই বক্তৃতায় বাজেটের উপর গতানুগতিক আলোচনা না করে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুর উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। সুশাসন, সুবিচার, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য, বাংলাদেশের ভাবমূর্তি, হরতাল কালচার, নারীর ক্ষমতায়ন, দেশের অর্জন, সংসদের কার্যকারিতা, বিরোধী দলের ভূমিকা—এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

মাননীয় স্পীকার

আমি সবকিছুর আগে প্রধান বিরোধী দলকে ধন্যবাদ জানাই। Better late than never. Good that wisdom has dawned on them to return to Parliament. Thank you.

গত কয়েক দিন ধরে বিরোধী দলের যাঁরাই বক্তব্য রেখেছেন, আমি বলব তাঁদের প্রায় সকলেই অত্যন্ত constructive statement করেছেন। সেই জন্য আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই। বিশেষ করে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতে চাই Mr. Nasim[১] was very much unlike Nasim. He has really spoken as a good Parliamentarian। আজকে তাঁর বক্তৃতায় কোন উত্তেজিত স্বর ছিল না। জনাব জাফরউল্যাহ[২], জনাব কিবরিয়া[৩], অধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ, জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ, কর্নেল শওকত আলী প্রত্যেকের বক্তব্যই ভালো লেগেছে। জনাব জলিল সাহেব[৪]ও খুব ভালো বক্তব্য রেখেছেন। They have helped us in pointing out the other side of the budget এবং তাঁদের কিছু কিছু বক্তব্য যে গ্রহণযোগ্য নয়, তাও ঠিক নয়। আমাদের অর্থমন্ত্রী নিশ্চয়ই শুনেছেন এবং খেয়াল রাখবেন।

আজকে আমি অভিনন্দন জানাই আমাদের অর্থমন্ত্রী জনাব মোঃ সাইফুর রহমানকে। গত আড়াই বছরে আমরা অনেকগুলি কঠিন পদক্ষেপ নিয়েছি। আপনারা যে বিধ্বস্ত অর্থনীতি রেখে গিয়েছিলেন, সেটা পুনরুদ্ধার করে সামষ্টিক অর্থনীতিতে আমরা একটি স্থিতিশীলতা এনেছি, এটা আপনারা কেউ আপনাদের বক্তব্যে অস্বীকার করেননি। তবে আপনাদের উচিত ছিল এই বাজেটের প্রশংসা করা। বাংলাদেশ একটি গরিব ও অনুন্নত দেশ হতে পারে। কিন্তু আজকে আমরা একটা example set করেছি। সামষ্টিক অর্থনীতিতে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি। এখন আমাদের কাজ হবে এই Macro-economyর সাফল্যকে তৃণমূল পর্যায়ে trickle down করা এবং এটাই হল এই বাজেটের মূল উদ্দেশ্য। সেইজন্য গরিব জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিবেদিত হয়েছে এই বাজেট। স্বনির্ভরতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটা হবে একটা মাইলফলক। একটি বাস্তবমুখী সংস্কারমূলক বাজেট আজ উপস্থাপন করা হয়েছে।

আজ থেকে ১১ বছর আগে, ১১ জুন ১৯৯৩ সালের *প্রথম আলো* পত্রিকায় আপনারা যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তখনকার বাজেটের উপর সেটা এখানে আছে। বলেছিলেন, "ফাঁকা বুলির বাজেট, গরিব মারার বাজেট, কোন নির্দেশনা নেই।" আজও আপনাদের বক্তব্যে প্রায় একই কথা বলেছেন, "কোন নির্দেশনা নেই," "এটি গরিব মারার বাজেট," "উত্থাপিত বাজেট প্রত্যাখ্যান করছি," *ভোরের কাগজ*, ১১ জুন ২০০৪, পড়ে দেখুন।

---

১. মোহাম্মদ নাসিম, ২. কাজী জাফর উল্যাহ, ৩. শাহ এএমএস কিবরিয়া, ৪. আবদুল জলিল

www.pathagar.com

তবে একটি ব্যাপারে আপনাদেরকে congratulate করি। কারণ, এর আগে যত বাজেট হয়েছে, সব বাজেটের সময় আপনারা হরতালের কর্মসূচী দিয়েছেন। আমি তারিখগুলি দিচ্ছি। ১৯৯২ সালের প্রথম বাজেটে ২১ জুন হরতাল করেছিলেন বাজেটের বিরুদ্ধে। ১৯৯৩ সালে করেছিলেন ২০ ও ২৯ জুন। ১৯৯৪ সালে করেছিলেন ১৪ জুন আর ১৯৯৫ সালে করেছিলেন ২৭ জুন। ২০০২ সালে হরতাল করেছেন ১৬ জুন। ২০০৩ সালে হরতাল করেছেন ২৮ জুন। এইবার বাজেটের বিরুদ্ধে কোন হরতাল করেন নি, অর্থাৎ এই বাজেটের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থে আপনাদের বলার কিছু নেই, I congratulate you for your wisdom and self-realisation। এখন সমালোচনার খাতিরে সমালোচনা করছেন।

এই বক্তৃতায় বাজেটের উপর গতানুগতিক আলোচনা না করে সুশাসন, আইন সংস্কার, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূলের উপর আলোকপাত করতে চাই। বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি, দেশে হরতালের কালচার, নারীদের ক্ষমতায়ন, বাংলাদেশের অর্জন, সংসদের কার্যকারিতা, আওয়ামী লীগের আন্দোলন ও আল্টিমেটাম—এইসব বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করি।

সুশাসনের উপর আপনারা অনেক কটাক্ষ করেছেন। আমি মনে করি যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে কতগুলি pre-condition-এর প্রয়োজন সেগুলি বাংলাদেশে সবই বিরাজ করছে। সুশাসনের প্রথম pre-condition হচ্ছে দেশে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান থাকতে হবে। আমাদের সেটা আছে। নির্বাচিত একটি সরকার আছে, আমাদের একটি সংসদ আছে। এখানে government can be made accountable, transparency of the government can be ensured। পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ দেশে এই ধরনের সংসদ, সংবিধান এবং নির্বাচিত সরকার নেই। আমাদের আছে। We can be proud of it। তারপর আছে স্বাধীন বিচার বিভাগ, a free media, absoulutely free, একটা vigorous প্রাইভেট সেক্টর আছে, active NGO community আছে। সুতরাং all the pre-conditions of good governance are there। চ্যালেঞ্জ হল, এই প্রিকন্ডিশনগুলির কোয়ালিটি improve করতে হবে। সেখানে সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন। এককভাবে সরকারের পক্ষে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য সহজে, কম খরচে, দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনেকগুলি ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। অনেক সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক সংস্কারমূলক কাজ আমরা করেছি। আমরা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম চালু করেছি। ১১ মাসে ২ হাজার ৬ শত ৫৪টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এক একটি মামলা এডিআর-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া মানেই ৫ থেকে ৭ বছর সময় বেঁচে যাওয়া, হয়রানি ও খরচ কমে যাওয়া। আমরা অর্থঋণ আদালত আইন নতুন করে প্রণয়ন করেছি। ১১ মাসে ৭৫৫৮টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। গত ১১ মাসে ৭৯৬ কোটি ব্যাংকের টাকা আদায় হয়েছে আদালতের মাধ্যমে, যেটা গত ১৫ বছরে করা সম্ভবপর হয় নি। দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধন করা হয়েছে। adjournment এবং injunction-এর কারণে delay যাতে কম হয়, মামলা যাতে দ্রুত হয়, তার ব্যবস্থা করেছি। Speedy Trial Court-এ ৩৪৮২টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। Speedy Trial Tribunal-এর ব্যাপারে আপনারা কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন যে, ট্রাইব্যুনালকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

একটা example দিতে পারবেন না। এই আইনকে আমরা রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করি নি। গত দেড় বছরে Speedy Trial Tribunal-এ, ৯টি ট্রাইব্যুনাল মাত্র, ৩৬৯টি মামলা নিষ্পত্তি করেছে। ১৬৯ জন মানুষের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। ৩২৭ জনের ২০ বছরের উর্ধ্বে কারাদণ্ড হয়েছে। মোট ৭৯৮ জন দাগী অপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়েছে। এখানে কোন politics নেই। নাসিম সাহেব আপনি বলেছেন যে, "শেখ মুজিবুর রহমানের আপীলের মামলা হয় না কেন, দ্রুত বিচার আপনি করছেন, এটা কেন করছেন না?" উত্তর হল, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে তো এই মামলা নেই, এটা trial stage-এ নেই, এই মামলা আছে সুপ্রীম কোর্টে। সেখানে সরকারের কোন

www.pathagar.com

ভূমিকা নেই। গত দেড় বছর আপনাদের তরফ থেকে বা যারা এই মামলার পক্ষে বলেন, আপনাদের কেউ সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে এই মামলা শুনানির জন্য আবেদন করেন নি, কোন উদ্যোগ নেন নি। আসলে রাজনৈতিক কারণে আপনারা এই মামলাটি বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই মামলার নিষ্পত্তি আপনারা চান না। এই সরকারের সময় তৃষা হত্যা মামলা যদি ২ মাস ১৪ দিনে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়, যদি এখানে ৩৬৯টি মামলা ১৫ মাসে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, ৫ বছর ক্ষমতায় ছিলেন কেন সেই মামলা নিষ্পত্তি করে যাননি?

মাননীয় স্পীকার, legal aid service-এর কার্যক্রম আমরা অনেক জোরদার করেছি। প্রায় ১২ হাজার গরিব মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধকে লিগ্যাল এইড দেওয়া হয়েছে গত এক বছরে। কারা সংস্কারের কাজ শুরু করেছি। আমরা সবাই জেলখানায় ছিলাম। জেলখানায় যখন থাকি তখন বলি জেলের সংস্কার করতে হবে। জেলখানা থেকে বের হবার পরে যখন we breathe air of freedom তখন আমরা সেটা ভুলে যাই। একজন ব্যক্তি যিনি কোন দিন জেলখানায় ছিলেন না, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, Jail Reform Commission গঠন করেছিলেন, the only man in Bangladesh। আজকে এই কারা সংস্কার করার জন্য আমরা অনেকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছি। Next time-এ যখন আমরা জেলখানায় যাব, আমরা বা আপনারা, পাখা পাবেন, টেলিভিশন পাবেন ইন্‌শাআল্লাহ।

[বাধা প্রদান]

পাখা এবং টেলিভিশন পাবেন আর জেলখানায় বসে টেলিভিশনে সুরঞ্জিত বাবুকে দেখা যাবে, যদি তখন তিনি মুক্ত অবস্থায় থাকেন। এই আড়াই বছরে আমরা ৯৩টি আইন করেছি। ২৫টি আইন করেছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Separation of Judiciaryর ব্যাপারে আমরা এগিয়ে চলেছি। সুপ্রীম কোর্টের Judgement হওয়ার পর আপনারা দেড় বছর ক্ষমতায় ছিলেন, কিন্তু কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। Anti-Corruption Commission করেছি এবং এই অধিবেশনে Criminal Law (Amendment) Act সংশোধনী পাস করার পরে দেশে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হবে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমস্যা আছে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমস্যা নেই। নাসিম সাহেব কালকে admit করেছেন, তিনিও বলেছেন যে সন্ত্রাস দমন এত সহজ নয়। কিন্তু একটা কথা সত্য, there is no god father in this Parliament। আপনাদের সময় অন্তত ৭জন সংসদ সদস্য godfather হিসাবে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আওয়ামী লীগ শাসনামলের অত্যাচার, নির্যাতনের কথা আমি বলতে চাই না, আমি পিছনের দিকে তাকাতে চাই না। তবে একটা ছোট সমীক্ষা দেব। আপনাদের ৫ বছরে প্রতিদিন ১০ জন খুন হয়েছে। প্রতিদিন ৭ জন ধর্ষিত হয়েছে। প্রতিদিন অপহরণ হয়েছে গড়ে ৩ জন, পুরা ৫ বছরে।

[বাধা প্রদান]

এটা government-এর statistics, আমার না। একটা ছবি দেখাতে চাই আপনাদেরকে। *যুগান্তর*, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০০১ তারিখের। আপনাদের একজন সংসদ সদস্য জনাব ইকবাল, হাতে পিস্তল নিয়ে ঢাকার রাজপথে ঘুরছেন। এই যে ছবি দেখুন, deny করতে পারবেন ন। Deny করছেন কেন? এই যে হেডলাইন দেখুন, "এমপি ইকবালের মিছিল থেকে গুলি।" ছবিতে ইকবাল সাহেবকে গোল চিহ্ন দিয়ে focus করা আছে। deny করতে পারবেন না, don't deny this fact, that will only harm your credibility। গত আড়াই বছরে আমাদের বিএনপি'র কোন পর্যায়ের নেতার ছবি পিস্তল হাতে দেখাতে পারবেন না। এইসব কারণে আপনারা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, আপনাদের কোনো গড্‌ফাদার নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেনি।

মাননীয় সদস্য জনাব কিবরিয়া সাহেব এখন নেই, তিনি বলেছেন—বিএনপির সদস্য হলে নাকি মামলা হয় না। তাঁকে জানাতে চাই, সনি হত্যা মামলায় bright girl of the Engineering

www.pathagar.com

University, she was killed in a cross fire। আমাদের ছাত্রদলের দুইজন নেতার ফাঁসির আদেশ হয়েছে সেই মামলায়। আমরা হস্তক্ষেপ করিনি। খাজা হাবিব, আমাদের একজন নেতা, ঢাকার নির্বাচিত কমিশনার, তাঁর ২৭ বছর সাজা হয়েছে, আমরা হস্তক্ষেপ করিনি। Ths is the difference between the Awami League government and this government। আপনারা আরও যদি জানতে চান তাহলে লিস্ট আছে। এই যে এডভোকেট হাবিব মণ্ডল হত্যা মামলা, রুবেল হত্যা মামলা, গেন্ডারিয়ার জোড়া খুনের মামলা, বুশরা হত্যা মামলা, ব্যবসায়ী শিপু হত্যা মামলা, স্কুলছাত্র শিহাব হত্যা মামলা, লতিফুর রহমানের কন্যা শাজনীন হত্যা মামলা, কাজল হত্যা মামলা, সীমা হত্যা মামলা, জিবরান তায়েবী হত্যা মামলা, মোহাম্মদপুরের জোড়া খুনের মামলা, ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবির হত্যা মামলা, সার্জেন্ট আহাদ হত্যা মামলা, লক্ষ্মীপুরের এডভোকেট নুরুল ইসলাম হত্যা মামলা, যুবদল কর্মী মাইকেল হত্যা মামলা, এস আই কনক হত্যা মামলা, পটুয়াখালীর হারুন গাজী হত্যা মামলা, শিল্পপতি আবদুল কাদের হত্যা মামলা, তানিয়া ধর্ষণ হত্যা মামলা, জাসদ নেতা কাজী আরেফ হত্যা মামলা, সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যা মামলা, রানার পত্রিকার সম্পাদক মুকুল হত্যা মামলা, সজল হত্যা মামলা, মুরগী মিলন হত্যা মামলা, খুলনার এস এম রব হত্যা মামলা এবং ডিবি'র সোর্স জালাল হত্যা মামলা—এগুলির সবই প্রায় আপনাদের সময়ের মামলা। আমরা সেই জঞ্জাল দূর করেছি। সেই অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছি এই দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে।

বিরোধীদল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের কথা বলেছেন। চাল, ডাল, লবণ, মরিচের মূল্য মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল আছে যেটা গরিব সাধারণ মানুষের জন্য নিত্যদিনের প্রয়োজন। তবে একটা তুলনামূলক চিত্র দেওয়া দরকার। দেশের মানুষ যাতে ভুলে না যান এবং আপনারাও যাতে ভুলে না যান। দৈনিক পত্রিকা *প্রথম আলো*, ২০ জানুয়ারি ২০০০ থেকে পড়ছি। করলা পূর্বের মূল্য ২০ টাকা, বর্তমান মূল্য হল ১৬ টাকা। আলু ১০ টাকা ছিল, এখন ৮ টাকা। টমেটো ছিল ২৪ টাকা এখন ১৫ থেকে ২০ টাকা।

দৈনিক পত্রিকা *প্রথম আলো*, ৮/৯/২০০০ তারিখ থেকে বলছি। জিরা ছিল ২৫০ টাকা থেকে ২৬০ টাকা, এখন ১৩০ টাকা থেকে ১৪০ টাকা। চিনি ছিল ৩৬ টাকা, এখন ৩০ টাকা। আলু ১২ টাকা, এখন ৮ টাকা। বেগুন ছিল ১৮ টাকা, এখন ১৪ টাকা। পেঁয়াজ ছিল ২৩ থেকে ২৬ টাকা, এখন ২০ টাকা। *ইনকিলাব* ০১/০৮/১৯৯৮ তারিখ থেকে পড়ছি। চাউল ছিল ১৩ থেকে ১৫ টাকা, এখন আছে সাড়ে বার থেকে ১৩ টাকা। এগুলি আপনাদের দেব। আরও পড়ি, wait করেন have patience, এত intolerant হচ্ছেন কেন? This is why you turned this country into a one party system. Because you did not want to tolerate any criticism at that time. Be quiet and don't disturb.

বিরোধী দল ওআইসি'র কথা বলেছেন—ইসলামী উম্মার কথা আপনারা সবাই বলেছেন। হঠাৎ ইসলামী উম্মার জন্য সাংঘাতিক দরদ বেড়ে গেছে আপনাদের। বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আপনাকে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৫(২) পড়ে শুনিয়েছেন। আমিও একটু পড়ে শোনাই। "রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন"। ১৯৭২ সালের সংবিধানে, আপনি যেটা স্বাক্ষর করেন নি, সেই সংবিধানে এটা ছিল না। এই নতুন ম্যান্ডেট শহীদ জিয়াউর রহমান দিয়েছেন এই সংবিধানে। ইসলামী উম্মার কথা আপনারা বলেন। সংবিধানের ফুটনোট পড়লে দেখবেন যে, কোন্ সালে এটা introduced হয়েছে। আপনারা ৭২ সালের সংবিধানে আল্লাহর নামে, ইসলামের নামে মুসলমানদের রাজনৈতিক দল করার অধিকার বন্ধ রেখেছিলেন। গণতন্ত্রের কথা বলছেন। গণতন্ত্র মানে হল সকল মানুষ সকল মত প্রকাশ করার অধিকার পাবে। এটাই হল গণতন্ত্র। আপনারা এটা বন্ধ করে রেখেছিলেন। মুসলমান দেশগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের কোন সম্পর্ক থাকবে না, সেটাই সংবিধানে রেখে গিয়েছিলেন। অনুচ্ছেদ ২৫(২) ফুটনোটসহ ভাল করে পড়ুন। এই বিধান ১৯৭৮ সালে শহীদ জিয়া সংবিধানে সংযোজন করেছিলেন। সুতরাং ইসলামী উম্মার প্রতি আমাদের কর্তব্য ইনশাআল্লাহ আমরা পালন করব। আপনারা কোন চিন্তা করবেন না।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, দুঃখের বিষয় হল, আমরা সকলেই বিদেশে যাই। হার্ভার্ডে যেখানে আমাদের বিরোধীদলের নেত্রী বক্তৃতা করেছেন, সেই একই হলে আমিও একই বছরে বক্তৃতা করেছি। সেখানে শুনলাম বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন। দেশে নির্বাচন হওয়ার পর তিনি নিউইয়র্কেও গিয়েছিলেন। সেখানেও দেশের অনেক বদনাম করেছেন। সংসদকে কার্যকর করতে হবে বলে আপনারা এখন সংসদে এসেছেন। কিন্তু নির্বাচনের পর আট মাস আপনারা এই সংসদে আসেন নি। বিরোধী দলের নেত্রী সারা দুনিয়ায় গিয়েছেন। নিউইয়র্ক, ফ্লোরিডা, ওয়াশিংটন, ভারত, ফ্রান্সে গিয়েছেন। দেশ ও সরকার সম্পর্কে বিরোধীদলীয় নেত্রীর উক্তি "বাংলাদেশে বর্তমানে জোট সরকারের ছত্রছায়ায় তালেবানরা সক্রিয় এবং সরকার তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে।" এই সকল তথ্য এখানে রয়েছে। কিভাবে, কি নগ্ন ভাষায় বিদেশে বাংলাদেশের বেইজ্জতী করেছেন, তাঁর সমস্ত উক্তি এখানে আছে। *জনকণ্ঠ* ছাপিয়েছে ভারতে গিয়ে তিনি আদভানীর সঙ্গে গোপনে বৈঠক করেছেন। বলা হয়েছেঃ

> শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব চেম্বারে শেখ হাসিনার সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আদভানী প্রথমে হাসিনার সফরসঙ্গী সংসদ ও দলীয় নেতাদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন। পরে পৃথকভাবে কথা বলেন বাংলাদেশের বিরোধীদলীয় নেত্রীর সঙ্গে। হাসিনা বা আদভানী দুজনের তরফ থেকে অবশ্য এই একান্ত বৈঠক সম্পর্কে সরাসরি কোন কিছু জানা যায় নি।

প্যারিসে গিয়ে তিনি কি বললেন? "ফ্রান্সের পার্লামেন্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পাস করানোর জন্য বিরোধীদলীয় নেত্রী দাবি করেছেন।" ফ্রান্সে আরও বলেছেন, "বাংলাদেশে এখন প্রতিদিন গড়ে ১০ জন খুন হয়।" ফ্রান্সে কেন বলেন? নিউইয়র্কে কেন বলেন? বাংলাদেশে বলেন। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে যত পারেন আমাদেরকে গালমন্দ করেন। বিদেশে গিয়ে দেশের ভাবমূর্তি কেন নষ্ট করেন?

Finally এই প্রসঙ্গে যেটা বলেত চাই, সেটা আরও দুঃখজনক, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩-এর *ইত্তেফাক* দেখুন। বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিন ওয়ালিক বলেছেন, "বাংলাদেশীরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু।" তিনি ঠিকই বলেছেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের শত্রু নিজেদের মধ্যেই রয়েছে। কেউ আমেরিকায় গিয়ে কংগ্রেসম্যানদের যখন বলেন বাংলাদেশে এটা খারাপ, ওটা খারাপ, তখন তাঁরাও বিশ্বাস করে বসে। এই কংগ্রেসম্যানদের ৮০%-এর কোন পাসপোর্ট নেই। তাঁরা অন্য কোন দেশে যান না। সুতরাং সেখানে গিয়ে যখন নিজের দেশ সম্পর্কে, নিজের জাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেন, তখন অবশ্যই এর একটি false impression হয়। যখন বলা হয় বাংলাদেশ একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র, বাংলাদেশকে কোন সাহায্য দেবেন না, দিলে কোন লাভ হবে না। অথচ দেখেন বাংলাদেশের যদি বেইজ্জত হয়, তার সম্মান নষ্ট হয়, তাহলে আপনারও তো সম্মান নষ্ট হয়। আমাদের শুধু নয়, এটা বাংলাদেশের জন্য সম্মানজনক নয়।

মাননীয় স্পীকার, হরতাল। হরতালের কথা বলি। ৩০ মাসে ৩৩টি হরতাল দিয়েছে। তারপরেও এই অর্থমন্ত্রী প্রবৃদ্ধির হার যেটা নির্ধারণ করেছিলেন, সেটা অর্জিত হয়েছে। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৫ শতাংশ। আপনারা যদি হরতাল না দিতেন, তাহলে এই প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে যেতে পারত এবং বাংলাদেশের অনেক উন্নতি হত। আপনারা এত বাধা দিয়েছেন, কোন ব্যাপারে আপনারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করেননি। তারপরও এদেশের মানুষ, এদেশের শ্রমিক, এদেশের কৃষক, এদেশের ব্যবসায়ীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালায় বিশ্বাস করে কাজ করে তারা প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আপনারা গত বছর জুন মাসে তিনটি হরতাল দিয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন। এক মাসে চারটিও দিয়েছেন।

অথচ দেখুন *ভোরের কাগজ* ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৮ সাল। হেড লাইন করেছে, "আওয়ামী লীগ আর কখনও হরতাল করবে না"। "প্রধানমন্ত্রী ও দলের সভানেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার এক তরফা ঘোষণা।" Wonderful, আমরা তো ভাবলাম, fantastic, এটা তো একটি lesson, একটি

www.pathagar.com

শিক্ষণীয় ব্যাপার হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা unconditional ঘোষণা দিলেন। রিপোর্টে বলা হল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, তার দল "আওয়ামী লীগ কখনও হরতাল ডাকবে না।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে একতরফাভাবে এই ঘোষণা দিচ্ছি।" পারেন তো refuse করেন যে, না এটা আমরা বলিনি, কিন্তু বলেছেন। এখন হয়ত বলবেন যে, আমরা এখন মত বদলেছি। এখন আমাদের হরতাল দিতে হবে, নানা অজুহাত দেখাবেন।

হরতাল করে কোন লাভ হয়নি বরং ক্ষতি হয়েছে অনেক। সোনিয়া গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। তাঁকে হরতাল করতে হয়নি। Listen, এই হরতালের culture এখন নেই। কিবরিয়া সাহেব চলে গেছেন, তিনি মস্ত বড় বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। তাঁরও quotation আছে। 'New Age' 28 June 2003-এ তিনি এক seminar-এ বলেছিলেন The country counts taka 386 crore in losses for every hartal the opposition enforce অর্থাৎ জনাব কিবরিয়ার হিসাব মতে আপনারা এই ৩৩ দিনে হরতাল ডেকে এদেশের জন্য ১২,৭৩৮ কোটি টাকার ক্ষতি করেছেন। এর জবাবদিহি অবশ্যই আপনাদেরকে করতে হবে। শুধু সরকার জবাবদিহি করবে না, বিরোধী দলেরও জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে হরতাল-culture বন্ধ করতে হবে। আপনাদের ঘোষণা ছিল শর্তহীন। এখন শর্ত জুড়েছেন। আপনারা অনেকগুলি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। এটা চলতে পারে না। তবে আমি এটাও বলতে চাই, সাধারণ আইন করে হরতাল বন্ধ করা যাবে না। প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধন করে হরতাল বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিরোধী দল মহিলা আসনের ব্যাপারে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিলের উপর বলেছেন। মহিলা আসনের ব্যাপারে আপনাদের তিন রকমের স্ববিরোধিতা রয়েছে। এটা double standard নয়, triple standard। এটা Awami League-এর chemistry-তে রয়েছে সবকিছুতে double standard। মুখে এক কথা, কাজে আর এক রকম। সুরঞ্জিত বাবু I will quote you now. I have this with me। Your report on মহিলা আসন as the chairman of the Parliamentary Standing Committee। এটা হল আপনার রিপোর্ট, নভেম্বর ২০০০ সাল। আপনি বলেছেন যে, সরাসরি ভোটে মহিলা আসন নির্বাচিত করা হলে বিপরীত বৈষম্যের reverse discrimination-এর প্রশ্ন উঠতে পারে। হ্যাঁ, why did you say this? আপনারা এই বিলে যেটা করেছেন, সেটা ছিল পুরনো যেভাবে ৩০ জন মহিলা সংসদ-সদস্য রাখার ব্যবস্থা ছিল সেটাই থাকবে। আর যারা মেজরিটি পাবে, তারা এই ৩০টা আসন পেয়ে যাবে। এই প্রভিশন করেছেন। কেন এই প্রভিশন করেছেন? এখন কেন ১০০ জন আর ৬০ জনের কথা বলেন? মাননীয় স্পীকার, it is documented, এটা তো এই পার্লামেন্টের দলিল। আমি তো নিজে তৈরি করিনি এটা। তখন আপনারা সরাসরি নির্বাচনের কথা বলেন নি। ১০০ জনের কথা বা ৬০ জনের কথা বলেন নি। আগে যে ৩০ জন ছিল, সেটাকে আপনারা আরও দশ বছরের জন্য বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। This is the law you had placed in the Parliament। আপনাদের মেনিফেস্টোতে আছে ষাটটি আসন হবে সরাসরি নির্বাচনে। আর এবার, আপনাদের নেত্রী বলেছেন, 'Hasina demands hundred reserved seats for women'। তাঁরা মেনিফেস্টোতে রেখেছেন ষাট, আর এখন ডিমান্ড করছেন একশ। কিন্তু পার্লামেন্টে যখন ছিলেন গতবার, তখন কী করেছেন? তখন তো আপনারা জানতেন যে, এই বিল পাস হবে না। তাহলে অন্তত নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কথা প্রমাণ করার জন্য আপনারা ওই ষাটটি সরাসরি আসনের প্রস্তাব কেন করেন নি তখন?

এখন আমি দেশের সার্বিক অবস্থার দিকে আসি। আপনারা শুধু নিরাশার কথা বলেন কিন্তু নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনারা সব সময় মনে করেন যে, বাংলাদেশ বোধ হয় কোনো কিছু অর্জন করে নি। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের অনেক অর্জন আছে। অনেক গর্ব করার বিষয় আছে। যেমন এখন শিক্ষায়, enrollment of school children in primary and

www.pathagar.com

secondary levels is the highest in the developing world। মেয়ে এবং ছেলেদের মধ্যে ratio হল ১০২%। অর্থাৎ ছেলেদের চাইতে মেয়েরা বেশি ভর্তি হচ্ছে। আজকে এটা অর্জিত হয়েছে আমাদের শিক্ষানীতির কারণে। শিক্ষা ছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন অর্জন করা সম্ভব হবে না। সেজন্য আমরা সবচাইতে বেশি জোর দিয়েছি নারী শিক্ষার উপর।

১৯৭২ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৪%। ওটা এখন ১.৫%-এ নেমে এসেছে। যদি আওয়ামী লীগ সরকার বিগত পাঁচ বছর কাজ করতেন, তাহলে আরও নিচে নেমে আসত। কিন্তু তাঁদের সময় পরিবার পরিকল্পনার কোন কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে চালু রাখেন নি। আমাদের দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষ ছিল ৭৮%, আজকে এটা নেমে ৪৮%-এ এসেছে। চার কোটি মানুষ আজকে বড় লোক হয় নি, কিন্তু দারিদ্র্যসীমার নিচে তারা আর বসবাস করে না। অর্থাৎ তারা ভালো আছে। ভালো খাচ্ছে। ভালো স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে। ভালো শিক্ষা পাচ্ছে। জীবন ধারণের নানা সুযোগ সুবিধা বেড়েছে আজকে সেই জন্য এই লেভেলটা কমে গেছে। কিন্তু আমাদের চ্যালেঞ্জ, এখনো প্রায় অর্ধেক মানুষ আমাদের দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে। তাদের জন্য জোরালো ব্যবস্থা নিতে হবে।

তারপর দেখুন expectancy of life। ১৯৭২ সালে গড় আয়ু ছিল ৪৩ বছর। আজকে সেটা বেড়ে হয়েছে ৬২ বছর। ১৯ বছর বেশি বেড়েছে সারা বাংলাদেশের মানুষের বয়স in average এই ৩২ বছরের মধ্যে। এটা কি বাতাসে হয়েছে? এটার জন্য কি কেউ কোন ট্যাবলেট, ইনজেকশন দিয়েছে? এটা সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টার কারণে হয়েছে।

খাদ্য উৎপাদন ৯০ লক্ষ টন ছিল ১৯৭২ সালে। যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, "it is a bottomless basket case," আজকে সেই দেশে আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। ২ কোটি ৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমরা উৎপাদন করেছি এবছর। আমাদের সেনাবাহিনীর ৪৪ হাজার সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করেছে এবং করছে। পৃথিবীর যতগুলি দেশ UN mission-এ কাজ করছে তার মধ্যে বাংলাদেশের সৈন্যসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এছাড়া infant mortality rate বাড়ানো, মহিলাদের fertility rate কমানো, child immunisation এবং গ্রামাঞ্চলে খাওয়ার পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে রয়েছে আমাদের অভূতপূর্ব সাফল্য। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশের এসব সাফল্যকে example হিসাবে cite করা হয়। এজন্য আমি বলতে চাই যে, আমাদের অনেক অর্জন আছে। যেহেতু বিএনপি এবার নিয়ে পাঁচ বার ক্ষমতায় এসেছে এবং এ অর্জনগুলির জন্য সরকার হিসেবে যদি কেউ কৃতিত্বের দাবিদার থাকেন, তবে সেটা বেশি দাবি করতে পারে বিএনপি সরকার।

সংসদের কার্যকারিতা সম্পর্কে বলছি। গত ৩০ মাসের ১৯ মাস আওয়ামী লীগ সংসদ চত্বরে আসেনি, কোন সংসদীয় কমিটি মিটিংয়ে যোগদান করেনি। প্রথম ৮ মাস তো সংসদে আসেই নি। বক্তৃতা, বিবৃতি, মিটিং এবং সংবাদ সম্মেলনে ছাড়া আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের জন্য কোন কাজ করেনি, গণতন্ত্রের জন্য আওয়ামী লীগের কোন অবদান নেই। বরং তারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। আপনারা জননিরাপত্তা আইন করে ২৬ হাজার তৎকালীন বিরোধী দলের নেতাকর্মীকে জেলে পাঠিয়েছিলেন। আর আমরা যখন বলেছি যে, আমরা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল করব, তখন আপনারা বলেছিলেন যে, বিরোধী দলকে দমন করার জন্য এটা করা হয়েছে। আমি আপনাদেরকে নামগুলি পড়ে শুনিয়েছি, কাদেরকে এ আইনে বিচার করা হয়েছে। তবে বোমা মানিক[১] দ্রুত বিচারের বাইরে যেতে পারবে না। কারণ nobody is above law in Bangladesh, এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, Article 67(1) (b)-এর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সংসদ বর্জনের culture আমাদেরকে পরিত্যাগ করতে হবে। সংসদ বর্জনের এ culture বাংলাদেশে আর চলতে দেওয়া যায় না। একজন সংসদ সদস্য নব্বই কার্যদিবস পর্যন্ত সংসদে অনুপস্থিতি থাকতে পারেন। এর মানে হচ্ছে প্রায় দেড় থেকে দু'বছর পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকতে পারে। এটা হতে দেওয়া যায় না।

১. ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে সুনামগঞ্জ-৫ আসনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য মুহিবুর রহমান (মানিক)।

www.pathagar.com

এ জন্য সংবিধান সংশোধন করা দরকার। এটাকে নামিয়ে ৩০ কার্যদিবসে আনা যায় কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। আর কেউ যদি স্পীকারের বিনা অনুমতিতে সংসদ বর্জন করে তাহলে তার বেতন-ভাতা যাতে না পায় তারও চিন্তাভাবনা করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, সবশেষে আমি জনাব জলিল সাহেবকে অভিনন্দন জানাচ্ছি for his famous ulimatum of 30th April। It was a good lesson for Awami League। May be this is one of the reasons why you have realised that জনসমর্থন আপনাদের নেই। সে জন্যই ভেবেছেন সংসদে ফিরে আসাটাই শ্রেয়। জনাব জলিল সাহেব, how can you go back on it? আপনি বলেছেন *New Age* ছাপিয়েছে, "Govt. will collapse by 30th April"। তারপরে বলেছেন আপনার নেত্রী আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। আপনার নেত্রী বলেছেন *ইত্তেফাক*, ২১ এপ্রিল "এটা প্রথম কল, এতেই সরকারের পতন হলে ফাইনাল কল আর লাগবে না," "সময় থাকতে বিদায় নিন", "৩০ এপ্রিলের মধ্যে জনগণকে রেহাই দিন," জলিল সাহেব বলেছেন, "এক ঘণ্টার আন্দোলনে সরকারের পতন হতে পারে।" তারপর দেখুন আরও আছে।

[বাধা প্রদান]।

শোনেন না। এই যে, ৩০ এপ্রিল যখন ঘনিয়ে এলো তখন জলিল সাহেব বললেন "I will play Trump Card in proper time", এটা আছে *আজকের কাগজে* ২১ এপ্রিল। "এখনও ৯/১০ দিন সময় আছে।" finally ২৮ তারিখে বলছেন, "এখনও শেষ কার্ড আমার হাতে।"

মাননীয় স্পীকার আমি বলছি তারা কেন ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, আপনারা স্বপ্নের মধ্যে ছিলেন যে, দেশের সব মানুষ বোধ হয় আপনাদের পক্ষে চলে গেছে। এতো hostile press এবং media, প্রতিদিন খবর বের হচ্ছে সরকার বুঝি আর নেই। প্রত্যেক দিন আপনারা বলেছেন, সরকার বলতে আর কিছু নেই। আর এখন বলেন, "ব্যর্থ রাষ্ট্র।" Please don't say this. Don't say Bangladesh is a failed state। আমাদের সাফল্য অনেক এবং You have also contributed to it। আপনারা ব্যর্থ রাষ্ট্র বলবেন না। ব্যর্থ সরকার বলেন। কিন্তু ব্যর্থ রাষ্ট্র বলবেন না। যারা বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বলেন তারা বাংলাদেশে বিশ্বাস করেন না বলেই ঐ কথাটা বলেন। আল্টিমেটাম দিয়েছিলেন। It will take you a long time to recover from the political blunder you have committed। অনেক সময় লাগবে আপনাদেরকে এটা recover করতে।

মাননীয় স্পীকার, Finally আমি আমার কথা শেষ করতে চাই। সেটা হল if you want a leader for long speeches, long, long, speeches ask the Leader of the Opposition. If you want anything to be done ask our Begum Zia, she will do it for you. It's a government of performance। আসুন আমরা কর্মসূচী এবং performance-এর উপর ভিত্তি করে রাজনীতি করি। তাহলে দেশের জনগণ জানবে যে কার performance কী রকম, কোন্ দলের কী আদর্শ এবং কী লক্ষ্য এটা তারা জানবে। কর্মসূচীভিত্তিক আন্দোলন করুন। হরতাল করবেন না। আসুন সংঘাতের রাজনীতি পরিহার করি। ২০০৭ সালে ইনশাআল্লাহ নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনে মোকাবেলা হবে। কাদের performance এবং কর্মসূচী জনগণ পছন্দ করেছে বেশি, তখন প্রমাণিত হবে, কোন্ দল জনগণের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

সরকারের যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ থেকে দুর্নীতি দমন কমিশনকে মুক্ত রাখতে হবে

ক্রিমিনাল ল এ্যামেন্ডমেন্ট আইন, ২০০৪

৪ এবং ১২ জুলাই ২০০৪

দেশের কতগুলি বিশেষ আইনের অধীনে বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য ১৯৫৮ সালে এই আইনটি প্রণীত হয়। বিশেষ করে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির জন্য এই আইনের অধীনে কিছু শর্ত, পদ্ধতি এবং বিশেষ আদালতের ব্যবস্থা করা হয়। এই সংসদে সদ্য প্রণীত দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের অধীনে মামলাসমূহ এই আইনের আওতায় সম্পন্ন করার বিধান করা হয়েছে। যদিও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি রোধের বিচারকার্য সুষ্ঠু এবং দ্রুত নিষ্পত্তি করাটাই হল ১৯৫৮ সালের আইনের মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু বর্তমান আইনের অধীনে কোন সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনার পূর্বে সরকারের অনুমতি গ্রহণ, সরকার কর্তৃক প্রসিকিউটার নিযুক্ত করা, মামলা প্রত্যাহার করা এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের বিশেষ জজ হিসাবে নিয়োগদানের ক্ষমতাগুলি দুর্নীতি দমন কমিশনকে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিপন্থীমূলক বলে বিবেচনা করা হয়। তাই দুর্নীতি দমন কমিশন যাতে সম্পূর্ণভাবে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য উপরোক্ত সাংঘর্ষিক বিধানসমূহ দূর করার নিমিত্তে এই আইনের সংশোধনী উপস্থাপন করা হয়। কার্যপ্রণালী বিধির ৭৪ ধারা অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সদস্য জনাব রহমত আলী একটি technical point তুলে এই বিলে আপত্তি উত্থাপন করেন এবং এই আপত্তির জবাব দেওয়ার পর সংসদে বিলটি উত্থাপিত হয়।

মাননীয় স্পীকার

এই আইনটিতে আপত্তি জানানোর জন্য সম্মানিত সংসদ সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই। এর ফলে আমারও একটু সুযোগ হয়েছে কিছু বলার।

সমাজে দুর্নীতি দমনের জন্য এই সরকার একটি ঐতিহাসিক আইন প্রণয়ন করেছে যা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন বলে এখন পরিচিত। এই সরকার দুর্নীতি দমন করবে, এই প্রতিশ্রুতি জাতির কাছে দিয়েছিল এবং তারই প্রতিফলন হিসেবে এই আইন আমরা ফেব্রুয়ারি মাসে প্রণয়ন করি। আমি ভেবেছিলাম যে, মাননীয় সংসদ সদস্য এই আইনটাকে স্বাগত জানাবেন। কারণ দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের অধীনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে সব মামলা হবে সেই মামলাগুলির বিচার হবে Criminal Law Amendment Act-এর under-এ। কিন্তু এই আইনে কতগুলি বিধান আছে যেগুলি দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবে না। সে জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে সেই প্রতিষ্ঠানটি যাতে স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারে, সে জন্যই এ আইনের সংশোধনীগুলি আনা হয়েছে।

এ প্রতিষ্ঠানটিকে আরও নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী করার জন্য চারটি বিষয়ে আমরা সংশোধনী এনেছি। যেমন—বিশেষ বিচারকের দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করা হবে। কিন্তু সেখানে আইনে বলা আছে যে, একজন ম্যাজিস্ট্রেটও বিশেষ বিচারক হতে পারবেন।

কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটরা এখনো সরকারের প্রশাসনিক আওতায় কাজ করেন। সে জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে বিশেষ বিচারক করা যাবে না। জেলা জজ এবং তাঁর অধীনস্থ জজ যাঁরা সুপ্রীম কোর্টের অধীনে স্বাধীনভাবে কাজ করেন তাঁদেরকেই বিশেষ বিচারক করা হবে এবং তাঁদের কোর্টেই এ মামলাগুলি বিচার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বিতীয় হল বর্তমান আইনের অধীনে যে কোন সরকারী কর্মকর্তার দুর্নীতির বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য আগে সরকারের সম্মতি নিতে হবে। এটা বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে অর্থাৎ এটা পাস করা হলে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে সরকারের কোন অনুমতি লাগবে না। কমিশন যে কোন সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিজস্ব

www.pathagar.com

মতামতের উপর ভিত্তি করে দুর্নীতির মামলা দায়ের করতে পারবে। তৃতীয় হচ্ছে—এ আইনে Public Prosecutor appoint করার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া ছিল। আমরা সেটা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কমিশন নিজে Public Prosecutor appoint করবে। কমিশনের নিজস্ব Public Prosecutor থাকবে। তাঁরা কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন, যাতে করে এ মামলাগুলি তাঁরা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন।

তারপর দেখুন বর্তমান আইনের অধীনে মামলা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা সরকারের আছে। এ প্রত্যাহার করার ক্ষমতা আর সরকারকে দেওয়া যাবে না। কারণ এ ক্ষমতা সরকারকে দিলে দুর্নীতি দমন কমিশনের আর স্বাধীনতা থাকে না। তাই মামলা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা সরকারের বদলে সংশোধনীর মাধ্যমে কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। শেষ সংশোধনী হল আমরা schedule পরিবর্তন করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলে যে অপরাধগুলি তালিকাভুক্ত আছে, সেগুলিই আমরা এ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করেছি। এইসব হলো এ আইনটি পরিবর্তনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ। বিলটি পাস করা হলে দুর্নীতি দমন কমিশন অত্যন্ত স্বাধীনভাবে, সুষ্ঠুভাবে, কার্যকরভাবে দেশে দুর্নীতি দমন করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে বলে আমরা মনে করি।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ক্রিমিনাল ল এ্যামেন্ডমেন্ট আইন, ২০০৪
১২ জুলাই ২০০৪

এই বিলটি ৪ জুলাই ২০০৪ তারিখে সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। স্থায়ী কমিটি বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংসদে রিপোর্ট দাখিল করার পর বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা হয়। বিলের উপর যদিও প্রধান বিরোধীদলের সদস্যদের অনেকগুলি সংশোধনী ছিল, কিন্তু তাঁরা সেদিন সংসদে আসেন নি। যাইহোক অন্যান্য সংশোধনীসমূহ বিবেচনার পর বিলটি পাস হয়।

মাননীয় স্পীকার

আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে প্রধান বিরোধীদল সংসদে নেই। জনমত যাচাইয়ের জন্য তাঁরা অনেকগুলি প্রস্তাব এনেছিলেন। বাছাই কমিটিতে নেওয়ার জন্যও কিছু সংশোধনী এনেছিলেন। তারপরও এই আইনটি যেহেতু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন, আমি মনে করি যে, আমার দু-একটি কথা এই সংসদের মাধ্যমে দেশের মানুষকে জানানো প্রয়োজন।

সমাজে দুনীতি দমন করার ব্যাপারে বর্তমান সরকার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। জাতির কাছে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে দেশে দুর্নীতি দমন করার জন্য আমরা সকল রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করব। এই আলোকে গত ফেব্রুয়ারি মাসে বর্তমান সরকার একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দেশে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করার জন্য আমরা একটি আইন প্রণয়ন করি, যার নাম হল দুর্নীতি দমন কমিশন আইন। ৯ মে এই আইনটি কার্যকর করা হয়েছে। এই আইন কার্যকর করার পরে বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই আইনের অধীনে বাছাই কমিটি এখন তাঁদের কাজ শুরু করবেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ২৮ ধারার অধীনে দুর্নীতির বিষয়ে মামলাসমূহের বিচার হবে Criminal Law Amendment Act, 1958-এর অধীনে। অর্থাৎ যে বিলটি আজকে আমরা এনেছি, এই বিলটির উপরেই নির্ভর করছে কত effectively দুর্নীতি দমন কমিশন দায়েরকৃত মামলাগুলির নিষ্পত্তি হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার জন্য বর্তমান আইনে যেসব অসঙ্গতিপূর্ণ, অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সাংঘর্ষিক বিধান আছে তা বাদ বা বিলুপ্ত বা সংশোধন করার জন্য আমরা এই আইনটি আজকে এনেছি। এই আইনটি যদি আমরা সংশেধন করি তাহলে দুর্নীতি দমন কমিশন নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। আমি কিছু উদাহরণ দিতে চাই। এ আইনের মধ্যে আছে যে, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটরা বিশেষ বিচারক অর্থাৎ Special Judge হিসাবে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার বিচার করতে পারবে। কোন

www.pathagar.com

ম্যাজিস্ট্রেট বিচারকের দায়িত্ব পালন করলে সেখানে সরকারের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করার একটা সুযোগ থেকে যায়। আমরা তাই এই ধারাটি বিলুপ্ত করতে চাই। একই ভাবে বর্তমান আইনে যেখানে যেখানে সরকারের কোন কর্তৃত্ব বা ভূমিকা বা হস্তক্ষেপের সুযোগ রয়েছে সেগুলি আমরা দূর করে দিয়েছি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই আইনের মাধ্যমে Section-4-এর Sub-Section-5-এর clause (b), Section-5-এর (২) এবং (4) Section-6-এর (1) (b), এবং (2), (5) এবং (6) বিলুপ্ত করেছি। Section-6-এর (5)-এ ছিল একজন সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়ের এবং মামলা পরিচালনা করার জন্য সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। এ ধারাটা আমরা তুলে দিয়েছি। এ আইনে আছে যে, Prosecutor সরকার নিয়োগ করবেন। সেটা আমরা এ নতুন আইনে বিলুপ্ত করেছি। কারণ দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে আমরা বলে দিয়েছি যে, Commission will have its own Prosecutor। এখানে দুর্নীতি দমন কমিশনের কোন মামলায় সরকারী Prosecutor জড়িত থাকতে পারবে না।

বর্তমান আইনে আছে যে, দুর্নীতি দমন কমিশনের কোন মামলা সরকার ইচ্ছা করলে প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। যদি এ ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয় তাহলে দুর্নীতি দমন কমিশন আর স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। তাই সেই ক্ষমতা এখন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আইনের বিচার্য বিষয়ের schedule টি সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে আমরা দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে যে schedule টি আছে সেটা প্রতিস্থাপিত করেছি। এ আইনটি পাস হলে দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীন, অর্থবহ এবং কার্যকরভাবে কাজ করতে পারবে এবং এই জন্যই সংশোধনীগুলি আনা হয়েছে। এখানে সরকারের কোন রকমের সংশ্লেষ বা সম্পর্ক বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বা প্রভাবের সুযোগ আর থাকবে না। আশা করি, এ সংশোধনী পাস হলে দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পূর্ণভাবে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারবে এবং এ সরকারের অঙ্গীকার ও প্রত্যয় অনুযায়ী এই দুর্নীতি দমন কমিশন কাজ করা শুরু করলে বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন করা সহজ হবে।

মাননীয় স্পীকার, বিরোধী দলের কয়েকজন সংসদ সদস্য যাঁরা এখানে উপস্থিত নেই তাঁরা কতগুলি সংশোধনী এনেছেন। যদিও তাঁরা উপস্থিত নেই, তবুও বলছি যে এই সংশোধনীগুলি তারা under some wrong perception-এ এনেছেন। তাঁরা থাকলে আমি বলে বুঝাতে পারতাম বা আমি চেষ্টা করতাম কেন তাঁদের এই সংশোধনীগুলি গ্রহণযোগ্য নয়।

মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এম এম শাহীন কয়েকটি সংশোধনী এনেছেন, আমরা দফা-১-এর ২ উপ-ধারায় বলেছি যে, সরকার সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তারিখ ঠিক করবে, কবে এই আইনটি কার্যকর হবে। এখন জনাব এম এম শাহীন দফা-১-এর ২ উপ-দফায় সংশোধনী এনে বলেছেন, "ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।" কিন্তু এটা অবিলম্বে কার্যকর করা সম্ভবপর নয়। তার কারণ দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে বলা হয়েছে, যে দিন কমিশন গঠিত হবে সেদিন দুর্নীতি দমন ব্যুরো, যেটা এখন কাজ করছে সেটা বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত না হবে ততদিন পর্যন্ত for the continuity of the law and the cases pending in the courts দুর্নীতি দমন ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে বিচারাধীন মামলাগুলি চলতে হবে। সুতরাং আমরা যদি এখন বলি যে, এই আইনটা এখনই কার্যকর করা হোক তাহলে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কার্যক্রমটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং বিচারাধীন মামলাগুলি সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রশাসনিক এবং আইনগত ক্ষেত্রে একটি বিরাট শূন্যতা দেখা দেবে। এই কারণে আমি তাঁর সংশোধনীটা গ্রহণ করতে পারছি না।

মাননীয় স্পীকার, ২ দফায় তিনি সংশোধনী এনে বলেছেন যে, "Government" means "Government of the People's Republic of Bangladesh।" এটার কোন প্রয়োজন নেই। এটা সকলেই জানে। এটা General Clauses Act-এ আছে, সংবিধানে আছে, তাই এই সংশোধনীর কোন প্রয়োজন নেই।

তিনি আর একটি সংশোধনী এনে বলেছেন যে, "High Court Division" means "The High Court Division under Article 94 of the Constitution"। এটা তিনি কি mean করেছেন জানি না। মাননীয় স্পীকার High Court Division has already been defined by

www.pathagar.com

the constitution under Article 153। সুতরাং যেখানে সংবিধানে হাইকোর্ট ডিভিশনকে ডিফাইন করা আছে সেখানে এই আইনে হাইকোর্ট ডিভিশনকে আলাদাভাবে ডিফাইন করার কোন প্রয়োজন নেই।

তিনি আর একটি সংশোধনীতে বলেছেন আইনের সিডিউলে Penal Code-এর কোন্ কোন্ অপরাধগুলি applicable হবে সেটা আমরা সঠিকভাবে উল্লেখ করিনি। সেখানে আমরা বলেছি সেকশন-১৬১—১৬৯ যার অর্থ সেকশন ১৬১ থেকে ১৬৯। উনি সংশোধনী এনেছেন ১৬১ থেকে ১৬৯। এটার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং এটাও গ্রহণযোগ্য নয়।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ।*

*বিলটি ২০০৪ সালের ১২ই জুলাই সংসদে কণ্ঠভোটে পাস হয়।

www.pathagar.com

রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে শ্রমিক সংগঠন করার পরিবেশ এখন সৃষ্টি হয়েছে

ইপিজেড শ্রমিক সংঘ ও শিল্প সম্পর্ক আইন, ২০০৪

১৩ জুলাই ২০০৪

বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দেশে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা Export Processing Zone প্রতিষ্ঠা করা। সস্তা শ্রম ছাড়াও এইসব অঞ্চলে শিল্প কারখানাসমূহে কোন শ্রমিক সংগঠন করার প্রচলিত আইনসমূহ স্থগিত থাকবে বলে সরকারের নিশ্চয়তা বিধান বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি বিরাট incentive হিসাবে কাজ করেছে। চট্টগ্রাম ছাড়াও দেশে এরকম আরও পাঁচটি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপন করা হয়। এই প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলসমূহ পরিচালনার জন্য সরকার ১৯৮০ সালে একটি আইনের অধীনে Bangladesh Export Processing Zone Authority নামে একটি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এই সব অঞ্চলসমূহে বিশেষ করে চট্টগ্রাম এবং ঢাকায় বিদেশী বিনিয়োগকারীরা প্রায় দুই শত কলকারখানা স্থাপন করে। এই সব অঞ্চলে প্রায় ১,৩৬,০০০ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয়ের প্রায় ২০ শতাংশ এই অঞ্চলসমূহের রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত হয়। সময়ের পরিবর্তন এবং এই অঞ্চলসমূহে বিদেশী বিনিয়োগ একটি প্রসারিত এবং স্থিতিশীল পর্যায়ে পৌঁছানোর কারণে সীমিতভাবে শ্রমিক সংগঠন করার অনুমতি দেওয়ার কথা সরকারকে বিবেচনা করতে হয়। একই সাথে বেশ কিছু কাল যাবত দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এইসব অঞ্চলে শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাবি উত্থাপন করতে থাকে। অন্যথায় তারা প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের রপ্তানীর ক্ষেত্রে যে সকল সুযোগসুবিধা দেয় (GSP) সেগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার হুমকি দেয়। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা প্রথম দিকে আপত্তি করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তারাও প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলসমূহে পর্যায়ক্রমে শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার পুনর্বহাল করার জন্য সম্মত হয়। বাংলাদেশ সরকার, যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্ব ব্যাংক এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের একটি সমন্বিত উদ্যোগের ফলশ্রুতি হিসাবে সরকার, রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকাসমূহের অভ্যন্তরে শ্রমিক সম্পর্কিত আইনসমূহ পুনর্বহাল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ক্রমান্বয়ে শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ৯৭টি ধারাযুক্ত একটি comprehensive এবং self-contained আইন সংসদে আনে। আইনটি স্থায়ী কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিলটি চূড়ান্ত আকারে সংসদে বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা হয়।

মাননীয় স্পীকার

আমি মাননীয় সংসদ-সদস্যদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এই আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করার জন্য।

শহীদ জিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনেকগুলি সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই দেশে দ্রুত বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানী বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে প্রথম রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপন করা। শহীদ জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি'র প্রথম সরকার এই অঞ্চলসমূহের জন্য একটি পৃথক আইন Bangladesh Export Processing Zone Authority 1980 প্রণয়ন করে। দ্রুত শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপরে আরও ৫টি এলাকায় এই প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এগুলির মধ্যে ২টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বড়। প্রথমটি হল চট্টগ্রামে এবং দ্বিতীয়টি হল ঢাকায়। বর্তমানে এই সব অঞ্চলে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার শ্রমিক কাজ করছে। আমাদের রপ্তানী আয়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলসমূহ থেকে অর্জন করি আমরা। দুটি প্রধান কারণে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে আসে এবং এই সব অঞ্চলে বিনিয়োগ করা শুরু করে। একটি হলো ট্রেড ইউনিয়নমুক্ত একটি পরিবেশ থাকবে। তাদের জন্য

www.pathagar.com

এটা একটা বিরাট আকর্ষণ ছিল, আর একটি ছিল যে, সস্তা শ্রম—cheap labour। এই দুটি কারণে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এই সব অঞ্চলে। দেশে শ্রমিক সম্পর্কিত যে প্রচলিত আইনের কথা বলেছেন সেটা সঠিক। ১৮টি আইন আছে। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলি হল Industrial Relations Ordinance 1969; Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965, আর Factories Act, 1965। বিদেশী বিনিয়োগকে আকর্ষণের জন্য এই আইনগুলির প্রয়োগ এই সব অঞ্চলে স্থগিত রাখা হয়। আমেরিকাতে আমরা ৩০০ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানী করি, বিশেষ করে পোশাক শিল্পে, এবং আমরা একটি বন্ধুভাবাপন্ন অনুন্নত দেশ হিসাবে তাদের Generalised System of Preference (GSP) facilities enjoy করি। এসমস্ত অঞ্চলে বিনিয়োগ এবং শিল্প স্থাপনে বিগত প্রায় ২৪ বছরে আমরা একটা লেভেলে এসেছি, একটা ম্যাচুরিটি স্টেজে এসেছি, যেখানে শ্রমিক সংগঠন করার অবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এতদিন যাবত এই সব অঞ্চলে শ্রমিকদের কোন সংগঠন ছিল না। সংগঠন ছিল। তাদের কল্যাণ সমিতি ছিল। প্রত্যেক ইউনিটে অত্যন্ত ভালভাবে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বজায় থেকেছে। এই জন্য আমি মালিকদেরকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তারা এই সব অঞ্চলে শ্রমিকদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে কাজ করেছে। তাদের জন্য আলাদা সুযোগ-সুবিধা, বেতন কাঠামো ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটা উন্নতমানের international standard maintain করেছে।

আমেরিকার Federation of Labour—Congress of Industrial Organisations যাকে বলা হয় AFL—CIO, United States Trade Representative Office এবং United States Government ও চায় আমরা এই সব অঞ্চলে শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার সম্পর্কিত আইনসমূহ পুনর্বহাল করি। এই আইন প্রণয়নের ব্যাপারে নাসিম সাহেব United States-এর Ambassador—এর চাপের কথা বলে একটু কটূক্তি করার চেষ্টা করেছেন। আরও দুয়েকজনও বলেছেন। আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আপনাদের সরকার gave in to the presssure of the United States। বিগত ৩১/১/২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে United States Government কে assure করেছিল যে, ১ জানুয়ারি ২০০৪ সাল থেকে শ্রমিক সংগঠন করার অধিকর দেয়া হবে। ৩ বছর সময় নিয়েছিলেন। হয়তো দেশের স্বার্থেই নিয়েছিলেন। কিন্তু এ কথটি বলা ঠিক হবে না যে তাদের চাপে পড়ে সরকার এই আইন করছে। কারণ, you committed, আপনারাই commit করেছেন যে, ৩ বছরের মধ্যে করবেন। আপনারা যদি সরকারে আসতেন তাহলে আপনাদেরকে ১ জানুয়ারি ২০০৪ সালেই করতে হত। কিন্তু very sorry. People rejected you. You could not form the government। যাই হোক আপনাদের দেওয়া commitment আজকে আমাদেরকে fulfill করতে হচ্ছে। বর্তমান সরকার ৩১-০১-২০০৩ অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ২০০৪-এর আগের দিন আমরা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেছি যে, বিষয়টি ততদিন স্থগিত থাকবে যতদিন না পর্যন্ত সরকার একটি দিন ধার্য করবে। আমরা এখনও সেই দিন ধার্য করিনি। Because, we wanted to bring it to the Parliament—সংসদের সম্মতি নিয়ে আইন করে আমরা এই বিষয়টির ফয়সালা করতে চেয়েছি। সুতরাং নাসিম সাহেব, আপনাদের মুখে এই আইনের সমালোচনা করা শোভা পায় না।

আমি আগেই বলেছি, শ্রমিকদের শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার ছিল না তা নয়, ছিল, এক ধরনের সমিতি ছিল। তবে আইনগত কোন কাঠামো ছিল না। কোন দরকষাকষির সংগঠন বা Collective Bargaining Agent, CBA ছিল না। আজকে আমাদেরকে একটি আইনের কাঠামো তৈরি করে দিতে হচ্ছে। আমরা মনে করি যে, এসব অঞ্চল এখন যথেষ্ট ডেভেলপ করেছে। এখন শ্রমিক সংগঠন করার আইনী অধিকার দিলে আমাদের রাষ্ট্র বা দেশের কোন ক্ষতি হবে না।

বিনিয়োগকারীরা, যাদের সবচেয়ে বড় stake আছে এই অঞ্চলসমূহে তারা obviously চায়নি যে এই স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়া হোক। কিন্তু তারা এখন সংবেদনশীল। তারাও বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা দেখেছে যে, সারা পৃথিবীতে যে অবস্থা বিরাজ করছে বাংলাদেশকে সেখান

www.pathagar.com

থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সেইজন্য American Federation of Labour, United States Trade Representative Office and the United States Government represented by Mr. Nasim's friend, আপনাদের বন্ধু হ্যারি কে টমাস।

[বাধা প্রধান]

যার সাথে গিয়ে বৈঠক করেন আর কত কটু কথা বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেন, তা আমরা জানি, আমরা তাদের সাথে অনেক দফা আলোচনা করি।

[বাধা প্রধান]

জনাব সুরঞ্জিতও মাঝে মাঝে যান। আপনাদেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যাই হোক, আমাদের অর্থমন্ত্রী, যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বব্যাংক এবং বিনিয়োগকারীদের নিয়ে অনেক পরিশ্রম করে একটি সমঝোতায় আসতে সক্ষম হয়েছেন। এই সমঝোতার মূল ভিত্তি হল এসব অঞ্চলে একটি ভারসাম্য রক্ষা করা। একদিকে আমাদের জাতীয় স্বার্থ দেখা, তারপর বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ দেখা, অন্যদিকে শ্রমিকদের স্বার্থ দেখা। আর অন্য পক্ষ হল, যুক্তরাষ্ট্র। অর্থাৎ আমেরিকায় আমাদের যে বাজার আছে সেই বাজারও যাতে নষ্ট না হয় সেটা দেখা। তিন দিকে বিচার বিবেচনা করে একটি অত্যন্ত ভারসাম্যমূলক সমঝোতায় আমরা আসতে সক্ষম হয়েছি। সেই জন্য এই আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি আমি এখন উল্লেখ করতে চাই।

'অবিলম্বে শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব ও কল্যাণ সমিতিকে আইনী স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং তারা ৩১-১০-২০০৬ সাল পর্যন্ত এই পর্যায়ে, অর্থাৎ ১ম পর্যায়ে থাকবে।' ১ নভেম্বর ২০০৬ সাল থেকে শ্রমিক সংগঠন করা যাবে এবং তার কতগুলি নীতিমালা আছে। আইনটি অনেক ব্যাপক, আপনারা দেখেছেন। ৯৭টি ধারা আছে এই আইনে এবং এটা বোধ হয় বাংলাদেশের একটি অন্যতম দীর্ঘ আইন। তার কারণ হল it is a comprehensive and self-contained law for special areas, for special purpose। সেইজন্য আপনারা যে সাধারণ আইনগুলির কথা বলেছেন সেইগুলি ঐসব অঞ্চলে প্রযোজ্য হবে না বলে ঐ আইনগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি এই আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং it has bridged all the other laws to extend to these particular zones as found necessary for the purpose of this law। একটি শিল্প ইউনিটে একটি ইউনিয়ন থাকবে। যদিও অঞ্চলের বাইরে তিনটা ইউনিয়ন পর্যন্ত থাকতে পারে। কিন্তু এসব অঞ্চলে একটি ইউনিয়নের ব্যবস্থা করেছি। আমি তো বলেছি যে, আমাদেরকে ব্যালেন্স রাখতে হয়েছে, আমাদের জাতীয় স্বার্থ দেখতে হয়েছে, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ দেখতে হয়েছে। আমাদের সব কিছু মিলিয়েই এই আইনের কাঠামো তৈরি করতে হয়েছে। একই মালিকের অধীনে যদি একই জোনে একাধিক শিল্পকারখানা থাকে সেখানে ইউনিয়ন থাকবে একটি এবং এ ব্যাপারে শ্রমিকরা সবাই একমত আছে। আর মাননীয় সদস্য শাজাহান খান সাহেব আপনি যে ৩০%-এর কথা বলেছেন, আপনি আইনটা ভাল করে পড়ে যদি দেখতেন তাহলে এই বিবৃতিটা করতেন না।

[বাধা প্রদান]

Please do not interrupt and don't enter into any personal conversation। পদ্ধতিটা আমি বলে দেই। একটি নির্দিষ্ট ইউনিটে কমপক্ষে ৩০% শ্রমিক রাজি হতে হবে যে তারা একটা সংঘ করতে চায়। তারপরে একটা গণভোট হবে। সেই গণভোটে অন্তত ৫০% শ্রমিক অংশগ্রহণ করতে হবে। অধিকাংশ যদি অংশগ্রহণ না করে তাহলে সেইখানে শ্রমিক সংঘ হবে কেন?

[বাধা প্রদান]

মাননীয় সদস্য শাজাহান খান সাহেব কী ধরনের সংগঠন করেন আমাদের জানা আছে। গণবাহিনী যখন করেছিলেন তখন ৩০%-এর কথা চিন্তা করেন নি।

তারপরে ৫০% শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশ ভোট দিতে হবে ইউনিয়ন করার পক্ষে। এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দর কষাকষির প্রতিনিধি Collected Bargaining Agent নির্বাচিত হবে ৪ বছরের জন্য, for four years। একটি ফেডারেশন করতে পারবে একটি অঞ্চলে। একটি অঞ্চলে যদি ২৫টা ইউনিয়ন থাকে সেই ২৫টা ইউনিয়ন মিলে একটি ফেডারেশন করতে পারবে। কিন্তু ঐ ফেডারেশন বাইরের, যেমন মাননীয় সদস্য শাজাহান খান সাহেবের ফেডারেশনের সাথে কোন

www.pathagar.com

সম্পর্ক রাখতে পারবে না। এমনকি কোন রাজনৈতিক দল বা তাদের কোন অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

[বাধা প্রদান]

ঐ আইএলও কনভেনশন আমরা পরে দেখব। আপনি এখন এই আইনটা দেখেন। কোন চাঁদাবাজি চলবে না। এমনকি বাইরে থেকে গিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করবে সেটাও চলবে না। আর বাইরের কোন ফেডারেশনের সঙ্গে এরা সম্পৃক্ত হতে পারবে না।

[বাধা প্রদান]

এই আইনের মূল স্পিরিটটা হল মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যবস্থা করা, সেটাই হল মূল উদ্দেশ্য। সেইজন্য বিরোধ মীমাংসা করা হবে প্রথমে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, তারপর সালিশের মাধ্যমে। সেটাতে যদি সফল না হয় তাহলে বিরোধ যাবে ট্রাইব্যুনালে, ট্রাইব্যুনাল থেকে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে। ধর্মঘট, লক আউটের বিধি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে শাজাহান সাহেব, you have no chance, ওরা নিজেরা যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে করতে চায় করবে। বাইরের কোন প্রভাব ওখানে থাকতে দেওয়া হবে না। আর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। মালিকদের জন্যও একই রকম ব্যবস্থা রাখা আছে। শ্রমিক-মালিক যারাই আইন ভঙ্গ করবে তাদের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, এই আইনটি একটি comprehensive, self-contained law. It is a legislative landmark in Bangladesh। আমাদের স্থায়ী কমিটির সভায় আপনারা তো আসেন না। আপনারা এলে আমরা উপকৃত হতাম। স্থায়ী কমিটিতে আলোচনা করে আমরা যতটুকু সম্ভব সমঝোতার মাধ্যমে এই বিলের অনেক সংশোধন করেছি। I would like to thank our Chairman খন্দকার মাহবুব উদ্দিন এবং স্থায়ী কমিটির সকল সদস্যকে যাঁরা অনেক পরিশ্রম করে আইনটিকে চূড়ান্ত করেছেন। একদিন তো আমরা সকাল ১০টা থেকে সারাদিন কাজ করেছি। তার আগের দিন রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করেছি। চারদিন continuously we had to work for this। আপনারা যাঁরা জনমত যাচাই এবং বাছাইয়ের জন্য প্রস্তাব করেছেন, ইচ্ছা থাকলেও আমার পক্ষে সেগুলি গ্রহণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কিছু বলেননি আজ। Because he knows he cannot oppose Ambassador Harry Thomas। তিনি ঠিকই বুঝেছেন যে, আজকে বললে কোন লাভ হবে না।

মাননীয় স্পীকার, আমি খুব সংক্ষেপে দুই একটি কথার উত্তর দিতে চাই।

আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সকলকে যে আপনারা সবাই খুব ভালভাবে আইনটা পড়েছেন এবং আপনারা সত্যিই অনেক contribute করেছেন। এটা মনে রাখবেন যে, it is a special law for a special area। যেমন Chittagong Hill Tracts-এর জন্য আপনারা আলাদা আইন করে দিয়েছেন, একটা আঞ্চলিক পরিষদ করেছেন। করা উচিত হয় নি। তবুও করেছেন। একটা বিশেষ এলাকার বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে। আর চাপের কথা বলেছেন। চাপের মুখে আমরা এই আইন করি নি। আমরা আমাদের দেশের জাতীয় স্বার্থের জন্য এটা করেছি। আপনারা যদি, আবার কোনদিন ক্ষমতায় আসেন, তাহলে এই আইন সম্পর্কে আপনারা যেসব কথা এখানে বললেন, আশা করি সেগুলি implement করবেন। কিন্তু আপনারা করবেন না। আপনাদের উপর যদি এই আইন করার দায়িত্ব থাকত, আপনারা ঐসব অঞ্চলে martial law দিয়ে রাখতেন। One party করে তো দেশকে একবার দেখিয়েছেন। ঐ রকম একটা আইন করতেন ঐ এলাকার জন্য।

মাননীয় স্পীকার, একই সাথে একটি দেশে দুটো আইন, একথাটাও বলা ঠিক নয়। কোন contradiction এখানে নেই। আপনারা ভাল করে পড়েন। যদি থাকে তাহলে বলব, no law is sacrosanct. Law is always subject to change। প্রয়োজন হলে সংশোধন বা পরিবর্তন করা হবে।

জাহাঙ্গীর হোসাইন সাহেব বলেছেন যে, স্থায়ী কমিটি এতগুলি সেকশন যখন পরিবর্তন করেছে, তার অর্থ মূল আইন আর এখন নেই। কিন্তু দেখবেন মূল আইনের কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে আরও উন্নতমানের করা হয়েছে। It has been enriched by the changes made by the

www.pathagar.com

Committee Members, কিন্তু মৌলিক কোন পরিবর্তন করা হয় নি। কেবিনেট যেভাবে আইনটি approve করেছে, ঠিক সেভাবেই রাখা আছে।

কাদের সিদ্দিকী সাহেব একটু sweeping remark করেছেন। এটাকে বাজে আইন বলেছেন। It's a very good law। আপনি কোন সময় যদি কোন সরকারের সাথে সম্পৃক্ত হন, তখন I am sure you will defend this law as a very good law। আমরা পরাধীন নই। আপনার মত বীর মুক্তিযোদ্ধা যতদিন বেঁচে আছেন, বাংলাদেশ কোনদিন পরাধীন হবে না। সুতরাং let us not be afraid of that। আমাদের শহীদ জিয়ার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, আমরা জানি দেশকে কিভাবে defend করতে হয় এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব কিভাবে অক্ষুণ্ন রাখতে হয়। We are aware of it and we will always pursue that। শাজাহান খান সাহেব, আপনার কথা আর কী বলব; শুনুন, আপনার পরিবহন সেক্টরের কথা বলি।

[বাধা প্রদান]

আপনারা করেননি, কিন্তু এই সরকার শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন করেছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করেছেন। আরও করেছি, শ্রম কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং এসব তহবিলে অনেক টাকা দিয়েছি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন। আপনি পরিবহন সেক্টরের একজন নেতা হয়ে ঐ সেক্টরে কোন কাজ করতে দেননি। আর খারাপ কথা বললাম না, বললে আবার withdraw করতে হবে। সে জন্য শুধু মনে রাখবেন যে, double standard is not good, যা এখানে বলবেন সেটাতে stick করবেন।

[বাধা প্রদান]

বললাম তো, ভবিষ্যতে যদি সরকারে আসেন তাহলে এই কথাগুলি মনে রাখবেন, ভুলে যাবেন না। ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০%-এর অধিক অর্থাৎ majority-র উপর নির্ভর করতে হবে। We believe in democracy. Majority যদি approve না করে তাহলে কী করে হবে? এটা অত্যন্ত সাধারণ একটি জিনিস।

মাননীয় স্পীকার, তারপরে আমরা একেবারে non-responsive নই। ১৩ দফার (১) উপ-দফায় জনাব শাজাহান এবং বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর প্রস্তাব আমরা accept করে নিচ্ছি। Your amendment, '২০০১'-এর পরিবর্তে '২০০৬' সাল হবে। আর ১৮ দফাতে নতুন একটা proposal কাদের সিদ্দিকী সাহেব দিয়েছেন, it is good। আপনি suggest করেছেন যে, শ্রমিক সংগঠনের গঠনতন্ত্রে কী কী থাকবে আমরা দিয়েছি কিন্তু আপনি মনে করেন তার সাথে ১৮ দফার (ঞ) উপ-দফার পরে নিম্নোক্ত নতুন (ট) উপ-দফা, "(টা) শ্রমিক সংঘের সাধারণ পরিষদ হইতে পদত্যাগ ও সদস্যপদ বাতিল হইবার পদ্ধতি" শব্দগুলি তাদের গঠনতন্ত্রে থাকা উচিত।

মাননীয় স্পীকার, আমি সেই জন্য ১৩ দফার (১) উপ-দফায় মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শাজাহান খান এবং বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী কর্তৃক আনীত সংশোধনী এবং ১৮ দফায় মাননীয় সংসদ সদস্য বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী কর্তৃক আনীত সংশোধনী গ্রহণ করতে রাজি আছি। সুতরাং আমরা এটা গ্রহণ করতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, I would like to only say সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত যদি আজকে তাঁর প্রস্তাবিত দফাগুলি উত্থাপন করতেন তাহলে তার মধ্যে অন্তত একটা সংশোধনী হয়তো আমরা বিবেচনা করতাম, কিন্তু যেহেতু উত্থাপন করেননি, সেটা আর বিবেচনা করার সুযোগ নেই। তিনি suggest করেছিলেন "ট্রাইব্যুনালে সিটিং জাজ" দেওয়ার জন্য। আমরা মনে মনে একটু চিন্তা করছিলাম যে, এটা হয়তো গ্রহণ করা যায়। কিন্তু যেহেতু তিনি সেটা উত্থাপন করেননি, আমরা আর সেই সংশোধনীতে রাজি হলাম না।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।*

*বিলটি সেদিনই সংসদে পাস হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কারাগারে চারজন জাতীয় নেতার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড একটা জাতীয় ট্রাজেডি

জেল হত্যা মামলা

৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪

১৯৭৫ সাল ছিল বাংলাদেশের জন্য স্বাধীনতা-উত্তর কালের সবচাইতে সঙ্কটময় বছর। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ এবং আর্থ-সামাজিক নৈরাজ্য এবং পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে সংবিধান সংশোধন করে দেশে একদলীয় শাসন প্রবর্তনের প্রেক্ষাপটে নেমে আসে একই বছরের ১৫ আগস্ট জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। কারাবন্দী করা হয় আওয়ামী লীগের চারজন শীর্ষ নেতা জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব মোহাম্মদ মনসুর আলী এবং জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে। এর পর ঘটে একই বছর আরও সামরিক অভ্যুত্থান, প্রতি-অভ্যুত্থান এবং সিপাহী-জনতার বিপ্লব। নভেম্বর মাসের ৩ তারিখে খোন্দকার মোশতাক আহমদকে সরিয়ে যখন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা দখল করার অভিযান চালায়, সেই রাতে কিছু সামরিক অফিসার ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করে উপরোক্ত চারজন নেতাকে গুলি করে একসাথে হত্যা করে। এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ছিল একটি জাতীয় ট্রাজেডি।

মাননীয় স্পীকার

গত পরশু সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি বহির্ভূত পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলের সম্মানিত সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ নাসিম এবং বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত জেল হত্যা মামলা সম্পর্কে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে মামলার কার্যক্রম এবং রায়কে কেন্দ্র করে কিছু বিভ্রান্তিকর ও অসত্য বক্তব্য এই সংসদে রাখেন। আপনি যদিও তাঁদের বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করেছেন কিন্তু গতকালের সংবাদপত্রসমূহে তাঁদের বক্তব্য সবই ছাপানো হয়েছে। তাই আমি কার্যপ্রণালী ৩০০ বিধির অধীনে দেশবাসীকে এই বিষয়ে সঠিক তথ্য অবহিত করার জন্য এই বক্তব্য উপস্থাপন করছি। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে সংগঠিত চার জন জাতীয় নেতার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড আমাদের জন্য একটি জাতীয় ট্রাজেডি। কোন বিবেকবান মানুষ এই হত্যাকাণ্ডকে গ্রহণ করতে পারে না। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করি। আমি এই চারজন জাতীয় নেতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে জানাই আমার আন্তরিক সমবেদনা।

১৯৭৫ সালের ৪ নভেম্বর তারিখে এই মামলার FIR দায়ের করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারে আসে ১৯৯৬ সালের জুন মাসে আর এই মামলার চার্জশীট দাখিল করা হয় ১৯৯৮ সালের ১৫ অক্টোবর অর্থাৎ সেই সরকার এত গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলার চার্জশীট দিতে ২ বছর ৪ মাস, ২৮ মাস সময় নেয়। এই চার্জশীটে ২১ জন ব্যক্তিকে আসামী করা হয় এবং ৭৫ জনের নাম সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। চার্জশীট দাখিলের প্রায় ১ বছর ৩ মাস পর এই মামলায় আওয়ামী লীগ সরকার দেশের স্বনামধন্য আইনজীবী মরহুম সিরাজুল হককে বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে ১৯৯৯ সালের ৭ জানুয়ারি তারিখে নিয়োগদান করেন এবং পরবর্তীতে জুনিয়র হিসেবে তাঁকে সহায়তাদান করার জন্য আরও চার জনকে নিয়োগ দেন। আওয়ামী লীগ সরকারের ইচ্ছাকৃত অবহেলা, অদক্ষতা এবং রাজনৈতিক হঠকারিতার কারণে এই মামলার নিষ্পত্তি তখন আর হয়নি। সুতরাং আমরা ক্ষমতায় আসার পর দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং বিচার বিভাগের উপর জনগণের আস্থা সুদৃঢ় করার জন্য অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করি। তার মধ্যে অন্যতম হল সমস্ত হত্যাকাণ্ডসহ সকল ফৌজদারী অপরাধের দ্রুত বিচার সম্পন্ন করা। এই আলোকে আমরা জেল হত্যা মামলার মত একটি জনগুরুত্বপূর্ণ মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এই লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিযুক্ত বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর এবং তাঁর জুনিয়রদের আমরা প্রায় ১

www.pathagar.com

বছর বহাল রাখি এবং তাঁদের উপর অর্পিত মামলা পরিচালনা করার সমস্ত দায়িত্ব অব্যাহত রাখি। পরবর্তী পর্যায়ে ২০০২ সালের ৭ নভেম্বর জনাব এডভোকেট সিরাজুল হক ইন্তেকাল করার পর তাঁর অধীনে জুনিয়রদের আর রাখা যায় না বিধায় আমরা তাঁদের ১৫/১২/২০০২ তারিখে অব্যাহতি দান করি। এই অব্যাহতি দান করার পরপরই বিরোধী দলের উপনেতা জনাব এডভোকেট আবদুল হামিদ ২৩/১২/২০০২ তারিখে আমাকে লিখিতভাবে এর প্রতিবাদ জানান। এই মামলা পরিচালনা করার জন্য বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগদানের জন্য অনুরোধ করেন। আমি সাথে সাথে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পত্রের মাধ্যমে তাঁকে অনুরোধ করি যে, যদি এই মামলা পরিচালনা করার জন্য বিরোধী দল বা মরহুম চারজন জাতীয় নেতার আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে কোন বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর বা আইনজীবী নিয়োগ করতে চান তাহলে তাঁদের নাম পাঠিয়ে দিলে সরকার তাঁদের নিয়োগদানের ব্যবস্থা করবে।

পরিতাপের বিষয় দীর্ঘ প্রায় ১১ মাস আমি আমার চিঠির কোন জবাব পাই নি। অবশেষে ২০০৩ সালের ৮ নভেম্বর তারিখে তিনি তাঁর পত্রের মাধ্যমে যাঁদের নাম বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য উল্লেখ করেছেন সরকারের তরফ থেকে ৩ ডিসেম্বর তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নিয়োগদান করি। নিয়োগপ্রাপ্তির পর তাঁরা রীতিমত মামলা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। মামলা যখন শেষ পর্যায়ে, এই আইনজীবীবৃন্দ মামলার কার্যক্রম থেকে ২০০৪ সালের ২৪ মার্চ পদত্যাগ করে অব্যাহতি নেন। গত প্রায় ৩ বছর যাবত ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতে এই মামলার বিচারকার্য অব্যাহত থাকে এবং ২০ অক্টোবর ২০০৪ সালে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ লিখিত ৩৭৪ পৃষ্ঠায় তাঁর রায় ঘোষণা করেন। এই রায়ে ৩ জন আসামীকে মৃত্যুদণ্ড, ১২ জন আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫ জন আসামীকে খালাস দেওয়া হয়। আর একজন আসামী মামলা চলাকালীন সময় মৃত্যুবরণ করে। একটি সুষ্ঠু বিচার কার্যক্রমের মাধ্যমে অবশেষে এই মামলার বিচার কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। সুতরাং আমার উপরোক্ত তথ্য প্রমাণ করে যে জনাব নাসিম এবং বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের অভিযোগসমূহের কোন ভিত্তি নেই।

মাননীয় স্পীকার, এছাড়াও আমার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি বিবিসিতে একটি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। আমার সম্পূর্ণ ইন্টারভিউ না উল্লেখ করে জনাব নাসিম এখানে একটি লাইন উল্লেখ করেছেন। আমি যেটা বলেছি সেটা এখানে আবার বলতে চাই। বিবিসি জানতে চেয়েছিল যে পুরনো একজন সাক্ষীকে আদালত যে ডেকেছে সে বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে কি না? আমি বলেছি, এটা আদালতের এখতিয়ার। যদি আদালত মনে করে যে, কোন সাক্ষীকে কল করবে, বা নতুন করে কল করবে, বা রিকল করবে এটা আদালতের এখতিয়ার। এটার সঙ্গে কোন ইঙ্গিতের সম্পর্ক নেই। আর আজকের *দৈনিক সংবাদে* দেখলাম যে, আমি নাকি নিজে বা মন্ত্রণালয় থেকে জজকে চিঠি দিয়েছি। আমি এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে, এ মামলার ব্যাপারে সরকার কোনভাবে কোন রকমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে নি এবং এই ধরনের কোন চিঠি আমরা লিখি নি এবং লেখার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। যদি আপনি এই চিঠি এখানে দেখাতে না পারেন তাহলে এই চিঠি দেখাতে না পারার কারণে আপনার উচিত হবে এই সংসদ থেকে পদত্যাগ করা। কারণ এই ধরনের একটি অসত্য কথা আমার সম্পর্কে সংসদে দাঁড়িয়ে বলাটা ঠিক হয় নি।

মাননীয় স্পীকার, আপনারা বলেছেন এটা একটি প্রহসনমূলক রায়। আপনারা একটি রায়কে গ্রহণ না করতে পারেন, প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কিন্তু একটি নিরপেক্ষ আদালত যেখানে রায় দিয়েছে সেটাকে প্রহসনমূলক রায় বলাটা আদালত অবমাননার শামিল। প্রহসনমূলক বলবেন না। বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে বলি, I thought you are an eminent lawyer। আপনি বলেছেন প্রহসনমূলক, এটা ঠিক না। আমাদের আদালতগুলি এখনো ঠিক আছে।

মাননীয় স্পীকার, আমি আরও জানাতে চাই যে—

১। জেল হত্যাকাণ্ড যখন ঘটে তখন বিএনপির জন্ম হয় নি। সুতরাং এই মামলার সঙ্গে এই সরকার, দল বা জোটের কোন সম্পর্ক নেই।

www.pathagar.com

২। ঢাকা মহানগর দায়রা জজ সরকারের অধীনে কাজ করেন না। তিনি সরাসরি ভাবে সুপ্রীম কোর্টের কাছে দায়ী। তাঁর দায়দায়িত্ব এবং জবাবদিহিতা একমাত্র সুপ্রীম কোর্টের কাছে।

৩। একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীনে এই মামলায় সরকারের হস্তক্ষেপ করার কোন অবকাশ ছিল না। বরং সুষ্ঠুভাবে এই মামলার বিচার সম্পন্ন করার জন্য সরকার সকল প্রকার সহযোগিতা করেছে। এই রায়কে defend করা বা এই রায়ে সরকারের ক্ষুব্ধ বা offended হওয়ার কোন কারণ নেই।

মাননীয় স্পীকার, আওয়ামী লীগ যে তাদের শাসনামলে এই মামলার নিষ্পত্তি চায় নি, অপরাধীদের শাস্তি দিতে চায় নি এবং রাজনৈতিক কারণে এই মামলাটি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন তার অকাট্য প্রমাণ হল যে সরকারে আসার পর তাঁরা ২ বছর ৪ মাস সময় অতিবাহিত করেছেন মামলার চার্জশীট জমা দিতে এবং এরপর আরও ১ বছর ৩ মাস পর মামলা পরিচালনা করার জন্য জনাব সিরাজুল হককে বিশেষ পিপি নিয়োগ করেন। ২ বছর ৪ মাস চার্জশীট দেন নি। আমরা সকলেই জানি বিগত সরকারের সময় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী কে ছিলেন? আইন-মন্ত্রী কে ছিলেন? আমি তাঁদের নাম উল্লেখ করতে চাই না। কিন্তু চার্জশীট দিতে কেন ২ বছর ৪ মাস সময় লাগে? আর ১ বছর ৩ মাস লেগেছে তাদের পিপি নিয়োগ করতে! অথচ আজকে আমাদেরকে দোষারোপ করেন আপনারা। Look at yourself, stand up before a mirror and look at your own faces. You will get the answer.

আমাদের সময় যদি সাধারণ দায়রা আদালতে শিহাব হত্যা মামলা ৩ মাসের মধ্যে, মোহাম্মদপুরের হারেজ ও বারেজ দুই ভাই হত্যা মামলা ৫ মাসের মধ্যে, বুশরা হত্যা মামলা ৫ মাসের মধ্যে, গাইবান্ধার তৃষা হত্যা মামলা ২ মাস ১৪ দিনে নিষ্পত্তি হতে পারে, তাহলে আওয়ামী লীগ সময়ে এই মামলার নিষ্পত্তি ৫ বছরে হয় নি কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আপনাদেরকে দিতে হবে। তাছাড়া দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে গত ২ বছরে ৪৫০টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। গেন্ডারিয়ায় জোড়া খুন, শিপু হত্যা মামলা, মহিমা হত্যা মামলা, সনি হত্যা, এডভোকেট হাবিব মণ্ডল হত্যা মামলাসহ আরও কয়েক শত মামলা ৬ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। আওয়ামী লীগ বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। সেটার প্রমাণ তারা এর আগে বহুবার দিয়েছে। চতুর্থ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে তারা বিচার বিভাগকে প্রশাসনের অধস্তন করেছিল। আজকে তাই একজন সম্মানিত নিরপেক্ষ বিচারকের রায়কে তারা "প্রহসনমূলক" বলে আখ্যায়িত করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতি অবজ্ঞা এবং আদালত অবমাননাকর দায়িত্বহীন বক্তব্য রাখতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। এই রায় দেশের নিম্নতম আদালত দিয়েছে। এর উপর আরও দুটি আদালত রয়েছে। যদি কোন কারণে এই রায়ে কেউ ক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন তাহলে আইন এবং সংবিধান অনুযায়ী এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এবং পরে আপীল বিভাগে আপীল করার সুযোগ রয়েছে। No judge is infallible। তাই নিজেদের অদক্ষতা ঢেকে রাখার অপচেষ্টা এবং বিচার বিভাগের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষমূলক মনোভাব আজকে জনসম্মুখে তাঁরা নিজেরাই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমি তাঁদের প্রতি আহবান জানাব যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার পথ পরিহার করে এই চারজন জাতীয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন, আর যদি এই রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন তাহলে উচ্চ আদালতে আপীল করে তাঁদের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করুন। তা না হলে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে, আওয়ামী লীগ কর্তৃক বিচার বিভাগের সম্মান, মর্যাদা এবং স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার যে কোন অপচেষ্টাকে এই সরকার অবশ্যই প্রতিহত করবে।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জাতীয় সংসদে সকল দলের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নারী সমাজের ক্ষমতায়ন আরও সুদৃঢ় হবে

জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪

১৩ সেপ্টেম্বর এবং ২৯ নভেম্বর ২০০৪

বর্তমান সংসদে নারীদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন নেই। সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন ২০০৪ দ্বারা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫-র ৩ উপধারার সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর ক্ষমতায়ন সুদৃঢ় করা হয়। সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে উন্নীত করে ৪৫ করা হয় এবং সংসদে নির্বাচিত দল ও জোটসমূহের মধ্যে এই আসনগুলি একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে আনুপাতিক হারে বন্টন করার বিধান করা হয়। সংবিধানের এই উন্নতমানের নতুন অধিকতর গণতান্ত্রিক বিধানকে কার্যকর করার জন্য এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে আনুপাতিক হারে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা বাংলাদেশে এই প্রথম। বিষয়টি নতুন বিধায় আইনটি প্রণয়ন করার জন্য অনেক গবেষণার প্রয়োজন হয় এবং আনুপাতিকহারে আসন বন্টনের প্রক্রিয়ায় ভোট বিভক্তি এবং বিভাজনের গাণিতিক একটি সার্বজনীন ফর্মুলার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এ বিষয়ে আমার নিজেরও কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।

মাননীয় স্পীকার

আজকে এই জোট সরকারের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। ১৯৭২ সালের প্রথম সংবিধানে সংসদে ৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত ছিল মহিলাদের জন্য। এরপর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে এই সংখ্যাকে ১০ শতাংশে উন্নীত করে সংবিধানে ৩০টি মহিলা আসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৯০ সালে আবার সংবিধান সংশোধন করে আরও দশ বছরের জন্য একই বিধান করা হয়। সেটা ২০০০ সালে শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ বিগত পার্লামেন্টের সময় সেটা শেষ হয়ে যায় এবং এখন এই মুহূর্তে সংসদে মহিলাদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা নেই। শহীদ জিয়া মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় করেছিলেন। এইবার আমরা সংশোধনী এনেছি, মহিলাদের আসন ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করার জন্য। আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল যে, আমরা আসন সংখ্যা বাড়াব। সেইজন্য আমরা ৪৫টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করেছি।

মাননীয় স্পীকার, সারা পৃথিবীতে যে সমীক্ষা আছে, United Nations Development Fund for Womens Report (Progress for the Women) 2002 অনুযায়ী সারা বিশ্বে নারী প্রতিনিধিত্বের গড় হল 15.2%, world average of women representation in Parliament। আমরা সেই আলোকেই এটা করেছি। একদিকে যেমন আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার, সেটা রক্ষা করেছি, অন্যদিকে আন্তর্জাতিকভাবে যে গড় এখন প্রচলিত আছে, সেটাই আমরা রেখেছি। পৃথিবীর ১৮৩টি দেশে পার্লামেন্টে মহিলাদের ১৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রতিনিধিত্ব নেই। তার নিচে আছে। মাত্র ১৩টি পার্লামেন্টে ১৫ শতাংশের উর্ধ্বে আছে। আজকে বাংলাদেশ একটি অনুন্নত গরিব দেশ হয়েও তাদের পর্যায়ে গেছি। গরিব দেশ হওয়া সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করি বলে আজকে আমরা এরকম একটি প্রস্তাব সংসদে আনতে সক্ষম হয়েছি।

মাননীয় স্পীকার, এই বিলটি আমরা স্থায়ী কমিটিতে নেব। আমি কমিটির সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করব জনাব কাদের সিদ্দিকীকে এবং প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী দলের যাঁরা নেতৃবৃন্দ রয়েছেন তাঁদেরকে সেখানে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। সেই স্থায়ী কমিটিতে বসে আমরা

www.pathagar.com

আলাপ-আলোচনা করব। দরকার হলে, নারী সংগঠন যারা এ ব্যাপারে সক্রিয় আছে তাদেরকেও আমরা দাওয়াত দেব, তাদের মতামত নেব। তারপর আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই আইনটি চূড়ান্ত করব।

মাননীয় স্পীকার, আমি শুধু সংক্ষেপে বলতে চাই, সরাসরি নির্বাচনের প্রভিশন আমাদের সংবিধানে আছে। ৩০০টি আসনের মধ্যে মহিলারা যে কোন সংখ্যক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন এবং তাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন। সুতরাং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা আমাদের রয়েছে। এছাড়াও আমরা আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এই বিলের মধ্যে এনেছি। যেটি অতীতে কোন সরকারের পক্ষে আনা সম্ভব হয়নি। আমরা ইচ্ছা করলে এই ৪৫টি আসন মেজরিটি পার্টির পক্ষে রাখার ব্যবস্থা করতে পারতাম। যেটা আগে ছিল। আমি এগুলির উপর বক্তব্য বিস্তারিতভাবে দেব যখন এই বিলটি বিবেচনার জন্য আসবে। এটি একটা গণতান্ত্রিক মন-সম্পন্ন সরকার, it's a democratic party। আমরা চাই যে, এই সংসদে নির্বাচিত সকল রাজনৈতিক দল, এমনকি যাঁরা একটি সদস্য পেয়েছেন তাদেরকেও একটি অধিকার দেওয়া, যাতে তাঁদের মতাবলম্বী মহিলাও এসে মহিলা সমাজের সমস্যাগুলি এই সংসদে তুলে ধরতে পারেন। মেইন স্ট্রিম রাজনীতিতে যাতে সকল দলের সম্মানিত মহিলা সদস্যরা অংশগ্রহণ করতে পারেন সেজন্য আমরা আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রেখেছি। এটি একটি উন্নতমানের ব্যবস্থা। এটার জন্য একটা উদার মনের প্রয়োজন, যে উদার মনের পরিচয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। আজকে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি আমরা। আজকে আমরা ইচ্ছা করলে ৪৫টি আসনই নিতে পারতাম, কিন্তু আমরা নিচ্ছি না। যাঁরা বিরোধী দলে আছেন এবং আপনারা যাঁরা একটা আসনও পেয়েছেন তাঁরা ৪ জন সংসদ সদস্যকে নিয়ে একটা জোট করে একজন মহিলা প্রতিনিধি আনতে পারবেন। এই ব্যবস্থাটা এই আইনের মধ্যে করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আমি বলতে চাই যে, আমরা আমাদের অঙ্গীকার থেকে সরে যাইনি। যে কোন প্রস্তাব এই সংসদে আমরা আনি না কেন দেশের সার্বিক মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই আমাদেরকে আনতে হবে। আজকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। পার্লামেন্টে নারী আসন এবং মূল রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা কী হবে? সেখানে আমাদেরকে বাস্তবসম্মত এবং সংবিধানসম্মত হতে হবে। যে প্রস্তাবগুলি আছে, সেগুলি আমি বিবেচনার সময় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করব। আমাদের অপশনগুলি কী ছিল? সরাসরি নির্বাচনের যে প্রস্তাব নারী সংগঠনসমূহ দিয়েছিল সেই প্রস্তাবগুলি কী কী ছিল সেগুলি আমি বলব। আজকে এটুকুই বলতে চাই যে, আমরা যে প্রস্তাবটা করেছি এটা গণতান্ত্রিক, উদারমনা, বাস্তবসম্মত এবং সংবিধানসম্মত।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ।*

২৯ নভেম্বর ২০০৪**

মাননীয় স্পীকার

সম্মানিত সংসদ সদস্যগণ প্রায় ৪৫ মিনিট যাবত এই বিলের উপর আলোচনা করেছেন। আমি সেইজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই।

(বাধা প্রধান)

আপনারা এতক্ষণ বলেছেন, এখন আমাকে বলতে দেবেন না? আপনাদের কথা এতক্ষণ শুনি নি? এজন্যই তো আপনারা আওয়ামী লীগ করেন। আপনারা প্রমাণ করেছেন যে, আপনারা আওয়ামী লীগ। ৪৫ মিনিট আপনারা বক্তব্য রেখেছেন, বিভিন্ন সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তার উত্তর শোনার মত ধৈর্য আপনাদের নেই এবং সেজন্যই আপনারা আওয়ামী লীগ।

* সেদিন বিলটি উত্থাপন করা হয়।

** বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর স্থায়ী কমিটি রিপোর্ট দাখিল করলে বিলটি সেদিন বিবেচনা এবং পাসের জন্য উত্থাপন করা হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

অডেন, ডবলিউ. এইচ., ১০২
অতীশ দীপঙ্করের চিতাভস্ম, ৩৯
অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ১৩৭, ১৪৬, ১৭৫, ১৭৭-৭৯
অমর্ত্য সেন, ১০৭, ১০৯, ১৫৩
অরগানাইজেশন অব দি ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি), ২৮০
অর্থঋণ আদালত, ২৭৮; আইন, ২০০-২০৭
অর্থনৈতিক
উন্নয়ন, ২৭, ৪৮-৪৯, ১০৪, ১৭০; পরনির্ভরশীলতা, ৫১-৫২; জরিপ, ১৪৬
অর্থবিল (মানি বিল), ১১, ১৪৫, ২৫০, ২৫৮
অস্ত্রের
রাজনীতি, ১৭-১৯; লাইসেন্স, ১৮৬
আইএলও কনভেনশন, ৯৪
আইএসআই, ২১৪
আইনজীবীদের সনদ, ২৩২
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ১৪৬, ১৫৯-৬০, ১৮৫-৮৭
আইয়ুব খান, xi, ২৫, ৩৩, ৩৬, ১২৭, ১৩৮
আইয়ুবুর রহমান, ৬৭
আওয়ামী লীগ, xiii, ১,২,১২, ২২, ২৮-৩০, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪৩, ৫০, ৫৯, ৯৭, ১৩৫, ১৫৬, ১৬০, ১৭১, ১৭৫, ১৮১, ১৮৫-৮৭, ১৯০-৯২, ১৯৫-৯৬, ১৯৮, ২১০, ২১২-১৩, ২১৫, ২১৭, ২২৩, ২২৫, ২৫২-৫৩, ২৬০, ২৬২, ২৬৯, ২৭৯-৮০, ২৮২-৮৩, ২৯২, ২৯৫, ২৯৭, ৩০০-০৫
আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, ৩০
আটালী, জ্যাক., ৯৭
আতিকুর রহমান, ২০৪
আদমজী মিল, ২১০
আদভানী, লালকৃষ্ণ, ২১৪, ২৮১
আদালত প্রশাসন, ২৪১-৪২
আদালত সংস্কার, ২৪১-৪২
আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, ৩০৫
আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ফোরাম, ৬৩
আফগানিস্তান, ৫১, ১০৪, ১২০, ২১৩
আবদুর রব, আ স ম, ১৬, ১৮, ৩৩-৩৬, ৪০, ৪৩-৪৫, ৫০, ৫২-৫৩, ৫৬-৫৭, ৬৪, ৯১-৯৪, ১০৫, ১১৮, ১২৫, ১৩২, ১৫৫
আবদুর রহমান বিশ্বাস, ১৫৯-১৬০
আবদুর রাজ্জাক, ১৯৬, ৩০৪
আবদুল জলিল, ২৮, ২১৫, ২৭৭, ২৮৪
আবদুল মতিন চৌধুরী, ১৮
আবদুল মান্নান, ২৫৫
আবদুল মোমিন, ১৯৬
আবদুল হক, খন্দকার, ৬৭
আবদুল হাই, ১২৪, ১৩১,
আবদুল হামিদ, ২৯৬
আবদুস ছাত্তার, ৬৭
আবদুস শহীদ, মোঃ, ২৭৫
আবদুস সাত্তার, ১২২-২৪, ১২৮
আবদুস সাত্তার, বিচারপতি, ১-৬
আবদুস সামাদ আজাদ, ২৭০, ২৭৭
আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, ১৯৩
আমজাদ হোসেন, সরদার, ১৬
আমলাতন্ত্র, ১,২,৮, ৮৯, ১১৬-১১৭, ১২৩, ১৪৮
আমলা-রাজনীতিক সম্পর্ক, ৯৫
আমেরিকা, ২২, ৬০, ৭৪, ১০২, ২৯০-৯১; রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা, ১২৯
আমেরিকান
এয়ারফোর্স, ৩২; কংগ্রেস, ৫১, ৭৮, ১২৩; ফেডারেশন অব লেবার- কংগ্রেস অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশনস (এএফএল- সিআইএ), ২৯০; সিনেট, ২৫৪; হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ, ১৩১
আয়েন উদ্দিন, মোঃ, ১৬
আল-কায়েদা, ২১৪-১৫
আলতাফ হোসেন, গোলন্দাজ, ১৬৮
আলমগীর কবির, ২০৯
আহসানউল্যাহ্‌ মাস্টার, ২৬৭-২৬৮
আহসান হাবিব লিঙ্কন, ৯৫
ইইসি, ৭৮, ১৬৭
ইংল্যান্ড, ৫১, ৯৯
ইপিজেড শ্রমিক সংঘ ও শিল্প সম্পর্ক আইন, ২৮৯-৯৯
ইউএনডিপি, ১২১
ইউএসএইড, ৯৬
ইউনাইটেড নেশন্স কমিশন ফর রিফিউজিস, ১৪৩
ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ফর উইমেন্স রিপোর্ট (প্রগ্রেস ফর উইমেন্স) ২০০২, ২৫৩-২৫৪, ২৯৯
ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস, ২৯০-৯১
ইউরোপিয়ান
কমিউনিটি, ১৫০; পার্লামেন্ট, ১২১; মার্কেট ১১৫, ১৫০
ইকনমিক ডেমোক্রেসি, ২৩

www.pathagar.com

ইকবাল, এইচ. বি. এম., ১৮৬, ২৭৯
ইনডিয়ান এক্সপ্রেস, ৪৬
ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ), ৯৭, ১৬২
ইন্দোনেশিয়া, ৬০, ১০৩, ১১৯, ১৫২, ১৬২, ১৬৪
ইয়াহিয়া খান, ৩৭
ইয়েমেন, ৫১
ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ৫১, ১০৪, ১২০
ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, ৬২
ইলেকট্রনিক্স শিল্প কারখানা, ২৫, ৬২, ১০৩, ১১৮
ইসলাম ধর্ম, ৩৩, ৩৫-৩৭, ৪১-৪২
ইসলামী
উম্মা, ১৫৬, ২৮০; ঐক্যজোট, ৩০৫; মূল্যবোধ, ৪১; রাষ্ট্র, ৩৩, ৫০; শীর্ষ সম্মেলন, লাহোর, ৫০; সম্মেলন, ৯৬
ইস্ট-ওয়েস্ট ইন্টারকানেকটর, ৩০
উ আংসুন, ১৪১-৪২
উইলসন, হ্যারল্ড, xvi
উন্নয়ন
কর্মসূচী, ১৪৫; খাত, ৯৬, বরাদ্দ, ১১১; বাজেট, ১১, ১২, ৫৫
উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, ১৯০-৯১
উনিশ শ চুয়াত্তর সালের দুর্ভিক্ষ, ২৯৫
উনিশ শ চুয়ান্ন সালের ২১ দফা, ৩৬
উনিশ শ ছেষট্টি সালের ৬ দফা, ৩৬
উপজাতীয়, ৩৮, ৭৯; কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮৩-৮৪; নেতৃবৃন্দ, ৮৩; প্রথাগত সুযোগ সুবিধা, ৮২; বৌদ্ধ, ৩৯; মেমোরান্ডাম, ৮২; হেডম্যান, ৮১
উপজেলা, ৪৮, ৯৯, ১১২, ১১৩; অবকাঠামো, ১১০-১১১; কাঠামো, ১৪৭; চেয়ারম্যান, ৮,৬৯; পদ্ধতি, ১,৭,৪৩, ৪৮; পরিষদ, ৮, ২৮, ৪৮, ৮৬; বাজেট বরাদ্দ, ৮
ঋণ খেলাপী, ২০৫, ২০৭
ঋণ সালিশী
আইন, ৯৮, বোর্ড, ৯৮, ১১০
ঋণের সুদ, ১০০
একদলীয় শাসন ব্যবস্থা, xii, ২৮, ৫৮, ১২৮, ২৬৬
এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, ২১১
এন্টি ডাম্পিং ল, ১৪৯
এন্টি মানি লন্ডারিং এ্যাক্ট, ২১০-১১
এরশাদ, হুসেইন মুহম্মদ, xii-xiii, ১, ৭, ৮, ১১, ১৩-১৪, ১৮, ৩৪, ৪১, ৪৩-৫৩, ৬২, ৬৬, ৭১, ৭৬-৭৮, ৮৩, ৮৬, ৯৫-১০৫, ১২২, ১২৫, ১২৭, ১৫২-৫৩, ২৪৬
এলিয়ট, টি. এস., ৯৭
এসিড অপরাধ দমন, ১৮৩-১৮৪, ২১১, ২১৮
এসিড নিয়ন্ত্রণ, ১৮১-১৮২, ১৮৭, ২১১, ২১৮
এহসান আলী খান, ১৩১
এ্যাপলবাই, হামফ্রে, ৯৯
ওদুদ চৌধুরী, ৯৮
ওবসানক্সি, মলি, ১০৯
ওয়াইনার, মাইরন, ৫৫, ১০৭-০৮
ওয়াক্কাস, মাওলানা, ৪০
ওয়ান স্টপ সার্ভিস, ৮৯, ৯১
ওয়ার্কার্স পার্টি, xii
ওয়ালিক, ক্রিস্টিন, ২৮৩
ওয়াহিদুল হক, ১০৭
ওয়েজ কমিশন, ১৬৮
ঔষধনীতি, ৮, ৪৬
কনজুমারস এসোসিয়েশন, ১৬২
কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যুজ, ৯০
কমরেড ফরহাদ, ২২, ৩০
কম্পিউটার সংযোজন, ৬৩, ১০২, ১১৬
কম্পুচিয়া, ৭৪
কর, ৩-৪, ২২, ৫৬, ১০৯, ১৫০; কাঠামো, ২৬; দাতা, ৪, ১০১; নির্ধারণ, ৩, ৪, ২৩; পুনর্বিন্যাস, ২৭-২৮; প্রস্তাব, ১১
কর্মসংস্থান, ১, ৫, ৭, ২১, ২৪, ২৬-২৭, ৩২, ৪৭-৫০, ৬০, ৬২-৬৪, ৯৫, ১০১, ১০৯, ১১১-১৪, ১৭০, ১৮০, ১০২-৫, ১৬১, ১৬৪, ১৬৮, ২১০-১১, ২৪৯
কল্যাণ সিং, ১৫৬
কলোরাডো নদী, ৭৫
কাজী জাফর আহমদ, ৬৪
কাজী জাফরউল্যাহ, ২৭৭
কাদের সিদ্দিকী, ২১৭, ২২০, ২২৩-২৪, ২২৭-২৮, ২৩৪, ২৪২-৪৩, ২৪৬, ২৫৫, ২৫৭-৫৮, ২৬০-৬১, ২৬৬, ২৬৯, ২৭১, ২৭৪-৭৫, ২৯১, ২৯৯, ৩০৫
কাপ্তাই ড্যাম, ৭৯-৮০, ৮২
কামরুজ্জামান, এ. এইচ. এম., ২৯৭
কামাল আহমেদ মজুমদার, ১৮৭
কামাল হোসেন, ১, ১২, ৩৬
কারা সংস্কার কমিশন, ২১২, ২৭৯
কিবরিয়া, শাহ এ. এম. এস., ২৭৭, ২৭৯-৮০
কিসিঞ্জার, হেনরী, ৩১, ২৮৩
কুয়েত যুদ্ধ, ১৩৫
কৃষি, ১, ৪, ৬০, ৯৮, ১১৩, ১৫১, ১৬৪; উপকরণ, ৫; কর্মসংস্থান, ২, ৬০, ১১৩; জাতীয় উৎপাদনে অংশ, ২১; পণ্যমূল্য, ৪, ১৬৭-১৬৮; ব্যবস্থাপনা, ১
কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ৮৩
কৃষিঋণ, ৫, ৬৫, ১১১; সার্টিফিকেট মামলা, ১১১; সুদ মওকুফ, ১৪৯
কেনেডি, জন এফ., ৬৬
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ১৮
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ১৯
কোরিয়া, ২৪-২৫, ৬০, ৬২, ৯৪, ১০৩, ১১১, ১১৫, ১৫২, ১৬৪৬৫, ১৬৮; অর্থনৈতিক নীতি, ১৫২; শিক্ষা ব্যবস্থা, ১৫১

www.pathagar.com

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে গণ্য হবে। আর আমি যদি কম পাঠাই তাহলে ঐ কম সংখ্যকটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে। কিন্তু যদি কোন দল বেশি পাঠায়, তাদের পাওনার চেয়ে বেশি পাঠায়, তাহলে সেখানে সেই দলের সংসদ-সদস্যদের মধ্যে উন্মুক্ত ভোটে নির্বাচন হবে। তখন একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন হবে। আর এই যে দশ দিন সময় দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে একে অন্যের সাথে জোট গঠন করতে পারবে। The small parties, like আমাদের বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর দল আছে, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সাহেবের দল আছে, যাদের সদস্য সংখ্যা পাঁচের নিচে আছে, নাজিউর রহমান সাহেবের চারটি আছে। দেখা যাবে, সব শেষে ১৩ জন সংসদ সদস্য থাকবেন to vote for two seats। বাকি ৪৩টি বড় বড় দলগুলির জন্য বণ্টনের মাধ্যমেই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। শুধু দুটি সীটের জন্য তাঁরা ইচ্ছা করলে জোট করতে পারবেন। নিজেদের মধ্যে জোট করতে পারবেন। যাঁরা independent আছেন, তাঁরা ইসলামী ঐক্যজোটের সঙ্গে জোট করতে পারবেন। ইসলামী ঐক্যজোট চাইলে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর সাথে জোট করতে পারবেন। Minumum পাঁচজনের একটি জোট যদি হয়, তাহলে সেই জোটও একটি আসন পাবে। অর্থাৎ ঐ তের জনের মধ্যে পাঁচজন করে যদি তাঁরা জোট করতে পারেন, তাহলে দুটি আসন পাবেন। এভাবেই calculate করা হয়েছে। আর যদি সমান সমান হয়, তাহলে কীভাবে নিষ্পত্তি হবে, সেটাও আইনের মধ্যে দেওয়া আছে।

মাননীয় স্পীকার, it is an educational thing for all of us। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। খুশি হতাম, যদি তাঁদের বক্তব্যের উত্তর শোনার জন্য ধৈর্য তাদের থাকত। তাহলে মনে করতাম যে, আওয়ামী লীগ পার্টি হিসেবে has really improved and has become a democratic political party. Unfortunately they have denied themselves of the elevation।

আমি এ বিলের উপর আলোচনার জন্য মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব মোঃ মসিউর রহমান ও গোলাম হাবিব দুলালকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। যদি ঠিক নম্বরে নমিনেশন দেওয়া হয় তাহলে নির্বাচনের ঐ প্রক্রিয়ায় যেতে হবে না। অর্থাৎ অংকের অনেক calculation বোঝারই দরকার হবে না। কিন্তু যদি নির্বাচন হয় তাহলে এই system-এ নির্বাচনটা হবে। সেখানে আমি অনুরোধ করব আইনটা বার বার পড়ার জন্য। আপনি মনোযোগ দিয়ে যদি দু'বার পড়েন, আমি মনে করি তাহলে calculationটা বুঝতে পারবেন এবং নির্বাচনটা কীভাবে হবে সেটাও বুঝতে পারবেন। আর correct number-এ যদি nomination হয়, তাহলে সেখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন হয়ে যাবে। এটাকে simplify করার কোন scope নেই। Because it is just simple arithmatical solution of factions। কোন না কোনভাবে factions গুলির সমাধান দিতে হবে। মাননীয় সদস্য ভুলের কথা বলেছেন। Law is not perfect। Law তে ভুল থাকতে পারে এবং সেগুলি হয়তো সংশোধন করতে হতে পারে। এ আইন একেবারে sacrosanct নয়। It has to go through a period of tests।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।*

---

* বিলটি সেদিন সংসদে পাস হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

অডেন, ডবলিউ. এইচ., ১০২
অতীশ দীপঙ্করের চিতাভস্ম, ৩৯
অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ১৩৭, ১৪৬, ১৭৫, ১৭৭-৭৯
অমর্ত্য সেন, ১০৭, ১০৯, ১৫৩
অরগানাইজেশন অব দি ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি), ২৮০
অর্থঋণ আদালত, ২৭৮; আইন, ২০০-২০৭
অর্থনৈতিক
উন্নয়ন, ২৭, ৪৮-৪৯, ১০৪, ১৭০; পরনির্ভরশীলতা, ৫১-৫২; জরিপ, ১৪৬
অর্থবিল (মানি বিল), ১১, ১৪৫, ২৫০, ২৫৮
অস্ত্রের
রাজনীতি, ১৭-১৯; লাইসেন্স, ১৮৬
আইএলও কনভেনশন, ৯৪
আইএসআই, ২১৪
আইনজীবীদের সনদ, ২৩২
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ১৪৬, ১৫৯-৬০, ১৮৫-৮৭
আইয়ুব খান, xi, ২৫, ৩৩, ৩৬, ১২৭, ১৩৮
আইয়ুবুর রহমান, ৬৭
আওয়ামী লীগ, xiii, ১,২,১২, ২২, ২৮-৩০, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪৩, ৫০, ৫৯, ৯৭, ১৩৫, ১৫৬, ১৬০, ১৭১, ১৭৫, ১৮১, ১৮৫-৮৭, ১৯০-৯২, ১৯৫-৯৬, ১৯৮, ২১০, ২১২-১৩, ২১৫, ২১৭, ২২৩, ২২৫, ২৫২-৫৩, ২৬০, ২৬২, ২৬৯, ২৭৯-৮০, ২৮২-৮৩, ২৯২, ২৯৫, ২৯৭, ৩০০-০৫
আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, ৩০
আটালী, জ্যাক., ৯৭
আতিকুর রহমান, ২০৪
আদমজী মিল, ২১০
আদভানী, লালকৃষ্ণ, ২১৪, ২৮১
আদালত প্রশাসন, ২৪১-৪২
আদালত সংস্কার, ২৪১-৪২
আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, ৩০৫
আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ফোরাম, ৬৩
আফগানিস্তান, ৫১, ১০৪, ১২০, ২১৩
আবদুর রব, আ স ম, ১৬, ১৮, ৩৩-৩৬, ৪০, ৪৩-৪৫, ৫০, ৫২-৫৩, ৫৬-৫৭, ৬৪, ৯১-৯৪, ১০৫, ১১৮, ১২৫, ১৩২, ১৫৫
আবদুর রহমান বিশ্বাস, ১৫৯-১৬০
আবদুর রাজ্জাক, ১৯৬, ৩০৪
আবদুল জলিল, ২৮, ২১৫, ২৭৭, ২৮৪
আবদুল মতিন চৌধুরী, ১৮
আবদুল মান্নান, ২৫৫
আবদুল মোমিন, ১৯৬
আবদুল হক, খন্দকার, ৬৭
আবদুল হাই, ১২৪, ১৩১,
আবদুল হামিদ, ২৯৬
আবদুস ছাত্তার, ৬৭
আবদুস শহীদ, মোঃ, ২৭৫
আবদুস সাত্তার, ১২২-২৪, ১২৮
আবদুস সাত্তার, বিচারপতি, ১-৬
আবদুস সামাদ আজাদ, ২৭০, ২৭৭
আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, ১৯৩
আমজাদ হোসেন, সরদার, ১৬
আমলাতন্ত্র, ১,২,৮, ৮৯, ১১৬-১১৭, ১২৩, ১৪৮
আমলা-রাজনীতিক সম্পর্ক, ৯৫
আমেরিকা, ২২, ৬০, ৭৪, ১০২, ২৯০-৯১; রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা, ১২৯
আমেরিকান
এয়ারফোর্স, ৩২; কংগ্রেস, ৫১, ৭৮, ১২৩; ফেডারেশন অব লেবার- কংগ্রেস অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশনস (এএফএল- সিআইএ), ২৯০; সিনেট, ২৫৪; হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ, ১৩১
আয়েন উদ্দিন, মোঃ, ১৬
আল-কায়েদা, ২১৪-১৫
আলতাফ হোসেন, গোলন্দাজ, ১৬৮
আলমগীর কবির, ২০৯
আহসানউল্যাহ্ মাস্টার, ২৬৭-২৬৮
আহসান হাবিব লিঙ্কন, ৯৫
ইইসি, ৭৮, ১৬৭
ইংল্যান্ড, ৫১, ৯৯
ইপিজেড শ্রমিক সংঘ ও শিল্প সম্পর্ক আইন, ২৮৯-৯৯
ইউএনডিপি, ১২১
ইউএসএইড, ৯৬
ইউনাইটেড নেশন্স কমিশন ফর রিফিউজিস, ১৪৩
ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ফর উইমেন্স রিপোর্ট (প্রগ্রেস ফর উইমেন্স) ২০০২, ২৫৩-২৫৪, ২৯৯
ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস, ২৯০-৯১
ইউরোপিয়ান
কমিউনিটি, ১৫০; পার্লামেন্ট, ১২১; মার্কেট ১১৫, ১৫০
ইকনমিক ডেমোক্রেসি, ২৩

www.pathagar.com

ইকবাল, এইচ. বি. এম., ১৮৬, ২৭৯
ইনডিয়ান এক্সপ্রেস, ৪৬
ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ), ৯৭, ১৬২
ইন্দোনেশিয়া, ৬০, ১০৩, ১১৯, ১৫২, ১৬২, ১৬৪
ইয়াহিয়া খান, ৩৭
ইয়েমেন, ৫১
ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ৫১, ১০৪, ১২০
ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, ৬২
ইলেকট্রনিক্স শিল্প কারখানা, ২৫, ৬২, ১০৩, ১১৮
ইসলাম ধর্ম, ৩৩, ৩৫-৩৭, ৪১-৪২
ইসলামী
উম্মা, ১৫৬, ২৮০; ঐক্যজোট, ৩০৫; মূল্যবোধ, ৪১; রাষ্ট্র, ৩৩, ৫০; শীর্ষ সম্মেলন, লাহোর, ৫০; সম্মেলন, ৯৬
ইস্ট-ওয়েস্ট ইন্টারকানেকটর, ৩০
উ আংসুন, ১৪১-৪২
উইলসন, হ্যারল্ড, xvi
উন্নয়ন
কর্মসূচী, ১৪৫; খাত, ৯৬, বরাদ্দ, ১১১; বাজেট, ১১, ১২, ৫৫
উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, ১৯০-৯১
উনিশ শ চুয়াত্তর সালের দুর্ভিক্ষ, ২৯৫
উনিশ শ চুয়ান্ন সালের ২১ দফা, ৩৬
উনিশ শ ছেষট্টি সালের ৬ দফা, ৩৬
উপজাতীয়, ৩৮, ৭৯; কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮৩-৮৪; নেতৃবৃন্দ, ৮৩; প্রথাগত সুযোগ সুবিধা, ৮২; বৌদ্ধ, ৩৯; মেমোরান্ডাম, ৮২; হেডম্যান, ৮১
উপজেলা, ৪৮, ৯৯, ১১২, ১১৩; অবকাঠামো, ১১০-১১১; কাঠামো, ১৪৭; চেয়ারম্যান, ৮,৬৯; পদ্ধতি, ১,৭,৪৩, ৪৮; পরিষদ, ৮, ২৮, ৪৮, ৮৬; বাজেট বরাদ্দ, ৮
ঋণ খেলাপী, ২০৫, ২০৭
ঋণ সালিশী
আইন, ৯৮, বোর্ড, ৯৮, ১১০
ঋণের সুদ, ১০০
একদলীয় শাসন ব্যবস্থা, xii, ২৮, ৫৮, ১২৮, ২৬৬
এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, ২১১
এন্টি ডাম্পিং ল, ১৪৯
এন্টি মানি লন্ডারিং এ্যাক্ট, ২১০-১১
এরশাদ, হুসেইন মুহম্মদ, xii-xiii, ১, ৭, ৮, ১১, ১৩-১৪, ১৮, ৩৪, ৪১, ৪৩-৫৩, ৬২, ৬৬, ৭১, ৭৬-৭৮, ৮৩, ৮৬, ৯৫-১০৫, ১২২, ১২৫, ১২৭, ১৫২-৫৩, ২৪৬
এলিয়ট, টি. এস., ৯৭
এসিড অপরাধ দমন, ১৮৩-১৮৪, ২১১, ২১৮
এসিড নিয়ন্ত্রণ, ১৮১-১৮২, ১৮৭, ২১১, ২১৮
এহসান আলী খান, ১৩১
এ্যাপলবাই, হামফ্রে, ৯৯
ওদুদ চৌধুরী, ৯৮
ওবসানস্কি, মলি, ১০৯
ওয়াইনার, মাইরন, ৫৫, ১০৭-০৮
ওয়াক্কাস, মাওলানা, ৪০
ওয়ান স্টপ সার্ভিস, ৮৯, ৯১
ওয়ার্কার্স পার্টি, xii
ওয়ালিক, ক্রিস্টিন, ২৮৩
ওয়াহিদুল হক, ১০৭
ওয়েজ কমিশন, ১৬৮
ঔষধনীতি, ৮, ৪৬
কনজুমারস এসোসিয়েশন, ১৬২
কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যুজ, ৯০
কমরেড ফরহাদ, ২২, ৩০
কম্পিউটার সংযোজন, ৬৩, ১০২, ১১৬
কম্পুচিয়া, ৭৪
কর, ৩-৪, ২২, ৫৬, ১০৯, ১৫০; কাঠামো, ২৬; দাতা, ৪, ১০১; নির্ধারণ, ৩, ৪, ২৩; পুনর্বিন্যাস, ২৭-২৮; প্রস্তাব, ১১
কর্মসংস্থান, ১, ৫, ৭, ২১, ২৪, ২৬-২৭, ৩২, ৪৯-৫০, ৬০, ৬২-৬৪, ৯৫, ১০১, ১০৯, ১১১-১৪, ১৭০, ১৮০, ১০২-৫, ১৬১, ১৬৪, ১৬৮, ২১০-১১, ২৪৯
কল্যাণ সিং, ১৫৬
কলোরাডো নদী, ৭৫
কাজী জাফর আহমদ, ৬৪
কাজী জাফরউল্যাহ, ২৭৭
কাদের সিদ্দিকী, ২১৭, ২২০, ২২৩-২৪, ২২৭-২৮, ২৩৪, ২৪২-৪৩, ২৪৬, ২৫৫, ২৫৭-৫৮, ২৬০-৬১, ২৬৬, ২৬৯, ২৭১, ২৭৪-৭৫, ২৯১, ২৯৯, ৩০৫
কাপ্তাই ড্যাম, ৭৯-৮০, ৮২
কামরুজ্জামান, এ. এইচ. এম., ২৯৭
কামাল আহমেদ মজুমদার, ১৮৭
কামাল হোসেন, ১, ১২, ৩৬
কারা সংস্কার কমিশন, ২১২, ২৭৯
কিবরিয়া, শাহ এ. এম. এস., ২৭৭, ২৭৯-৮০
কিসিঞ্জার, হেনরী, ৩১, ২৮৩
কুয়েত যুদ্ধ, ১৩৫
কৃষি, ১, ৪, ৬০, ৯৮, ১১৩, ১৫১, ১৬৪; উপকরণ, ৫; কর্মসংস্থান, ২, ৬০, ১১৩; জাতীয় উৎপাদনে অংশ, ২১; পণ্যমূল্য, ৪, ১৬৭-১৬৮; ব্যবস্থাপনা, ১
কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ৮৩
কৃষিঋণ, ৫, ৬৫, ১১১; সার্টিফিকেট মামলা, ১১১; সুদ মওকুফ, ১৪৯
কেনেডি, জন এফ., ৬৬
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ১৮
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ১৯
কোরিয়া, ২৪-২৫, ৬০, ৬২, ৯৪, ১০৩, ১১১, ১১৫, ১৫২, ১৬৪৬৫, ১৬৮; অর্থনৈতিক নীতি, ১৫২; শিক্ষা ব্যবস্থা, ১৫১

www.pathagar.com

ক্রশনা, বার্নাড, ৯৭
ক্রিমিনাল ল এ্যামেন্ডমেন্ট আইন, ২৮৫-২৯০
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ২১, ৬১, ১১৩, ১৯৪, ১৪৯
ক্ষুদ্র শিল্প ও কারখানা, ২১, ২৬, ৬১, ৬৫, ৯৫, ১০১, ১১৪-১১৫
ক্ষুদ্রশিল্প ব্যাংক, ৬১
ক্ষেতমজুরের মজুরি, ৮
খন্দকার, এ.কে., ৮৩
খলিলুর রহমান, ৩১
খাগড়াছড়ি, ৭৯, ৮১, ৮৪
খাজা হাবিব, ২৭০, ২৮০
খাদ্য, ৫-৭, ২৪, ৪৯, ৬৫, ৭২, ১০৩, ১১১-১২, ১১৫, ১১৮, ১৫১; উৎপাদন, ৫, ৭, ২৪, ১০৩, ১১৮, ১৪৭, ১৬৮-৬৯, ২০৯, ২৮৩; স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ২৪, ৩২, ৪৯, ১১১
খান, এফ. আর., ৩২
খালেদ মোশাররফ, ২৯৫
খালেদা জিয়া, বেগম, ৩১, ১৪২, ১৭৭, ১৮৭, ২১০-১২, ২৬৩-৬৬, ২৮৪
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬৯
খুলনা শিপ-ইয়ার্ড, ৫৯
খোয়াই নদী, ১৪৭
গড় আয়ু, ২৮৩
গণ আন্দোলন ১৯৬৮-৬৯, ১২৮
গণতন্ত্র, ৯, ১২-১৬, ২৮, ৩৮, ৪৪, ৬৬, ৬৯-৭০, ১০৫, ১১৩, ১২০, ১২৫, ১২৭-২৯, ১৩২-১৩৬, ১৩৮, ১৪১, ১৪৮, ১৫৩-৫৪, ১৫৯-৬১, ১৭০, ১৭২, ১৭৫, ১৮০, ১৮৫, ১৮৭, ১৯৮, ২০৯, ২৩৪, ২৩৭, ২৫০, ২৫৫, ২৫৮, ২৬৫, ২৬৮-৬৯, ২৮০, ১৮৩; উত্তরণ প্রক্রিয়া, ১১-১৩; প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, ১৪৮, ২৫৩
গণতান্ত্রিক অধিকার, ৪৪, ৫২-৫৩, ১২৮; অর্থনীতি, ২২-২৩; ধারা, ১৩, ২২; প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ৯, ৮৫, ১২৯; রাজনীতি, ১২; রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ix, ১৩, ৯৯, ১৩৬
গণবাহিনী, ২০৪
গণভোট, ৩৫
গর্বাচেভ, মিখাইল, ১০০-১০১, ১০৪, ১০৭, ১১৯, ১২০
গলব্রেথ, জন কেনেথ, ৯৯, ১২৩
গান্ধী, রাজীব, ১৫৬
গান্ধী, সোনিয়া, ২৮২
গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী, ৭
গোফরান, এম. এ., ৩৫, ১২৪
গোমতী নদী, ১২০
গোলটেবিল বৈঠক ১৯৬৯, ৩৩, ৩৬
গোলাম কাদের, ২১৭, ২২০, ২২৩-২৬, ২৩৬-৩৯, ২৬২, ২৬৬, ৩০৪
গোলাম হাবিব দুলাল, ৩০৫
গ্রুপ সেভেনটি সেভেন, ৬৪
গ্লাস্‌নস্ট্‌, ১০৪, ১২১
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ১৭২
চামড়া, ৬২; জাত দ্রব্য, ৬১, ১১৫; রপ্তানী, ১১৫
চারদলীয় ঐক্যজোট, ১৭৫
চিটাগাং ড্রাই-ডক, ৫৯
চিত্রা নদী, ১২০
চীন, ৩৯, ৭৪, ৯৭, ৯৪, ১০৪, ১২০-২১, ১৪৯
চুনু মিয়া, ২৫, ৬২
জগন্নাথ হল, ১৮
জননিরাপত্তা আইন, ১৮৬, ১৯০, ২১৮, ২৮৩
জননিরাপত্তা ট্রাইব্যুনাল, ২২৭-২২৮
জননিরাপত্তা বিশেষ বিধান আইন, ২১৩
জনসংখ্যা, ৩, ৬, ২১, ২৩-২৪, ৩২, ৪৯, ৫৫, ৬০, ১০৯, ১১৯, ২৫১-৫২, ২৬৩, ৩০১; নিয়ন্ত্রণ, ৪৯, ১১১-১১২, ১৫১; বৃদ্ধির হার, ৪৯, ১১১, ১৪৭, ১৬৯, ২১০, ২৮৩; -ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, ৩; সমস্যা, ৩২
জমির
ফসলের ভাগ, ৮; সিলিং, ১১০
জয়নাল হাজারী, ১৮৬
জয়নুল আবেদীন, ১৮৭
জরুরী আইন, ১৯৭৪, ৩০
জাতিসংঘ, ৯৬-৯৭, ১২১; পুরস্কার, ১১৭; শান্তিরক্ষা মিশন, ২৮৩; সনদ, ১১১; সাধারণ অধিবেশন, ১৬
জাতীয় পার্টি, ৪৭, ৩৬, ৪৭, ৭৭, ১১৪, ১৪৫, ১৪৭-৪৮, ১৫৩, ১৫৯, ১৬৮-৬৯, ১৭১, ৩০৪
জাতীয় শ্রমিক লীগ, ২৬৭
জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪, ২৯৯-২০৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ২, ১২, ১২২, ১৭১
জাতীয়করণ, ২২, ৫৭
জাপান, ২৫, ৬০, ৬৩-৬৪, ৯৩, ১১৫, ১২১, ১৬৫
জামায়াতে ইসলামী, xii, ৩৭, ১৩৩, ১৬১, ৩০৪
জাহাঙ্গীর হোসাইন, ২৯২
জাহাঙ্গীর, আ.খ.ম, ২০৭, ২৭৬, ৩০৩
জিয়াউর রহমান, ii, ২০৯, ২১২, ২৫৩, ২৬২, ২৬৬, ২৭৯, ২৮০, ২৮৯, ২৯৯
জিয়াউল হক, xi
জিল্লুর রহমান, ১৯৬
জিল্লুর রহমান খান, ৪৪
জেলহত্যা মামলা, ২৯৫-২৯৭
জেলা পরিষদ, ৪৮, ৬৯, ৮৬; বিল, ৪৮, ৬৯
জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, ix, ১৯৬
জোট সরকার, ২১৩
জোসেফ, কিথ, ১০২
জ্যোতি বসু, ২১৪
টমাস, হ্যারি কে., ২৯০-৯১

www.pathagar.com

টরেন্টো কনফারেন্স, ৬৪, ১০৫
টাকার
বিনিময় হার, ১৭৬; মূল্যমান, ২১০
টাস্কফোর্স রিপোর্ট, ১৪৬
টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন, ২১১
ট্যাক্স হলিডে, ১১৩
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), ১২৪
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২৪৪
ঠিকানা প্রকল্প, ৯৮, ১১০
ডাকসুর নির্বাচন, ১৮
ডিজেল প্লান্ট, ৫৯
ডেনিং, লর্ড, ২৩৭
ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন, ১০, ১১, ৬৮
ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (ডি আই টি), ২৭
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, ২১২-১৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭-১৯
ঢাকা মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স, ১৪৭
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন, ১৭১-৭২
ঢাকেশ্বরী মন্দির, ৩৯
তাইওয়ান, ৬০, ১১৫, ১৫২, ১৬৪
তাজউদ্দীন আহমদ, ৩১, ২৯৫
তালুকদার মনিরুজ্জামান, ৩০
তাহের, ১৮৬
তিউনিশিয়া, ৫১
তিস্তাবাঁধ, ১৪৭
তেভাগা আন্দোলন, ৯৮
তৈরি
খাদ্য, ১১০; পণ্য, ৪, ২৬, ৬১; পোশাক, ১১৫
তোফায়েল আহমেদ, ১৩৮
ত্রিপুরা, জে. এল., ৮২
থাইল্যান্ড, ২৪, ৬০, ৭৪, ১০৩, ১১৫, ১৫২
থ্যাচার, মার্গারেট, ৪৬
দবিরউদ্দিন জোয়ার্দার, মোহাম্মদ, ১২৪
দি ট্রান্সফার অব প্রপার্টি এ্যাক্ট, ২৬৯, ২৭১-৭২, ২৭৪-৭৬
দি ডেইলি স্টার, ১৭৮
দি নিউ এজ, ২৮৪
দি বাংলাদেশ অবজারভার, ২১৪
দি বাংলাদেশ টুডে, ২১৪
দি স্টেটসম্যান, ২১৪
দি হিন্দুস্তান টাইমস্, ২১৪
দুর্নীতি দমন কমিশন, ২৮৫-২৮৭; আইন, ২০০৪, ২৪৩-২৪৭
দুর্নীতি দমন ব্যুরো, ২৪৫, ২৮৭
দেওয়ানী কার্যবিধি আইন, ২৬৯
দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধন, ২০১-০৪, ২১২, ২১৭-২২১, ২৩৫, ২৭৮
দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, ১৮৫
দেশবন্ধু চিনিকল, ২১০
দৈনিক আজকের কাগজ, ১৭৭-৭৮, ২০৯, ২৮৪
দৈনিক ইত্তেফাক, ১০, ১৮, ১৫৩, ১৭৭, ২১৩, ২৮১, ২৮৪
দৈনিক ইনকিলাব, ১৭৭-৭৮, ২৮০
দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭৬,১৭৯, ২১৪, ২৮১
দৈনিক জনতা, ২০৯
দৈনিক প্রথম আলো, ১৭৭-৭৯, ১৯৪, ২৭৭, ২৮০
দৈনিক বাংলার বাণী, ১৮, ৩১
দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৮০, ২১৩-১৪, ২৭৭, ২৮১
দৈনিক মানবজমিন, ১৮৬
দৈনিক যুগান্তর, ১৭৫, ১৮৬, ২১৫, ২৭৯
দৈনিক সংগ্রাম, ১৮৬, ১৯১
দৈনিক সংবাদ, ৩১, ২৯৬
দ্য কুয়েলার, প্যারেজ, ৯৬
দ্রুত বিচার আদালত, ১৮৭, ১৮৯-৯০, ১৯৩, ২১১-১২, ২১৮, ২২৭, ২৭৮
দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, ১৮৯-১৯৪, ২১১-১২, ২১৮, ২২০, ২২৭, ২৭৮, ২৮০, ২৮৩, ২৯৭
ধর্মনিরপেক্ষতা, ৩৩, ৩৬-৩৯, ৪১, ১৫৫
ধর্মযুদ্ধ, ৩৬, ১৫৫
ধর্মীয় রাষ্ট্র, ৩৯
ধলেশ্বরী নদী, ১২০
ধোলাই খাল কনসেপ্ট, ২৫,৬২, ১০১, ১১৪, ১৪৯
নজরুল ইসলাম, সৈয়দ, ১০, ২৯৫
নরসীমা রাও, ১৫৫
নাজিউর রহমান, ৮২, ৩০৫
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন, ১৮৩, ২২৩-২৯
নারী পাচার বিরোধী বিল, ৬৯, ১০৭, ১২৭
নারীর ক্ষমতায়ন, ২৫০, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৭-৫৮, ২৬৩-৬৪, ২৮৩, ২৯৯
নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি, ১০৩-১০৪, ১২০
নূরুল ইসলাম, ২৯-৩০
নুরুল ইসলাম মনি, ৯২, ১২৪
নূরে আলম জিকু, ৮১, ১২৪
নেহেরু, জওহরলাল, xv
নৌবাহিনী, ১৫৯-৬০
ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল, ১০৪, ১২৫
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২৪
পঞ্চশীলা নীতি, ৭৪-৭৫
পঞ্চানন বিশ্বাস, ২০৩
পর্তুগাল, ১০০, ১৫০
পরিবেশ, ১৪৮, ২১১; আদালত, ২২৭, ২২৮
পশ্চিম জার্মানী, ৭৮
পাঁচ দলীয় ঐক্যজোট, ১৭১
পাঁচশ আসনের পেশাভিত্তিক সংসদ, ৪৩, ১০৪, ১৩২
পাওয়েল, কলিন, ২১৩

www.pathagar.com

পাকিস্তান, xi, ২৪, ৩৬; আমল, ১১, ২৬; সংবিধান, ১৪, ১৫, ৩১, ৩৩, ৩৬, ১২৭-১২৮; সরকার, ৭৯
পানির হিস্যা, ৭৩-৭৫, ৭৭
পাবলিক ইন্ড্রাসট্রিয়াল কর্পোরেশন, ৫৯
পাবলিক কর্পোরেশন ম্যানেজমেন্ট অর্ডিন্যান্স, ৫৯
পারভেজ মোশাররফ, xi
পার্বত্য চট্টগ্রাম, ৭৯-৮৭, ১১৭, ১১৮, ১৯৩, ২৯২
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, ৮২
পুঁজি, ২, ৪, ২৭, ৫৯, ১১৩-১৪; প্রত্যাহার, ৫; বিনিয়োগ, ৮৯, ৯০, ৯৩, ১১৩-১৬
পুলিশ, ৮৬, ১১৭, ১৪৬, ১৫০, ১৭৯, ১৮৬, ২১২, ২২৪-২৫, ২৪৪-৪৫, ২৬৮
পেরেস্ত্রয়কা, ১০৪, ১০৭, ১১৯, ১২০, ১২১
পোলিও মুক্ত দেশ, ২১০
পোশাক শিল্পের রপ্তানী, ৬১, ১১৫
প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র, ১০৪, ১২০
প্রতিকৃতি, ২৪৯, ২৫৭, ২৬২
প্রতিরক্ষা বাজেট, ১১৭
প্রধান বিচারপতি, ১৩, ১৩৩-৩৪, ১৩৭-৩৯, ১৫৯, ১৭১-৭২, ১৭৫, ১৯৪, ২০৩, ২১১, ২৩২, ২৪১-৪২, ২৪৫
প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার, ১৫, ৩৭
প্রশাসন
আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ৫৮; জবাবদিহিতা, ৯৯-১০০; বিকেন্দ্রীকরণ, ১, ৬, ৭, ৯, ১৪, ৩৪, ৩৫, ৪৬-৪৭, ৯৫, ৯৮, ১০০, ১১০; দলীয়করণ, ১৫৪; পুরস্কার-তিরস্কারনীতি, ৯৫, ১০০
ফজলুর রহমান পটল, ১৬১
ফজলুল হক, এ, কে, ৩০
ফাইনার, এ. সি., ৩১
ফারাক্কা ব্যারেজ, ৭৫
ফারুক খান, ২০৭
ফিলিপাইনস, ১০৩, ১১৬, ১৭০
ফৌজদারী কার্যবিধি আইন, ১৮৯৮, ২৬৯
ফ্রান্স, ৯৬-৯৭
ফ্রান্সের পার্লামেন্ট, ২১৫, ২৮১; ফার্স্টলেডী, ৯৬-৯৭
ফ্লাড এ্যাকসন প্রোগ্রাম, ১৪৮
বজলুল হুদা, ৩৭, ৪৪, ১২৫, ১২৯, ১৩১, ১৩২
বদরুদ্দোজা চৌধুরী, এ.কিউ.এম., ১৬৩, ১৭৫
বন্যা, ৪৩, ৬৫, ৭১-৭৮, ৯৫-৯৬, ১১১, ১১২, ১২১, ২৯৫
বর্গাদার, ৫, ৭-৮, ৩৫, ৯৮, ১১০
বসতবাড়ি, ৪, ১১০
বস্ত্রখাত, ২৭, ১৬৪-৬৫
বস্ত্রশিল্প, ১৪৯-১৫০
বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা, ১২৮-২৯
বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি, ২৮৯
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, ১১৬
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), ১, ২, ৭, ১২, ৪৩, ১২৫, ১৩৫, ১৪৭, ১৫৭, ১৭১, ১৭৫, ১৮০, ১৮৬, ১৮৭, ২২৩, ২৫৩, ২৯৩, ২৯৬, ২৯৯
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ৫৬
বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি, ৫৯, ১৪৯
বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর), ১১৭
বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা, ১১৩
বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, ১১৩
বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতি, ১৪১-১৪৩
'বাংলাদেশী', ৩৮; জাতীয়তাবাদ, ৪০-৪১, ৫২
বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি, ১২
বাংলাদেশের স্বাধীনতা
ঘোষণা, ১৩; যুদ্ধ, ১৩, ২৪, ৩২, ৩৭-৩৯, ৫৭, ৭৫, ৭৭-৭৮, ১৪৫; যুদ্ধের চেতনা, ৩৭, সংগ্রাম, ৩৩; স্বাধীনতার সনদ, ১৫, ৩৩, ৩৭
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ২য় খণ্ড, ৩৬
'বাঙ্গালী', ৩৮; জাতীয়তাবাদ, ৪০-৪১, ৫৩
বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া, ৩, ৮, ১১, ৫৫
বাজেট বক্তৃতা, ২১-৩২, ৫৫-৭০, ১০৭-১২৫, ১৪৫-১৫৪, ১৬১-১৭০, ২০৯-২১৫, ২৭৭-২৮৪
বাটোয়ারা দলিল, ২৭০, ২৭৪
বান্দরবান, ৭৯, ৮৪
বাবরী মসজিদ, ১৫৫-১৫৮
বায়তুল মোকাররম, ৬১, ১৪৮, ১৫৩
বার কাউন্সিল, ২৩১-৩৫
বার্মা, ১৪১
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি), ১, ৩, ১১, ৯৬, ১৬১, ১৬৭
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর), ২০১-২০৪, ২০৭, ২১৮, ২৭৮; আইন, ২১১, ২২৭
বিচারপতিদের অবসর, ২৫৫-২৫৬, ২৫৮-৫৯, ২৬৪-২৬৫
বিচার বিভাগ, ২৩১; পৃথকীকরণ, ১৩৮, ২১৩; স্বাধীনতা ১৪, ১৭২, ২৬৬
বিচার ব্যবস্থা, ৩৪, ৫১, ১২৮-২৯; বিকেন্দ্রীকরণ, ৩৩-৩৪, ৪৬
বিজয় সরণী, ১৬৯
বিদ্যুৎ উৎপাদন, ৪৯, ৬২, ৬৫, ১০৩-০৪, ১১৮, ১৪৭, ১৬৯
বিদেশী উদ্যোক্তা, ৩২, ৬৩, ১১৪
বিদ্যুৎনগরী, ৬২
বিনিয়োগ, ২১, ২৩, ৫৭, ৮৯;-আইন, ৮৯-৯০; নীতি, ২৯; ফোরাম, ৩২; বোর্ড, ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৪, ১০১, ১১৪;
বিপ্লবী দল, ১২
বিশেষ আদালত, ২২৭-২২৯
বিশেষ জজ আদালত, ২২৭
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট, ৪৯; স্বায়ত্তশাসন, ৪৯

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাংক, ৩১, ৩৫, ৯৬, ১২৪, ১৪৬, ১৬২, ২৪১, ২৬৩, ২৮১, ২৯১
বিশ্বরোড, ১৬৯
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডবলিউ এইচ ও), ৮
বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ১৫৬
বীজ, ১১২, ১৪১; কর্পোরেশন ১১২
বৃহত্তর ঢাকা শহর বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, ৯৮
বেকারত্ব, ১, ১০১, ১১২, ১২১, ১৫৩, ১৬৩
বেসরকারী খাত, ৪, ২৮, ৬০, ৬২, ৮৯, ১০২, ১১৩-১৫, ১১৯, ১৩৫, ২৭৮; বিনিয়োগ, ১৬২-৬৩
বেসরকারীকরণ নীতি, ১০২
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, ৯৩
বৈদেশিক ঋণ, ৬৪, ৬৫, ১১৯; গ্রহণ নীতি, ১-২
বৈদেশিক মুদ্রা, ২৬, ১০৫, ১৪৭; মজুদ, ১০৩, ১১৮, ১৪৭, ১৬১, ১৬২, ১৭৬, ২১০, ২১১
বৈদেশিক সাহায্য, ১২৩; নির্ভরশীলতা, ২২
বৈদেশিক সাহায্যের ফাঁদ (Aid trap), ১০৯, ১৪৯, ১৬১
বৌদ্ধ
কল্যাণ ট্রাস্ট, ৩৯, ৮৪; ধর্ম, ৫১; বিহার, ৩৯; সম্প্রদায়, ৩৮-৩৯
ব্যর্থরাষ্ট্র, ২৮৪
ব্যাংক ঋণ, ৬১, ৮৯, ১৯০
ব্যাংকের ঋণদান ও অর্থায়ন প্রক্রিয়া, ৮৯
ব্রহ্মপুত্র ব্যারেজ, ৭৮
ব্রিটিশ
পার্লামেন্ট, ১৩; হাউস অব কমন্স, xvi, ২৫৪; লেবার পার্টি, ২২
ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি) ২১৩, ২৯৬
ভারত, ix, xi, xv, ২৪, ৩৭, ৪০, ৪৬, ৫০, ৫৩, ৬২, ৭৩, ৭৫, ৮৭, ১০৪, ১২০, ১৫০, ১৫৮, ১৬৬, ২৫৩, ২৬৫, ২৮১, ৩০৪
ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), ১৫৫, ১৫৬; রথযাত্রা, ১৫৬
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ১৫৫-৫৬
ভি পি সিং সরকারের পতন, ১৫৬
ভিয়েতনাম, ১০৪, ১৭০
ভূমি
নীতিমালা, ৭; ব্যবস্থাপনা, ২৬৯, ২৭০, ২৭৬; রেজিস্ট্রেশন, ২৬৯-৭৮; সংস্কার, ১-২, ৫-৭, ৬৫, ৯৫, ১২০; হস্তান্তর, ১৭০, ২৭৬
মকবুল হোসেন, ১৮৬
মঞ্জুর কাদের, ১৩৮
মতিন, এম. এ., ১৫, ২৯-৩০, ৪৫, ১১১
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ, ১৩৪, ১৩৫
মনসুর আলী, মোঃ, ২৯৫
মনিরুল হক চৌধুরী, ৯৫
মন্ত্রিপরিষদ, ১, ৬, ১৪৬, ১৬২, ১৭৫, ১৯৭, ২১২, ২১৭, ২২৪, ২৪৪, ২৭৩-৭৪, ২৯৩
মন্ত্রিসভা, ১, ৬, ১৪৬
মফিজুর রহমান রোকন, ৫৩, ১২৪
মরিতানিয়া, ৫১
মরিস, জে., ৯৫
মল্লিক, এ. আর., ২৯
মশিউর রহমান, মোঃ, ২০৪-০৫
মশিউর রহমান রাঙ্গা, ২৩৪
মহাজন, ১১০
মহাজনী ঋণ, ৯৮
মানবেন্দ্র নাথ লারমা, ৮২
মান্নান, এম. এ., ৩৭, ৪০
মামলা ব্যবস্থাপনা, ২৪১-৪২
মায়ানমার, ১৪১-৪৩
মার্শাল ল কোর্ট, ১৯
মালয়েশিয়া, ৫১, ৬০, ৯০, ১০৩, ১৭০
মাহবুব-উদ্দিন আহমাদ, খন্দকার, ২৪৪, ২৪৬, ২৬০, ২৯২
মাহমুদুল ইসলাম, ২১৭, ২২৪, ২৩৬-৩৭
মিজানুর রহমান চৌধুরী, ৩৬
মির্জা আজম, ২০৭
মির্জা সুলতান রাজা, ১৬
মিশুক, ২৫-২৬
মুক্তিযুদ্ধ, ১০৮, ১২৮, ১৭৭, ২১১
মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ৬৭
মুজাফ্‌ফর আহমদ, ৫৭
মুজিবনগরের স্মৃতিসৌধ, ১৪৮
মুজিবর রহমান, ৩০
মুজিবুর রহমান (মানিক), ২৮৩
মুদ্রার অবমূল্যায়ন, ১৭৬
মুদ্রাস্ফীতি, ৪, ২১, ২৩, ২৬, ১৬২, ১১৮
মুসলীম লীগ, ১২
মুহসীন হল, ১৯
মেকং নদী, ৭৪-৭৫
মেক্সিকো, ৭৪
মোক্তার হোসেন জোয়ার্দার, ১৩১
মোতাহার হোসেন, ২০৩
মোশতাক আহমদ, খোন্দকার, ২৯৫
মোস্তাফিজুর রহমান, ১২৪
মোহাম্মদ জহির, ২২৪, ২১৭
মোহাম্মদ নাসিম, ১৩৮, ২০৭, ২৩৭, ২৭৭, ২৭৯, ২৯০-৯১, ২৯৫-৯৬, ৩০৪
মোহাম্মদ শাহজাহান, ৫৯, ১২৪-২৫, ১৩১
মৌলবাদ, ৩৭, ৪০-৪১
মৌলিক অধিকার, ১৪, ৫২, ১২৮
ম্যাকনামারা, রবার্ট, ৩১
ম্যাকিয়াভেলী, ৩৬
যমুনা সেতু, ১২০, ১৪৮

www.pathagar.com

যুক্তফ্রন্ট, ১৩, ১১৩, ১৪৭
যৌথ অভিযান, ১৯৫-৯৯
রওশন এরশাদ, বেগম, ১৬৯
রক্ষী বাহিনী, ১৮৬
রপ্তানী, ২১, ২৫, ৩১-৩২, ৬০-৬৪, ৯২, ৯৪-৯৫, ১০২, ১১৫-১৬, ১৪৭, ১৫০, ১৬১-১৬৬, ১৬৯, ২১৯, ২৮৯-৯০
রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, ২৮৯
রফিকুল হক, ২১৭, ২২৪, ২৩৬
রহমত আলী, মোঃ, ২০৩, ২৭৬, ২৮৫, ৩০৩
রাঙ্গামাটি, ৭৯, ৮৪-৮৫
রাম জন্মভূমি, ১৫৬
রাশেদ খান মেনন, ১৪২, ১৬০
রাষ্ট্রধর্ম, ৫১
রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, ৩৩, ৩৫, ৩৯, ৫০, ১২৮
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ৭, ১১, ৫২
রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা, xi-xii, ৬, ৪৩, ১২৭
রিডার্স ডাইজেস্ট, ৪৬
রিগ্যান, প্রেসিডেন্ট, ৯৬, ১২১
রেজাউল বারী ডিনা, ১৯৮
রেজিমেন্টেড
ইকনমি, ৫৭; সোসাইটি, ২২-২৩, ৪০; সোসালিস্ট ইকনমি, ১০০, ১১২
রেফারেন্ডাম, ৩৫
রেহমান সোবহান, ২৯, ৫৭-৫৮
রোকন উদ্দিন মাহমুদ, ২১৭, ২২৪, ২৩৭
রোকেয়া সরণী, ১৬৯
রোমান ক্যাথলিকইজম, ৫১
লংমার্চ, ১৫৬
লজ অব কনটিনুয়ান্স এনফোর্সমেন্ট অর্ডার, ১৫
লতিফ মুন্সী, ১৬৯-৭০
লাওস, ৭৪
লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৬৫-৬৬
লাঙ্গলবন্দ ঘাট, ৩৯
লায়লা সিদ্দিকী, বেগম, ১৬
লারমা, এম, এল, ৮২
লালবাগ হত্যাকাণ্ড, ১৭১-১৭৩
লিগাল এন্ড জুডিশিয়াল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প, ২৪১
শওকত আলী, ২৭৭
শহীদ মিনার নির্মাণ, ১৪৮
শাজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬৯
শাজাহান সিরাজ, ৩৫-৩৬, ৪০, ৪৫, ৪৭, ৭১, ৮১, ৯৩, ১০০, ১০৯-১০, ১১৭, ১২৩-২৪, ১৩২, ১৯২, ২১১
শান্তি বাহিনী, ৮৫
শামসুল হুদা চৌধুরী, ৬৬-৬৭
শাহ আজিজুর রহমান, ৬
শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ৩৬
শাজাহান খান, ২০৪, ২৯১-৯৩, ৩০৩
শামীম ওসমান, ১৮৬
শাহীন, এম. এম., ২২৮, ২৮৭
শিক্ষা, ২১, ২৩-২৪, ৪৯, ১৬১; খাত, ১৫১, ২৮২-৮৩; নীতি, ১৫১; বরাদ্দ, ৬৫, ২১১; বিস্তার, ১১১-১২; হার, ১০৩
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্দুকযুদ্ধ, ১৫২; সেশনজট, ১৭, ৪৯
শিব সেনা, ১৫৫, ১৫৬
শিল্প
উদ্যোক্তা, ২৭; ঋণ, ১১৩; কনসোর্টিয়াম করে অর্থায়ন, ১১৩; কাঁচামাল, ৪, ২১, ১২৪-১৫; খাত, ২, ৫, ২১, ৭২, ৯০, ১১৫, ১৬৪-৬৫; নগরী, ২৮, ১০১, ১১০, ১১৩; নীতি, ২১, ২৬, ৪৬, ৫০, ৬০, ৬৩, ৮৯, ৯০, ৯১, ১০১; প্রবৃদ্ধি, ১৪৭; বিনিয়োগ, ৮৯-৯৩, ১১৪; বেসরকারীকরণ কর্মসূচি, ৯০; বিপ্লব, ৯২; সরকারী ও বেসরকারী বৈষম্য, ১১৩; ব্যবস্থাপনা, ১; ব্যাংক, ২৮, ৬১
শিল্পায়ন, ২৭, ৬১, ৬৩, ৮৯, ৯১, ১২৩, ১৪৯, ১৬১-৬২, ১৬৪-৬৫
শুল্ক, ৪, ২৬, ২৮, ৬১; শুল্ক কাঠামো, ৬, ২৬, ১০৩, ১৬৫; পুনর্বিন্যাস, ৬১, ১০৩, ১১৪
শেখ ফজলুল হক মনি, ৩০
শেখ মুজিবুর রহমান, xii, ৩০, ৫০, ৯৩, ১৯১, ২১২, ২৭৮-৭৯, ২৯৫
শেখ সেলিম, ২৫, ৩০
শেখ হাসিনা, ১, ১৪২, ১৭৯, ১৯৪, ১৯৬, ২০৯, ২১৩-১৫, ২৫২-৫৩, ২৬০-৬১, ২৮১-৮২
শ্রম আইন, ১৫০; শ্রমনীতি, ৬০, ১৫১
শ্রমিকদের মালিকানা, ৫৯-৬০
শ্রীলঙ্কা, ৯৪
শ্রীহরি ঠাকুর, ৩৯
সংখ্যালঘু, ৪১; নিপীড়ন, ১৫৬-১৫৮
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ১৪, ৫১, ১২৮
সংবিধান, ১৯৭২, ৯, ৩৩-৩৫, ৪৭-৪৮, ১২৮; পরিবর্তন, ৫৮; পুনর্বহাল, ৭
সংবিধান সংশোধনী, ১২৮; তৃতীয়, ২৮, ১২৮, ১৩৫; চতুর্থ, ৯, ১৯৫-৯৬, ২১০, ২৯৭; পঞ্চম, ১৩; ষষ্ঠ, ১২৮; সপ্তম, ১৩-১৬; অষ্টম, ৩৩-৪২, ৫০, ৬৮-৭৯, ১২৮; নবম, ১০৭, ১২৭-১৩৩; দশম, ২৬২; একাদশ, ১৩, ১৩৭-১৩৯; দ্বাদশ, ১৩৭; ত্রয়োদশ, ১৭৭; চতুর্দশ, ২৪৯-২৫৬
সংবিধানের ধারাবাহিকতা, ১৩-১৪, ১২৫
সংযোজন শিল্প, ২১, ৬১
সংসদ বর্জন, ২৮৩-৮৪
সংসদ সদস্য
এডিপিতে অংশগ্রহণ, ৩; শপথ গ্রহণ, ১১, ২৫০, ২৫৮
সংসদীয় গণতন্ত্র, xi, ১২৮; পুনঃপ্রবর্তন, ২৬৬; সরকার পদ্ধতি, ১২৭
সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন, ২৫০, ২৫২-৫৩, ২৫৮, ২৬২, ২৮২

www.pathagar.com

সন্ত্রাস দমন, ১৭, ১৫২, ১৬০, ১৭২
সমাজতন্ত্র, ২২-২৩, ২৮-২৯, ৫৭, ৯৩
সমাজতান্ত্রিক
অর্থনীতি, ৫৭-৫৮; দল, ২৮; পদ্ধতি, ২২
সফিউর রহমান, ১৭৯
সরকার
আমলা নির্ভরতা, ২; আর্থিক নীতিমালা, ১-২; জবাবদিহিতা, xiv, ২১; ধারাবাহিকতা, ১৩; নির্বাহী ব্যয়, ৩; পরনির্ভরশীলতা, ১২৩; পরিসর সংকোচন, ১; বিকেন্দ্রীকরণ, ১, ২, ৪৭; শিল্পোন্নয়নের দিক্-নির্দেশনা, ৫৯; স্বচ্ছতা, xiv
সরকারী খাত, ২৩; বেসরকারী খাতের সঙ্গে ভারসাম্য, ৯৫; লোকসান, ১৭৭; শিল্প-কারখানা, ৫৮-৬০, ২১০
সাইদুজ্জামান, মোহাম্মদ, ২১
সাইফুর রহমান, ১৫০, ১৬৭, ২৭৭
সাংবিধানিক
কাঠামো, ১২৮; নিশ্চয়তা, ১৪; রাজনীতি, ১২৭; শূন্যতা, ১২, ১৩৭; সংকট, ১৩; সরকার, ১৪
সাদেক হোসেন খোকা, ১৭৮
সাধারণ নির্বাচন, ১৯৮৬, ৭, ১০; ১৯৮৮, ৪৩
সামরিক
অভ্যুত্থান, ৩১, ২৯৫; আইন, ৭, ১০-১২, ৩১, ৪৫, ১২৭-২৮; বাহিনী, ১, ৪৫, ১২৭; শাসন, ix-x, ৭, ১১-১২, ৪৫, ১২৭-২৮
সামষ্টিক অর্থনীতি, ১৪৫-৪৬, ১৬১-৬২, ২১০
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ৪০, ১৫৫-৫৬
সার্ক, ৭৭-৭৮, ৯৬, ১২১, ১৫৭
সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি, ১৬৪
সালাউদ্দিন ইউসুফ, ১৩৮, ১৭২
সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, ১৯৮, ২১০
সাহাবুদ্দিন আহমদ, ১৩, ১৩৩-৩৯, ১৭৫-৮০
সিঙ্গাপুর, ৬০, ১২৫, ১৬৪
সিপাহী-জনতার বিপ্লব, xii, ২৯৫
সিরাজুল আলম খান, ৪৪
সিরাজুল হক, ১৯১, ২৯৫-৯৬
সুকর্ণপুত্রী, ২১৩
সুকী, ১৪১-১৪২
সুদান, ৫১
সুপ্রীম কোর্ট, ৩৩, ১৯৬, ২০৩, ২১১-১২, ২৩১-৩২, ২৭৮-৭৯, ২৫৮, ২৮৫, ২৮৭-৮৮, ২৯৭; বার সমিতি নির্বাচন, ২৩২-৩৮
সুফিয়া কামাল, বেগম, ৫৮
সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ২৩, ২৯, ৩১, ১৮৬, ১৯১-৯২, ১৯৪-৯৫, ১৯৮, ২৩৭, ২৫২, ২৬১, ২৬৩, ২৯১-৯৩, ২৯৫-৯৬, ৩০১-৩০৪
সুলতান রাজা, মির্জা, ১৬
সুশাসন, ৪৬, ২১১-১২, ২৭৮
সেনাবাহিনী, ১৩, ১৪, ৬৪, ১৬০, ১৭৯, ২৮৩
সেভেন-নেশন্ ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেশন্স সামিট, ১২১
সোভিয়েত ইউনিয়ন, ix, ২২, ৬৪, ১০২, ১১৮
সোলার্স কমিটি, ৫২
সোলার্স, স্টিফেন, ৫২, ৭৮
সোহরাওয়ার্দী, হুসেইন শহীদ, xi,
সৌদি আরব, ix, ৫১, ১৩৫
স্টক এক্সচেঞ্জ, ৪, ১১৬
স্টেট
এথিইজম, ৪০; কনট্রোল, ১১৩; ক্যাপিটালিজম, ১০০; প্রিন্সিপল্, ৩৮
স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট, ১২৮
স্থানীয় শাসন, ৯, ৪৭-৪৮
স্থানীয় সরকার, ৫১, ১৪৭-৪৮; আইন, ৭৯; গভর্নর পদ্ধতি প্রশাসন, ৯, ৪৮; পরিষদ, ৮৬; নির্বাচন, ২৪৯-৫০, ২৫৫
স্পীকার নির্বাচন, ১০, ১১, ৬৮
স্বাস্থ্য, ৬, ১১০, ২১৯, ২৮৩
হংকং, ১১৫, ১৬৪
হত্যাকাণ্ড ও হত্যা মামলা, ১৮৬-৮৭, ১৯০-৯১, ২১২, ২২০, ২৭০-৭১, ২৭৯-৮০, ২৯৭
হরতাল, ১৮০, ২১৩, ২১৮, ২৭৮
হাইকোর্ট বিভাগ,
বিচারক নিয়োগ, ২৭১; স্থায়ী বেঞ্চ, ৩৩
হান্টিংটন, স্যামুয়েল, ৩১
হাজী দানেশ, ৯৮
হাজী সেলিম, ১৮৬
হাফিজউদ্দিন আহমেদ, ২৩৪
হামিদ আসাদী, ৯৬, ৯৮
হারুনুর রশীদ, ২৩৭
হার্ট, মাইকেল, ৪১
হাসান আরিফ, ২১৭, ২২৪, ২৩৬
হিন্দু
কল্যাণ ট্রাস্ট, ৩৯; জঙ্গীবাদী, ১৫৫; তফশীলী কল্যাণ ট্রাস্ট, ৩৯; তফশীলী সম্প্রদায়, ৩৯; মৌলবাদী, ১৫৬
হুমায়ুন কবির, ৩২
হেবাদলিল রেজিস্ট্রেশন, ২৭০, ২৭৪
হোয়াইট হাউস, ৯৭
হোসিয়ারী নগর, ৬২
হোস্টপার, জেরেমি, ৯৭
হ্যাভেল, ভ্যাকলাভ, ১৪২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইউপিএল প্রকাশনা

মওদুদ আহমদ

বাংলাদেশ:
শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল

•

গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ
প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সামরিক শাসন

•

বাংলাদেশ:
স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা

মোঃ আনিসুর রহমান
অপহৃত বাংলাদেশ

আবদুল আউয়াল মিন্টু
বাংলাদেশ: পরিবর্তনের রেখাচিত্র

জয়া চ্যাটার্জী
বাঙলা ভাগ হল
হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ
১৯৩২-১৯৪৭

মোহাম্মদ আসগর খান *সম্পাদিত*
ইসলাম, রাজনীতি এবং রাষ্ট্র
পাকিস্তান-অভিজ্ঞতা

সন্তোষ গুপ্ত
সমাজতন্ত্রের অন্য ইতিহাস

হায়দার আকবর খান রনো
সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সত্তর বছর

মঈদুল হাসান
মূলধারা '৭১

আকবর আলি খান
পরার্থপরতার অর্থনীতি

নারিয়াকি নাকাজাতো
পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্থা
১৮৭০-১৯১০

ISBN 984 05 0278 6
9 789840 502783